প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই বৈশাখ, ১৩৮০

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
বিভূতি
সেনগুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ.,
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

'যাদুদা'র

(ডাঃ শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়)

করকমলে

শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

স্নেহধন্য

কালীচরণ

নিবেদন

কয়েক বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর, 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' শেষ হইয়াছে। ঘটনা, নাম ও তারিখের যে এত বিরাট সমাবেশ হইবে, সে-ধারণা আমার ছিল না। কয়েকটি অমার্জ্জনীয় ভুল নজরে পড়িয়াছে; তন্মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম এ-তালিকায় সর্ব্বপ্রধান। অজ্ঞতা, অনবধানতা এবং অতিবার্দ্ধক্যই ইহার কারণ।

অনেক নাম বাদ পড়িয়াছে, তাহা সুনিশ্চিৎ। তিন বৎসরের কম যাঁহাদের দণ্ড-কাল, তাঁহাদের নাম এ-গ্রন্থে যে নাই, তাহা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। একেবারে শেষের দিকে, 'ফ্রীডম ফাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন' (Freedom Fighters' Association)-এর পক্ষে অনুজপ্রতিম শ্রীনয়নাঞ্জন দাশগুপ্তর যত্নে কতকটা অভাব দূর হইয়াছে। পরমশ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ অনেকগুলি নাম সম্পর্কে ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। বর্ণানুক্রমিক-সূচী-প্রণয়নে তাঁহার অকুণ্ঠ সহায়তা আমার প্রচুর শ্রম লাঘব করিয়াছে। আমি উভয়ের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

শেষ পর্য্যন্ত কবির ভাষায় বলিতে পারি,—

"কিন্তু যদি দয়া কর   ভুল দোষ গুণ ধর"

তাহা হইলেই সহৃদয় পাঠকবর্গ পুস্তকখানি সরাসরি বর্জ্জনের বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন। সমস্ত ত্রুটির জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই।

বিনীত

১৫. ৪. ৭৩ গ্রন্থকার

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
৩০৬	৩১	ফাঁসিকাঠে	প্রেসিডেন্সী জেলে ফাঁসিকাঠে
৩০৭	১৪	ফাঁসি	প্রেসিডেন্সী জেলে ফাঁসি
৩২৮	২৮	বিঘাটি	বাজিতপুর
৩৩৮	১৮	সেণ্ট্রাল	প্রেসিডেন্সী
৪১৭	২৯	শচীন্দ্র	সত্যেন
৪৯৩	২১	বিষ্ণুচরণ	বিষ্ণুশরণ
৪৯৪	২	নাইনী	এলাহাবাদ সেণ্ট্রাল
৫১৪	১৭	ড়ুমড়ুমা	ধুম
৫১৬	১	ত্রিগুণা	ত্রিপুরা
৫১৬	১	ঘোষাল	লালা
৫১৬	২	যতীন	জিতেন
৫৩৯	১৭	চট্টগ্রাম	ময়মনসিংহ
৫৮০	৩	কেদারনাথ	কেশবলাল
৬৫২	২০	পর্ণচন্দ্র	পূর্ণচন্দ্র

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

বিস্ফোরণ

'সন্তবামি'

কংগ্রেসের জন্মের আগে থেকেই বাঙ্গালীর দাবীদাওয়া নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে বাক্ ও লেখনী সাহায্যে তর্জ্জমা শুরু হয়েছিল একশ্রেণীর লোকের, বিশেষ করে ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষিতের সঙ্গে। সেটা ছিল শান্তির পথ। কংগ্রেস সে-ধারা বজায় রেখে চলেছে ; তবে ১৯০৭ সালে সুরাটে প্রকাশ্যভাবে দুই মতের সঙ্ঘর্ষ ঘটে। সে কেবল ধূমায়িত বহ্নির বহিঃপ্রকাশ।

বাঙ্গলায় এ ভাবধারা ছড়িয়ে পড়তে বিশেষ বিলম্ব হয়নি। স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন বড় করে মনে ওঠে। এই বিপদের মধ্যে কারা এসেছিলেন, আর কেন এসেছিলেন ? প্রথম যুগের যাঁরা যাত্রী, মোটামুটি পরিচয় দেবার মত বংশগৌরব তাঁদের ছিল। ঘরে তাঁদের অন্নাভাব ছিল না ; সংসারে শিক্ষার চর্চ্চা ছিল এবং তাঁরা নিজেরা মোটামুটি "শিক্ষিত" ; আর ছিল ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি। পরিবারে ছিলেন স্নেহময়ী মাতা এবং মমতায় পরিপূর্ণ অপরাপর আত্মীয় ও আত্মীয়া। এঁদের অনেকেই বংশের দুলাল, ভবিষ্যতের আশা-ভরসা-স্থল ; মাতাপিতার নয়নের মণি। প্রায় সকলেই সুস্থ, সবল, চরিত্রবান, পরদুঃখকাতর, আত্মসুখে অনবহিত, কৃচ্ছ্রসাধনে অপরাঙ্মুখ, নিজেদের পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তালেশহীন। মোটামুটি "বেপরোয়া" ভাব প্রভৃতি গুণ বা দোষ তাঁদের নিজস্ব পরিচয়।

সকলেই যে সব দিক বিচার করে এসেছিলেন, তা নয়। দেশসেবায় উৎকট নির্য্যাতন সহ্য করতে, জীবন আহুতি দিতে সকলেই সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন, এ কথা সত্য নয়। কিন্তু তাঁদের অন্তরে যে গভীর দেশপ্রেম ছিল, পরাধীনতার ব্যথা যে তাঁদের চিত্ত উদ্বেল করে তুলেছিল সে-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। তাঁদের মূল প্রেরণা যুগিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা-লাভের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কয়েকজন যুগন্ধর মহামানব। দেশের দুর্দ্দশায় যাঁদের মন কাঁদতো, তাঁদের ঘর থেকে মায়ের আঁচল ছাড়িয়ে এঁরাই বার করে এনেছিলেন আদর্শ দিয়ে। সন্দেহগ্রস্তর মনে সাহস দান করে এই মহাপুরুষরাই অনুগামীদের নিজের পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখার ইচ্ছাকে প্রতিনিবৃত্ত করে রেখেছিলেন।

সাধারণ জাগতিক বুদ্ধিতে এই ঘরছাড়ার দলের কার্য্যবিধি বোঝা বড়ই কঠিন। সকল তর্কবুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে এক অতীন্দ্রিয় ব্যথা-বেদনার অনুভূতি তাঁদের কাজের মূল উৎস। ভাষা সে-ভাব-প্রকাশে সম্পূর্ণ অক্ষম। প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিঃশেষে রুদ্ধ। অন্ধ আবেগ কেবল বিপদসঙ্কুল, অজানা-অচেনা পথে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। মৃন্ময়ী দেশ চিন্ময়ীরূপে ফুটে উঠে মনের অতল

গভীরে অমিত বল সঞ্চয় করতে সহায়তা করেছে, উন্মাদনায় অগ্রপশ্চাৎ ভাববার সময় পর্য্যন্ত দেয়নি। সে শক্তি একবার জাগ্রত হয়ে আর আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি ; অবিরাম গতিতে চলেছে,—স্নেহ-মমতার বন্ধন, মঙ্গলামঙ্গল সকল চিন্তার বাঁধ ভেঙ্গে দুকূল প্লাবিত করে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

এর জন্য তাঁদের নূতন করে কোনও চেষ্টা করতে হয়নি। বেঁচে থাকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত স্বভাবসিদ্ধ রীতি হিসাবে এ প্রেরণা জেগে উঠেছে।

"সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে,
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে"

—সেই প্রকৃতির নিয়ম এঁদের অভিভূত করেছিল। কস্তুরীমৃগ আপনার নাভির গন্ধে আত্মহারা হয়ে ছুটে বেড়ায়,—পতঙ্গ অগ্নিতে আত্মনাশে পরা শান্তি লাভ করে। এই ধারা থেকে বিপ্লবী জীবনের গতির একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। পুঞ্জীভূত আবেগ বহিঃপ্রকাশ চাইছে। তাই—

"জাগিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর ?"

বিপদের সম্ভাবনা নির্দ্দেশ করে বহু সাবধানতা-বাণী উৎসারিত হয়েছে। "ও-পথে যেও না, ফিরে এস বলে কানে কানে" কত শুভানুধ্যায়ী মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। তাঁদের "করিয়াছে অবিশ্বাস মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস অতি পরিচিত অবজ্ঞায়"। তাঁদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে গন্তব্য পথের শেষ মৃত্যুর আলিঙ্গনে ; প্রত্যাবর্ত্তনের পথ ধ্বংসের প্রতীক নরকঙ্কাল-সমাকীর্ণ।

কালে কালে দেশে দেশে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলেছে। "আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান" তাঁদের মাতিয়ে তুলেছিল। মাতৃনামের মন্ত্রগ্রহণে স্বাধীনতার রশ্মিরেখা লক্ষ্য করে তাঁরা চলেছিলেন। দুর্দ্দশার ভয় দেখিয়ে তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা চিরতরে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। সত্য-সত্যই এঁরা জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের দেশ "স্বর্গ হতে(ও) মহা মহীয়ান্"। তাঁদের কাছে "স্বর্গ স্বর্গ করে লোক, সার তার নাম, প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম"।

বাঙ্গলার এই দধীচির দলের নিকট মায়ের সেবায় জীবনপাত "স্বর্গসুখ" হতেও লোভনীয়। এঁরা বলছেন—

"মিশেছ মোর দেহের সনে
মিশেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি মর্ম্মে গাঁথা।"

অবিচ্ছেদ্য মধুর সম্পর্ক এক জনমের নয়,

"আমি জানি ভাগ্য মোর
তব সনে গাঁথা,
জন্ম-জন্মান্তর হতে
অয়ি ! চির মাতা।"

সহস্র বৎসরের পরাধীনতার অন্ধকার আপনজন চিনে নেবার পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়েছে সেই অবলম্বনের কথা, যাঁকে পেলে নিজেকে সংযত সংহত শক্তিমান বলে মনে করতে পারা যাবে।

"আপন মায়েরে চিনেছি এবার,
লভেছি বিরাম স্থান জুড়াবার
'মা' বলে ডাকিতে হৃদয়ের দ্বার
চকিতে গিয়াছে খুলিয়া।
দূরে গেছে ভয় ভাবনা দীনতা,
ঘুচে গেছে লাজ দারুণ হীনতা,
প্রাণের আবেগে দেহের ক্ষীণতা
গিয়াছি সকলে ভুলিয়া।"

তার ফলস্বরূপ

"শত বলে মোরা আজ বলীয়ান্
হৃদয়ের তেজে স্ফুরিত নয়ান
'মা' নামে গভীর ভকতি।"

এই মাতৃনাম কষ্ট করে গ্রহণ করতে হয়নি। "শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে" সেই ভাবে এই অভয়মন্ত্র অন্তর থেকে অজ্ঞাতসারেই উৎসারিত হয়েছে। মা-ও তাঁর "ভৈরব দুর্জ্জয় আহ্বান" প্রেরণ করেছেন। আর

"হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্ম-শোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।"

সবই বিস্মৃতির তলে চলে গেছে।

"কবে আসিয়াছি, কোথা আসিয়াছি,
কেন আসিয়াছি ? গেছি পাশরিয়া,
তোমারই পতাকা করিয়া লক্ষ্য,
আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া।"

সঙ্গে সঙ্গে এ বাণী তাঁরা মোটেই বিস্মৃত হননি—

"তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি।"

তাঁরা এ প্রচণ্ড প্রাণান্তকারী কর্ম্মভার হাসিমুখে কাঁধে নিয়েছিলেন। তাঁরা শুষ্ক বারুদের স্তূপের ওপর বহ্নিশিখা স্পর্শ করিয়েছিলেন। দেশ বিকম্পিত করে দারুণ বিস্ফোরণের শব্দ সমস্ত জাতির মোহনিদ্রা নিষ্ক্রিয়তা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছিল।

অবিসম্বাদিতরূপে বাঙ্গলায় বিপ্লব-যজ্ঞের যিনি হোতা, সেই ঋষি অরবিন্দ বলেছেন—"যদি দেশকে শুধু একটা ভৌগোলিক অবস্থিতি, কতগুলো মাঠ-বন-পর্ব্বত-নদীর সমষ্টি এবং কয়েক লক্ষ ভালমন্দ মানুষের বসবাস (ভূমি) বলে মনে করতাম তাহলে নিজের ও দশজনের জীবনকে বিপন্ন করতাম না মোটেই। আমি তো জড়বাদী নই। দেশকে আমি 'মা' বলে অনুভব করেছি, পূজা করেছি, তোমরা যেমন মাকে পূজা কর। তোমাদের রক্তমাংসের দেহের মত দেশও জীবন্ত, প্রাণবন্ত; তা না হলে দেশপ্রেম হয় না।" ('পুরোধা', "স্বপ্ন", ১৯৬৮ জানুয়ারী)

দার্শনিক, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, দেশপ্রেমিক স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী এই নব-জাগরণকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন--এটা আকস্মিক বা আঞ্চলিক ব্যাপার নয়। তিনি 'শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা' (বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪) পত্রিকায় লিখেছেন ঃ

"বিংশ শতকের প্রারম্ভ এক মহা যুগসন্ধিক্ষণ। সে সন্ধিক্ষণ মহান এইজন্যে যে, কালশক্তি অথবা যুগদেবতা কোনো এক সীমিত দেশে, স্তরে, পর্ব্বে, বা ভূমিকায় তার আরব্ধ বিপ্লব সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।

"ভারতের ইতিহাসে মুখ্যতঃ মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশে বিপ্লব-শক্তি-জাগৃতির সূচনা হইয়া থাকিলেও, তার ব্যাপ্তি কোনো প্রাদেশিক গণ্ডী মানিয়া লয় নাই।

"কেবল তাহাই নয়, সে শক্তি-জাগৃতি নানারূপে, নানাছন্দে সারা ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

"মানবগোষ্ঠীর বা সমাজের স্তর-বিশেষেই উহা সীমাবদ্ধ হয় নাই। সাধারণতঃ গণজাগরণই এর রূপ এবং বিপ্লবই (সহিংস-অহিংস) এর ছন্দ। আবার রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক কোনো পর্ব্ববিশেষেই ইহা নিঃশেষিত হয় নাই। মানুষের পূর্ণ অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স্ বা সর্ব্বাঙ্গীণ সর্ব্বজনীন মুক্তিই এর প্রেরণা-মূল ছিল।

"কাজেই সে-লক্ষ্যের অনুরোধে এর ভূমিকা-বদলও হইয়াছে।

"প্রতি ভূমিকায় যে কর্ম্ম, সেটিকে যদি বলা যায় 'সাধন' বা 'সেবা', তবে সে মূলতঃ চতুর্ব্বিধ ঃ

(১) বিশেষতঃ কায়িক শ্রমের স্বাচ্ছন্দ্য-সহকৃত নিষ্ঠার দ্বারা সেবা;

(২) ভোগ্য-উৎপাদন-কুশলতা এবং বণ্টনভূয়িষ্ঠতা দ্বারা সেবা;

(৩) তেজঃ বা ওজঃ শক্তির দ্বারা যোগক্ষেমায় সেবা;

(৪) তপঃ, ত্যাগ ও বোধশক্তির দ্বারা সেবা।

"গীতায় ভগবান এই চতুর্ব্বিধ সেবাকে 'চাতুর্ব্বণ্যম্' আখ্যা দিয়াছেন।

"এ চারিটি সেবায় অঙ্গাঙ্গিভাব, সুতরাং সুসঙ্গতি আবশ্যক এবং সামগ্রিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশেই এ সেবা-চতুষ্টয়ের চরিতার্থতা।

"বিংশ শতকের প্রারম্ভে যে শক্তিসম্বিৎজাগৃতি, সেটি চাহিয়াছিল এই চতুরঙ্গা চরিতার্থতাকেই ; তার চাইতে অবম বা ন্যূন কিছু সিদ্ধি নয়।

"ঋষির ধ্যানে এই চরিতার্থতা হইল পূর্ণ যোগসমন্বয়। কবির মানসে ইহা মহামহিমান্বিত মানবতা। সাধকের ইহা উপনিষদ্-স্বারাজ্যসিদ্ধি। যে বা যাহারা পরাধীন, পরবশ, শৃঙ্খলিত—তাদের আকূতিতে ইহা পূর্ণস্বরাজ।

"যুগ-প্রবর্ত্তনের আগেই ঋষি বঙ্কিম ইহা ধ্যানে পাইয়াছিলেন তাঁর 'আনন্দ মঠে' ; আর এর অমোঘ মন্ত্রও পাইয়াছিলেন—'বন্দে মাতরম্'।

"এই পূর্ণস্বরাজের উপনিষদ্—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আর শ্রীঅরবিন্দ এই বরেণ্যত্রয়ী, বিশেষভাবে দেশমায়ের সেবায় আপনাদের উৎসর্গীকৃত করিয়া এই গীতোপদিষ্ট পূর্ণস্বরাজকেই লক্ষ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সে অঙ্গীকার 'কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাব' হইতে দেন নাই কোনোক্রমে।" [গুরুদেবের অনুমতিক্রমে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত]।

তিলক, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব তাঁদের ন্যায্য স্থান আজও পাননি, কিন্তু যখন আদর্শচ্যুত, মদগর্ব্বী, লোভী, অবিমৃষ্যকারী, অপরিণামদর্শী, বিলাসপ্রিয়, দেশীয় নেতৃবৃন্দের নাম লোকের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে, বা নাসিকাকুঞ্চনের সঙ্গে উচ্চারিত হবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দর নাম জাতির কাছে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। সঙ্গে থাকবেন তিলক, অরবিন্দ, বারীন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ, ভগৎ সিং, সূর্য্যকুমার, সুভাষচন্দ্র, রাসবিহারী প্রমুখ মহাবিপ্লবীদের নামাবলী। তাঁদের ভাস্বর দীপ্তিতে ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। 'বন্দে মাতরম্' আর শেষের 'জয় হিন্দ্' মন্ত্র ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি সূচিত করে। অহিংস-পথে মহাত্মা গান্ধীর অবদান স্মরণ করতেই হয়। এটাও একটা বিপ্লব ; আন্দোলন বহুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে রাজার জাতিকে দস্তুরমত বিব্রত করতে সক্ষম হয়েছে।

যখন বৈপ্লবিক কাজ বাঙ্গলায় শুরু হয়ে যায় তখন যারা এসে পড়েছিল এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়েছিল, তাদের একটা হিসাব নেওয়া যেতে পারে। বলে রাখা ভাল, ধর্ম্মগত বা জাতিগত বিশ্লেষণ থেকে প্রকৃত চিত্র পাওয়া কঠিন ; বিপ্লবের গতিপথে কিছু পরিবর্ত্তন হয়ে থাকবে। ইংরেজ সরকার যে হিসাব রাখতে চেষ্টা করেছিল, তার আভাস দেওয়া যাচ্ছে। বিদেশী শাসকের পক্ষে হয়তো অশান্তি-নিরোধ-কল্পে এটা প্রয়োজন ছিল—যে শ্রেণীর ভেতর থেকে বেশীসংখ্যক যুবক বেরিয়ে আসে, সেইদিকটায় তারা লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করেছে বেশী করে।

১৯০৭ থেকে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ১৮৬ জন বিপ্লব-সংক্রান্ত ব্যাপারে দণ্ডিত

হয়েছিল। সন্দেহে ধৃত বা বিচারান্তে মুক্তিপ্রাপ্ত শত শত কর্ম্মীর হিসাব এর মধ্যে নেই। পরের ঘটনা-বিচারে মনে হয় এই অনুপাত মোটামুটি বজায় থেকে গেছে।

জাতি-হিসাবে প্রধানতঃ কায়স্থকে দেখা যায় প্রতি শতে ৪৬.৬ জন, ব্রাহ্মণ ৩৪.৯, আর বৈদ্য ৭। সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজে এই তিন শ্রেণী যে স্থান অধিকার করে আছে. সেটা কেবল শিক্ষাদীক্ষা আর ধনের প্রভাবের বলে নয়, বিদ্যাচর্চ্চা, বুদ্ধিমত্তা, দেশপ্রেম, জনসেবা-প্রবৃত্তি, কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগ প্রভৃতি গুণের দাবীতে হয়ে থাকা বিচিত্র নয়।

অন্যান্য জাতি বা শ্রেণীর অংশ—মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত, প্রত্যেকেই ১.৬ শতাংশ গ্রহণ করেছে। তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক, 'বৈশ্য', কর্ম্মকার, বারুজীবী, মুদী (মোদক) প্রভৃতি সকলকেই সেই তালিকায় দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বৈপ্লবিক চিন্তা সকল স্তরেই গিয়ে পৌঁছেছিল। সঙ্গদোষে পড়ে রাজপুত ও ওড়িয়া এক এক জন হিসাবে, আর অস্ত্রবিক্রয় ব্যাপারে চারজন শ্বেতাঙ্গ (ফিরিঙ্গি) দণ্ডিত হয়েছিল।

কর্ম্মবিভাগ অনুযায়ী বিচার করলে দেখা যায়, ছাত্ররা ছিল দলে ভারি। তারাই শতকরা ৩১.২ জন। বেকার (অন্ততঃ সরকারী খাতায়) ছিল ১২.৯, আর প্রায় সমান অনুপাত রক্ষা করেছে শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত লোক ও জমির উপস্বত্বভোগী (landlord)। সাধারণ কেরানী ও সরকারী চাকুরে শতকরা ১০ জন। নিজেদের ধারণামত শিক্ষকদের একটা খুব বড় স্থান দেওয়া ছিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁরা পাঁচ শ্রেণীর পর ষষ্ঠ-স্থান করেছেন, অর্থাৎ ৮.৬ শতাংশ। চিকিৎসাব্যবসায়ী ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার (৪.০%), সংবাদপত্রসেবী (৩.০%) প্রভৃতি এসে দল পুষ্ট করেছিলেন।

এইবার বয়সের হিসাব নেওয়া যাক্। সকলের চেয়ে দুরন্তকাল ২১—২৫ বৎসর: শতকরা ৪০.৮ হ'ল তাদের অংশ; ১৬—২০ হচ্ছে ২৫.৩%। তৃতীয় স্থান হচ্ছে ২৬—৩০; এরা হ'ল শতের মধ্যে ১৫, আর ৩১—৩৫ বছরের যৌবনপারের লোক হ'ল মাত্র ৬.০%। এর পর আসে ৩৬—৪৫ বছরের দল। ১০—১৫ বছরের কিশোর থেকে ৪৫ ঊর্দ্ধের লোকও ছিল এ-দলে। দেখা যাচ্ছে সকল স্তরের লোকের মধ্যে এই বিপদসঙ্কুল চিন্তা প্রবেশ করেছিল, আর যত লোক দণ্ডিত হয়েছিল, তার সহস্রগুণ লোক এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল এবং নানা ভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছে।

উদ্যোগপর্ব্ব

যখন সংবাদপত্রে প্রচার, সভা-সমিতিতে উৎসাহ-দান, ঘরোয়া আলোচনায়ও ইংরেজকে মেরে তাড়ানোর কথা চলছিল, গুপ্ত-সমিতি তখন অন্তরালে বেশ ভালভাবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। বলা বাহুল্য, গোড়ার দিকে এর সংখ্যা ছিল প্রায় শূন্য, অর্থাৎ একটি বা দুটি। পিছন থেকে তারাই বাহিরের আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করতে থাকে।

মার খেলে ফিরিয়ে মারতে হবে, প্রয়োজনবোধে হিংসাত্মক কার্য্যবিধি অবলম্বন করে উদ্ধত ইংরেজ বা বিদেশীর সাহায্যকারী কা'কে-কা'কেও শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয় এপর্য্যন্ত মন তৈরী হয়েছে। বিরাট জনসংখ্যার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দলই এ পথে অগ্রগামী। চিরকাল সব দেশেই তাই হয়ে থাকে এবং বাঙ্গলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বিদেশী-নিয়োজিত পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি গজিয়ে উঠতে দেখা যায়। তখনও স্বাধীনতা-লাভের কথা বড় করে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠেনি,—অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত প্রতিশোধ নেবার একটা তীব্র বহিঃপ্রকাশ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এ অবস্থা বেশীদিন চলেনি। একদিকে যেমন পুলিশের অত্যাচার বাড়তে থাকে, অন্যদিকে তাকে প্রতিরোধ করবার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। তখন কেউ মনে করেনি যে, সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে ঘুষি, হয়তো-বা দু'-এক-গাছা লাঠি সড়কি ছোরা দিয়ে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভব; অতএব কিছু কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

এ চিন্তাধারার রূপ-গ্রহণের মুখে সব ব্যাপারই যে নেতাদের পূর্ণ মত অনুযায়ী হয়েছে, সে কথা বলা যায় না। অবস্থা-পরম্পরা যেন আন্দোলনকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে। তখন ঋজুপথ ছেড়ে বিপ্লব আপনার পথ বেছে নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

পথের বিচার

বিপ্লবকে রূপ দেবার নানা পথের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। বড় কিছু হবার আগে যে-দুটো সামনে এসে পড়লো, তারা হ'ল অত্যাচারী এবং উচ্চ পর্য্যায়ের রাজকর্ম্মচারী ও মুক্তিপথের বাধাস্বরূপ বিভীষণের দলকে হত্যা এবং অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতি। এ দুই কাজে গুরুতর বিপদ আছে। তবুও চলার পথে এরাই হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গুরুতর বিপদের কথা জেনেও যুবকরা এগিয়ে পড়লো।

অরবিন্দ বললেন যে, অসাড় অনড় জাত বাসী মড়ার মত পড়ে আছে, একে জাগাতে গেলে প্রচুর রক্তপাত প্রয়োজন। প্রাণ দিতেও হবে, নিতেও হবে। অত্যাচার উৎপীড়ন যত নির্ম্মম আকার ধারণ করবে, ততই মানুষের ইংরেজ শাসনের প্রতি মমতা ছুটবে, আপন শক্তিতে দাঁড়াবার চেষ্টা হবে। সুখশান্তির মধ্যে ডুবে থাকলে দেশ-উদ্ধার-চেষ্টা কেবল কল্পনায় পর্য্যবসিত হবে ; "অত্যাচার উৎপীড়ন তো চাই। তা না হলে দাসত্বের শান্তিময় সুখ ভাঙ্গব কি করে ?"

সে অবস্থায় পৌঁছুতে গেলে বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবার কথা। এখানে-সেখানে এক-আধটা গুপ্তহত্যা করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে সময় লাগবে প্রচুর, সরকারী নির্য্যাতনে আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং গোড়া থেকেই নেতারা একটা বোঝাপড়ার জন্য তৈরী হবার কথা ভেবেছিলেন এবং তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিছু না হলে, ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান বিষয়ে পর্য্যালোচনা দ্বারা অরবিন্দ বুঝেছিলেন, স্থানে স্থানে গরিলা-যুদ্ধের বিশেষ সুযোগ আছে। তার সাহায্যে অত্যাচারী ইংরেজ রাজশক্তিকে এ-দেশে বিপর্য্যস্ত করা সম্ভব হতে পারে।

বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদ

এসকলের জন্য প্রস্তুতি খুব খানিকটা এগিয়ে যাবার পূর্ব্বেই গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। অরবিন্দ বলেছেন—"স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সরকার-মহলে ভয়ানক চাঞ্চল্য ও ভয়ের সৃষ্টি হয়, ফলে দমননীতি শুরু হয় ভীষণ ; স্কুল-কলেজের ছেলেদের জরিমানা করা, বের করে দেওয়া, জেলে পোরা, শাস্তি দেওয়া, এমন-কি প্রকাশ্যে বেত-মারা ইত্যাদি অত্যাচার যখন বেড়ে উঠল, তখন বিপ্লবীরা স্থির করল এর প্রতিবিধান চাই অর্থাৎ বিপ্লববাদ আস্তে আস্তে সন্ত্রাসবাদের রূপ নিল। বোমা-তৈরীর কাজ আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে বিপ্লবের উদ্দেশ্যে, এখন দমননীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে বারীনেব দল স্থির করল তখনকার গভর্ণর ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে বোমা ছুড়ে মারবে।" ('পুরোধা', ১৯৬৮ জানুয়ারী, পৃঃ ২৪)

আপন ছন্দে বাংলায় সন্ত্রাসবাদের আত্মপ্রকাশ। এর ফলাফল যে কি, সেটা সামান্য-সংখ্যক লোক জেনে আর প্রায় সবই না-জেনে বেড়াজালে জড়িয়ে পড়লো। অরবিন্দ বলছেন—সারা-ভারত-ব্যাপী যে "উত্তেজনা উদ্দীপনা" দেখা গেল, "তোমরা তা কল্পনাই করতে পার না"। তিনি বলেছেন—"এসব ক্ষুদে ডাকাতি, সাহেব-মারা মোটেই আমার বিপ্লবের অঙ্গ বা অভিপ্রায় ছিল না।" কিন্তু তিনি তাতে বাধা দেননি, কারণ "যখন কোনো আন্দোলন জনমতের ইচ্ছার অনুকূল হয়, তখন তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়"।

বারীন্দ্রকুমার 'আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামী অবস্থায় ১৯০৮ মে ৪-ঠা স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন—"আমরা কখনোই বিশ্বাস করিনি যে রাজনৈতিক

(গুপ্ত) হত্যা দ্বারা স্বাধীনতা আসবে। তবে আমাদের বিশ্বাস জন্মালো যে জনসাধারণ এটা চাইছে।" ("We never believed that political murder will bring independence. We believed the people wanted it.")

কিন্তু আসল লক্ষ্য জাতীয় অভ্যুত্থান—সামগ্রিক বিপ্লব। "We are thinking of a far-off revolution and wish to be ready for it." কেবল বিপ্লবের প্রচার দ্বারা দেশকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। মানুষের মধ্যে বিপদের সম্মুখীন হবার মত আধ্যাত্মিক শক্তি (-সম্ভূত সাহস)-সঞ্চয়ে শিক্ষা দিতে হবে: "We are convinced that a purely political propaganda would not do for the country and that people must be trained up spiritually to face danger." (*ibid*)

একদিকে যেমন কংগ্রেস তার আপন নিরুপদ্রব পথে চলতে লাগল, তেমনি বিপ্লবের গতি গোপন রাস্তায় দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছিল। সংশ্লিষ্ট সকলেই জানত—ধরা পড়লে অকথ্য নির্য্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, তবুও ধীরে ধীরে এই বিপদ-সঙ্কুল পথে বাঙ্গালী ছেলেরা পা বাড়িয়ে দিয়েছে। মহারাষ্ট্র বিদ্যুতের চমকে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে ম্লান হয়ে পড়েছিল। বাঙ্গলার ছেলেরা যেন ছিন্নসূত্র জোড়া দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হ'ল। জেলের ভয় অনেকটা ভেঙ্গে গেছে স্বদেশী আন্দোলনের কৃপায়। 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্র দত্ত পথটা পরিষ্কার করে দিয়ে অনুগামী অনেকের যাত্রা সুগম করেছিলেন। এখন যে-যাত্রা শুরু হ'ল—সেটায় বৈচিত্র্য অনেক, বিপদ অনেক বেশী। নিতান্ত প্রাসঙ্গিক বলে একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে। বিপ্লববাদের সঙ্গে বঙ্গ-বিভাগের সম্পর্ক "দাদা আর ভাই"; 'স্বদেশী আন্দোলন' বিপ্লব-প্রচেষ্টার পরে এসেছে এবং জনগণের মন বিক্ষুব্ধ করে "দাদার" কাজের সহায়ক হয়েছে। অরবিন্দ প্রারম্ভেই বলেছিলেন যে, নিপীড়িত জনসংখ্যার এক বড় অংশ অশান্ত না হলে, বিপ্লব কখনই ভিত গাড়তে পারবে না। এ যেন বিধির বিধান; বিপ্লব-কাজের পরিচয় পেয়েও কার্জ্জন-সাহেব বাঙ্গলা-বিভাগ করে কাজটা সহজ করে দিলেন।

ডাকাতি

প্রতিষ্ঠান-রক্ষা, তার প্রসার ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। প্রথমদিকটায় নেতাদের মধ্যে স্থির হয়েছিল যে, দেশের ধনীদের কাছ থেকে এবং নিজেদের দলের লোকের সাহায্যে কিছুটা অর্থ পাওয়া যেতে পারে। সেটা সম্ভব হয়নি, কারণ ধনী-মাত্রেই টাকা দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে কেউ ছিল না; তার ওপর ছিল গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টির ভয়। বিশেষ করে গভর্ণমেণ্টের তাঁবেদারি করে যে সুখ-সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা সেটা তখনই বন্ধ হবার কথা; উপরন্তু নির্য্যাতনের সম্ভাবনা। এটাও একটা কথা যে, এভাবে যে-পরিমাণ অর্থ আসতে

পারে সেটা প্রায়ই সাহারার বুকে গণ্ডুষমাত্র জল ছিটিয়ে, তার তৃষ্ণা মেটাবার প্রয়াস বলেই মনে হবার কথা। নিজেদের মধ্যে থেকে টাকা যোগাড় করা সম্ভব হয়নি, কারণ কর্ম্মী বা তাদের আত্মীয়দের সঙ্গতি নিতান্তই সীমিত ; পাওয়া যাচ্ছেই বা ক'টা টাকা ? সে-অবস্থায় অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নাকি 'আনন্দ মঠ'-এর নজির তুলে লুণ্ঠনের পরামর্শ দেন। বলা বাহুল্য, সেইসঙ্গে নানা অসুবিধার কথা বড় করে ওঠে। প্রথমদিকেই চিন্তা—মাত্রা ঠিক রেখে ডাকাতি করা যায় কিনা, বাধ্য হয়েই উদ্দেশ্যের বাইরে এমন কিছু ঘটতে পারে, যার শেষ ফল—পরিতাপ। সাধারণ লোকের সহানুভূতি হারাবার সম্ভাবনা আছে। আর আছে—মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামা, অর্থনাশ, দুশ্চিন্তা এবং সাহসী কর্ম্মীদের দীর্ঘ কারাবাস। অনিচ্ছুক বা সহানুভূতিহীন অভিভাবকদের পক্ষে আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্রয় নেওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং সকলে একবাক্যে ডাকাতির সমর্থন জানাতে পারেনি। কতকাংশের মিললেও, সমস্ত কাজটায়, এমন-কি সকল বিপ্লবীর সমর্থন পাওয়া যায়নি।

সরকারী ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের ফলে লেখা হয় ঃ

"The principle of raising money by dacoity has all along had many hot opponents in persons otherwise in full sympathy with political outrage. Still it was the part of the plan of campaign preached by the *Yugantar* and had more advocates than opponents in the revolutionany party."

হেঁয়ালি পরিত্যাগ করলে বলা যায়, সরকারী তহবিল লুঠ করায় কারও আপত্তি ছিল না, উপরন্তু সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দেবার সুযোগ হিসাবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সরকারী না হলেও, বিদেশী কোম্পানী, এমন-কি গভর্ণমেণ্ট-ঘেঁষা ধনীর ক্ষেত্রেও এ-নীতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ধনী বা মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থগ্রহণে আপত্তি ছিল বহু বিপ্লবীর। অবস্থার গতিকে সকলটাই উপেক্ষিত হয়েছে, হয়তো কতকটা ক্ষোভের সঙ্গে। সরকারী অর্থ লুণ্ঠনের ইঙ্গিত ছিল 'আনন্দ মঠ'-এর যুগ (১৮৮২ সাল) থেকে ; সুপ্ত ছিল ভাবটা, 'যুগান্তর' পত্রিকা তাকে সাধারণ পাঠকের মধ্যে চালু করে দিয়েছে।

ডাকাতি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অন্য একটি কারণে। ছেলেরা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে লড়বে বলে এসে জমায়েত হচ্ছে। স্বদেশী আন্দোলনের একতরফা কর্ম্মপদ্ধতি তাদের সন্তুষ্ট করতে পারছে না। তাদের অনেকেই চায় কোনও বিপজ্জনক কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের পরিচয় রাখতে। ভবিষ্যতের বিপদসঙ্কুল কাজের উপযুক্ত করবার জন্য গোড়ার দিকে ছোটখাটো ডাকাতিতে তাদের পাঠাতে হয়েছে। ক্রমে ব্যাপারটা একটু সংক্রামক হয়ে পড়ে। অনেকস্থলে স্থানীয় "নেতা"

নিজ পসার-প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরিপক্কবুদ্ধি যুবক নিয়ে গিয়েছেন। এরকম বহুক্ষেত্রে ফল প্রতিকূলই হয়েছে।

বিপ্লবী আন্দোলনে ডাকাতি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছিল। রাজপুরুষরাও ঘটনা-পরম্পরায় ক্রমে ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বাঙ্গলার ছোটলাট উইলিয়াম ডিউক (William Duke) ১৯১৩ ডিসেম্বরে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এই রাজনৈতিক ডাকাতির ভিতর দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে। অতি সতর্কতার সহিত স্থাপিত সুবিস্তৃত সংস্থার সঙ্কেত দিচ্ছে এবং ডাকাতদের বুদ্ধি ও সাহসের সঙ্গে সফলতার প্রমাণও দিচ্ছে। পেশাদার ডাকাতরা সাধারণতঃ ভুল করে বসে এবং অল্পপরিমাণ টাকার জন্য দীর্ঘকারাবাস তারা ভয় করে। কিন্তু "স্বদেশী" ডাকাতরা অদ্ভুতভাবে তাদের লক্ষ্য স্থির করে। বহু টাকা লুণ্ঠিত হয় এবং প্রায়ই তারা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

ইংরেজীটা এইরূপ ঃ

"They (the dacoities) are important because of the spirit of violent opposition to all settled Government which they display, of the widespread and carefully prepared organisation of which they give evidence and of the enterprise and success with which they are carried out. Ordinary dacoits usually make bad shots and risk long terms of imprisonment for the sake of a handful of rupees, but the political variety have been wonderfully successful in spotting out likely subjects and have frequently netted large sums indeed." (*Amrita Bazar Patrika*, December 5, 1913)

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ডাকাতিতে অনেক ক্ষেত্রে ভুলক্রমে কিছু কিছু অনাচার যে হয়েছে, সে-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। তবু এক-একটি ঘটনার পিছনে যে সতর্কতা পালিত হয়েছে, স্বার্থশূন্য হয়ে বিপদকে উপেক্ষা করতে হয়েছে, সে-বিষয়ের কিছু সংবাদ নিয়ে রেখে দেওয়া মন্দ নয়। বহু বিপ্লবী নেতা এবং এককালে ডাকাতির অংশভাগী লোকের মুখ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত তথ্য থেকে একটি 'এ্যাক্‌শন' বা ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

আনুষঙ্গিক

কলিকাতা বা অন্য শহরের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের ডাকাতি করবার তোড়জোড়ে অনেক পার্থক্য আছে ; আর, ডাকাতির সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গে অনেক বেশী। সেখানে নদী-নালা দিয়ে যাতায়াত রক্ষা করতে হয়, সুতরাং ডাকাতির প্রস্তুতিপর্বে নৌকা, কখনও কখনও স্টীমারের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। সুবিধা থাকলে, রেল বা পায়ে হেঁটে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো গেছে।

সাধারণতঃ যে-সকল নৌকা ব্যবহৃত হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল লম্বা, সরু এবং দ্রুতগামী ; প্রচলিত নাম "এক-মাল্লা ডিঙ্গী"। অপর শ্রেণীর জলযানের নাম ছিল "ঘাসী নৌকা", এবং এর সংখ্যাও ছিল অনেক।

প্রধানতঃ যে-সকল বিত্তশালী লোক জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করেনইনি, উপরন্তু গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচরের কাজ করতেন তাঁরাই ছিলেন প্রথম লক্ষ্য। তা'ছাড়া উৎকট সুদখোর, অধমর্ণের প্রতি অত্যাচারের বদনামধারী, পরস্বাপহারী, স্বার্থপর, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বা বিপ্লবীর নিকট অন্য কারণে "অপরাধী", প্রধানতঃ তাঁদের বাড়ী লুঠ হয়েছে। বহুক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ঘরের ডাকাতিতে গৃহস্বামীকে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তাঁর সঞ্চিত উদ্‌বৃত্ত অর্থ ঋণস্বরূপ গৃহীত হচ্ছে ; দেশ স্বাধীন হলে সে-ঋণ পরিশোধ করা হবে। বলা বাহুল্য, কার্য্যক্ষেত্রে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।

কোনও একটি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট হলে, গ্রামবাসীদের সংখ্যা, শিক্ষা, অর্থসঙ্গতি, উপজীবিকার ক্ষেত্র প্রভৃতি তথ্য সংগৃহীত হ'ত। কোন্ দিক থেকে বিপদ আসতে পারে, বিরুদ্ধভাবাপন্ন সবল লোক বাধা দিতে আসতে পারে কিনা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, হাট-বাজার, স্কুল প্রভৃতির দূরত্ব, থানার অবস্থান প্রভৃতি সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ লওয়া ছিল ডাকাতির জন্য প্রস্তুতির সর্ব্বপ্রথম পর্য্যায়।

কার্য্যোদ্ধারের পর পলায়নের পথের সন্ধান একটি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়। পথে নিরাপদ ও গোপন আশ্রয়স্থল, জল ও রেলপথের দূরত্ব কত, নৌকা প্রভৃতি কোনও যান নিকটেই পাবার সম্ভাবনা প্রভৃতি অনুসন্ধান হ'ল পরের পর্য্যায়।

সবিস্তারে সংবাদ-সংগ্রহের পর শেষ অধ্যায় উপস্থিত। চৌদিকে ঘুরে-ফিরে বাড়ীর ঘর-দালান ও জানালা-দরজার একটি সুস্পষ্ট ধারণা করার প্রয়োজন। অনেক সময় আক্রান্ত বাড়ীর যুবক এ-কার্য্যে সহায়তা করেছে। উপধায় অবস্থিত কাজটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ ; অভিজ্ঞ চতুর লোক ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়ার কথা নয়। তার জন্যে নানা অছিলার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কখনও কখনও নিকটস্থ আত্মীয়-বন্ধু-বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ, নিকটেই দোকান-খোলা, ক্লান্ত পথিকরূপে জল বা অন্ন গ্রহণ উপলক্ষে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে সেখানকার একটি ধারণা করে নেওয়ার সুযোগ অবশ্য প্রয়োজন।

এইবার কর্ম্মী-নির্ব্বাচনের পালা। স্থানীয় লোক সঙ্গী হলে কাজের সবিশেষ সুবিধা। তার সঙ্গে আগ্রহশীলতা ও সাহস এই দুই গুণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য রাখা হয়েছে কাছাকাছি কোনও সহানুভূতিসম্পন্ন বাড়ীর দিকে। তাহলে পূর্ব্ব হতেই সেখানে অস্ত্রশস্ত্রাদি, যেমন—হাতুড়ি, ছেনি, ডাণ্ডা—আক্রমণ ও প্রতিরোধের অস্ত্র প্রভৃতি জমা রেখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। হয়তো ডাকাতদল সেখানে

এসে জমায়েত হয়ে একসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছে। কাজ সেরে ফেরবার পথে আশ্রয়স্থল হতে নানারূপ সাহায্য পাওয়ার সুবিধা খুব। আরও প্রয়োজন বোধ হয়েছে দূরপাল্লার, হয়তো অন্য জেলার লোককে সাময়িকভাবে রাখার। এটা সম্ভব হলে, ভারী যন্ত্রপাতি, টাকার অংশ কিছুটা রেখে, হাল্‌কা হয়ে চলে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

যত সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা হ'ল, ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না। দু'পক্ষে দুর্ভাগ্যক্রমে ছোট-বড় সংঘর্ষ হয়েছে ; আক্রমণকারী ধরা পড়েছে, গ্রামবাসীর হাতে নিগৃহীত ও নিহত হয়েছে। তারপর ছিল বিচারে দীর্ঘ কারাবাস, দ্বীপান্তর ও ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ-বলিদান।

তাহলেও বলতে হবে, একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতি পেয়েছিল বিপ্লবীদের কর্ম্মতালিকায় একটা প্রধান স্থান। যতদূর সম্ভব বড় ঘটনাগুলির, অসম্পূর্ণ হলেও, একটা তালিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। আক্রমণ দ্বারা বিদেশী রাজপুরুষ, বেতনভুক্ দেশীয় রাজকর্ম্মচারীর উপরে হামলা ও হত্যা উচ্চপর্য্যায়ের ঘটনা। তার পরিচয় দিতে না পারলে বাঙ্গলার বৈপ্লবিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

কর্ম্মকাণ্ড (১৯০৬-০৭)

বাঙ্গলায় যখন হিংসাত্মক কাজ আরম্ভ হ'ল, তখনও কর্ম্মীদের মধ্যে বড়রকম দল-ভাগ হয়নি। পরে 'যুগান্তর'-পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট যুবকরা কিছু স্বতন্ত্র হয়ে কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে, আর বড় অংশটি (পরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, 'অনুশীলন' নামে পরিচিত) পূর্ব্ববঙ্গ, বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলে কাজে নেমে পড়লো।

বড় অর্থাৎ নিছক বিপ্লবাত্মক ঘটনার তালিকায় যা পড়ে না, এমন ছোটখাটো ঘটনা কড়েয়া, তারকেশ্বর ও কলিকাতার উপকণ্ঠে ঘটেছে। সে-সবের বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', তন্মধ্যে সতীশচন্দ্র বসুর বিবৃতি, পৃঃ ১৮২)। এসকল ব্যাপারে পুলিশী অনুসন্ধান যা হয়েছে, সে-সবই সাধারণ "রাহাজানি" পর্য্যায়ে পড়েছে বলে মনে করা যেতে পারে; বিপ্লব-সংক্রান্ত পুলিশী নথিপত্রে স্থান পায়নি।

হাতে-খড়ি: কলিকাতার দিকে বড় কেন্দ্র মাণিকতলা বাগান ১৯০৭ সালের একেবারে গোড়ার দিকে স্থাপিত হয়। তার আগে 'যুগান্তর' পত্রিকার আড্ডা—'কানাই ধর লেন', চাঁপাতলা প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহাত্মক আলোচনা চলতো। ১৯০৬ সালেই হাতে-খড়ি বলা চলে: কেন্দ্র: উত্তরবঙ্গ—আগষ্টের প্রথমদিকে রংপুর (মাহিপুর গ্রামে) ডাকাতির চেষ্টা হয়। তখন অত্যন্ত "কাঁচা" অবস্থা; গ্রামে এক দারোগা বাস করে শুনেই চলে আসতে হয়। পরেরটা হয় ১৯০৬ অক্টোবর ২৪-এ, ঢাকার শেখরনগরে। এবার লোহার সিন্দুক ভাঙ্গা গেল না; প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল; ভাগ্যে ঘটলো বদনাম। ১৯০৬ সালে আর কোনও প্রচেষ্টা হয়নি। কিন্তু দলগুলি নিরুৎসাহ হ'ল না; উদ্যম চললো সমানে। পরের বৎসর উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র দাস বোমা তৈরী করতে সমর্থ হলেন; আক্রমণের ধারা পাল্টে গেল।

ময়মনসিংহ: জামালপুর— ঢাকা জেলায় 'অনুশীলন দল' বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৯০৭ এপ্রিল ২১-এ জামালপুরে (ময়মনসিংহ) ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে এবং বিপ্লবীরা তাতে অংশগ্রহণ করেন। কলিকাতা থেকে তিন-চারজন প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল এবং অপর একজন বন্দুক নিয়ে এই দাঙ্গায় উপস্থিত ছিলেন। এতে দাঙ্গার প্রকৃতি বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হয়। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শিশিরকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বসু (মীর্জাপুর ষ্ট্রীট), ইন্দ্রনাথ নন্দীকে কার্য্যবিধি ১০৭ ধারা অনুসারে জামিন মুচলেকা দিতে হয়। ব্যাপারটিকে গভর্ণমেণ্ট খুব ভাল-চোখে দেখেনি, কারণ এঁদের কৃতিত্বে গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হাঙ্গামায় ভয়ত্রস্ত হিন্দুনারীদের উদ্দেশ্য করে কামিনী ভট্টাচার্য্যের "আপনার মান রাখিতে জননী আপনি

কৃপাণ ধর গো" ('মাতৃমন্ত্র', পৃঃ ১১৮) এবং হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "আজি মাগো খুলে রাখ মণিময় হার, গলে পর নরমুণ্ডমালা" ('মাতৃমন্ত্র', পৃঃ ১১৬) গান দুটি পাঠ করলে আজও দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ঢাকা ঃ ১৯০৭ সেপ্টেম্বর ৪-ঠা জন্মাষ্টমীর খুনে (Janmastami Stabbing Case) রাত্রি আটটায় মোহন গোপ (ডাকনাম 'বোসা') পৃষ্ঠে ছুরিকাহত হয়। দুই দলের বিদ্বেষের পরিণতি এই আক্রমণ। বিপ্লব-আন্দোলনে এই হত্যাপ্রচেষ্টা এক নতুন ধারা এনে দেয়। এর পরে বহু গুপ্তহত্যার উদাহরণ পাওয়া যাবে।

ঢাকা ঃ পটুয়াটুলি— ঐ তারিখেই ঢাকা পটুয়াটুলি 'সাহীন মেডিক্যাল হল্' (Saheen Medical Hall)-এর বারান্দায় সন্ধ্যা সওয়া সাতটার সময় শশীকুমার দে নামে এক যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শশী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তাকে পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করা হয়েছিল।

চন্দননগর ঃ অক্টোবর মাসে (১৯০৭ সাল) চন্দননগরে ছোটলাটের ট্রেন উড়িয়ে দেবার মতলব দু'বার করা হয়। পরিকল্পনায় এ দুটির পরিসমাপ্তি ঘটলেও এখন থেকে শুরু করে দেশী ("কালীমায়ীর") বোমা বিপ্লবাত্মক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরের ঘটনা হচ্ছে—খড়্গপুর থেকে এসে বেণাপুর আর নারায়ণগড়-এর মধ্যে লাইনের তলায় বোমা বসিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে তাকে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা হয়। বোমা ফেটেও ছিল, কিন্তু লাটের গাড়ীর কোনও ক্ষতি হয়নি। সে-সম্পর্কে বিবরণ পরে দেওয়া হচ্ছে।

ঢাকা ঃ উয়াড়ি— এখানে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির ফলস্বরূপ এক ছোটখাটো দাঙ্গা হয় ১৯০৭ নভেম্বর ১৭-ই। কিন্তু এর মধ্যে রাজনীতি এসে পড়ে, কারণ 'অনুশীলন সমিতি'র পুলিনচন্দ্র দাস ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী এতে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং পুলিশ চেষ্টা করে পুলিনকে এক মামলায় জড়িয়ে ফেলে। 'অনুশীলন সমিতি'র সম্পর্ক ছাড়া পুলিন তখন স্থানীয় ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক। ১৯০৮ জানুয়ারী ১৩-ই আসামীর তিন সপ্তাহ সশ্রম কারাবাস, নগদ পনেরো টাকা জরিমানা ও সচ্চরিত্রতার রক্ষাকবচস্বরূপ ২৫০ টাকার জামিন মুচলেকা মেনে নিতে হয়।

গোয়ালন্দ ঃ ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যালেন ছুটিতে দেশে যাচ্ছিলেন। গোয়ালন্দ ষ্টেশনে তিনি আততায়ীর হাতের রিভলভারের গুলিতে পৃষ্ঠদেশে গুরুতর-ভাবে আহত হন ১৯০৬ ডিসেম্বর ২৩-এ। ভাগ্যক্রমে এ্যালেনের প্রাণরক্ষা হয়েছিল।

২৪-পরগণা ঃ চিংড়িপোতা— যখন বেণাপুর ও নারায়ণগড়ের মাঝে ছোটলাটের ট্রেন ওড়াবার চেষ্টা হচ্ছে, সেই রাত্রেই (১৯০৭ ডিসেম্বর ৬) ২৪-পরগণায়

সোণারপুর থানার অন্তর্গত চিংড়িপোতা (সুভাষগ্রাম) ষ্টেশনে এক ডাকাতি হয় ভোর সওয়া চারটা নাগাদ। 'পোর্টার' খুব জখম হয়েছিল ; পরিমাণ সামান্য হলেও কিছু টাকা ষ্টেশনের লোহার সিন্দুক ভেঙ্গে 'ডাকাতদল' নিয়ে চলে যায়। স্থানীয় যুবকদের দ্বারা এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (M. N. Roy) প্রভৃতি কয়েকজনকে আসামী করে মামলা রুজু হয়েছিল। ১৯০৮ ফেব্রুয়ারী ১২-ই সকল আসামীকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দেওয়া হয়।

মেদিনীপুর : নারায়ণগড়

আলিপুর মামলায় যে-সকল তথ্য বাইরে প্রকাশিত হতে লাগল, তা'তে ভারতে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ শাসক ভয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। একটা ঘটনা থেকে তার আভাষ পাওয়া যাবে।

ছোটলাট-বাহাদুর এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার (Andrew Fraser) ১৯০৭ ডিসেম্বর ৫-ই কটক ছেড়ে কলিকাতায় আসছিলেন। ট্রেন যখন মেদিনীপুরে বেণাপুর ও নারায়ণগড়ে (৬-ই ডিসেম্বর) ভোর ২-৪৫-এর সময় এসে পৌঁছেচে তখন গাড়ীর নীচে বিকট শব্দে এক বিস্ফোরণ ঘটে ; তা'তে ট্রেনের কোনও ক্ষতি হয়নি, সময়মত সেটা কলিকাতায় এসে পৌঁছেছিল।

ভোরে পরীক্ষায় দেখা গেল লাইনের তলায় মাটিতে ৫-৬ ফুট ব্যাস ও ঐরকম গভীর এক গর্ত হয়েছে এবং সেইখানের লাইন বেশ খানিকটা বেঁকে গেছে। আশেপাশে কিছু সংবাদপত্র (২৪ ডিসেম্বরের 'ইংলিশম্যান') ছেঁড়া অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

বোমার বিদারণ-ভঙ্গী থেকে আন্দাজ করা স্বাভাবিক ছিল যে, ওটা বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকের কাজ। কিন্তু তাদের খুঁজে বার করতে সময় যাবে ; এতদিন পুলিশ একেবারে বে-ইজ্জত হয়ে থাকতে পারে না। তদন্ত শুরু হয়ে গেল।

ঘটনাস্থলের কাছেই রঘুনাথপুর গ্রাম এবং শিবদাস নামে এক কুলীর বাড়ী। মাটির ভিতর থেকে পাথর-বার-করা তার কাজ। তার বাড়ী তল্লাসী হ'ল ডিসেম্বর ১৬-ই (১৯০৭) এবং কিছু বারুদও পাওয়া গেল। পাথর-কাটা লোকের কাছে বারুদ থাকায় অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না।

শিবুকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করলে, সে ১৯ তারিখে এক "স্বীকারোক্তি" করে এবং তার দেওয়া তথ্যমত গোপাল, উমেশ, ফকির, তরু, অপি, কুমেদ, নেপাল ও অযোধ্যা পাহাড়ীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকারোক্তির ও একরার করার ধুম লেগে গেল ; পুলিশ-হেফাজতে এবং তাদের কৃপার উপর থাকলে, এ ব্যাপারটার ব্যতিক্রম হবার কারণ খুব সামান্যই বিদ্যমান। অযোধ্যা পাহাড়ী ১৯-এ ডিসেম্বর বললে, সে শিবুকে বারুদ বিক্রী করেছিল। কুমেদ ২০-এ তারিখে অপরাধ স্বীকার করে নিল।

নেপালের ব্যাপার একটু ভিন্ন রকমের বলে মনে করা যেতে পারে। এক দারোগা-সাহেব ২০-এ তারিখে তাকে প্রথমে নারায়ণগড়ে দেখতে পান এবং আটক করেন। ২১-এ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করলে সে সমস্ত সংস্রব অস্বীকার করে এবং পরের দিন তাকে পুলিশ-হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচ দিন পুলিশের কবলে থাকার পর তাকে পুনরায় হাকিমের কাছে হাজির করা হয় এবং সে অপরাধ কবুল করে। তখন তাকে পুলিশ-হাজত হতে জেল-হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ ক'দিন তার যেভাবে কেটেছে এবং "সত্যের" প্রতি তার কেন এত অনুরক্তি হ'ল, সেটা কল্পনাগ্রাহ্য বস্তু, বলে বোঝানো কষ্টসাধ্য বিষয়।

তখন সকল আসামীকে ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে হাজির করা হ'ল ১৮-ই ফেব্রুয়ারী (১৯০৮) এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক মামলা অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তথ্যানুসন্ধান শুরু হ'ল। শিবু দাসের অকপট স্বীকারোক্তির ফলে, "ক্ষমা" (pardon) করে তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট-তদন্তে দেখা গেল আসামীদের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, এবং অপরাধের গুরুত্ব বিধায়, তারা দায়রা-জজ কর্ত্তৃক বিচারের উপযুক্ত। তখন আর কাল-বিলম্ব নেই ; ম্যাজিষ্ট্রেট মতামত দিলেন ৯-ই মার্চ (১৯০৮), দায়রা আরম্ভ ৩১-এ মার্চ,—মাত্র ক'টা দিনের ব্যবধানে।

বিচারে আসামীপক্ষ প্রমাণ দিলে, বেশীর ভাগ কুলী-ই দাঁতনে কাজ করেছিল ঘটনার দিন, আর দাঁতন নারায়ণগড় থেকে ২৫ মাইল দূরে। শিবু আর নেপাল ৫-ই ডিসেম্বর বেলা ২-৪৫ মিনিটে তাদের মজুরি নিয়েছে, সুতরাং তাদের পক্ষে নারায়ণগড় থেকে পরদিন সকালেই দাঁতন ফিরে এসে রেল-লাইনে কাজে লেগে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

বিচারের রায় প্রকাশিত হ'ল। দু'জন এ্যাসেসর-ই নেপাল দলুইকে দোষী সাব্যস্ত করলেন ; সুতরাং তার ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। অপর আসামী সম্বন্ধেও জজ-সাহেব অনুকম্পা প্রকাশ করেননি। ফলে গোপাল, তরু ও ফকিরের প্রত্যেকের পাঁচ এবং কুমেদ ও অপর প্রত্যেকের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল। রেলের গেট্‌ম্যান উমেশ মুক্তিলাভ করেছিল।

হাইকোর্টে আপীল দায়ের হয়েছে ১৯০৮ জুন ১৬-ই। ইতিমধ্যে এক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ৪-ঠা মে তারিখে আলিপুর বোমার আসামী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও পরদিন বিভূতি সরকার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একরার করেছেন যে, এই ঘটনা তাঁদের দ্বারা সংসাধিত হয়েছিল ; প্রফুল্ল চাকীও সঙ্গে ছিলেন। বিশদভাবে তাঁরা বিবরণ প্রকাশ করেন। বোমার অংশ, উপকরণ, নির্ম্মাণ-ব্যবস্থা কিছুই অপ্রকাশিত রাখেননি। তাঁদের বোমা মোড়া হয়েছিল 'ইংলিশম্যান' ও 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাতে। পূর্ব্বে বলা হয়েছে, ঘটনাস্থলে 'ইংলিশম্যান'-এর একখানি পাতাও পাওয়া গিয়েছিল।

এ দোষ স্বীকার করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যাতে নিরীহ লোক কষ্ট না পায়। কিন্তু আসামীদের কপালে দুঃখ আছে, খণ্ডিত হবার উপায় নেই। জজ-সাহেব বললেন, বিচার্য্য মামলাতে স্বীকারোক্তি এবং অপরাপর সাক্ষ্য দ্বারা আসামীদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং অপরে কোথায় কে কি বলেছে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। ১৯-এ আগষ্ট সব আপীল নাকচ করা হ'ল; পূর্ব্বদণ্ডাদেশ বহাল রয়ে গেল। ভাবতে লজ্জা হয় যে, এটা দেশের সর্ব্বপ্রধান বিচারশালা এবং সেখানে এতবড় ব্যভিচার! আসামীরা সব জেলখানায় প্রেরিত হ'ল। ঘানি-টানা থেকে সব গুরু কাজই "সশ্রম" দণ্ডে পালিত হতে লাগলো। বিবেক বলে যে বস্তু আছে, সেটা শান্তি দিতে চাইলে না। ভিতরে ভিতরে খুব ফাইল-চালাচালি হতে লাগলো। হঠাৎ ১৯১০ মে ১৮-ই কমবেশী কুড়ি মাস দণ্ডভোগ করবার পর সরকারী আদেশে আসামীরা মুক্তি পেল। ভূমিষ্ঠ হবার পরেই বিধাতাপুরুষ খাগড়ার কলমে তাদের কপালে কারাবাস লিখেছিলেন, সুতরাং খণ্ডিত না হয়ে বিনা অপরাধেই তাদের কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ল।

কলিকাতা ঃ বাগবাজার— 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হলে, নানা স্থানে সভা-সমিতি করে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছিল। বিডন স্কোয়ারে আহূত এক সভায় পুলিশ থেকে এক বক্তাকে বক্তৃতাদানে বাধা দেয়। প্রথমে বচসা, পরে দাঙ্গা। ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবের ছেলেরা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল; সঙ্গে দর্জিপাড়ার 'অনুশীলন সমিতি' যোগ দেয়। পুলিশের সঙ্গে মারামারিতে উভয় দলের যশ ক্ষুণ্ণ হয়নি। পুলিশ বুঝেছিল যে, ছেলেরা ক্ষেপেছে—আর, যখন-তখন এলোপাথাড়ি মার দেওয়া চলবে না।

এই শ্রাদ্ধ গড়ায় অনেক দূর। ক্লাবের সভ্যরা এক ফিরিঙ্গি সার্জ্জেণ্টকে পাকড়াও করে এবং তার আচরণের শাস্তিস্বরূপ তার একখানা হাত কেটে ফেলে। ফলে, ৫-নং দীন রক্ষিত লেনের সত্যচরণ দাঁ-র নামে মামলা ওঠে এবং হাইকোর্ট সেসনে ১৯০৭ ডিসেম্বর ১১-ই তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বাঁকুড়া ঃ হাঁসাডাঙ্গা— আগষ্ট মাসে হাঁসাডাঙ্গা (বাঁকুড়া)-য় ডাকাতির চেষ্টা হয়; এতে সরকারী তালিকা স্ফীত করা ব্যতীত কোনও লাভ হয়নি।

ঢাকা ঃ নিতাইগঞ্জ— অক্টোবর মাসে নিতাইগঞ্জে একটি লোক কিছু টাকা একটি পুঁটলির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। 'সমিতি'র ছেলেরা সন্ধান পেয়ে সেটা ছিনিয়ে নেয়। তখনকার দিনে হয়তো কিছু সার্থকতা ছিল, কিন্তু না হলে ক্ষতি ছিল না।

বৈপ্লবিক রীতি

বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনার পর বিপ্লবীদল ক্রমে অধিক সতর্ক হয়ে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের তরফে সমস্যার প্রতিরোধ-কল্পে চণ্ডনীতি প্রচণ্ড বেগে নেমে

আসে। এখন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত হিংসাত্মক কার্য্যে গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করার নানা উপায় অবলম্বনের পালা। এ-সময় নেতৃত্ব এক কেন্দ্রে নিবদ্ধ ছিল না। ছোট ছোট দলের মধ্যে কর্ম্মী বেরিয়েছে, কর্ম্মপন্থা স্থির হয়েছে, তাদেরই মধ্যে একজন নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বাঙ্গলায় যখন নানারকম আক্রমণ আরম্ভ হ'ল, তখন দূরে সহরে বসে একজনের পক্ষে সমস্ত পরিচালনা করা আর সম্ভব ছিল না। কিন্তু তখনও মোট দল দুটি, 'অনুশীলন' আর 'যুগান্তর'—তার মধ্যে "গ্রুপ" বা দল—মাদারিপুর, হাওড়া, ঢাকা, ঢিংড়িপোতা, ময়মনসিংহ, রায়পুর প্রভৃতি নানা কেন্দ্র করে কাজ চলতে লাগলো। সহর বা সহরতলীতে অস্ত্রসংগ্রহ বা বোমা-তৈরীর প্রণালী (টেক্‌নিক) শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো। এইসব হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে, হয়তো আদর্শের লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে খুনজখম, লুঠপাট চলতে থাকে। পরে যে-সকল পন্থা অবলম্বিত হয়েছে তার প্রায় সবরকম নমুনা ১৯০৮ সালে পাওয়া যায়। বিস্ফোরক তৈরী করতে প্রাণ-বিসর্জ্জন এইসময়ই দেখা যায়। বিপ্লবী নিজে মরেছে, অপরকে মেরেছে এবং সে-সংখ্যা পরে বৃদ্ধিই পেয়েছে। (পরে অবশ্য মোটর নিয়ে ডাকাতি একটা নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল)।

সরকারী প্রতিরোধ

সভা-সমিতি ঃ বিপ্লবী ঘটনার তালিকা দীর্ঘ হয়ে উঠছে, সুতরাং গভর্ণমেণ্ট থেকে তার বিস্তার রোধ করার চেষ্টাও চুটিয়ে আরম্ভ হ'ল। প্রথম নজর পড়লো সভাগুলির ওপর। বঙ্গ-বিভাগের পর এর প্রাচুর্য্য ছিল খুব, কিন্তু তাতে যে-সকল বক্তৃতা হ'ত তাতে মোটামুটি অর্থনীতি, নিজেদের অসহায়তা এবং তার প্রতিবিধানের কথা থাকতো। তাতে গভর্ণমেণ্টের খুব বিচলিত হবার কারণ ছিল না। যারা একটু 'গরম' কথা বলেছে, ছলছুতায় গভর্ণমেণ্ট বিচারের প্রহসনে তাদের সাজা দিয়েছে, না-হয় লাঠিবাজি করে, হুমকি দিয়ে বন্ধ করতে চেষ্টা করেছে। রাজদ্রোহোদ্দীপক 'আপত্তিকর' বক্তৃতা থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

এখন 'রাজদ্রোহ'র সঙ্গে সক্রিয় প্রতিরোধের বক্তৃতা যুক্ত হয়েছে। সুতরাং কড়াকড়ি আরও বেড়ে উঠলো। ১৯০৭ নভেম্বর ১-লা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 'অসন্তোষ' বা বিদ্বেষ প্রসার বন্ধ করার জন্য আইন (Prevention of Seditious Meetings Act) বিধিবদ্ধ হয়েছিল। প্রকাশ্য সভার তো কথাই নেই, বিশজন লোকের সমাবেশের জন্য ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করা হলে, সেটা 'সাধারণ সভা' বলে এখন থেকে গণ্য করা হবে এবং সে-সভায় পুলিশকে উপস্থিত থাকতে দেবার অধিকার দিতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের রিপোর্টের ওপর যে-কোনও মিটিং বন্ধ করে দেবার অধিকার লাভ করে এবং ওয়ারেণ্টে বক্তাকে সরাসরি গ্রেপ্তার করার শক্তি প্রদত্ত হয়।

মুদ্রাযন্ত্র ঃ সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও কঠোরতর করা হ'ল। ১৯০৭ জুন ৩-রা তারিখের আগে কোনও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করতে হলে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কারণ দেখিয়ে অনুমতি নিতে হ'ত। এখন যে-ব্যবস্থা হ'ল তাতে গভর্ণমেণ্টের কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। যদি প্রাদেশিক সরকার মনে করে যে, আইনের সীমা লঙ্ঘন করে কোনও পত্রিকা কিছু লিখেছে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখের দিকে চেয়ে না থেকে, প্রাদেশিক সরকার সরাসরি মামলা রুজু করবার অধিকার পায়। এখন থেকে সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রেসের মালিক প্রভৃতি তো বটেই, বিক্রেতা, হকার, প্রচারক প্রভৃতি সকলকেই জালের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হতে লাগলো। মনে রাখতে হবে, এ আইন কেবল সংবাদপত্র নয়, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, পুস্তক—অর্থাৎ ছাপার অক্ষর যাতে বেরিয়েছে তার সকলগুলিই এই আইনের এলাকায় বাঁধা পড়ে গেল।

অসুবিধা খুবই হ'ল বটে, কিন্তু এর ফলে যেন বাঙ্গালী নূতন উৎসাহ সঞ্চয়ে মনোযোগ দিয়েছিল।

বোধনে বিঘ্ন (১৯০৭)

'মুরারিপুকুর বাগান'

বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের প্রথম পর্য্যায় কাটবার পর, ক্ষেত্র বাড়িয়ে বিপ্লবীদল হাত পাকাবার জন্য নানা পরীক্ষা যে চালিয়ে যাচ্ছিল তার প্রমাণও কোনও কোনও ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। সে-সকলের কথা বিবৃত করবার আগে 'আলিপুর ষড়যন্ত্র' সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। মাণিকতলা বা মুরারিপুকুর বাগান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। বাঙ্গলার বিপ্লব কোন্ পথ নিচ্ছে, কারা এর মূলে আছে, উদ্দেশ্য তাদের কি. বিপদের গুরুত্ব তাদের কতখানি, উদ্যোক্তাদের মানসিক অবস্থা, কতদূর বিপদ ঘাড়ে নিয়ে তারা নেমেছে, ইত্যাদি তত্ত্বগুলি এই ব্যাপারে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এটি বাঙ্গলার সশস্ত্র বিপ্লবের মূলকেন্দ্র এবং সেখান থেকে বে-পরোয়া বিপ্লবী মনোভাব চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। গভর্ণমেণ্টও বুঝতে পারে, এ নিতান্ত ছেলেখেলা নয়। নিরীহ 'গো-বেচারা' অগ্নিগর্ভ বাঙ্গালী-মন উত্ত্যক্ত হলে, আত্মসম্মান-রক্ষায় বদ্ধপরিকর এবং দেশপ্রেম উদ্বেলিত হয়ে উঠলে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে সে আপনাকে উৎসর্গ করে দিতে পারে।

বিরাট ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে উপেক্ষণীয় অভিযান। তবুও সামান্য কয়টি "বোমার আসামী" পরবর্ত্তী কালে বিপ্লবী যুবকদের মনে সাহস যুগিয়েছে, মনোবল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিতে শিক্ষা দিয়েছে ; অসাধ্যসাধনে কৃতসঙ্কল্প করে ছেড়েছে। তারা পথ দেখিয়ে গেছে, আর সেই রক্তরাঙ্গা রেখা ধরে বছরের পর বছর বাঙ্গলা-মায়ের বীর যোদ্ধদল অকুতোভয়ে জেল, কালাপানি আর ফাঁসিকে আলিঙ্গন জানিয়েছে।

দেওঘর ঃ প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

মাণিকতলা বাগানে কেন্দ্র খোলবার আগে থেকেই তোড়জোড় চলছিল নানা-রকম, তার মধ্যে প্রচণ্ডশক্তিসম্পন্ন বোমা-প্রস্তুত ছিল অন্যতম লক্ষ্য। এর জন্য দেওঘরের কাছে অন্য একটা ঘাঁটি খোলা হয়েছিল। সেখানে বোমা তৈরী করতে লেগে গেলেন উল্লাসকর দত্ত ; তার শক্তি সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কোনও ধারণা করার মত অবস্থায় এসে পৌঁছাননি অনেকদিন। অবশেষে বোমা-নির্ম্মাতা বললেন যে, তাঁর গবেষণা পূর্ণত্ব লাভ করেছে, এখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার পরীক্ষা প্রয়োজন।

প্রয়োগ করার জায়গা স্থির হ'ল দেওঘরেরই কাছে লতা-গুল্ম-ঢাকা অনুচ্চ দিঘিরিয়া পাহাড়। সেখানে গেলেন স্বয়ং উল্লাসকর, আর সঙ্গী চারজন হলেন

রংপুরের প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, বারীন্দ্র, নলিনীকান্ত গুপ্ত আর বিভূতি সরকার। পাহাড়ের মাথায় "একটা প্রকাণ্ড পাথর দেখা গেল—একদিক খাড়া উঁচু, বুক-প্রমাণ হবে, আর একটা দিক ক্রমে ঢালু হয়ে নীচে চলে গেছে বিশ-পঁচিশ হাত। প্ল্যান হলঃ প্রফুল্ল ছুড়বে খাড়া দিকটার আবডালে পিছনে দাঁড়িয়ে ঢালুটার ওপর তাক করেই, ছুড়ে বসে পড়বে যাতে ফাটার পরে কোনো টুকরো গায়ে না লাগে।" (নলিনীকান্ত গুপ্ত ঃ 'স্মৃতির পাতা', ১৩৭০, পৃঃ ৪৩)। ঘটনা ঠিক এ-রাস্তা নিল না। প্রফুল্ল বোমা ছুড়েছিলেন, মনে করেছিলেন বোমা ভূমিতে পড়ে ফাটবে। কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং বোমার টুক্‌রো এসে প্রফুল্লর মাথার ডান দিকটায় দারুণ আঘাত করে আর মৃত্যু সঙ্গে-সঙ্গেই ঘটে। অশুভ সেদিনটা ছিল ১৯০৮ জানুয়ারী ২৯-এ।

প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর অপঘাত মৃত্যু দিয়ে যাত্রা শুরু। বোমার বিস্ফোরণ এই প্রথম এবং তাই দিয়ে হ'ল বিপ্লবীর জীবনান্ত। অমূল্য তাঁর দান। এ-সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা'য় লিখেছেন ঃ "আমাদের একটি ছেলে বোমা ফাটিয়া মারা পড়ে। আমাদের যতগুলি ছেলে ছিল, তার মধ্যে সেইটিই বোধ হয় সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে, যে তাহাকে দেখিয়াছে, সে-ই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই।" প্রফুল্ল রংপুরের জজ-কোর্টের পেস্কার ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র। স্থানীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় তাঁর একটা অংশ ছিল, এবং মাণিকতলা যড়যন্ত্রে তাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে যায়। তাঁর খোঁজে পুলিশ বাঙ্গলার বহু জেলা তোলপাড় করেছে; তাঁকে ধরবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে, কিন্তু প্রফুল্ল তখন সকল ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। পুলিশ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ঐ সাংঘাতিক লোকটি বাইরে থাকলে, কিছু অঘটন ঘটাতে পারে। খোঁজাখুঁজি সমানে চলেছে ও অন্যদিকে বোমার মামলার আয়োজনও হচ্ছে। পুলিশের গোপন অনুসন্ধানের ফল অতি উচ্চ দপ্তরে জানানো হয়। তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকলেই মনে করতো, গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত, প্রফুল্ল সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে গেছেন। এটি মাণিকতলা ষড়যন্ত্রের প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লর মৃত্যু বিপ্লবীদের নিরুৎসাহ করতে পারেনি। মাণিকতলা কেন্দ্র গড়ে ওঠার সামান্য আগে ও পরেই চন্দননগরের মেয়রের ঘরে বোমা ফেলা, সেখানে রেল-লাইন ধ্বংস করার চেষ্টা, নারায়ণগড়ে ছোটলাট-হত্যার পরিকল্পনা ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—সবই এই দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল

কাজী কিংস্‌ফোর্ড-এর নাম গ্রহণ না করে বাঙ্গলার বিপ্লবের ইতিহাস লেখা যায় না; যেমন যায় না, লাট কার্জ্জনকে বাদ দিয়ে। কলিকাতায় কাজীকে হত্যার চেষ্টা

হয়েছে। মোটা বইয়ের পাতার মাঝখান কেটে গর্ত্ত করে (book bomb) তার মধ্যে বিস্ফোরক ভর্ত্তি করবার পর তাঁর বাসভবনে পাঠানো হয়েছিল। বইখানার দড়ির বাঁধন খুললেই, স্প্রিং ঠিকরে উঠলে বোমা ফাটবে এবং তাতেই কাজীর জীবনান্ত ঘটবে। (বইখানি দিয়ে আসেন পরেশ মৌলিক)। কপালে কাজীর মরণ নেই, তাই সে-বই আর খোলা হয়নি। সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে কাজী মজঃফরপুরে বদলি হয়ে যান। রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তিতে খবর পেয়ে, পরে পুলিশ সেখানে বইখানি খুঁজে পেয়ে তার মধ্যে বোমা আবিষ্কার করে।

বাঙ্গলার বিপ্লবী সংস্থা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সুতরাং সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁর পিছনে ছুটে চলেছে যমের দূত। ১৯০৮ মার্চ ২৮-এ কিংস্‌ফোর্ড কলিকাতা থেকে বদলি হয়ে যান।

স্থান পরিদর্শনের জন্য প্রথমে যান প্রফুল্ল চাকী ও সুশীল সেন। পিতার গুরুতর পীড়ার সংবাদে সুশীল কলিকাতায় ফিরে আসেন। পরে হেমচন্দ্র দাস ক্ষুদিরামকে মনোনীত করলে, তিনি ২৯-এ এপ্রিল মজঃফরপুর যান এবং ষ্টেশনে প্রফুল্লর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ; তৎপূর্ব্বে পরস্পরের পরিচয় ছিল না।

কলিকাতা থেকে পাঠানো হ'ল মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু আর রংপুরের দীনেশচন্দ্র রায়কে (ওরফে প্রফুল্ল চাকী)। তাঁরা ১৯০৮ এপ্রিলের ১৭-১৮ তারিখ নাগাদ মজঃফরপুর পৌঁছান এবং এক ধরমশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ কাজে প্রধান সহায় হয়েছিলেন কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা থেকে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে এপ্রিল ২০-এ কুড়ি টাকার যে মনি-অর্ডার গিয়েছিল ধরমশালার ঠিকানায, সে টাকা তাঁর হাতে পড়ে (পোষ্ট-অফিস মারফত) এবং তিনি সে-টাকা প্রফুল্লকে দেন। এর জন্য পরে কিশোরীর নামে দায়রা আদালতে মামলা রুজু করা হয়েছিল (মে ৩০-এ)। কিন্তু ১৯০৮ জুন ১৩-ই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

দিন যায় ; কিংস্‌ফোর্ড-এর গতিবিধি লক্ষ্য করতে সপ্তাহ গড়িয়ে এল, ঠিক সুযোগ হচ্ছে না। অথচ কার্য্যোদ্ধার না করে তাঁরা ফিরে যেতে পারেন না ; "মন্ত্রের সাধন" হ'ল প্রতিজ্ঞা। অচেনা জায়গায় সব খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করা সহজ নয়। এটা বোঝা গেল, কাছারি যাওয়া-আসা ছাড়া কাজী তাঁর বাসা থেকে প্রায়ই বার হন না। কাছারিতে (এজলাসে) হত্যা করা যেত, কিন্তু অনেক নিরীহ প্রাণী হতাহত হবে বলে কিছু করা হয়নি।

শিকারের খোঁজে দুই বন্ধু সতর্ক হয়ে রয়েছেন। কিংস্‌ফোর্ড-এর গমনাগমন লক্ষ্য করা একটা বড় কাজ। কোয়ার্টারের কাছেই ইয়োরোপীয় ক্লাবে কিংস্‌ফোর্ড তাস খেলতে যান। ১৯০৮ এপ্রিল ৩০-এ তাঁর খেলার সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় বড় উকিল কেনেডির পত্নী ও কন্যা। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় খেলা শেষ হলে এঁরা

কিংস্‌ফোর্ড-এর ঘোড়া-টানা গাড়ীর মত অবিকল দেখতে একটা 'ভিক্টোরিয়া' চড়ে তাঁদের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। অল্প দূরত্বের ব্যবধানে কিংস্‌ফোর্ড-এর গাড়ী পিছনে আসছিল। কেনেডির গাড়ী কিংস্‌ফোর্ড-এর ফটকের সামনে আসতেই ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করেন। প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত শহর কাঁপিয়ে বোমা ফাটে আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা চুরমার হয়ে যায়। শ্রীমতী ও কুমারী কেনেডি মারা যান অল্প সময়ের মধ্যে।

আততায়ীরা জুতা ফেলে খালি-পায়ে ছুটতে আরম্ভ করেন। তাঁরা কিছু পথ একসঙ্গে চলার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যান ; দীনেশ সমস্তিপুর ও ক্ষুদিরাম ওয়াইনীর দিকে। পুলিশের লোক ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। এক দল রেল-লাইন ধরে পিছু ধাওয়া করতে লেগে গেল। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পুলিশ মোতায়েন করা হ'ল। থানায় থানায় খবর গেল সন্দেহোদ্দীপক কোনও যুবককে খালি-পায়ে দেখলেই যেন ধরে রাখা হয়।

দীনেশ রায়ঃ ঘটনাস্থল থেকে (১৯০৮) মে ১-লা দীনেশ বেঙ্গল ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল (বর্ত্তমানে মোকামা-বারোণী লাইন)-এর সমস্তিপুর পৌঁছে মোকামা-ঘাট যাবার টিকিট কেনেন। ইতিমধ্যে তিনি নতুন পোশাক ও জুতো কিনে পরেছেন। ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্ম্মে তাঁকে দেখে সাব-ইন্‌সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহ হয়। তিনি ছুটী-শেষে কাজে যোগ দেবার জন্য মজঃফরপুর থেকে সিংভূম যাচ্ছিলেন। নন্দ দীনেশের সঙ্গে একই কামরায় ওঠেন ও আলাপ জমাতে চেষ্টা করেন। দীনেশের সেটা মোটেই ভাল লাগে না। সেমুরিয়া-ঘাটে নেমে গঙ্গার জল খেয়ে তিনি ভিন্ন কামরায় ওঠেন এবং মোকামা জংশনে নামেন। শিকার ফস্কে যায় মনে করে নন্দ ঘুরে-ফিরে মোকামা-ঘাটে দীনেশকে খুঁজে বার করেন এবং তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সয়তানির সীমা নেই! ইতিমধ্যে তিনি মজঃফরপুরে এক টেলিগ্রামে অবস্থার বিবরণ দিয়ে দীনেশকে গ্রেপ্তার করবার অনুমতি চান। দীনেশ মোকামা ষ্টেশনে নেমে হাওড়া যাবার টিকিট কেনেন। এখানে নন্দর ইচ্ছা পূরণ করে টেলিগ্রাম আসে। তিনি দীনেশকে গ্রেপ্তার করছেন সানন্দচিত্তে এই কথা বলেন। "বাঙ্গালী হয়ে এই কাজটা করলেন?"—বলেই দীনেশ সরে পড়তে চেষ্টা করেন। নন্দর আর্দ্দালী পশ্চাদ্ধাবন করে। দীনেশ ফিরে গুলি চালান, কিন্তু কনষ্টেবলের লাগে না। প্ল্যাটফর্ম্মের প্রায় শেষে উল্টো দিক থেকে আর-এক পাহারাওয়ালা এসে পলায়মান দীনেশের পথরোধ করে। এখন সামনে ও পিছন থেকে দু'জনে তাঁকে জাপ্টে ধরে ফেলে। অসীম শক্তিবলে দীনেশ হাত-দু'টো মুক্ত করে নেন এবং দু'বার তাঁর ব্রাউনিং-পিস্তল হতে নিজ দেহে গুলি ছোড়েন। একটি তাঁর চিবুক ও দ্বিতীয়টি তাঁর কণ্ঠার হাড় ভেদ করে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে (মে ১-লা)। দীনেশের মৃতদেহ কলিকাতায়

আনা হয় এবং স্বল্পকালের মধ্যে তাঁকে রংপুরের প্রফুল্ল চাকী বলে সনাক্ত হলে পুলিশ স্বস্তিলাভ করে।

রংপুরে রাস্তায় "বন্দে মাতরম্" গান করায় দীনেশ সরকারী স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে স্থানীয় জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখানকার "প্রবেশিকা" পাশ করে কলিকাতায় এসে ন্যাশনাল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং মাণিকতলা বাগানের সঙ্গে জড়িত হন। প্রফুল্লকে উদ্দেশ করে রচিত সে-কালের এক গানে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। তার সামান্য অংশ উদ্ধৃত হ'ল ঃ

"আজিও তোমারে ভুলিতে পারিনি
বীর প্রফুল্ল চাকী ;

* * *

তব পবিত্র সুকঠোর দেহ
স্পর্শিতে কভু পারে নাই কেহ
নিজ হাতে দিলে পরাণ আহুতি
বন্ধন-লাজ ঢাকি।"

ক্ষুদিরাম (দুর্গাদাস) ঃ ক্ষুদিরাম ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে রেল-লাইন ধরে চলতে থাকেন এবং চব্বিশ মাইল অতিক্রম করে বেঙ্গল ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের ওয়াইনী (বর্ত্তমানে ওয়েন) ষ্টেশনে গিয়ে পোঁছান পরদিন সকাল আটটায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে কাতর হয়ে তিনি নিকটস্থ এক দোকানে গিয়ে মুড়ি কিনে খাচ্ছিলেন, সন্দেহক্রমে পুলিশ তাঁকে সেখানে গ্রেপ্তার করে।

খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কলিকাতায় খবর এলে, বিহার পুলিশকে নির্দ্দেশ যায়, যেন কড়া পাহারার মধ্যে ("under strong guard") ক্ষুদিরামের বিবৃতি যাচাই করা হয়, যার সাহায্যে কলিকাতার পাণ্ডাদের জড়িয়ে ফেলা যায়। তা ছাড়া, বিস্ফোরক-সরবরাহ-কেন্দ্রের সংবাদ যেন আবিষ্কার করা হয়। কোনও ত্রুটী যে হয়নি সে-কথা বলা বাহুল্য। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পকেট থেকে রিভলভার বার করবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু পুলিশের লোক হাত চেপে ধরায় সক্ষম হননি। তাঁর নিকট দুটো রিভলভার, খুচরো সব মিলিয়ে নগদ প্রায় ত্রিশ টাকা এবং সাঁইত্রিশটি টোটা ছিল। আর ছিল—ভারতীয় রেলপথের একখানা মানচিত্র এবং টাইম-টেবলের একটা বিচ্ছিন্ন পাতা।

বিকালের ট্রেনে তাঁকে মজঃফরপুর নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর মুখে চিন্তার কোনও রেখা ছিল না, যেন কিছুই ঘটেনি। ট্রেন থেকে থানায় নিয়ে যাবার জন্য পুলিশের গাড়ীতে তোলবার সময় তিনি উচ্চৈঃস্বরে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দিয়েছিলেন মাত্র।

মামলা দায়রা সোপর্দ্দ হয়—মে ২৫-এ, আর বিচার আরম্ভ হয় (১৯০৮) জুন ৮-ই। জজের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অপরাধ স্বীকার করেন। তিনি কাঠগড়ায় অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে, তাঁকে দেখলে বোঝাই যেত না যে, ঐ মামলার সঙ্গে তাঁর কোনো সংস্রব আছে। অনেক সময় তাঁকে সুপ্ত অবস্থায় দেখা গেছে। জুন ১৩-ই তারিখের প্রদত্ত রায়ে ফাঁসির হুকুম হয়। তখনও নির্বিবকার। তিনি বলেছিলেন যে, গীতা পড়ার ফলে তাঁর মরণের ভয় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে।

হাইকোর্টে আপীলের রায় বেরোয় জুলাই ১৩-ই। গভর্ণমেণ্ট আর দেরী করতে পারেনি। আগষ্ট ১১-ই মজঃফরপুর জেলে ফাঁসিকাঠে বাঙ্গলার বীর-বালক জীবন উৎসর্গ করে অমর হয়ে আছেন। প্রায় সত্তর বছর পরেও তাঁর কথা লিখতে গর্ব্ববোধ করছি।

মনে থাকার আর-এক বড় কারণ আছে। দেশের বন্ধন-মুক্তির জন্য ইংরেজের ফাঁসিকাঠে জীবন উৎসর্গ করা এই প্রথম বললেই হয়। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে মহারাজা নন্দকুমারের কথা মনে পড়ে (১৭৭৫ আগষ্ট ৫-ই)। দেশের লোক ক্ষুদিরামকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে নানা গানের মধ্য দিয়ে ; লোকে চারণের মত সে-সব গান পথে পথে, সভা-সমিতিতে গেয়ে বেড়িয়েছে। কাপড়ের পাড়ে একটি গানের অংশ বুনে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে নিষেধ করেছে। ঐ পাড়ের কাপড়ের চলন তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।

কাপড়ের পাড়ে ছিল ঃ "বিদায় দে মা ঘুরে আসি"। এই গানটিই চলেছিল বেশী। কিন্তু এতে ক্ষুদিরামের প্রতি হয়তো কিছু অবিচার হয়ে থাকবে। বীরের তেজ এতে নেই, কাঁদুনী ভাব বেশী। অন্যান্য গানও রচিত হয়েছিল। মনে হয়, তার আগে একজন দেশপ্রেমিকের মরণে এতগুলি গান বহুকাল রচিত হয়নি। একটি ছিল ঃ

"ক্ষুদিরাম তুমি দিয়েছিলে প্রাণ
বাঙলারে ভালবাসি।
হাসিতে হাসিতে মরণ-মঞ্চে
গলায় পরিলে ফাঁসি।"
('মাতৃমন্ত্র', পৃঃ ১২৪)

দ্বিতীয়টি ঃ

"ক্ষুদি তোমার পায়ে নমস্কার !
তোমার কাণ্ড দেখে ভণ্ডরা সব
করছে ভয়ে হাহাকার।

* * *

রাজার জাতি বুটের লাথি
পড়ছে মাথায় দিবারাতি
তুমি ভাঙ্গলে সে ভুল জীবন দিয়ে
দেশের লোকের সবাকার।"

পরেই দেখা যায় ঃ

"ক্ষুদিরাম নূনের ছিটে—
ফেললো সাদা জোঁকের মুখে,
রাঙা মুখ কুঁকড়ে গেল
লাগলো কাঁপন তাদের বুকে।"

এসকলকে ছাপিয়ে গেল ঃ

"তোরা প্রাণ খুলে বল 'বন্দে মাতরম্'।
তোদের ঘুমের নেশা ভাঙ্গিয়ে দিলে
ক্ষুদিরামের একটি বম্॥

তোরা শক্তি-মায়ের শক্ত ছেলে
তোদের জোড়া কোথায় মিলে ?
তোরা মা অভয়ার অভয় পেলি
তোরা নয়রে ছোট নয়রে কম।
একবার তোরা ফিরে দাঁড়া,
তুলে নে মার বলির খাঁড়া।
ছুটবে তোদের মনের ধাঁধা,
বুঝবি নিজের পরাক্রম॥"

দীর্ঘ হয়ে যাবার ভয়ে অবশিষ্ট অংশ ছেড়ে দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নানা 'যুগে' অত্যাচারীর যে দুর্দ্দশা ঘটেছিল সে-সবের উল্লেখ করে কবি কেবল নিজের ব্যাপক দৃষ্টিরই পরিচয় দেননি, দিয়েছেন ক্ষুদিরামকে তাঁর প্রাপ্য যশ। লিখছেন—

"দৈত্যকুলে জন্মাল এক
ক্ষুদির মত পাগলা ছেলে,
বল্‌ল কভু কৃষ্ণ নাম
ছাড়বে না, তার জীবন গেলে।
অত্যাচারের পাকে পাকে
কেবল 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' ডাকে।
শেষে নরসিংহের নখাঘাতে,
ঘুচলো দৈত্যের মনের ভ্রম॥

ত্রেতা যুগে রামের সীতা
করলো চুরি রাবণ রাজা
নারীহরণ পাপের ফলে
পেল পাপী উচিত সাজা
সোনার লঙ্কা ভস্ম হ'ল,
শক্তির দম্ভ ঘুচে গেল
বংশ-শুদ্ধ সবাই ম'লো
হ'ল না তার একটা কম ॥

দ্বাপরেতে রাজ্যলোভী দুর্য্যোধনের সর্ব্বগ্রাসে
মিথ্যা পাশার নেশায় পড়ে পাণ্ডব গেল বনবাসে,
হরণ করে নারীর বস্ত্র
গড়লো নিজের মারণাস্ত্র,
শেষে ভীমের গদায় পেল সাজা ।
হ'ল না তার ব্যতিক্রম ।

ভাবলি বুঝি কলিকালে
তোদের কাজের শাস্তি নাই,
সেই সাহসে গায়ের জোরে,
জুলুম করে বেড়াস্ তাই ।
মিথ্যা মুখোস ফেল না খুলে,
দেখ্‌না জ্ঞানের চক্ষু খুলে ।
আজ ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে
দাঁড়িয়ে আছে তোদের যম ॥"

নূতন অঙ্ক

এইবার মাণিকতলার বাগানবাসী ও তাঁদের সঙ্গীদের আর এক অঙ্ক আরম্ভ হ'ল । আর, তার গর্ভাঙ্ক অতি দুঃসাহস এবং অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে ।

মজঃফরপুর ঘটনার পরই পুলিশ একেবারে ভীষণভাবে তৎপর হয়ে পড়লো । তারা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই "বাগান" চৌকি দিচ্ছিল । তা'ছাড়া আরও কয়েকটি কেন্দ্রের ওপর যে কড়া নজর রাখা হ'ত, সেটা যুগপৎ কয়েক স্থানে খানতল্লাসী থেকে বোঝা গেল । ১৯০৮ মে ২-রা—(ক) মুরারিপুকুর রোড (বাগান), (খ) ১৩৪-নং হ্যারিসন রোড, (গ) ২৩-নং স্কট্‌স লেন, (ঘ) ৪৮-নং গ্রে ষ্ট্রীট, (ঙ) ৩৮।২-নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, (চ) ১৫-নং গোপীমোহন দত্ত লেন—একদিনে একই সময়ে খানাতল্লাসী

হয় এবং বোমার মামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে বেপরোয়া ধরপাকড় চলতে থাকে। সেই সপ্তাহের মধ্যে আরও বহু স্থানে খানাতল্লাসী হয়েছিল, তার মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' অফিস অন্যতম। কলিকাতার বাইরে থেকেও আসামী গ্রেপ্তার এবং কলিকাতায় বিচারের উদ্দেশ্যে টেনে হাজির করা হয়েছে। সংখ্যায় জন পঞ্চাশেরও বেশী হবে। তার মধ্যে আবার বেছে বেছে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ঠিক করা হয়।

কলিকাতা পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জনকয়েককে মে ৪-ঠা এবং ২৪-পরগণা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি (Leonard Birley)-র নিকট মে ৬-ই সমস্ত আসামীকে হাজির করা হয়। মে ১৮-ই পর্যন্ত সকলকে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে হাজতবাসের হুকুম দেওয়া হয়। এই দিন মোট একত্রিশ জনকে হাজির করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে বার্লি দু'শতাধিক সাক্ষী গ্রহণ করেন ; আগষ্ট ১৯-এ উনত্রিশ জনকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় একদল (সাত জন) খাড়া করা হলে, সেপ্টেম্বর ১৪-ই তাঁদেরও প্রথম দলের আসামীদের সঙ্গে বিচারের আদেশ হয়।

দায়রা জজ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ (Charles Porten Beachcroft) অক্টোবর ১৯-এ শুনানি আরম্ভ করেন ; পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯০৯ এপ্রিল ১৩-ই। মোট আসামী-সংখ্যা ছত্রিশ। ১৯০৯ মে ৬-ই দায়রার রায় ঘোষণা করা হয়। তাতে সতেরো জন মুক্তি পান, তন্মধ্যে অরবিন্দ অন্যতম। দু'জনের ফাঁসি, দশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, তিন জনের দশ বছর দ্বীপান্তর (এঁদের সকলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়), তিন জনের সাত বছর ও একজনের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

প্রধান আসামীদের কয়েকজন দীপ্ত ভাষায় অকপটে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছবার কথা বলেছিলেন এবং ষড়যন্ত্রের সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলেন। প্রধান আসামী বারীন্দ্রকুমার বিবৃতি দেন—মে ৪-ঠা। পরে উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন, যিনি যে-কাজের ভার নিয়েছিলেন, সে-সকল কথা প্রকাশ করে বলেন। আজ আমার নিকট এ বিষয়ের ভাল-মন্দ বিচারের যৌক্তিকতা নেই। সে-যুগে এই তেজোব্যঞ্জক বিবৃতির ফলে বহু সন্দেহবাদী অথচ দেশপ্রেমে মাতোয়ারা যুবক ঘর ছেড়ে সাহসে ভর করে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং উত্তরকালে বিপ্লবে বড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সে-কথা একাধিক লোকের মুখ থেকে শুনেছি।

এইবার হাইকোর্টের পালা। বারীন ও উল্লাসকরের আপীল ১৯০৯ মে ১৩-ই ও অপর সকলের মে ১৭-ই দাখিল করা হয়। আগষ্ট ৯-ই সওয়াল শুরু হয়ে নভেম্বর ২৩-এ রায় দেওয়া হয়েছিল। ফাঁসি রদ হয়ে যায় ; চারজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, তিনজনের দশ বছরের দ্বীপান্তর, তিনজনের সাত বছরের দ্বীপান্তর এবং দু'জনের পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়। রায় দেন জজ জেঙ্কিন্‌স্ (Jenkins) ও কার্ণ্‌ডফ্‌ (Carnduff)।

পাঁচজন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়ায় তৃতীয় জজ (Richard Harrington)-এর

নিকট পুনর্বিবচারের জন্য প্রেরিত হয়। তিনি ১৯১০ জানুয়ারী ৪-ঠা শুনানি আরম্ভ করেন এবং ফেব্রুয়ারী ১৮-ই রায় দেন। ফলে, তিনজন মুক্তি পান এবং দু'জনের সাজা বজায় থাকে।

ছকে সাজালে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়ঃ

[যাঃ দ্বীঃ = যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, বঃ দ্বীঃ = বৎসর দ্বীপান্তর, সঃ = সশ্রম কারাদণ্ড]

	দায়রা জজের রায় (৬. ৫. ০৯)	হাইকোর্টে রায় (২৩. ১১. ০৯)	তৃতীয় জজের রায় (১৮. ২. ১০)
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	ফাঁসি	যাঃ দ্বীঃ	—
উল্লাসকর দত্ত	ফাঁসি	যাঃ দ্বীঃ	—
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	যাঃ দ্বীঃ	যাঃ দ্বীঃ	—
হেমচন্দ্র দাস	যাঃ দ্বীঃ	যাঃ দ্বীঃ	—
বিভূতিভূষণ সরকার	যাঃ দ্বীঃ	১০ বঃ দ্বীঃ	—
হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল	যাঃ দ্বীঃ	১০ বঃ দ্বীঃ	—
ইন্দুভূষণ রায়	যাঃ দ্বীঃ	১০ বঃ দ্বীঃ	—
বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন	যাঃ দ্বীঃ	দ্বিমত	৭ বঃ দ্বীঃ
সুধীরচন্দ্র সরকার	যাঃ দ্বীঃ	৭ বঃ দ্বীঃ	—
ইন্দ্রনাথ নন্দী	যাঃ দ্বীঃ	দ্বিমত	মুক্তি
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	যাঃ দ্বীঃ	৭ বঃ দ্বীঃ	—
শৈলেন্দ্রনাথ বসু	যাঃ দ্বীঃ	দ্বিমত	৫ বঃ সঃ
শিশিরকুমার ঘোষ	১০ বঃ দ্বীঃ	৫ বঃ সঃ	—
নিরাপদ রায়	১০ বঃ দ্বীঃ	৫ বঃ সঃ	—
পরেশচন্দ্র মৌলিক	১০ বঃ দ্বীঃ	৭ বঃ দ্বীঃ	—
সুশীলকুমার সেন	৭ বঃ দ্বীঃ	দ্বিমত	মুক্তি
বালকৃষ্ণ হরি কানে	৭ বঃ দ্বীঃ	মুক্তি	—
অশোক নন্দী	৭ বঃ দ্বী	মৃত	—
কৃষ্ণজীবন সান্যাল	১ বঃ সঃ	দ্বিমত	মুক্তি

মামলা আরম্ভ এবং যথারীতি দিনের পর দিন চলবার পর একসময় শেষও হ'ল। কিন্তু ইতিমধ্যে যা ঘটল তা সমস্ত বিচারবুদ্ধি, এমনকি কল্পনাকেও পরাস্ত করতে সক্ষম।

নরেন-কানাই-সত্যেন

আসামীদের রায়ের মধ্যে তালিকায় তিনটি লোকের নাম দেখা যায় না। অথচ তাঁরা খাঁটি দোষী বলে গভর্ণমেন্টের ধারণা এবং মামলাতেও তাঁদের নাম ছিল।

এ তিন জন হচ্ছেন ঃ মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত আর শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। কানাই হচ্ছেন প্রথম ঝাঁকের আসামী; মে ২-রা তারিখে—১৫-নং গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে ধরা পড়েন। নরেনকে শ্রীরামপুরে মে ৫-ই গ্রেপ্তার করে প্রথম দলের আসামীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সত্যেন প্রথমে মেদিনীপুরে তাঁর ভাইয়ের বন্দুক নিয়ে বে-আইনী ঘোরাফেরা করার অপরাধে জুলাই ৪-ঠা দু'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জুলাই ১৮-ই দায়রা জজ তাঁর আপীল নাকচ করে দেন। কয়েদীর পোশাক-পরিহিত সত্যেনকে (১৯০৮) জুলাই ২১-এ আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করলে, তাঁকে দ্বিতীয় ঝাঁকের মধ্যে আসামী করা হয়।

বড়লোকের ছেলে নরেন। ঠিক এতটা হজম করতে হবে, এ কথা ভাবেনি। প্রথমটা বেশ মন-মরা হয়ে পড়ে, অন্যান্য আসামীদের হৈ-হুল্লোড়ে যোগ দেয় না। পুলিশ কি সন্ধান পেয়েছিল বলা যায় না। কিন্তু একদিন দেখা গেল নরেনকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গেল জেল-অফিসে, তারপর আরও কয়েকবার। ফলে দাঁড়াল, নরেনের অনুসন্ধিৎসা বাড়ল দলের সভ্যদের, বিশেষ করে বাঙ্গলার বাইরের সভ্যদের পরিচয় জানতে। সহ-আসামীরা সন্দেহ করতে লাগলেন—নরেনের মাথায় কোনও কুবুদ্ধি গজিয়ে উঠেছে এবং তাঁরা সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য নাম তৈরী করে সরবরাহ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে নরেন মে ২৯-এ পুলিশের এক কর্ত্তার কাছে গোপনে জবানবন্দী দেয় এবং গভর্ণমেণ্ট জুন ৮-ই তাকে রাজসাক্ষী করা স্থির করে। সকলের অজ্ঞাতে সব ঠিক হবার পর সে আরও উৎসাহভরে গোপন-তথ্য-সংগ্রহে উঠে-পড়ে লেগে যায়।

জুন ২৩-এ ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি-র নিকট হাজির করলে, (সরকারী সাক্ষী নং ৬৮) নরেন্দ্র গোঁসাই-এর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হয়। তখন প্রাণ খুলে সে বিশেষ করে অরবিন্দকে জড়িয়ে একরার করতে থাকে। পরে (১৯০৮) জুন ২৪-এ ও জুলাই ৩-রা পর্য্যন্ত মোটমাট চারদিন ধরে তার বিবৃতি চলে। বলা বাহুল্য, সব বন্দোবস্ত যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন তাকে অন্য সকল আসামী থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে ইউরোপীয় অভিযুক্তদের ওয়ার্ডে রাখা হয়। কাছারীতেও তার স্বচ্ছন্দ ঘোরাফেরা, পুলিশের সঙ্গে হাসি-তামাসা চলতে থাকে। মনে যে তার আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই সে-কথা তার হালচাল থেকে বুঝতে কারও বাকী রইল না।

কিন্তু এদিকে বিপদ ঘনিয়ে উঠল। তার জবানবন্দীর ওপর জেরা হয়ে গেলে, সেটা আইনসম্মত সাক্ষ্য (evidence) রূপে গৃহীত হবে। বিশেষ করে পুলিশের পরামর্শে অরবিন্দকে সে যে-ভাবে জড়িয়েছে তা'তে তাঁর গুরুতর সাজা হওয়া বিষয়ে কোনও সন্দেহই ছিল না।

আসামীদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী জেলের দেওয়াল টপ্‌কে পালাবার মতলব

হচ্ছিল এবং বাইরের লোক, বিশেষতঃ চন্দননগরের কর্ম্মী বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পত্রের আদানপ্রদান চলতে থাকে। কেবল এই কাজে নয়, আসামীদের অজুহাত-মত হাসপাতালে ভর্ত্তি করা প্রভৃতি ব্যাপারে জেলের 'বড়' ডাক্তারবাবু বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সহায়তা করতেন। (বিপ্লবের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত)। কোয়ার্টারে ফিরে যাবার আগে তিনি বাইরে পাঠাবার চিঠি নিয়ে এবং প্রাপ্ত চিঠি পৌঁছে দিয়ে যেতেন। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য ফাঁক-ফাঁক গরাদ দিয়ে (তারের জালহীন) একটা ব্যবধান সৃষ্টি করা ছিল মাত্র। তার মধ্যে দিয়ে মালপত্র পাচার করার কোনও অসুবিধা ছিল না। বারীনের নির্দ্দেশমত একদিন আগষ্টের একেবারে শেষদিকে বসন্তকুমার আর শ্রীশচন্দ্র আসামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে গায়ের চাদরের আবরণে দুটি রিভলভার দিয়ে যান। আরও একটি অন্য সময়ে আসে; সেটি ব্যবহার করা হয়নি। নলিনী-কান্ত গুপ্তর মাথা রাখবার মাটির "বালিশের" গর্ত্তের মধ্যে রাখা ছিল। হাঙ্গামা বেধে যাবার পর সম্ভবতঃ জেল-কর্ত্তৃপক্ষ আরও বে-ইজ্জত হবার ভয়ে সেটা গাপ্ করে ফেলে।

সত্যেন এক চিররুগ্ন যুবক, কিন্তু মাথায় ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি আর মনে ছিল অসীম সাহস। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি (১৯০৮) ২৬, ২৭ ও ২৮-এ জুলাই মামলার শুনানীতে কোর্টে হাজির হননি। মাঝে মাঝে তাঁকে হাসপাতালের শরণ নিতে হচ্ছে। রোগবৃদ্ধিতে ২৭-এ তিনি হাসপাতালে পুনরায় স্থানান্তরিত হন। আগষ্ট ৩০-এ বাইরের লোকের সঙ্গে তাঁর দু'বার সাক্ষাৎকার ঘটেছিল।

সত্যেন আর কানাইয়ের মধ্যে কিছু গোপন পরামর্শ হয়ে থাকবে। পেটের কলিক্ (শূল-বেদনা) বলে কানাই আগষ্ট ৩০-এ হাসপাতালে চলে যান। জুলাই ২৯-এ সত্যেন নরেন গোস্বামীকে খবর পাঠান, যেন সে একবার হাসপাতালে সত্যেনের সঙ্গে দেখা করে। কারণ তিনি অসুস্থ, এবং কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত। সব খবর জানিয়ে দিয়ে তিনি মন পরিষ্কার করে নিতে চান। নরেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে সব কথা বলে এবং অনুমতি পেয়ে সেই সন্ধ্যাতেই এবং পরের দিনও (৩০-এ) একবার দেখা করে। ৩১-এ সকালে আবার দেখা করবার ব্যবস্থা ঠিক করে প্রফুল্লমনে ফিরে আসে।

আগষ্ট ৩১-এ সকাল ৭-টা নাগাদ সে এক ফিরিঙ্গি ওয়ার্ডার সঙ্গে করে হাসপাতালে গিয়ে দোতালায় উঠে আন্দাজ দশ মিনিট বারান্দায় অপেক্ষা করতে থাকে। এমন সময় কানাই এসে গুলি ছোড়েন এবং নরেনের হাতে লাগে। সে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে এবং সিঁড়ি ধরে নামতে থাকে। ইতিমধ্যে সত্যেন এসে পড়েন এবং দেখেন শিকার হাত-ছাড়া হয়ে যায়। পিছনে ছুটেছে দুই যমদূত। ওয়ার্ডার বাধা দিতে গেলে, তিনি ডান হাতের তালুতে একটা গুলি দ্বারা আহত হয়েও নরেনকে

রক্ষা করে পিছনে পিছনে ছুটে চলেন। কানাই ও সত্যেন গুলি ছুড়তে ছুড়তে পিছু ধাওয়া করে চলেছেন। একটা বুলেট নরেনের পাছাতে লাগে এবং নরেনের পলায়নের গতি কিছুটা ব্যাহত হয়ে পড়ে। যখন হাসপাতাল পার হয়ে অফিসের দিকে চলেছেন তখন সত্যেন ও কানাইকে ওয়ার্ডাররা ধরে ফেলে। কোনরকমে ডান হাতটা ছাড়িয়ে কানাই শেষ বুলেট নরেনের দেহে প্রবিষ্ট করে দেন। নরেনের আধখানা দেহ নর্দ্দমার মধ্যে আর বাকীটা তার পাড়ে লুটোতে থাকে। কানাই ও সত্যেন সফলতার আনন্দে বিভোর ; নিরীহ শান্ত লোকের মত ওয়ার্ডারদের হাতে বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাগলা-ঘণ্টির শব্দে জেলখানার মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। কয়েদীরা সব ঘরে ঘরে বন্ধ হলেন। তখন সকাল সওয়া সাত। ক'মিনিটের ব্যাপার, কিন্তু ইতিহাসের কাহিনীর গতিপথ সম্পূর্ণ নতুন খাতে বইতে আরম্ভ হ'ল।

কতকগুলি পত্রিকা আনন্দ চেপে রাখতে পারেনি। তারা কানাই ও সত্যেনের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লাস ফেটে পড়ল। মুখে মুখে এক কথা ঃ "সাবাস !"

বিদেশী-পরিচালিত 'পায়োনীয়ার' পত্রিকাও (১৯০৮ সেপ্টেম্বর ৪-ঠা) আততায়ীদের কাজের সুখ্যাতি করে এক প্রবন্ধ লেখে। 'ষ্টেট্‌সম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' সমস্বরে চীৎকার করে বলতে থাকে—হত্যাটা পাশবিক ('brutal'), গর্হিত ('foul') ; দয়ালেশহীন ('callous') বললে 'ইংলিশম্যান'। অপর পত্রিকাটির মতে—এটা কাপুরুষোচিত হত্যা, যখন সশস্ত্র লোক নিরস্ত্রকে খুন করছে ("cowardly assassination of an unarmed man by men who were provided with deadly weapons")।

'পায়োনীয়ার' বিদ্রূপ করে বলছে যে, 'ষ্টেট্‌সম্যান'-এর মতে আততায়ীদের আক্রান্ত লোককে অস্ত্র সরবরাহ করে, সম্মুখ-সমরে লড়াই করাই উচিত ছিল। কিন্তু এটা তো জেলের মধ্যে সম্ভব নয়। আর তাঁরা তা করবেনই বা কেন ? অন্য যা-ই হোক্‌, 'কাপুরুষোচিত' তো নয়ই (" 'cowardly' the deed most certainly was not")। হন্তারকরা জেনেই করেছেন যে জেল থেকে পালানোর কোনও উপায় নেই ; পরিবর্ত্তে যা হতে পারে সেটা হয় আত্মহত্যা, না-হয় ফাঁসি। খুব বেশী বললে, বলতে হয় যে ওটা একেবারে চরম দুঃসাহসিক ('desperate') কাজ। একে কাপুরুষোচিত বলা নির্ব্বোধের ('fatuous') বাণী। খুনের নানা স্তর, নানা কারণ আছে। যেখানে হত্যা কোনও নীচস্বার্থে সংশ্লিষ্ট নয়, শিশু, নারী, অসহায়কে অর্থ, কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতা, নৃশংসতা প্রভৃতি কারণে নয়, সেরকম ক্ষেত্রে খুনের রক্ত তত লাল নয়, বরং ফিকে বাদামী ('hue of grey') বলা বিধেয়। একটা নিকৃষ্ট জীব সহকর্ম্মী ও বন্ধুদের ফাঁসির ব্যবস্থা করছে, সেখানে তাদেরই দু'জন বিশ্বাসঘাতকের নিপাতের ব্যবস্থা করেছে। হত্যা নিশ্চয়ই, কিন্তু এটা কর্ত্তব্যানুরক্তি ("This is murder, but

it is also self-devotion")। কতকগুলো বাজে, "ছেঁদো" কথা দিয়ে ঘটনার মূল তত্ত্ব ভুলিয়ে দিতে গেলে চলবে না। যদি বাঙ্গালীরা এঁদের দেশোদ্ধারে আত্মোৎসর্গকারী হারমোডিয়স্ (Harmodius) ও অ্যারিষ্টোজাইটন (Aristogeiton)-এর সঙ্গে তুলনা করে, তাহলে তাদের নাম দুটির নির্ব্বাচনে কোনও ভুল হবে না।

সেপ্টেম্বর ৩-রা তাঁদের দায়রা সোপর্দ্দ করা হ'ল। তারপর বিচারের পালা। মামলা উঠল ৭-ই। কানাই আত্মপক্ষ-সমর্থনের কোনও ব্যবস্থাই করেননি। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, বাকীটা নিষ্প্রয়োজন। ১৯০৮ সেপ্টেম্বর ৯-ই মামলার নিষ্পত্তি। জুরী-সংখ্যা মোট পাঁচ ছিল—সকলেই কানাইকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তিন জন সত্যেনকে নিরপরাধ বলেন। সঙ্গে সঙ্গে কানাইয়ের ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। অধিকসংখ্যক জুরীর সঙ্গে একমত না হওয়ায় সত্যেনের মামলা হাইকোর্টে পাকা অভিমত গ্রহণের জন্য প্রেরিত হয়।

আপীল করায় কানাইয়ের আপত্তি। আপীলে যে-ক'টা দিন নষ্ট হবে, ফাঁসিতে মরলে সে-ক'টা দিন আগে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন, এই হ'ল তাঁর উক্তি। অক্টোবর ২১-এ হাইকোর্ট দু'জনের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে।

কানাই সম্পূর্ণ অবিচলিত। তাঁর যে মৃত্যু আসন্ন সে-বিষয় তাঁর মুখে কোনও রেখাপাত হয়নি।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা'য় লিখেছেন—"শুনিলাম যে, কানাইলালের ফাঁসির দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য প্রহরীরা দয়া করিয়া শেষ দেখিবার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

"যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিবার মত জিনিষই বটে! আজও সে-ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে ; বাকী কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাইয়ের মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটি নাই। সে-মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই। চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্য-মূল্য হইয়া গিয়াছে, সে-ই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য তাহাই যেন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে।"

ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল নভেম্বর ১০-ই। ধীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অপরের বিনা সাহায্যে কানাই ধাপ-কয়টি উঠে পড়লেন। হাত-বাঁধা, মুখ-ঢাকা যথারীতি সব ঠিকই হ'ল। আসামী একবার "বন্দে মাতরম্" বলে উঠলেন ; পায়ের

তলায় তক্তা সরে গেল। নিমেষের মধ্যে কানাইয়ের নিস্পন্দ দেহ ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখা গেল।

তাঁকে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে দাহ করবার অনুমতি দেওয়া হয়। বিপুল শঙ্খধ্বনি আর পর্ব্বতপ্রমাণ ফুলের মধ্যে দিয়ে বিরাট মিছিল চলতে থাকে। জয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, আদর্শনিষ্ঠার প্রতীককে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের জন্য হাজার হাজার ছাত্র জুটে ছিল, আর তাদের দলপতি হলেন পরবর্ত্তী কালের স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। চন্দনকাঠের চিতার মাঝে কানাইয়ের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল বটে, কিন্তু কানাই আজও অমর। শ্রদ্ধার সঙ্গে সকল ভারতবাসী (কয়েকটি কুলাঙ্গার পাষণ্ড ছাড়া) তাঁর নাম আজও সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করে।

সত্যেনের ফাঁসি হতে একটু বিলম্ব পড়ে যায়। মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে পুলিশ প্রমাণ করতে পারেনি যে সত্যেনের গুলিতে নরেনের মৃত্যু হয়েছে। সব দিক বিচার করেই পাঁচজন জুরীর মধ্যে তিনজন তাঁকে নির্দোষ বলেছিলেন। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করা হয়। সকল স্তর পার হয়ে যাবার পর তাঁকে ১৯০৮ নভেম্বর ২১-এ ফাঁসি দেওয়া হয়। কানাইয়ের শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রার দৃশ্য গভর্ণমেণ্টকে সন্ত্রস্ত করেছিল। কানাইয়ের শবযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে সত্যেনকে জেলের মধ্যেই দাহ করা হয়।

অন্যান্য আসামীঃ আলিপুর মামলার আরও তিন দণ্ডিত ব্যক্তির পরিচয় দরকার। প্রথম—ভবভূষণ মিত্র। ইনি পরে ধরা পড়েন ৩-রা নভেম্বর বোম্বেতে এবং পূর্ব্বের সাক্ষী ধরে বোমার (অতিরিক্ত) মামলায় বিচার আরম্ভ হয়। ১৯০৯ এপ্রিল ২৩-এ দায়রায় মামলা চলে ; ভবভূষণের সাড়ে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। হাইকোর্টে আপীলে (১৯১০ জুলাই ৩০-এ) পূর্ব্বদণ্ডাদেশ সমর্থিত হয়।

হরিশচন্দ্র ঘোষ মুরারিপুকুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে পুলিশ খোঁজ করতে আরম্ভ করলে তিনি ফেরার হন। পরে ধরা পড়লে, আলিপুর জেলা-হাকিমের নিকট তাঁকে ১৯১০ অক্টোবর ২১-এ হাজির করা হয় ; ১৯১১ জানুয়ারী ৩১-এ দায়রা সোপর্দ্দ হলেন। পলাতক অবস্থায় বহু কষ্ট সহ্য করবার পর অর্থহীন অবস্থায় আদালতের ঝামেলা আর বিফলে সহ্য করার প্রয়োজন অবাস্তব বোধে তিনি অপরাধ স্বীকার করে নেন। তখন তাঁকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আলিপুর বোমার মামলার জের মিটতে চায় না। এ-সম্পর্কে তারানাথ রায় চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়—১৯০৮ মে ১৯-এ, এবং প্রথমদিকে বিশেষ কোনও অপরাধের পরিচয় না থাকায় জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। পরেই গুপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে, ৪-নং রাজা লেনে তাঁর বাসা খানাতল্লাসী করে একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে

কতকগুলি কার্ত্তুজ ও রিভলবার আবিষ্কার করা হয়। এদিকে আসামী জামিন পেয়েই পলাতক। বহু চেষ্টায় আর সন্ধান পাওয়া যায় না। পরে ১৯১০-এ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাইকোর্ট দায়রায় বিচারের জন্য চালান দেয় ১৯১০ মার্চ ২৯-এ। মে ১৯-এ দায়রার রায় বেরোয়; তারানাথের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

'অস্ত্র আইন' মামলা

কথায় বলে "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা"—আর, মাণিকতলা-বাগানবাসীর মামলায় নানা রূপে কতরকমে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সাজা-শাস্তি দেওয়া যেতে পারে তারই চেষ্টায় কথাটা প্রমাণিত হয়। ১৯০৮ এপ্রিল ২৬-এ, উল্লাসকর ৩৪-নং গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে (ঘোড়ার গাড়ী নং ৪৯৪) তিন-চারটি বাক্স নিয়ে ৩০।১-নং হ্যারিসন রোডে আসেন। পুলিশ সে-ঘটনা লক্ষ্য করে। মে ১-লা (মাণিকতলা বাগান তল্লাসীর আগের দিন) পুলিশ বাড়ীতে হাজির হয়ে মালগুলি হস্তগত করে এবং একসঙ্গে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে অন্য এক দলে সেখান থেকেই আর দু'জন এবং আরও একজনকে মাণিকতলা বাগান থেকে পাকড়ে, মোট ছ'জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র-আইনে মামলা জুড়ে দেয়। ১৯০৮ মে ১২-ই প্রাথমিক তদন্তের পর দায়রা আদালতে জুলাই ২৮-এ মামলা আরম্ভ হয়। আগষ্ট ৭-ই রায় বেরোয় এবং নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ধরণী সেনগুপ্ত ও উল্লাসকর দত্ত—প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। নগেন, ধরণী ও উল্লাসকর মূল (আলিপুর) মামলারও আসামী ছিলেন; উল্লাসকরের সাজা হয়। ধরণী আর নগেন বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌-এর রায়ে মুক্তিলাভ করেন। তাঁদের অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে সাত বছর সশ্রম দণ্ড চলছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আলিপুর বোমার মামলার পূর্ব্বেই উল্লাসকরের সাত বছর পরিমাণ জেল হয়ে গিয়েছে। অশোক নন্দী মামলায় আসামী ছিলেন, কিন্তু নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হওয়ায় মুক্তি পান। পরে আলিপুর বোমার মামলার আসামী করা হয়। একেই বলে : বাঘের চেয়ে পুলিশ বেশী মারাত্মক।

মরণ-যজ্ঞ

অশোক নন্দী : মাণিকতলা বাগানের অধিষ্ঠাত্রী, অদৃশ্য বুভুক্ষু-দেবীর ক্ষুধা এখনও চরিতার্থ হয়নি। এই মামলার মধ্যেই এক আসামী অশোক নন্দীর জীবনাবসান ঘটে। মনে রাখা ভাল, অশোককে একবার উল্লাসকরের সঙ্গে অস্ত্র-আইনে জড়ানো হয়েছিল। লম্বা মামলার পরে সেখানে মুক্তি পান। বার্লি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ জজের পাল্লায় পড়েছেন কিশোর অশোক নন্দী।

মামলা যখন চলছে তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। উরু-সন্ধিতে যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগের আবির্ভাব। রোগ-সংক্রমণের ভয়ে তাঁর ভাগ্যে জেলখানার অস্বাস্থ্যকর স্থানে স্বতন্ত্র বাস ঘটে।

দায়রায় তাঁর সাত বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। আপীলের শুনানির সময় তাঁকে জামিনে মুক্তি দেবার জন্য বার বার আবেদন করা হয়। জজ-সাহেবের মন তা'তে ভিজল না। তখন কৌঁসুলী চিত্তরঞ্জন দাশের পরামর্শমত ছোটলাট-বাহাদুরকে আবেদন করার ফলে, ১৯০৯ জুলাই ২-রা অশোককে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। এ সীমিত স্বাধীনতা থেকে শ্রীভগবান তাঁকে সকল বিপদ, সকল দণ্ড, মানুষের সকল জিঘাংসার বাইরে পাঠিয়ে দেন—১৯০৯ আগষ্ট ৬-ই। তাঁর সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটে। হাইকোর্টের রায়ে অশোক মুক্তিলাভ করেন। তার পূর্ব্বে তাঁর চিরমুক্তি হয়ে গেছে!

ইন্দুভূষণ রায় (চারু): দ্বীপান্তরের আসামীদের আন্দামানে নিগ্রহের কাহিনী বলার আগে, এঁদের প্রথম দলের বাঙ্গলা-ত্যাগের কথা বলা দরকার। পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের স্থায়ী অধিবাসী এবং আলিপুর মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন জানিয়েছেন—প্রথম দলে ছিলেন বারীন, উল্লাসকর, হৃষীকেশ, অবিনাশ, হেমচন্দ্র, ইন্দুভূষণ ও বিভূতি, আর তাঁরা রওনা হলেন ১৯০৯ ডিসেম্বর ১১-ই। দ্বিতীয় দল যান ১৯১০ জানুয়ারী ২২-এ—উপেন ও সুধীর। আগষ্ট ১৬-ই যান বীরেন। সবাই 'মহারাজা'-নামক জাহাজের যাত্রী।

আলিপুর বোমার মামলার কাহিনী শেষ হবার নয়। মামলা তো শেষ হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক নিগ্রহ সহ্য করতে হচ্ছে কয়েদীদের। যখন নিপীড়ন সহ্যাতীত হয় তখন আত্মহত্যাই নিষ্কৃতির একমাত্র পথ।

হাইকোর্টের আপীলে যুবক ইন্দুভূষণ রায়ের দশ বৎসর দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ হয়। আন্দামানের জেলে অপরিসীম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। তার মাঝে পড়ে ইন্দুভূষণ একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েন। কঠোর অমানুষিক পরিশ্রম ও সর্ব্বক্ষণ গালিগালাজ সহ্য করা তাঁর শক্তির বাইরে হয়ে পড়েছিল। সঙ্গীদের তিনি নিজ দুরবস্থার কথা বলেন, আর ভাবেন দশ বৎসর ধরে এ নরক-যন্ত্রণা সহ্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

অতি সাহসী ইন্দু, যিনি একসময় চন্দননগরের মেয়রের ঘরে বোমা ফেলেছিলেন; আজ তাঁর অতি করুণ অবস্থা। যন্ত্রণায় এবং শরীরের দুরবস্থায় আজ তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন। জেলে তাঁর কাজ ছিল 'রম্বাস' নামে গুল্ম থেকে সাদা-শণ-উদ্ধার। 'রম্বাস'-এর রস দেহে লাগলে ফোস্কা হয়। ইন্দুর হাতে ফোস্কা হয়ে, গলে গিয়ে দগ্‌দগে ঘা হয়েছে—সাদা জল লাগলেও অসহ্য জ্বালা করে। ১৯১২ এপ্রিল ২৮-এ মে তিনি জেল-সুপারের কাছে যান। কর্ত্তা অকথ্য

গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেয়। বেরিয়ে যাবার আগে তিনি কাতরভাবে বলেন, যেন কয়েকদিনের জন্য তাঁকে বদলি-কাজ দেওয়া হয়। ফলে দাঁড়ালো ঘানি-ঘোরানো। ইংরেজীতে যাকে বলে "from the frying pan into the fire"। সঙ্গে কু-কথা, অশ্রাব্য তিরস্কার হ'ল উপরন্তু লাভ।

অসহ্য ; ঐ হাতে ঘানি-টানা রক্তমাংসের দেহে সম্ভব নয়। জেলারের ঘর পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দু তার পরের করণীয় স্থির করে ফেলেছিলেন। ১৯১২ এপ্রিল ২৯-এ ইন্দুকে তাঁর কুঠুরীর জানালার গরাদ থেকে মৃত অবস্থায় ঝুলতে দেখা গেল। তাঁর ব্যবহারের জন্য জেলের যে কোর্ত্তা, তাকে ছিঁড়ে, ফালি করে জুড়ে-জুড়ে দড়ি তৈরী করে নিয়েছিলেন। সেইটাই তাঁর ফাঁসির দড়িরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে, জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এসে হাজির হলে, কারারক্ষক (Jailor) তাঁদের বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মেরে ফেলতে পারে এইরকম আতঙ্কের বশীভূত হয়ে কয়েদী আত্মহত্যা করেছেন। এত বড় ঘৃণিত মিথ্যা মাত্র সয়তানের মাথায় গজাতে পারে, অপরের নয়।

গল্পটা তখনই বিশ্বাস করে নিয়ে গভর্ণমেণ্ট সেই 'সত্য' প্রচার করে দেয়। সমুদ্রতীরে বুদ্‌বুদের মত ইন্দুর দেহ অনন্তে মিলিয়ে গেল। সহকর্ম্মী, সমদুঃখভাগী বন্ধুরা সমবেদনার নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেছিল ; স্মৃতি সে-ঘটনাকে বহন করছে চিরকাল। আত্মীয়-স্বজনরা শোকাভিভূত হয়েছিল, জিঘাংসা চরিতার্থ করার উপায় তো নেই। কিন্তু ইন্দুভূষণের আত্মত্যাগ ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তরে আঘাত করে গেল ; সেখানে ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী একটা গভীর আঁচড় কেটে দিলেন।

'আলিপুর বোমা' কাহিনী এখানে শেষ নয়। আরও দুটি বিপ্লবী জীবন (চারু বসু ও বীরেন দত্তগুপ্ত) এবং সরকারের তিন শক্তিশালী স্তম্ভ (নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশু বিশ্বাস ও সামসুল আলম) লুপ্ত হয়েছিলেন। সে কাহিনী যথাস্থানে বিবৃত হবে।

"রুদ্রদূত"

আলিপুর বোমার মামলা সম্পর্কে বলতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীঅরবিন্দর কথা মনে আসে। তাঁকে কেন্দ্র করেই মামলা,—সরকারের পক্ষে একাগ্র চেষ্টা, জব্দ করা; আর দেশবাসীর পক্ষে একমাত্র কামনা তাঁকে সকল বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা।

কেবল আলিপুর মামলা কেন, বাঙ্গলার সামগ্রিক বিপ্লবের মধ্যমণি হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর কথা পূর্ব্বে নানা স্থানে উল্লেখ করতে হয়েছে, কারণ তাঁকে বাদ দিয়ে বিপ্লবের ইতিহাস লেখাই অসম্ভব।

দণ্ডিত অবস্থায় ইংরেজের জেলে বাস তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না। এর অবশ্যম্ভাবিতা সত্ত্বেও বিধির বিধানে তিনি মুক্ত অবস্থায় কাটিয়েছেন। বিচারাধীন আসামীর কারাবাস তাঁর ভাগ্যের লিখন মাত্র।

মজঃফরপুর-হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে ১৯০৮ মে ২-রা তাঁর ৪৫-নং গ্রে ষ্ট্রীট বাসায় পুলিশ গিয়ে আবির্ভূত হয়। ভোর পাঁচটায় হোমরা-চোমরা পুলিশ-সাহেব, ধূর্ত্ত শঠ পদস্থ বাঙ্গালী পুলিশ ইন্‌সপেক্টর, লালপাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষীতে তাঁর শয়নের ক্ষুদ্র ঘরটি ভরে উঠলো। অরবিন্দ বলেছেন—"হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক-কামান-সহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিয়াছে।" তল্লাসীর বড়কর্ত্তার হুকুমে অরবিন্দর হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি পড়লো। ঘণ্টাখানেক বাদে সে-দড়ি খুলেও নেওয়া হয়েছিল। পুলিশপুঙ্গবের কথার ভাবে প্রকাশ পেলো যে, "তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্ত্তে ঢুকিয়াছেন। যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্রস্বভাববিশিষ্ট আইনভঙ্গকারী। আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

খানাতল্লাসী সাড়ে পাঁচটায় আরম্ভ হয়ে প্রায় সাড়ে এগারোটায় শেষ হয়। "বাক্সের ভিতর বা বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজের টুকরা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা পাওয়া যায় কিছুই এই সর্ব্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি পায় না" (শ্রীঅরবিন্দ : 'কারাকাহিনী', ১৩৭৩, পৃষ্ঠা ৪)।

গ্রেপ্তারের পর ক'দিন লালবাজার ও রয়ড ষ্ট্রীট থানা ঘুরে, মে ৫-ই অরবিন্দ আলিপুর জেলে পৌঁছান। আগে থেকেই তাঁর জন্য নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি পার হয়ে, জজ বীচক্রফ্‌ট্‌-এর কোর্টে মামলা চলছে। বিচারের ফলাফল সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট একপ্রকার নিশ্চিৎ যে, তাঁর দীর্ঘ কারাবাস হবে। তা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্টের আশঙ্কা ছিল যে, যদি অরবিন্দ মুক্তি পান তাহলে সমূহ

বিপদ। সরকার মনে করতো—অরবিন্দ যে "Udoubtedly the leader of the whole movement"—সমস্ত (বৈপ্লবিক) আন্দোলনের তিনিই নায়ক। ছোটলাট-বাহাদুরের "has no doubt .... that he is the master mind at the back of the whole extremist campaign in Bengal"—তিনিই বাঙ্গলার উগ্র রাজনীতির মন্ত্রণাদাতা। অন্যান্য সকল আসামী দণ্ডিত হয়েও যদি একা অরবিন্দ মুক্তি পান তাহলে আবার দল গড়ে উঠবে, আবার ঝামেলা জুটে যাবে। এ মামলায় মুক্তি যদি কপালে থাকে তাহলে তাঁকে অন্ততঃ বাঙ্গলার ১৮১৮ সালের ৩ আইনে আটক রেখে দিতেই হবে।

আইনের দোহাই পেড়ে তাঁকে কয়েদ করবার চেষ্টা বারে বারে বিফল হয়েছে। 'বন্দে মাতরম্' রাজদ্রোহ-মামলায় তিনি রক্ষা পেলেন; সাজা হয়েছিল মুদ্রাকর অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসুর।

আলিপুর মামলায় ১৯০৮ মে ৫-ই থেকে আলিপুর জেলে তাঁর কারাবাস আরম্ভ। পরবৎসর, মে ৬-ই তিনি নিষ্কৃতি পান। তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ় ধারণা ছিল যে, তিনি নিশ্চিৎ মুক্তি পাবেন। এ সম্পর্কে, ধরা পড়ার পর পঞ্চম দিনে আদালতকক্ষে তিনি আত্মীয়কে বলেন—"বাড়ীতে বোলো, কোনও ভয় যেন না করে; আমার নির্দ্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হবে" ('কারা কাহিনী', পৃঃ ১২)।

এ বিশ্বাসে তিনি অটুট ছিলেন। তাঁকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য 'আলিপুর মামলা'-সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও কৌঁসুলী চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি।

অরবিন্দকে দণ্ডিত করবার জন্য কত হীন প্রচেষ্টা হয়েছে, তার তুলনা ইংরেজের বিচার-বিভাগে ভারতেও অতি বিরল। যখন পুলিশ হালচাল লক্ষ্য করে বেশ বুঝতে পারল আসামী নরেন গোঁসাইকে "হাত" করা যেতে পারে, তখন সুযোগ ও সুবিধামত তার কাছে কেবল স্বীকারোক্তি নয়, তাকে রাজসাক্ষী খাড়া করবার ব্যবস্থা হয়।

১৯০৮ মে ২৯-এ নরেন্দ্র এক পুলিশকর্ত্তাকে জানায় যে, তার বন্ধুরা তাকে প্রতারণা করেছে; সুতরাং অপকটে সে সমস্ত গুপ্তকথা গভর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দেবে। মামলায় অপরাধ পাকা করবার জন্য যে-সকল তথ্য প্রয়োজন, পুলিশ বলে দিলে, নরেন তোতাপাখীর মত সে-সকলের পুনরাবৃত্তি করে। আদালতে তার বিবৃতি সাক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হবার ব্যবস্থা করা হ'ল।

রাজদ্রোহ এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রমাণিত হলে, দীর্ঘ সশ্রম কারাবাস তো আছেই, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হওয়া নিতান্ত ব্যতিক্রম নয়। সে-কারণে নরেন ঐ ২৯ তারিখেই বলে যে, ভারতকে বিদেশীর হাত থেকে মুক্ত করাই তাদের সমিতির উদ্দেশ্য এবং তার জন্য রাজনৈতিক খুন-জখম দ্বারা শাসক সম্প্রদায়কে ভয় দেখিয়ে ভারত-ত্যাগ করানোই প্রধান লক্ষ্য। আরও অনেক কথা সে বলে। কিন্তু এতে তো

অরবিন্দ সাক্ষাৎভাবে আসছেন না। তাইতে পরে তার উক্তি—অরবিন্দই দলের নেতা এবং তিনিই সমস্ত অর্থ সরবরাহ করতেন।

১৯০৮ জুন ২৩-এ হাকিম বার্লি-সাহেব সমস্ত বিষয় সত্য বলবার আশ্বাসে নরেন্দ্রকে অপরাধ-মুক্ত (tendered pardon) ঘোষণা করে, বাদী অর্থাৎ সরকারপক্ষের সাক্ষী-রূপে কাঠগড়ায় দাঁড় করান।

প্রথম দিনের জবানবন্দীতে সে কেবল অরবিন্দ নিয়েই তথ্য পরিবেশন করতে থাকে। অরবিন্দকে সে ভালরকম চেনে। প্রায়ই (রাজা) সুবোধ মল্লিকের বাড়ী এবং 'বন্দে মাতরম্' অফিসে দেখেছে। সমিতির খরচপত্র বিষয়ে অরবিন্দ তার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। পূর্ব্বে গোপন বিবৃতিতে বললেও (আইনতঃ সাক্ষ্য হিসাবে যার কোনও মূল্য নেই), এবার সরকারী সাক্ষী হিসাবে বলেছিল যে, রংপুরে ডাকাতি করবার জন্য অরবিন্দ খরচ ও কার্ত্তুজ দিয়েছিলেন, ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে অপর আসামীদেরও জড়িয়ে যাচ্ছে। নাচের পুতুল, তারে যেমন টান পড়ছে, সেইরকম নাচছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিবৃতি চলছে। জুন ২৪ ও ২৯ গেল; জুলাইয়ের ৩-রা এলো।

নরেন্দ্র সমানে এজেহার দিয়ে চলেছে। প্রথমে বললে, অরবিন্দর হাতের লেখা চেনে না। পরে বললে, ঠিক চেনে না। তারপর, চিনলেও চিনতে পারে; আর তার পরমুহূর্ত্তেই যখন কতকগুলো কাগজ ও চিঠি দেখিয়ে সরকারী কৌঁসুলী প্রশ্ন করলেন "কার এ হস্তাক্ষর ?"—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—"অরবিন্দর"।

বেশ কথা। কিন্তু সরকারী নথিপত্রের মধ্যে একটা চিঠি আছে যা আজও "Sweets Letter" বলে ঐতিহাসিকদের নিকট পরিচিত—সেখানে "sweet" অর্থাৎ মিষ্টান্ন কথাটার একটা সদর্থ করা দরকার—কারণ অরবিন্দ, বারীন্দ্র ও বোমা একসঙ্গে জড়িয়ে পড়বে—অরবিন্দর নিষ্কৃতি নাস্তি। চিঠিটার বয়ান এই ঃ

"Bengal Camp Near Ajit's
20th December 1908

Dear Brother,

Now is the time. Please try and make them meet for our conference. We must have sweets all over India ready made for emergencies. I wait here for your answer.

Yours affectionately,
Barindra Kumar Ghosh"

এই "sweets"-এর ব্যাখ্যা জুলাই ৩-রা পুলিশ নরেনকে দিয়ে করিয়ে নেয়। নরেন বলছে—"আমাদের সমিতিতে 'সুইট' (মিষ্টান্ন) মানে বোমা বোঝাতো; বোমাকে আমরা 'রসগোল্লা'ও বলতাম।"

এইদিনের পর নরেন জুলাই ১৩-ই ও ২৯-এ এবং আগষ্ট ১৪-ই এজেহার দেয়। বুঝতে কষ্ট হয় না, এ কয়দিন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে যা বলেছে তা'তে ফাঁসি থেকে 'কালাপানি' হওয়ার নিশ্চয়তা প্রায় ষোলো আনা।

এই "মিষ্টি চিঠি"-খানির জন্য, যদি নরেন্দ্র জীবিত থেকে জেরার দাপট কাটিয়ে উঠতো তাহলে অরবিন্দর মুক্তির কোনও সম্ভাবনা থাকতো না। অরবিন্দর ভাগ্যদেবতা এমন কলকাঠি নাড়লেন যে, সত্যেন-কানাইকে "নিমিত্ত মাত্র" খাড়া করে অসংখ্য ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়ে দিলেন: "আমি আটক থাকবো না, নিশ্চয়ই মুক্তি পাবো।"

চিঠিখানা যে কত বড় শয়তানির পরিচয় তা আর বলবার নয়। তখন দুই ভাই-ই একসঙ্গে সুরাট কংগ্রেসে উপস্থিত। দেখাশোনা ইচ্ছামাত্রেই করা যায়, কোনও বাধা নেই। সম্বোধন-ভাগ "প্রিয় ভাই"। চিত্তরঞ্জন দাশ সওয়ালেতে বলেছিলেন যে, বাঙ্গলাদেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখতে হলে,—কয়েকজন বড় ভাইদের মধ্যে লিখে থাকে—'প্রিয় মেজদা, সেজদা'। ছোট ভাই পুরো নাম লিখে চিঠি শেষ করে না; যে চিঠির এত গুরুত্ব, তাকে সঙ্গে নিয়ে কেউ বেড়ায় না, কাছেও রাখে না। জজ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ শেষ পর্য্যন্ত চিঠিটার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দেন। অরবিন্দ রক্ষা পেয়ে যান।

অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। বিশ্রাম নেই; সভা-সমিতিতে যোগদান, বক্তৃতা করা এবং সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন—ইংরেজী 'কর্ম্মযোগিন্' আর বাঙ্গলা 'ধর্ম্ম'। দু'বার ফস্‌কে গেছে বলে পুলিশ নিরুৎসাহ হয়নি। ওৎ পেতে বসে আছে কখন ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়বে।

খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯০৯ ডিসেম্বর ২৫-এ 'কর্ম্মযোগিন্' পত্রিকায় "To My Countrymen" (আমার দেশবাসীর প্রতি) প্রবন্ধ ছাপা হবার পর গভর্ণমেণ্ট তা'তে রাজদ্রোহের গন্ধ আবিষ্কার করে তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ফাঁদ পেতেছিল, যাতে আসামী উধাও হতে না পারে।

তাঁর কাছে এ সংবাদ পৌঁছুতে, তিনি পত্রিকায় "My Will and Testament" (আমার শেষ-ইচ্ছা-সম্বলিত দলিল) বলে ছাপিয়ে দেন। পরে তিনি সংবাদ পান যে, তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ("It had served its purpose"—*Aurobindo on Himself*, p. 94)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেরকম কিছুই হয়নি। গভর্ণমেণ্টের মত যথাপূর্ব্বং—সেইরকমই আছে; অরবিন্দ জেলের বাইরে থাকলেই গোলমাল পাকিয়ে উঠবে।

যখন অবস্থা বেশ ঘোরালো বলে মনে হচ্ছে, তখন অরবিন্দর অন্তর্য্যামী তাঁকে চন্দননগরে যেতে আদেশ করলেন। তিনি আর কোনও দিকে মন না-দিয়ে, অযথা

কালক্ষেপ না-করে মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে নৌকাযোগে চন্দননগর চলে যান—১৯১০ ফেব্রুয়ারী ১৫-ই। চন্দননগরে তাঁর অবস্থানকাল মার্চ ৩১-এ পর্য্যন্ত। শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় ১৯১০ এপ্রিল ১৭-ই তারিখের এক পুলিশ-রিপোর্ট উদ্ধৃত করে ('People's Path', September 1968, p. 55) বলেছেন—মার্চ ৩১-এ অরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ মিত্র এবং তাঁর সহচর বিজয় নাগ (বি. সি. ভৌমিক বলে ছদ্মনামে) পুলিশকে বোকা বানিয়ে ডুপ্লে জাহাজে পণ্ডিচেরীর পথে রওনা হন। তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর তারিখ—১৯১০ এপ্রিল ৪-ঠা বলে জানা গেছে।

ফরাসী রাজ্যে গিয়েও তিনি নিস্তার পাননি। শ্রীসুধীরকুমার সরকার আলিপুর বোমার মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী এবং শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে পণ্ডিচেরী আশ্রমে কালযাপন করেছেন। তিনি নানা তথ্য উল্লেখ করে বলছেন—বারে বারে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কখনও তা সফল হয়নি। সুধীরদা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেগুলি পাঠে প্রকৃত অভিসন্ধি প্রকাশ পাবে। তৎপূর্ব্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসকবর্গের সদাশয়তার একটু নমুনা চাটনির মত নিতান্ত মন্দ লাগবে না।

শ্রীঅরবিন্দর মাস-ছয়েক পণ্ডিচেরী বাসের পর ভারত সরকার বোধ হয় বুঝলে যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনমার্গে চলেছেন; তাঁর নিকট হতে আর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। ১৯১০ নভেম্বর ২১-এ গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার জারি করে। তার মূল কথা—ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৮৭ ও ৮৮ ধারা অনুযায়ী অরবিন্দর বিপক্ষে 'কর্ম্মযোগিন্'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে রাজদ্রোহের অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হচ্ছে এবং প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এলাকাভুক্ত আসামীর যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা আছে, সে-সব তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হচ্ছে।

এইবার সুধীরদা যা লিখেছেন, তার কথা বলা যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী পৌঁছবার পর কিছুদিন বাদে জাহাজে মাল-সরবরাহকারী (stevedore) এক ফরাসী শ্রীঅরবিন্দকে ফরাসী জাহাজে অন্যত্র নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। সে-লোক যে ইংরেজ কর্তৃক প্রেরিত সেটা বুঝতে কোনও কষ্ট হয় না। যখন কথাটা বেশ জানাজানি হয়ে পড়ে তখন সাথীরা তাঁকে অন্য একটা বাসায় চলে যেতে পরামর্শ দেন। আত্মবিশ্বাসের বলে তিনি সে-কথায় কর্ণপাত করেননি। বিপদও আর কিছু ঘটেনি।

প্রথম মহাযুদ্ধ বেধেছে ঃ চারিদিকে হৈচৈ। শ্রীঅরবিন্দর যতটুকু সীমিত স্বাধীনতা আছে সেটাও ইংরেজ রাজশক্তি ভয়ের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করে এবং তাঁকে নিজেদের সম্পূর্ণ এক্তিয়ারের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়। সেই মহদুদ্দেশ্যে ভারতের ইংরেজ সরকার উচ্চপদস্থ এক বিশেষ বার্ত্তাবহ পাঠিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে দার্জ্জিলিঙে

"রাজার হালে" রাখবার লোভ দেখান। বলা বাহুল্য, ইংরেজের সে-চেষ্টাও ফলবতী হয়নি।

এতেও যখন হ'ল না, তখন কূটবুদ্ধি ইংরেজ মিত্রশক্তি ফরাসীকে বিশেষ জিদ ধরে এবং অরবিন্দকে পাঁওচেরী থেকে নিষ্ক্রান্ত করে দিতে বলে। তারা বলে, ভারতবর্ষ থেকে বাইরে ফরাসী-অধিকৃত যে-কোনও অঞ্চলে সরিয়ে না-দিলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা। ফরাসী সরকার এ-নীচবৃত্তি অবলম্বন না করে কিছুটা আত্মসম্মানের পরিচয় দিয়েছিল।

যদিও বিপ্লবের দর্শন, ইতিহাস, গতি, প্রকাশ-ভঙ্গী নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখছিলেন বেশ কিছুদিন আগে থেকে, কিন্তু ১৯০৬-এর আগে, তিনি হিংসাত্মক আন্দোলন কেন, কোনও রাজনীতিতেই অংশগ্রহণ করেননি; যদিও তিনি দর্শক হিসাবে ১৯০২ সালে আহম্মদাবাদ ও ১৯০৪ সালে বোম্বাই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে প্রতিনিধি (delegate) হয়ে প্রথম আসেন। তিনি ব্রিটিশ-ভারত ত্যাগ করলেন ১৯১০-এর এপ্রিলে। এই স্বল্পকালের মধ্যে দেশকে যে নাড়া দিয়ে গেলেন, জাতির সম্বিৎ এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করলেন যে, যুবকের দল সকল নির্য্যাতন উপেক্ষা করে প্রায় শূন্যহাতেই প্রচণ্ড যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এ গৌরব আর কোনও নেতার ভাগ্যে জোটেনি; এ দেশে তো নয়ই, বিদেশেও এর নজির পাওয়া কঠিন।

তাঁর উত্তরকালের আধ্যাত্মিক জীবন বর্ত্তমানে আলোচ্য বিষয় নয়। তবে এক্ষেত্রেও তাঁর যে বিরাট অবদান তা বোঝবার জন্য ভবিষ্যৎ মানবকে অভিনিবেশ সহকারে চর্চ্চা করতে হবে।

অতীত ভারতের শ্রেষ্ঠ ঋষিদের পথে যে নূতন যোজনা করে গেছেন, সেটা তাঁর মত ক্ষণজন্মা মানবের পক্ষেই সম্ভব।

অতিকষ্টে অর্জ্জিত শ্রীঅরবিন্দ-লিখিত একখানি পত্রের অনুলিপি এখানে মুদ্রিত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না যে, এমন নিপুণ আত্মবিশ্লেষণ কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তদ্ব্যতিরেকে অনুজ বারীন্দ্রের যে-চরিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন, সেটা তাঁর তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচায়ক। ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গী এত গূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত যে, অনুবাদ করতে গিয়ে তার সৌন্দর্য্য বহুলাংশে বিঘ্নিত হবে বলে আশঙ্কা আছে। দুই ভ্রাতার পরিচয়-সম্বলিত অংশ ইংরেজী ভাষাতেই দিলাম। পত্রটি এইরূপ ঃ

"Calcutta, June 8th 1906

My dear Father-in-law,

* * *

I am afraid I shall never be good for much in the way of domestic virtues. I have tried very ineffectively to do some part of my duty as a son, a brother and a husband, but there is something too strong in me to subordinate everything else to it. Of course, that is no excuse for my culpability in not writing letters, a fault I am afraid I shall always be quicker to admit than to reform. I can easily understand that to others it may seem as to spring from a lack of the most ordinary affection. It was not so in the case of my father from whom I seem to inherit the defect. In all my fourteen years in England, I hardly got a dozen letters from him, and yet I cannot doubt his affection for me, since it was the false report of my death which killed him. I fear you must take me as I am with all my imperfections on my head.

* * *

Barin has again fallen ill and I have asked him to go out to some healthier place for a short visit .... If he goes (to you) I am sure you will take good care of him for the short time he may be there. You will find him, I am afraid, rather wilful and erratic, the family failing. He is especially fond of knocking about himself in a spasmodic and irregular fashion when he ought to be sitting at home and nursing his delicate health. But I have learnt not to interfere with him in this respect ; if checked, he is likely to go off at a tangent and make things worse.

* * *

Your affectionate
son-in-law
Aurobindo Ghose"

'কালাপানি'

বিপ্লবী সংঘাত চলছে, ক্ষেত্র বিস্তারলাভ করছে। গভর্ণমেণ্টও আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কেবল রোধ করা নয়, বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ড, এমনকি হিংসাত্মক মনোভাব কি-ভাবে নির্ম্মূল করতে পারা যায়। যাঁদের অতি গুরু সাজা হ'ল, কোনও রকমে দু'জনে ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে গেলেন—কি অবস্থায় তাঁদের দিন কাটছে তার বিবরণ এখানে দেবার কথা নয়, কিন্তু এ প্রসঙ্গে কিছুটা বলা প্রয়োজন।

ইন্দুভূষণ রায়ের আত্মহত্যার কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। কারণটা একটু বিশদভাবে বলা যাক্। গোলাকৃতি চৌকীদারী ঘর (watch tower) বা গম্বুজকে কেন্দ্র করে সাতটা স্বতন্ত্র তিনতলা, একহারা, লম্বা কোঠা বা ইমারত চলে গেছে। প্রত্যেকটি অপর হতে "জেল-পাঁচিল" (বিবরণ নিষ্প্রয়োজন) দিয়ে আলাদা করা। সাতটার মধ্যে তিনটা একটু বড়। প্রত্যেক তলায় সারিবন্দী, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আট ফুট করে স্বতন্ত্র কুঠুরী একনাগাড়ে চলে গেছে সংখ্যায় পঞ্চাশটি, সামনে একসারি টানা লম্বা দালান বা বারান্দা। আর, তিনটি wing অপেক্ষাকৃত ছোট ; সেল বা কুঠুরী সংখ্যায় পঁয়ত্রিশ, একই ধরনের সামনে টানা লম্বা দালান। বারান্দা বা দালানের খিলানের প্রত্যেক ফোকর বা ফাঁকটি লোহার মোটা ছড় দিয়ে বন্ধ করা। আলো-জল আসে, চড়াই-চামচিকে গলে যেতে পারে ; জন্তুর মধ্যে বিড়াল হয়তো-বা পারে।

সেলগুলির সামনের দিকে কপাট বা পাল্লা নেই। জেলখানার মত শক্ত ছড়ের দরজা, দেয়ালের মধ্যে খোপ কেটে তালা-চাবি দিয়ে তাকে বন্ধ রাখবার পাকাপোক্ত-রকম ব্যবস্থা। জানালা নেই, আছে পিছনে প্রায় চৌকো এক গর্ত্ত বা ফোকর, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দু'ফুট ও দেড় ফুট, জেলের নিয়মে ছড় বা শিক দিয়ে আঁটা উঁচু প্রায় ছাদের কাছাকাছি, দাঁড়িয়েও যাতে হাত না-পৌঁছায়। আলো আসে নামমাত্র ; বাইরে ঝড় বইলে বাতাস বাধ্য হয়ে খানিকটা ঢোকে। প্রচুর আসে জল, আর আন্দামানে বার্ষিক বারিবর্ষণ হ'ল ১২০ ইঞ্চি।

এখানকার জেলের প্রধান সুবিধা হ'ল—দ্বীপটি চারিদিকে উত্তাল সীমাহীন সমুদ্র দিয়ে ঘেরা ; সাতশ'-আটশ' মাইল দূরে বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ, বর্ম্মা সওয়া বা সাড়ে তিনশ' মাইল হবে। পালাবার উপায় নেই, সুতরাং একবার পুরে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। ইন্দু রায়ের মত যে মরেছে, মাত্র সেই-ই কারাদণ্ডের নির্দ্দিষ্টকালের পূর্ব্বে পালাতে সক্ষম হয়েছে ; অপর একজনও নয়। দ্বিতীয় সুবিধে, সেখানকার কোনও সংবাদই কারও কাছে পৌঁছে দেবার উপায় নেই।

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অথবা জেলার কয়েদীদের প্রথম সম্ভাষণে জানাতেন যে, সেখানে 'বাঘ-সিংহ' হিংস্র জন্তুদের অক্লেশে বশীভূত করা হয়, সুতরাং 'সাবধান'। সর্ব্বপ্রথম কথা হচ্ছে—শৃঙ্খলা-রক্ষার নামে একেবারে সাধ-আহ্লাদ-দার্ঢ্যহীন নিৰ্জ্জীব নিস্তেজ জীবিত জড়পিণ্ড করে ফেলার প্রক্রিয়া। তার জন্য জেলের আইন ছাড়া, বে-আইনী যে-কোনওরকম অত্যাচার-অনাচার প্রযুক্ত হ'ত ; বাধা-নিষেধের বালাই ছিল না। দ্বিতীয় লক্ষ্য, জেলের আয় যেন ক্রমে বাড়তে থাকে, কয়েদীদের স্বাস্থ্য, এমনকি প্রাণের বিনিময়েও।

দুর্দ্দান্ত বা অশান্ত কয়েদী বশ করবার প্রধান দুইটি যন্ত্র : এক—ঘানি ; আর, দ্বিতীয়—নারিকেল-ছোবড়া-পেটাই এবং তাই থেকে নারিকেল-দড়ি বা 'কাতা' তৈরী করা। দুটোই শক্তিমান কয়েদীর পক্ষেও প্রাণান্তকর শ্রমসাপেক্ষ কাজ। দারুণ দুর্দ্দান্ত আসামীও জেলের এই দু'টি অতি 'সাধারণ' কর্ত্তব্যের নামে শিউরে উঠতো। আর যখন সম্ভ্রান্ত, হয়তো সমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষিত সাধারণ বাঙ্গালী ঘরে প্রতিপালিত হওয়ায় কিছুটা স্বভাব-দুর্ব্বল আসামীকে এ-কাজে জুড়ে দেওয়া হ'ল, তখন তার অবস্থা নিতান্ত বর্ণনাতীত হয়ে দাঁড়ায়। যার যা নির্দ্দিষ্ট কাজ দেওয়া হ'ত তার কোনও ত্রুটি হলে জেল-আইনের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য দায়ী করে সাজা দেওয়া হ'ত। এ-ছাড়া অপরাধ আবিষ্কার করবার অফুরন্ত কৌশল বর্ত্তমান। কাজে অবহেলা, (বোমার আসামীদের মধ্যে) পরস্পরে কথা বলা, জেলের অতি ক্ষুদে ওয়ার্ডার, পেটি-অফিসার, টিণ্ডাল প্রভৃতির "আজ্ঞা" অবহেলা বা পালনে বিলম্ব, মুখে মুখে উত্তর, মার খেয়ে প্রতিবাদ—ইত্যাদি সবই নতুন 'অপরাধ'। "বোঝার ওপর শাকের আঁটি"-টি মাত্র।

যেমন অপরাধের তালিকা অফুরন্ত, সাজা-শাস্তিও ছিল সীমাহীন, বৈচিত্র্যে একেবারে তুলনাহীন। পান থেকে চুন খসতে হ'ত না, খসবার সম্ভাবনায় আন্দামানের আবহাওয়ার সামঞ্জস্য রেখে বৃষ্টির ধারার মত কিল, চড়, লাথি, গলাধাক্কা, গলার হাঁসুলি ধরে টেনে ফেলে দেওয়া প্রভৃতি "দাওয়াই" সদ্য সদ্য প্রযুক্ত হ'ত ; এর জন্য 'অফিসার' জেল-কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত ওপরে যেতে হ'ত না।

নির্জ্জন কারাবাস তো ছিলই। কুঠরীর ভেতরেই বা দালানের কোনও স্থানে মোটা শক্ত তারের জালের খাঁচা তৈরী করে তার ভিতর হিংস্র পশুর মত বন্ধ করে রেখে, দিন-মাস-সপ্তাহ নয়, বছর গড়িয়ে গেছে। তার মধ্যেই কয়েদীর জীবনাবসান হয়েছে।

সর্ব্বাপেক্ষা নিরীহ ও ব্যাপক বিধি ছিল কুঠরী-বন্ধ ও কঞ্জি-সেবন। পোকা-ধরা চালের গুঁড়া গরম জলে গুলে-দেওয়া—লবণ ও মিষ্টিহীন বস্তু হচ্ছে 'কঞ্জি'। সাধারণ পথ্যও এরই "মাসতুতো ভাই"। উপেন্দ্রনাথ ('নির্ব্বাসিতের আত্মকথা')

পরিচয় দিয়েছেন ঃ "রেঙ্গুন চালের ভাত ও মোটা মোটা রুটি, এ না হয় একরকম চলে, কিন্তু কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা, চুপড়ি আলু, খোসা-সমেত কাঁচাকলা ও পুঁইশাক, ছোট কাঁকর আর ইঁদুরনাদি একসঙ্গে সিদ্ধ, এই হ'ল সাধারণ পথ্য। তার সঙ্গে চড়-চাপড়, লাথি, দাঁতখিঁচুনি ছিল অতিরিক্ত লাভ, 'চাটনী' বললেই হয়।"

ডাণ্ডা-বেড়ী কথায় কথায়। সঙ্গে ছিল দাঁড়া হাতকড়া। পায়ে বেড়ী-যুক্ত অবস্থায় ছোবড়া-পেটা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কাজ করতে বাধ্য করায় ছিল বাহাদুরী। অকথ্য গালিগালাজটা ফাউ—'এক্স্ট্রা' লাভ। এসকলের সঙ্গে সহাবস্থান—আন্দামানী ম্যালেরিয়া আর আমাশয়। ডাক্তাররাও ছিলেন প্রায় সকলেই বাঙ্গালী, কয়েদীর অসুখ হলে তাঁদের ক্বচিৎ ডাক দেওয়া হ'ত; প্রায় বিনা-চিকিৎসা বা হাতুড়ে ব্যবস্থার চলন ছিল। কয়েদীর 'রোগ' অর্থাৎ সেটা 'ছুতো'; এই 'রোগ'-নিরাময়ের ব্যবস্থা জমাদার, মেট, টিণ্ডালরা নিজ হাতেই রেখে দিয়েছিল।

মানুষের মাথায় নিপীড়ন ও নির্য্যাতনের যতরকম ফন্দী যোগাতে পারে, দেশ-বিদেশের কারাগারে 'বাঘ' বশ করার যতরকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে সে-সকল আবিষ্কার বা শিক্ষালাভ করার জন্য আন্দামান থেকে অফিসাররা সরকারী ব্যয়ে 'ডেপুটেশনে' যাবার খবর জানা নেই, কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তিতে এঁরা কারও চেয়ে কম যান না। একটু কড়া মাত্রার অপরাধী হলে, যেমন জেলর বা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে বাদানুবাদের জন্য একটি বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। একটা "তেকাঠা" (triangle), যদিও লোহার ঢালাই, বা whipping-rack-এ খুব টান করে একসঙ্গে হাত-দুটো যতদূর সম্ভব মাথার উপর উঁচু করে টেনে, হাতকড়া লাগিয়ে এবং পা-দুটো যতটা যায় ফাঁক করে তেকাঠার পায়ার সঙ্গে আটকে উলঙ্গ করে দশ-বিশ-ত্রিশ-ঘা বেত মারা হ'ত। রক্ত ঝরছে, সংজ্ঞাহীন হয়ে মাথা ঢুলে পড়ছে, হাতকড়ার বাঁধনে দেহ মাটিতে পড়তে না পেয়ে ঝুলছে—কিন্তু তখনও পাঁচ-ঘা বাকী,—যখন গুনতিতে মিললো বিশ-ঘা, তখন বাঁধন খুলে নির্দ্দিষ্ট কুঠুরীতে ধরাধরি করে ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত। যাদের জেলের বাইরে settlement-এ কাজ দেওয়া হ'ত, তাদের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। রৌদ্র, বর্ষা-জোঁক পরিবৃত হয়েও কাজ ওঠাতেই হ'ত। তার ওপর ছিলনা আহারের নিশ্চয়তা। সব দিন হয়তো যোগাড় ক'রে নেওয়া সম্ভব হ'ত না।

সবরকম হীন অত্যাচার মিলিয়ে যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা'তে ইন্দুভূষণ রায়ের মত আরও কয়েকটা আত্মহত্যা ঘটেছে। পিটিয়ে মারা হয়েছে পাঞ্জাবী ও শিখ কয়েদীর কয়েকজনকে। তা'ছাড়া নির্ম্মম প্রহারের ফলে রক্তবমন হয়ে মরেছেন, আঘাতজনিত যক্ষ্মা (traumatic phthisis) হয়েও মরেছেন আরও কত! পাগল হয়েছেন অত্যাচারে অনেক; হিসাব করলে তালিকা নিতান্ত ক্ষুদ্র হওয়ার কথা নয়। যে-কোনও অত্যাচার যাঁর মুখের হাসি, মনের তেজ কেড়ে নিতে পারেনি সেই উল্লাসকর

দত্তকে এরা পাগল করে দিয়েছিল। জেলের বাইরে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে তাঁকে কাঁচা মাটি থেকে ফর্ম্মায় ফেলে 'ইট কাটবার' হুকুম হয়। তিনি তাতে সম্মত না হয়ে জেলের মধ্যে ফিরে আসেন। এতবড় অপরাধ, বিনা শাস্তিতে তো নয়ই, লঘু শাস্তি দ্বারা রেহাই দেওয়া যায় না! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাতদিন 'দাঁড়া হাতকড়া', অর্থাৎ সটান দাঁড়িয়ে, হাত সম্পূর্ণ উঁচু করলে যেখানে পৌঁছায়, সেইখানে দেয়ালের গায়ে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। শরীর আগেই দুর্ব্বল ছিল। ঐ অবস্থায় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি হাতকড়া-অবলম্বনে ঝুলতে থাকেন। যন্ত্রণা-বোধেরও শক্তি অন্তর্হিত হয়েছে। সকালে যখন হাতকড়া থেকে মুক্তি পেলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থাতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। যখন জ্ঞান হ'ল তখন তিনি বিকট উন্মাদ।

বোমার মামলার আসামীরা পৌঁছুবার পর মহারাষ্ট্রের কয়েকজন নেতা হাজির হলেন। কত ব্যথা-বেদনা, নির্য্যাতন, নিপীড়ন, দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে দ্বীপটিকে ঘিরে উঠলো তার ইয়ত্তা নেই। কত মাতা, ভগ্নী, পত্নী, কন্যার আকুল চিন্তা, মাঝে মাঝে চোখে দেখবার উদগ্র বাসনা, একটা সংবাদ পাবার জন্য বুকফাটা উৎকণ্ঠা—বন্দীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অশান্ত মন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঝড়ের তাণ্ডবে সমুদ্র অপেক্ষা বিক্ষুব্ধ উদ্বেলিত হয়ে থাকতো, তৃণ অপেক্ষা সংখ্যাতিরিক্ত কত চিন্তা কারাগৃহের অন্তর-বাহির আচ্ছন্ন করে থাকতো, তার হিসাব করা সম্ভব নয়। অনাগত-অমঙ্গল-আশঙ্কা-মথিত নিঃশ্বাস সুদূর দ্বীপের আকাশ-বাতাস ভারী করে ফেলেছিল। তা'তে ইংরেজের সাম্রাজ্যের প্রকাশ্য ক্ষতি কিছু হয়নি। বাঙ্গালীর মধ্যে কয়েকটি পরিবারের মাত্র কয়জন লোক সংসার থেকে, কর্ম্মক্ষেত্র থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের আগুনে বাত্যা সংযোগ হয়েছিল।

বাইরে খবর আসতে পায়নি, এসেছে অতি ক্ষুদ্র ছিন্ন সংবাদের টুকরো। কিন্তু জেলের 'শান্তি' ক্ষুণ্ণ হতে আরম্ভ হ'ল এইসব কয়েদীদের আবির্ভাবে। জেলের দরজায় পদার্পণের সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদ মনের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে। নবাগতদের দৈহিক অত্যাচার সাহায্যে মনকে দুমড়ে কাদার তাল করা একপক্ষের ইচ্ছা, আর এক শক্তি তাকে প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর। তখন দুই পক্ষের মনের জগতে

"বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয় খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয় ;
ভ্রূকুটির সনে গর্জ্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।"

রাজনৈতিক বন্দী নিয়ে এ-খেলা চলেছে ১৯১০ সাল থেকে; সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি, যতদিন না সেলুলার জেলে রাজনৈতিক কয়েদী পাঠানো বন্ধ হয়েছে। সে-কথা বলবার সময় এখনও আসেনি।

জোয়ার-ভাঁটা

সেলুলার জেলের মধ্যে দু'পক্ষের লড়াই জেলের বাইরের সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এটাই আবার সারা পৃথিবীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। রুশীয় ঐতিহাসিক অতি স্বচ্ছভাবে যা বলেছেন, এখানে তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

সকল দেশে স্বাধীনতা-লাভের সংগ্রামে শাসক ও শাসিত দুই দলের শক্তির পরীক্ষা সমানে চলতে থাকে। কখন কে প্রবল হয়ে প্রতিপক্ষকে নিঃশেষ করে ফেলবার অবস্থায় এনে ফেলতে পারে, সে কথা বলা যায় না। অত্যাচারী শাসক দুর্ব্বলকে বিব্রত করতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোথাও নিঃসংশয়ে জয়ী হতে পেরেছে, ইতিহাস সে-কথা বলে না।

বাঙ্গলার বৈপ্লবিক আন্দোলন ও ক্রিয়াকলাপ এপর্য্যন্ত সে-শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি, যাতে ইংরেজ শাসক খুব বিব্রত হয়ে পড়ে। সংগ্রামের সমপর্য্যায়ে উঠতে না পারলেও, বিপ্লবীরা কতদিন শত্রুকে যে ভীতত্রস্ত, চিন্তাকুল করে ফেলেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঠেলাঠেলি চলছে দু'পক্ষে। এ সময়ের পরিস্থিতিটা যেন হুবহু চিত্রিত করেছেন লেখনী-সাহায্যে রুশ-ঐতিহাসিক জিলিয়াকস্ (Konnie Zilliacus)—রুশরাজ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থান অবলম্বন করে।

'রুশ-বিপ্লব' পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন (১৯০৫ আগষ্ট)—মহামান্য সম্রাট পিটার (Peter the Great)-এর আমল থেকেই রুশ নাগরিক ভয়াবহ বিপ্লবের পন্থা অনুসরণ করে চলেছে। বিচ্ছিন্নভাবেও এর গতিরোধ করা যায়নি। কখনও মনে হয়েছে বন্যা কূলের যতখানি প্লাবিত করেছিল, তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; আবার প্রবলতর বিক্রমে ফিরে এসে, যে-সকল অঞ্চল ইতোপূর্ব্বে স্পর্শ করেনি, এখন তা-ও ছাপিয়ে যাচ্ছে।

একনায়কত্বের অত্যাচার হতে উদ্ধার পাবার পথের কাহিনী মূলতঃ একই। দয়ালেশহীন দু'পক্ষের সংঘর্ষ। একপক্ষের 'সেন্সর' (গোপন পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ), কারাগার, ডাণ্ডাপ্রহার এবং সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন; আর অপরদিকে গুপ্তঘাতকের শাণিত ছুরিকা, বোমা প্রভৃতি হাতিয়ার। এ কাহিনীর তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে, মন বেদনায় ভরে ওঠে। বয়স্করা কর্ম্মস্থল থেকে যেমন অন্তর্হিত হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গেই অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর, এমনকি কিশোরীকে পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-লোপ, অবধারিত মৃত্যুর পথে যেভাবে টেনে আনছে তা'তে মন গভীর শ্রদ্ধায় ও প্রশস্তিতে ভরে ওঠে।

বিপ্লবীরা যথেচ্ছাচারকে প্রায় সমাধির কিনারে এনে উপস্থিত করেছে এবং শীঘ্রই তার ঘৃণিত অস্তিত্ব এই কবরের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাবে।

তাঁর রুশ-ভাষায় লিখিত পুস্তকের ইংরেজী তর্জ্জমা নিম্নে দেওয়া হ'ল।

দু'বার অনুবাদে (রুশ থেকে ইংরেজী, আবার ইংরেজী থেকে বাঙ্গলা) মূলের ভাব ও ভঙ্গী কতকটা ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং ইংরেজী অনুবাদটা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ

"From the time of Peter the Great there has been this grim march towards revolution. There have been constant checks. Now and again the tide has seemed to go aweeping back from the shore that it had invaded, but has always returned flowing over areas it had left untouched before.

"The main outlines of the story of the war against autocracy are familiar enough. It has been a struggle without mercy on either side, with the censorship, the prison, the knout, and Siberia as the weapons of one party, and assassins' dagger and the bomb as the final appeal of the othLr. The story is one that cannot be read without pain, without admiration for the manner in which men and women, and even boys and girls, have quietly taken up work which meant loss of freedom or of life as their comrades have been removed out of the ranks.

"The revolutionaries have gradually forced autocracy to the brink of the grave, whither it is bound ignominiously to descend in no distant future."

অব্যাহত গতি (১৯০৮)

প্রথম উদ্যমের লক্ষণস্বরূপ কয়েকটি বিপ্লবী সংঘটন হয়েছিল ; পরে কমবেশী হিসাবে চলেছেও কিছুদিন, কিন্তু বিপ্লবী সংস্থাগুলি ইতিমধ্যে বেশ আঘাত খেয়েছিল। বারীনের সঙ্গে তীব্র মনোমালিন্যে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় নিলেন। 'আলিপুর বোমার মামলা'-য় বারীন, উল্লাসকর প্রভৃতি দীর্ঘ কারাবাসে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অপসৃত হলেন। পুলিন দাসের ওপর বিষনজর পড়েছে, নানারকমে তাঁকে "দাগী" করে রাখছে, যাতে যুবকদের অভিভাবকরা পুত্র ও আত্মীয়-বন্ধুকে তাঁর সঙ্গে মিশতে না-দেন ; যুবকরাও ভয় পেয়ে দলে আসা থেকে নিরস্ত হয়। তিনি প্রেরিত হলেন নির্ব্বাসনে। অরবিন্দ গেলেন পণ্ডিচেরী—হ'ল রাজনীতি থেকে তাঁর চির-অবসর। আর আদি শূর পি. মিত্র করলেন মহাপ্রস্থান।

নেতৃহীন হয়ে পড়লো দলগুলি। এ সময় যাঁরা এগিয়ে এসে হাল ধরে নিমজ্জমান তরণী ভাসিয়ে রেখেছিলেন, তাকে কর্ম্মপটু করে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন —তাঁদের অগ্রণী হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সম্ভাবনায় এঁর নেতৃত্ব সম্যক্‌ভাবে ফুটে ওঠে।

ঘটনা-প্রবাহ

'আলিপুর বোমার মামলা' আর বিভিন্ন স্থানে বৈপ্লবিক ঘটনা সমানে চলেছে। এখানে তার একটু পরিচয় দেওয়া যাক্।

বোমা-প্রস্তুত-পদ্ধতি কতকটা সফল হবার পর, ১৯০৮ সালে কলিকাতা ও উপকণ্ঠে কয়েকটি বোমা ফাটানো হয়। এগুলির বিশেষত্ব হ'ল যে, বারুদ ভরা হয়েছিল নারিকেল-খোলের মধ্যে ঃ ধাতব আধার তখনও তৈরী করা সহজসাধ্য হয়নি। যদি বলা যায়, বাড়ীতে তৈরী করলে উদ্যোক্তারা যেমন উপযুক্ত সময়ের আগেই আনন্দলাভের জন্য পটকা ফাটায়, এগুলিও তদনুরূপ ঘটনা, তাহলে উপমায় বিশেষ তারতম্য হয় না। পুলিশের মতে, তারা "not of a formidable character"—মোটেই মারাত্মক নয়। গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও ভক্ত অনুগতদের ভয় দেখানোই বোধ হয় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথম উৎপাত (১৯০৮) মে ১৫-ই, গ্রে ষ্ট্রীটে ; জন-চারেক্ লোক আহত হয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনার তারিখ—জুন ২১-এ (মধ্যরাত্রি), কাঁকিনাড়া রেল-ষ্টেশনের এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় নারিকেল (নারিকেল-খোলের)-বোমা ফেলা হয়। কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। তৃতীয়, আগষ্ট ১২-ই সন্ধ্যা ৭-টা ২০ মিনিট নাগাদ

শ্যামনগরের নিকটবর্ত্তী একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ওপর বোমা পড়ে। তারপর পড়ে নভেম্বর ২৪-এ বেলঘরিয়া ও আগড়পাড়ার মধ্যে, বাইরে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে। ডিসেম্বর ২১-এ সোদপুর-খড়দার মাঝামাঝি স্থানে অনুরূপ ঘটনা ঘটে।

কলিকাতা ঃ সেনা-বিভাগে আনুগত্য ভঙ্গ করার চেষ্টা অন্যতম বৈপ্লবিক কার্য্যধারা বলে গৃহীত হয়েছিল। বাঙ্গলায় অবস্থিত দশম জাঠ (10th Jats) সেনাদের মধ্যে বিপ্লবীদের চেষ্টার ফলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। তবে খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। শুরুতেই জানাজানি হওয়ায় একজন হাবিলদার ও একজন সিপাহীর বিরুদ্ধে সামরিক আদালতের বিচারে দু'জনেরই এক বৎসর করে কারাদণ্ড হয়।

এ-জাতীয় চেষ্টা অতি সন্তর্পণে চলতে থাকে, কিন্তু ফল বিশেষ হয়নি। শেষ, ১৯১০ সালে চব্বিশজন সিপাহীদের রাতারাতি বদলি করে অন্যত্র পাঠানো হয়।

রাণাঘাট ঃ 'রাণাঘাট শক্তি সমিতি'র সভ্য অতুলকুমার পাল নদীয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটি বোমা-ভরা পার্শেল পাঠিয়ে দেন। বহু অনুসন্ধানে পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করে চালান দেয়। ১৯০৮ সেপ্টেম্বর ১৭-ই দায়রা মামলায় অতুলের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কুষ্ঠিয়া ঃ গুপ্তচর সন্দেহে আক্রমণ করার দুঃসাহস ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। কুষ্ঠিয়ায় (J. Harvey) হিকেনবোথাম নামে পাদ্রী ছেলেদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করতেন এবং আচরণ থেকে মনে হ'ত পরস্পরে একটা প্রীতির সম্বন্ধ আছে। ইতিমধ্যে বিপ্লব-আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের মনে সন্দেহ জন্মে যে, সাহেব এই মেলামেশার সুযোগ নিয়ে পুলিশকে গোপনে তথ্য সরবরাহ করেন। ১৯০৮ মার্চ ৪-ঠা, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় একজন ছাত্রকে তার বাড়ীতে ফেরার সময় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে হিকেনবোথাম যখন মিশনের মাঠের কোণ নাগাদ এসে পৌঁছেচেন তখন হঠাৎ কে বা কারা পিছনদিক থেকে গুলি মেরে সরে পড়ে। মে ৬-ই সন্দেহক্রমে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। দু'জনকে বাদ দিয়ে, জুলাই ৩-রা তিনজন আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হ'ল বটে, কিন্তু আগষ্ট ১৭-ই জুরীরা একমতে সকলকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করায়, আসামী তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হয়।

চন্দননগর ঃ ফরাসী চন্দননগর ছিল আগ্নেয়াস্ত্র-সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র, কারণ সেখানে অস্ত্র-অধিকার নিষিদ্ধ না থাকায়, সাধারণ নাগরিক ফ্রান্স থেকে পিস্তল প্রভৃতি আমদানী করতে পারতো। কতকটা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চাপে পড়ে মেয়র মঃ তার্দ্দিভেল (Tardivel) বাধা-নিষেধ স্থাপনের চেষ্টা করলেন। সেই আক্রোশে ১৯০৮ এপ্রিল ১১-ই, রাত্রি ৯-টা নাগাদ মেয়রের নৈশভোজের সময়, তাঁর ঘরে একটা বোমা পড়ে। নিতান্ত 'নিরামিষ' বস্তু। সেটি ফাটেনি ; মেয়র ও তাঁর পত্নী দু'জনেই সুস্থ

শরীরে ছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস যে, পরবর্ত্তীকালে 'আলিপুর বোমার মামলা'র অন্যতম আসামী ইন্দুভূষণ রায় এই কাজ করেন। সঙ্গী ছিলেন বারীন আর নরেন গোস্বামী।

বাহ্রা (ঢাকা)

লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ এবং প্রাণহানি দিয়ে বিচার করলে, ১৯০৮ জুন ২-রা ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার এলাকায় বাহ্রা গ্রামের ডাকাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৌকা করে এসে, মাঝরাত্রি পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যামিনীমোহন সরকারের বাড়ীতে ৩০-৩১ জন সশস্ত্র লোক হানা দেয়। চীৎকার-শব্দে গ্রামবাসী অনেকে এসে বাধা সৃষ্টি করে, সুতরাং দ্রুত কার্য্যোদ্ধারে বাধা পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ কিছু পরে এসে হাজির হয়। ইতিমধ্যে গুলির আঘাতে একজন চৌকীদার ও তিনজন গ্রামবাসী নিহত হয়েছে; লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ও গহনার মূল্য অন্যূন ২৩,০০০ টাকা। নানা বিপত্তির ফলে আক্রমণকারীদের নৌকায় ফিরে আসতে প্রায় ভোর হয়ে পড়ে। যাত্রীরা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চলতে থাকে, আর কাতারে কাতারে লোক নদীর পাড় দিয়ে পিছু ধাওয়া করে। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়ে এবং নৌকা ধরার চেষ্টায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দেয়। মাঝে মাঝে দুইপক্ষে গুলি-বিনিময় চলছে, পুলিশের গুলিতে নৌকার একস্থানে ফুটো হয় এবং জল প্রবেশ করতে থাকে। এ সময় জল ছেঁচে ফেলে না দিলে নৌকা ডোবে, সুতরাং সে-ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ডাকাত-দল পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে ইচ্ছামতীতে কয়েক ঘণ্টা চলবার পর ধলেশ্বরীতে এসে পড়ে। যখন সাভার থানার সামনে দিয়ে নৌকা যায়, তখন ঐ থানার দারোগা বন্দুক ছুড়তে থাকে। ইতিমধ্যে জল-সেচ-কাজে ব্যস্ত গোপাল সেন নামক এক যুবকের মাথায় গুলি লাগে এবং তিনি নিহত হন।

পুলিশ ও অন্যান্য লোক নৌকা নিয়ে তাড়া করে চলেছে, উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছে; তথাপি পলায়নপন্থী যুবকরা সাহস হারাননি। এদিকে বন্দুকের টোটাও নিঃশেষ হয়ে আসছে। সন্ধ্যা সমাগত। ভোর থেকে বারো ঘণ্টার ওপর এইভাবে চলছে; আহার-বিশ্রাম কিছুই নেই, আছে প্রচুর উদ্বেগ। জেলার পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট লণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যে পশ্চাদ্ধাবনে যোগ দিয়েছেন। প্রতিমুহূর্ত্তে সঙ্কট ক্রমশঃই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

তখন অশান্ত প্রকৃতি ডাকাতদের সহায় হলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারকে গাঢ়তর করে এবং প্রবল বর্ষণকে সঙ্গে নিয়ে প্রভঞ্জন নামলেন। অবস্থা গুরুতর। নদীতে তুফান; কাছের বস্তুও আর দেখা যায় না। এই সুযোগে ডাকাতরা প্রাণপণ চেষ্টায় শত্রুর নাগালের বাইরে যেতে সফল হয়। সে-অসমযুদ্ধের কাহিনী মনে করতেও রোমাঞ্চ হয়।

গোপালের কথা একটু বলা দরকার। যখন নৌকায় জল উঠতে আরম্ভ করে, তখন তিনি একখানা সান্‌কি দিয়ে জল ছেঁচতে আরম্ভ করেন। এ কাজে তাঁকে পালাক্রমে সটান দাঁড়াতে এবং সামনে ঝুঁকতে হচ্ছিল। অপর-সকলে দাঁড়ি-মাঝি হিসাবে বসে আছেন, বিপদের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। গোপাল নিজেকে রক্ষার চেষ্টায় কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করতে পারেননি। প্রকৃত বিপ্লবীর মত তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন। নৌকার ভারী নোঙরের সঙ্গে বেঁধে তাঁর দেহ নদীগর্ভে ফেলে দেওয়া হয়। এই গোপাল সেনদের ক'জন লোক চেনে? ক'জন মনে রাখে? অথচ এইসকল বীর-ই স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন। ধলেশ্বরী তাঁর নিভৃত ক্রোড়ে গোপালকে নিয়ে রেখে দিলেন। এঁরা স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা ভি.আই.পি.-র কেউ ন'ন। যেখানে গোপালের মরদেহ নোঙর জড়িয়ে পড়েছিল, জলজন্তুর আহার্য্য হয়ে তাদের উপকার করেছিল, সে স্থান নির্দ্দেশের লোক নেই; থাকলেও, সেখানে স্মৃতিসৌধ, বা স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ওঠার কথা নেই। শিশুপাঠ্য পুস্তকে এঁদের জীবনচরিত ভাল করে লেখা বাঞ্ছনীয়। ধন, বিদ্যা, বংশগৌরব্‌ না থাকলেও, মানুষ চিরস্মরণীয় হতে পারে, এ শিক্ষা হওয়া দরকার।

রাজসাহী ঃ নাটোর— সরকারী ডাক লুণ্ঠন করা বহুবার হয়ে গেছে, খুব বেশী তোড়জোড় করতে হ'ত না। নিভৃত স্থান ও সুযোগ বেছে নিতে পারলে, অন্যান্য ডাকাতির চেয়ে কাজ সহজ ছিল।

১৯০৮ আগষ্ট ৩-রা নাটোরের সন্নিকটে ডাকপিয়ন আক্রান্ত হয় এবং কিছু টাকা লুণ্ঠিত হবার কথাও প্রচারিত হয়ে গেল। ধরপাকড় আরম্ভ হ'ল। কালীচরণ ঠাকুর এবং জন-পাঁচেককে আসামী খাড়া করে হাইকোর্টে (ফৌজদারী বিভাগ) ১৯০৯ এপ্রিল ২১-এ মামলা রুজু হয়। মে ৫-ই সকলে নির্দ্দোষ বলে মুক্তিলাভ করেন।

কিন্তু আসামী কালীচরণ ঠাকুর বন্দী-বিচারাধীন অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। জামিনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ সিভিল সার্জ্জন বললেন— "জেলখানায় আসামীর অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় কিছু খারাপ নয়" ("his case is not worse in jail")। অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হয়ে উঠলো। নতুন আবেদনও বিফল হ'ল।

বৎসরের শেষের দিকে বড়দিন-এর সময় জেলের মধ্যেই কালীচরণ ঠাকুর ইহলোক ত্যাগ করেন: জেলের সঙ্গী পুত্র পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কয়েক ঘণ্টার জন্য শ্মশানে যাবার প্রার্থনা করেন। ইংরেজ রাজত্ব উল্টে যাবার ভয়ে পুত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। জেল-গেটে মৃত পিতাকে বিদায় দিয়ে তাঁর মনের যা অবস্থা হ'ল, কলম-সাহায্যে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই মামলার জের চলে আরও কিছুদিন। এ সম্পর্কে (১৯০৮) আগষ্ট ৩-রা নাটোর ও রাজসাহীর মধ্যে টেলিগ্রাফ তার কাটার জন্য দুর্লভ মণ্ডলকে আসামী খাড়া করে 'অতিরিক্ত নাটোর ডাক-লুঠ মামলা' চালানো হয়। ফলে, এপ্রিল ২৯-এ তাঁর দু'বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ঢাকা ঃ সাটিরপাড়া— পুলিশ রিপোর্ট দিলে যে, ১৯০৮ আগষ্ট ১৪-ই নীলমণি জুগাই-এর নৌকা নিয়ে যাঁরা উধাও হয়েছিলেন, তাঁদের নিশ্চয়ই কোনও দুরভিসন্ধি ছিল। একজন আসামী ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (মহারাজ)-র বিবরণ হতে পাওয়া যায় যে, এ ব্যাপারে রাজনীতির বিন্দুবিসর্গও ছিল না। যাই হোক্, ১৯০৮ অক্টোবর ২০-এ দু'জনের পাঁচ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা হিসাবে জরিমানা হয়।

ময়মনসিংহ (বাজিতপুর) এবং হুগলী (বিঘাটি)— মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বহুদূরে অবস্থিত দুই বিভিন্ন জেলায় দুটি ডাকাতি সংসাধিত হয়। যখন পুলিশে ধরপাকড় আরম্ভ করলো এবং মামলা বিচারের জন্য পাঠানো হ'ল তখন দেখা গেল কয়েকটি আসামী দুই মামলাতেই জড়িত।

প্রথমটি হ'ল—ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর থানার আটকাপাড়া গ্রামে, ১৯০৮ আগষ্ট ১৫-ই, রাজেন্দ্রকিশোর দাসের বাড়ীতে। চারজন লোক পুলিশ কর্ম্মচারী বলে বাড়ীতে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়টি হয়—হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত বিঘাটি গ্রামে কিশোরী-মোহন রায়ের বাড়ীতে, সেপ্টেম্বর ১৬-ই, রাত্রি ৯-টা হতে ১১-টার মধ্যে। এখানে দু'জন লোক ডিটেকটিভ পুলিশ বলে বাড়ীখানা তল্লাসী করে। যাবার সময় যা নিয়ে যেতে পারলো, তার জন্য এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয় না।

বাজিতপুর ডাকাতির আসামী হয়েছিলেন, দু'জন পলাতক গরহাজির বাদে, (১) কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, (২) সুরেশচন্দ্র মজুমদার, (৩) ধীরেন ঘোষ ও (৪) বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। হাইকোর্টে মামলার বিচার আরম্ভ হয় ১৯০৮ ডিসেম্বর ৩-রা।

এর মধ্যে কার্ত্তিক ও সুরেশের সাজা হয়, বিঘাটি ডাকাতি সংক্রান্ত অপরাধে। কার্ত্তিকের ছয় ও সুরেশের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেই হিসাবে গভর্ণমেণ্ট থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে বিঘাটি মামলার অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়।

আর, ধীরেনের আঠারো মাস এবং বসন্তর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়—১৯০৯ এপ্রিল ১৪-ই।

বিঘাটি মামলা ১৯০৯ মার্চ ১৫-ই হাইকোর্ট স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের এজলাসে শুরু হয় এবং ২৯-এ রায় প্রদত্ত হয়। এখানে কার্ত্তিক দত্তর ছয়, সুরেশচন্দ্র মিত্র ও

সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রত্যেকের পাঁচ এবং পান্নালাল চক্রবর্ত্তীর সাড়ে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

ঐ সময়েই, ১৯০৯ মার্চ ২৯-এ 'বাজিতপুর মামলা'র অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়।

মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র

হঠাৎ গভর্ণমেণ্টের খেয়াল হ'ল মেদিনীপুরে ইংরেজ-বিতাড়নের বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে এবং বিস্ফোরক প্রস্তুত হচ্ছে। অযথা কালক্ষেপ না করে, গভর্ণমেণ্ট বেপরোয়া ধরপাকড় আরম্ভ করে দিলে। এর মধ্যে সজ্জন, কৃতবিদ্য, ধনী, বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কহীন কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে হাজতে বন্দী রাখা হয়। বহু চেষ্টায়ও মেদিনীপুরে জামিনে মুক্তি পাওয়া যায়নি, প্রায় প্রত্যেকের জন্য হাইকোর্টে আপীল করতে হয়েছে।

পুলিশী তাণ্ডব শুরু হয় ১৯০৮ আগষ্ট ৩১-এ ; ঘটনাচক্রে সেইদিন আলিপুর জেলে নরেন গোঁসাই নিহত হয় সত্যেন-কানাই কর্ত্তৃক। হয়তো তার জন্যে পুলিশের আক্রোশ কিছু বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। জামিনের অর্থের পরিমাণ থেকে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে সামান্য অবান্তর হলেও নাম-প্রকাশের লোভ সম্বরণ করতে পারা গেল না।

নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ হাইকোর্ট কর্ত্তৃক জামিনে মুক্তি পান সেপ্টেম্বর ২২-এ। আগষ্ট ৩১-এ থেকে তাঁকে হাজত-বাস করতে হয়েছে। অক্টোবর ২-রা তাঁর জামিনের পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার টাকা। যামিনীনাথ মল্লিক (শিববাজার), অবিনাশ মিত্র (কেরাণীতলা), মন্মথনাথ কর (মীরবাজার), উপেন্দ্রনাথ মাইতি (নতুনবাজার)—সকলেই মোটা টাকার জামিনে মুক্ত হন।

দায়রায় মামলা চলতে থাকলো। বিচারে বিস্ফোরক আইনে (Explosives Substances Act) ১৯০৯ জানুয়ারী ৩০-এ সন্তোষ দাসের দশ বৎসর ও অতিরিক্ত সাত বৎসরের দ্বীপান্তর এবং সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাত বৎসরের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

ভাগ্য নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন। দুই আসামী-ই হাইকোর্টের আপীলে (১৯০৯) জুন ১-লা নির্দ্দোষ বলে প্রতিপন্ন হন।

যোগজীবন ঘোষ ষড়যন্ত্রের অপরাধে দশ বৎসর দ্বীপান্তরের দণ্ড প্রাপ্ত হন। হাইকোর্টের আপীলে ১৯১২ আগষ্ট ১৩-ই তিনিও মুক্তিলাভ করেন।

ফরিদপুর ঃ পালঙ— ডাকাতির ক্ষেত্র খুবই ছড়িয়ে পড়েছে। এবার নারিয়া গ্রামে ১৯০৮ অক্টোবর ৩০-এ রাত্রি দশটা নাগাদ ঘটে। আন্দাজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন

লোক ডাকাতির অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নারিয়া বাজারে হানা দেয়। ষ্টীমার-অফিস লুঠ করার পর, যশোদা কুণ্ডু, মধু সাহা আর কৃষ্ণ নন্দীর বাড়ীর ওপর চড়াও হয়। লাভ খুব বেশী হয়নি, তবে বাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়াতে স্থানীয় লোকের বেশ ক্ষতি হয়েছিল।

ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেল। অন্ততঃ পাঁচজনকে টেনে এনে আসামী খাড়া করা হ'ল। হাকিমের কাছে হাজির করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হ'ল বেশ কয়েকজনকে। ফরিদপুরের ঘটনা, কিন্তু খুব বেশী ধরা হ'ল ঢাকা জেলার ছেলেদের। ফেব্রুয়ারী ২৪-এ নাগাদ প্রায় সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণাভাবাৎ মামলা খারিজ করে দিতে হয়েছিল।

"রাখে কৃষ্ণ—"

ছোটলাট এ্যান্‌ড্রু ফ্রেজারকে মারবার অনেকরকম চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁর মৃত্যু লেখা ছিল না। শেষ চেষ্টা হয় কলিকাতায় ওভারটুন (Overtoun) হল্-এ, ১৯০৮ নভেম্বর ৭-ই। সন্ধ্যা ৬-টায় বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করবার জন্য ফ্রেজার আসেন ; বক্তা তখনও পৌঁছাননি। ফ্রেজার সবে উচ্চমঞ্চে (platform) বসতে যাচ্ছেন—এমন সময় পাশ থেকে এক যুবক লাটের বুকের একেবারে কাছে রিভলভার-এর ঘোড়া দু'বার টিপে দিলেন। পাছে ডান হাত কেঁপে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সে-কারণে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত ধরা ছিল। গুলি ছুটলো না, রিভলভার বিকল। তৃতীয় দফায় চেষ্টা করবার সময় আশপাশের লোকরা আততায়ীকে ধরে ফেলে, এবং এক্ষেত্রে যা হয়, তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। নাম জানা গেল জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা ১৯০৮ নভেম্বর ৭-ই এ-সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখে :

এ প্রচেষ্টা এক দুঃসাহসিক ও ঘৃণ্য কাজ ('dastardly and abominable')। নৈরাজ্যবাদীদের দোষাবহ মূর্খতা চূড়ান্ত পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেচে ('the criminal folly of the anarchists has reached its culminating point'), রাজদ্রোহমূলক বিক্ষোভের উন্মাদকারী ফল আধাপাগলা যুবকদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে ('such has been the maddening effect of the treasonable ferment, which has been working in the minds of a certain class of half-crazy youngmen')। এতেও *Statesman* সন্তুষ্ট নয়—এটা 'stupid and atrocious plot' আর তাদের এই নির্ব্বুদ্ধিতা তাদের নষ্টামির সঙ্গে তুলনার যোগ্য ('they are guilty of folly only equalled by their wickedness')।

সঙ্গে সঙ্গে দায়রায় মামলা দায়ের হ'ল, শুনানী আরম্ভ হয়—নভেম্বর ১৫-ই। আর ২৫-এ রায় প্রকাশিত হয় ; আসামীর দশ বৎসর সশ্রম কারাবাস।

হাওড়া ঃ ছোটখাটো রকমের ডাকাতি চলছিল, টাকা-পয়সার দিক থেকে বিশেষ কোনও লাভ হচ্ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে তোড়জোড় করতে যা খরচ হয়ে যায়, তাও উশুল হয় না। এইরকম এক কাণ্ড ঘটে ১৯০৮ এপ্রিল ৩-রা, হাওড়া শিবপুর থানার এক গণ্ডগ্রাম শ্রীহরিণাপাড়ায় ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের বাড়ী, রাত্রি আড়াইটার সময়। বাড়ীর মালিকের মতে, চার শতর মত টাকা লুণ্ঠিত হয়েছিল। আসামী কেউ ধরা পড়েনি।

ঢাকা ঃ ভোজেশ্বর— ১৯০৮ অক্টোবর ১৮-ই নিবারণচন্দ্র পালের বাড়ীতে ডাকাতির চেষ্টা হয়। যে কারণেই হোক্, ডাকাত-দলকে কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যেতে হয়। সকালবেলা দেখা গেল বাড়ীর ধারে একটি বাণ্ডিল (পুঁটলি) পড়ে আছে এবং তার মধ্যে ছোরা, তরোয়াল, সড়কির ফলা প্রভৃতি রয়েছে। তিন জনের খোঁজখবর চলতে থাকে। দু'জনকে মামলায় জড়ালেও, প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হয়। আর একজন পলাতক বলে পুলিশ প্রচার করে। শেষ পর্য্যন্ত আর কিছু দাঁড়ায়নি।

মালদহ ঃ গোপালপুর— ১৯০৮ অক্টোবর ২১-এ রাত্রি দুটো নাগাদ দ্বারিকানাথ তেওয়ারীর বাড়ীর ওপর আন্দাজ ২৫-৩০ জন লোক চড়াও করে। খুব সোরগোল ওঠে এবং ডাকাতরা চলে যেতে বাধ্য হয়। পরে দু'জন গ্রেপ্তার হয়। মামলা চললেও শেষ পর্য্যন্ত আসামীরা মুক্তি পায়।

নদীয়া ঃ রাইতা— ব্যাপারটা বড় কিছু নয়, গড়ায়নিও বেশীদূর। হয়েছিল ১৯০৮-এর নভেম্বর ২৯-এ, রাইতা গ্রামে অতিথরাম শাহার বাড়ীতে। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ আন্দাজ হাজার দুই টাকা। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি; শীঘ্রই সব চুপচাপ।

হুগলী ঃ মোরেহল— হুগলী জেলা কৃষ্ণনগর থানার মোরেহল গ্রামের শশীভূষণ সাহার বাড়ী ১৯০৮ ডিসেম্বর ২-রা রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ এক ডাকাতি হয়। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়, তবে একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল। ধরপাকড় আরম্ভ হ'ল এবং পাঁচজনকে ডাকাতির অভিযোগে দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়। ১৯০৯ মে ১-লা চারজনকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং পঞ্চম আসামী মন্মথনাথ চৌধুরীর মামলা হাইকোর্টে বিশেষ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। ১৯১০ জুলাই ৮-ই মন্মথর সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বরিশাল ঃ দেহারগতি— এখানে ডাকাতি হয়েছিল বড়দিনের সময়। হাজার-তিনেক টাকাও লুণ্ঠিত হয়; কা'কেও ধরপাকড় হয়নি।

নির্ব্বাসন

বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এবং যাঁদের কেউ বিপ্লবী তো ন'ন-ই, বিপ্লবীদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল বলে এ-অপবাদ যাঁদের কেউ দেয়নি, সারা

বাঙ্গলা থেকে উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, প্রকাশ্য রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন লোককে বিনা বিচারে আটক-বন্দী রাখা গভর্ণমেণ্টের আতঙ্কেরই পরিচয় বহন করে।

১৮১৮ সালের ৩-নং রেগুলেশনের ধারা-মতে বিনা বিচারে কয়েদ রাখার ঘটনা; ১৯০৮ ডিসেম্বর ১৪-ই কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমে ধরপাকড় শুরু হয়। দেখা যায়, আদেশ প্রকাশিত হবার দু'-তিনদিন আগে থেকেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা শুরু হয়েছিল।

ধৃত ব্যক্তিদের নামগুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বন্দীজীবন কোথায় কেটেছে তারও উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

প্রথম হচ্ছেন (রাজা) সুবোধচন্দ্র মল্লিক। তাঁদের কাশীতে বাড়ী। সেখান থেকে গ্রেপ্তার করে লক্ষ্ণৌ এবং পরে ফৈজাবাদ জেলে আটক রাখা হয়;

বরিশাল বানরীপাড়ার মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে নিয়ে যায় বর্ম্মায়, ইন্‌সিন জেলে;

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রথমে চুনার জেলে ও পরে বর্ম্মায় থাঁয়েটমিয়ো জেলে স্থানান্তরিত হন;

'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রর সমস্ত বন্ধন-দশা আগ্রা জেলে কাটে;

অ্যাণ্টি-সার্কুলার সোসায়েটি ও 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু কলিকাতা থেকে রাওয়ালপিণ্ডি জেলে আশ্রয়লাভ করেন;

'অনুশীলন সমিতি'র প্রধান পুলিনবিহারী দাস পাঞ্জাবের মণ্টগোমেরী জেলে কাটিয়েছেন;

ঢাকার বারোদির ভূপেশচন্দ্র নাগ কাটিয়েছেন যুক্তপ্রদেশের ফতেগড় জেলে;

বরিশালের নেতা, দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ জেল হয়ে, যান বর্ম্মার জেলে; এবং ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বেসিন জেলে বন্দী রাখা হয়।

প্রায় চৌদ্দ মাস আটক রেখে, ১৯১০ ফেব্রুয়ারী ৯-ই এবং ১০-ই দু'দিনে সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়। এঁদের গ্রেপ্তারের কারণ সম্বন্ধে বহু জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, কিন্তু পুলিনচন্দ্র দাস ছাড়া কাকেও "under personal restraint"-এ রাখবার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রতিশোধ

কেবল ডাকাতি, খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা নয়, আন্দোলনের ক্ষতি যারা করছে, এরকম সন্দেহে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। এর পূর্বে যে হয়নি তা নয়, ক্রমে ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কয়েকটি হত্যার পরিচয় দেওয়া যাক্‌ঃ

কলিকাতা ঃ প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তার সম্পর্কে দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্টের কাছে যথেষ্ট বাহাদুরী লাভ করেন ; মোটা পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

১৯০৮-এর নভেম্বর মাসে ছুটি কাটাতে ১০০/২-নং সার্পেন্টাইন লেনে ভাইয়ের বাসায় উঠেছেন। তাঁর কর্ম্মস্থানে ফিরে যাবার সময়ও এগিয়ে এসেছে। ১৯০৮ নভেম্বর ৯-ই সন্ধ্যা ৭-টা থেকে ৭৷৷০-টার মধ্যে একখানা চিঠি ডাকে দেবার জন্য বাসার বাইরে গেছেন। পূর্ব্ব মে মাসের ১-লা তারিখ থেকে ছ'মাস বাদে জীবনের ভয় খুব খানিকটা কেটে গেছে, তাই নির্ভয়ে বাসা থেকে বেরিয়েছেন। শ'দুই গজ যাবার সঙ্গে-সঙ্গে, পিছনদিক থেকে কে বা কারা এসে পিস্তলের গুলির দ্বারা আঘাত করে। তা'তেই তিনি সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েন ; কেবল বলে উঠলেন—১০০/২-নং বাড়ীতে যেন তাঁর ভাইকে খবরটা দেওয়া হয়।

এদিকে আততায়ীরা নন্দর মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য তাঁর ভূপতিত দেহে আরও দু'তিনটে গুলি বসিয়ে দিয়ে একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করে। নন্দর মাথা, পিঠের মাঝখান ও ডানদিকে এবং বাঁ-কাঁধের মধ্যে গুলি প্রবেশ করে।

সূক্ষ্ম কাজ ; কারও কোনও সন্ধান মেলেনি, কাজেই মামলাও হয়নি। নন্দর মৃত্যু বিপ্লবীদের লক্ষ্য ঃ সুপরিকল্পিতভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠার সে-কথা চিরতরে থেকে যাবে,—অজ্ঞাত বীর স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালীর নমস্যই থেকে গেলেন। গোপন যুদ্ধে এ এক পরম গৌরবের অধ্যায়।

বিঘাটি ঃ বিঘাটি ডাকাতির গূঢ় কথা পুলিশকে দেয়, এইরূপ সন্দেহ করে, হাওড়ার কেশব দে-কে বন্ধুরা খুন করে পুঁতে ফেলেন।

ঢাকা ঃ রমনায় অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ গুপ্তভাবে খুন হয়েছিল ১৯০৮ নভেম্বরে। 'সমিতি'র কাগজপত্র নিয়ে তার খুড়াকে দেখাতো, আর তিনি ছিলেন সি.আই.ডি ইন্সপেক্টর।

ঢাকা ঃ রায়না— ঢাকা রায়না অঞ্চলের অধিবাসী সুকুমার চক্রবর্ত্তীকে পুলিশ একবার গ্রেপ্তার করে। কিছু বোঝাপড়া হয়ে গেলে, তার হাজত-বাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। এখন দেখা গেল, পুলিশের সঙ্গে তার গোপন ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছে এবং সে বিপ্লবীদের সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ সরবরাহ করে। হঠাৎ ১৯০৮ নভেম্বরের একদিন তার খোঁজ পাওয়া গেল না। তারপরে নভেম্বরের ১২-ই তার গলিত শব ঢাকায় রমনার এক নিভৃত স্থানে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

সরকারী অভিমত

যখন বিপ্লব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেছে তখন পুলিশের বড়কর্ত্তা (L. F. Marshead, I. G. of Police) তাণ্ডবের কারণ সম্বন্ধে ১৯০৮ সালে নিজস্ব মতামত

ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, যারা ইংরেজী শিক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যে জাতীয়তার এক নূতন প্রবল ভাববন্যা এসেছে। পরিতাপের সঙ্গে মার্সহেড বলেন যে, গভর্ণমেণ্টের অমনোযোগিতায় এরা বেড়ে উঠেছে, এবং তার বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। উগ্রপন্থীদের লক্ষ্য হচ্ছে বিদেশীর কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করা। সেই লক্ষ্যে স্থির থেকে ভদ্রঘরের সন্তানরা খুনখারাপি করতে আর পিছপাও নয়। তার ওপর সমস্যা, ভারতের এক শ্রেণীর শিক্ষিত ও বিত্তবান লোকের এই কার্য্যধারার ওপর পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় ঘোষণা

নরমপন্থীরা কংগ্রেসকে সম্বল করে রাজ্যশাসন-ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদের ওপর দাবী বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের জন্য তো বটেই, হয়তো উগ্রপন্থীদের উদ্দেশ্যে যোধপুরে বড়লাট লর্ড মিণ্টো ১৯০৮ নভেম্বর ২-রা নূতন সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের বাণী পাঠ করেন। তা'তে বলা হয়ঃ

"Steps are being continually taken towards obliterating distinctions of race as to the test of access to posts of public authority and power"—দাঙ্গা-হাঙ্গামার কাজ নেই; বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে আর 'কালা-ধলা'র বিভেদ থাকবে না।

নতুন বাঁধন

দাঙ্গা, লুঠ, খুন প্রভৃতি মিলে গভর্ণমেণ্টকে দস্তুরমত উত্ত্যক্ত করে ফেলা হয়েছে। গভর্ণমেণ্টও নিশ্চেষ্ট না থেকে এইবার সাধারণ আইনের পরিবর্ত্তন আর নূতন আইন প্রণয়নের পথ গ্রহণ করলো।

১৯০৮ জুন ৮-ই সংবাদপত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করা হ'ল। আপত্তিকর লেখা ছাপা হলেই সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করার বিধি এলো। মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা এবং পুলিশ এসে সমস্ত আটক করে, উঠিয়ে নিয়ে তাকে আবদ্ধ রাখার শক্তি দান করা হ'ল। সংবাদপত্র-দলনের ব্যাপারে এর চেয়ে আর সুষ্ঠু ব্যবস্থা হতে পারে না।

বছরের শেষদিকটায় (ডিসেম্বর ১২-ই) ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সংশোধন হয়ে গেল। বিচার (ও সাজা) অতি সরল করা হ'ল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়রার প্রয়োজন রইল না; বিশেষ বিচারালয় সে-সবের ভারপ্রাপ্ত হ'ল। প্রাথমিক তদন্তের সময় আসামীর অনুপস্থিতি উপেক্ষিত হবে। বে-আইনী কাজে লিপ্ত থাকলে, সমিতির উচ্ছেদ প্রভৃতি কার্য্যে যে-ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ল, তাকে একেবারে নাগপাশ বললেই চলে।

একই ধারায় (১৯০৯)

আলিপুরের বোমার মামলার মূল ঘটনা ও কোনও কোনও আসামীর স্বীকারোক্তি একটা নতুন বৈপ্লবিক পরিবেশ যে সৃষ্টি করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। লোক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিদিনের বিবরণ অতি আগ্রহসহকারে পড়তো এবং আসামীদের কার্য্যকলাপকে মনে মনে সমর্থন করতে যে আরম্ভ করেছে, সেটা বেশ বোঝা যেত। তার মধ্যে ছোট একদল ক্রমে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয়। সাধারণ লোকের বদ্ধমূল ধারণা দাঁড়িয়েছিল যে, যতদূর প্রকাশ পাচ্ছে, ষড়যন্ত্র তার চেয়ে বেশী ব্যাপক ও বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছে।

বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা এসে যোগ দেয়। যাঁরা দেশের মুক্তির জন্য দুরন্ত সাজা পেয়েছেন তাঁদের প্রতি তো বটেই, যাঁরা ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করলেন তাঁরা প্রায় অতিমানব পর্য্যায়ে উন্নীত হয়ে গেলেন। ইংরেজের শাসনকে ভয় করতে হয়েছে বটে, কিন্তু মনোজগতে যে বিপ্লব স্থান নিতে আরম্ভ করে, উত্তরকালে সেটা প্রকাশ পেয়েছিল নানাক্ষেত্রে নানারূপে।

জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি সাহস সঞ্চয় করতে থাকে এবং অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের জন্য, প্রকাশ্যে ঠিক না হলেও, প্রচ্ছন্নভাবে বিপ্লবীদের সমর্থন জানাতে থাকে। ফলে, পাঠকদের মনোভাবের দ্রুত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট এ লক্ষণ দেখে সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে কৃপণতা করেনি।

বড় দুই দল, 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' এবং তাদের সহচর ও অনুচরদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্য্যের আচরণে বেশ একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছিল। পূর্ব্ববঙ্গে যখন 'অনুশীলন সমিতি' ডাকাতি ও খুন চালিয়ে যাচ্ছে তখন 'যুগান্তর' দলের মধ্যেও 'অনুশীলন'-এর পথে চলবার জন্য একটা আগ্রহ গড়ে ওঠে।

তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর উচ্চস্তরে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে আন্দোলন খুব গুরুতর হলেও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে পরাধীনতার গ্লানি দূর করবার জন্য একটা মনোবল ও প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে।

সমিতি-বিলোপ

বিপ্লব-আন্দোলনকে পিষে মারবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নববর্ষের 'উপহার' ঘোষণা করেছিল—১৯০৯ জানুয়ারী ৫-ই। ফলে সাতটি সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়।

গুপ্তভাবে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ চলছিল। এবার প্রকাশ্য শরীর-চর্চ্চা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গভর্ণমেণ্ট যা ভেবেছিল তার উল্‌টো ফল হ'ল। কেন্দ্রগুলির ওপর নজর রাখলে পুলিশের কাজ অনেকটা সহজ হ'ত; এবার প্রত্যেকটি উৎসাহী যুবকের পিছনে "টিকটিকি"-পুলিশ বা গুপ্তচর সন্দেহভাজন যুবকদের ওপর নজর দিতে আরম্ভ করে।

বিপ্লব-সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ সমানেই চলেছিল। ডাকাতি, খুন, বন্দুক-চুরি, লাটের গাড়ীর যাতায়াতের তত্ত্ব গ্রহণ প্রভৃতি মিলে পুলিশকে বিব্রত করে তুলতে আরম্ভ করে।

'বিধির নির্দ্দেশ'

এ-সময়ের বড় ঘটনা হ'ল—সরকারী উকিল আশু বিশ্বাসের হত্যা, ১৯০৯ ফেব্রুয়ারী ১০-ই, বেলা নাগাদ চারটায়। ঘটনাটি যেমন আকস্মিক তেমনি তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক।

আলিপুর বোমার মামলা পরিচালনায় আশু বিশ্বাস অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কপালে সরকারী কৃপাদৃষ্টির সঙ্গে বিপ্লবীর প্রতিহিংসা-বৃত্তি জুটেছিল অনুপাত রক্ষা করে। কার্য্যোদ্ধারের অটল সঙ্কল্প গ্রহণ করলে, পঙ্গুদ্বারা অসাধ্য সাধন হয়ে থাকে। তারই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এখানে দেখতে পাওয়া যায়: আততায়ী চারুচন্দ্র বসুর জন্মাবধি ডান হাতের তালুটি ছিল না, সুতরাং আঙ্গুল তো নয়ই। ঘটনার দিন সেই বিকলাঙ্গ হাতে একটি টোটা-ভরা রিভলভার বেঁধে,. গায়ের কাপড়ে ঢেকে তিনি আলিপুর সুবারবন পুলিশ কোর্টে (দক্ষিণ কলিকাতার ফৌজদারী মামলার কোর্টে) হাজির হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছেন আশু বিশ্বাস।

আশু বিশ্বাস ছিলেন দুর্দ্দান্ত উকিল। সরকারের পক্ষে মিথ্যা মামলা সাজাতে এবং আসামীর সাজা ঘটাবার কাজে অদ্বিতীয়। চারু খুঁজে বার করলেন, কি-ভাবে তাঁর শিকারকে ঠিকমত আক্রমণ করতে পারবেন। কয়েকবার বাগে পেয়েও ছেড়ে দিতে হ'ল, পাছে নিরীহ কেউ তাঁর গুলিতে আহত হয়। দূর থেকে চারু লক্ষ্য রেখে চলছেন, একবারও চোখের বাইরে যেতে দিচ্ছেন না। বিকাল ৪-২০ মিনিটের সময় আশু সুবারবান কোর্টের পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে, মোড় ঘুরে বারান্দার দক্ষিণ দিকে চলতে আরম্ভ করছেন এবং যখন বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এসে পৌঁছেছেন তখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসে আশু বিশ্বাসের একেবারে পিঠের কাছে ডান হাতটা তুলে, বাঁ হাত দিয়ে আততায়ী রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলেন। গুলি ঢুকে গেল শিকারের পিঠে। "বাপ্‌ রে!"—বলে চীৎকার করে হাত-দুটো উঁচু করে আশু পশ্চিমমুখে ছুটতে লাগলেন। পাছে কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে আততায়ী

ছুটে কাছে এসে আর-একটা গুলি ছুঁড়লেন। সে গুলি আশুর দেহ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেরিয়ে গেল। আহত আশু কাছারি-ঘরটা এক পাক ঘুরে কোর্ট-ইন্সপেক্টরের কামরা পর্য্যন্ত এসে আছাড় খেয়ে পড়লেন। তখন তাঁর প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর ছেড়ে রওনা দিয়েছে।

দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছনদিক থেকে এক কন্ষ্টেবল চারুকে দু'হাত-শুদ্ধ জাপটে জড়িয়ে ধরে। সে-অবস্থায়ও চারু আর-একবার রিভলভার চালিয়েছিলেন। কাকেও লাগেনি। সেই সময় আরও দু'জন কন্ষ্টেবল এসে তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেলে।

ধরা পড়বার পর চারুর অবস্থা বর্ণনা করার চেষ্টা করা বৃথা। তখনও চারুর মুখে স্মিতহাস্য; ধন্য তাঁর মনের জোর, দেহটা কিছুই নয়। যতরকম নিষ্ঠুর অত্যাচার কল্পনায় ধরা যায় সবই চারুর উপর প্রযুক্ত হ'ল—তাঁর সহকর্ম্মী প্রভৃতির খবরাখবর জানবার জন্য। অদ্ভুত বিপ্লবী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন এই অজ্ঞাত অখ্যাত যুবক। পুলিশের পক্ষে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় তাঁর মুখ থেকে এক বর্ণও পাওয়া যায়নি।

প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, এ কাজটি সম্পূর্ণ তাঁর একার। কার্য্যপদ্ধতি তিনি একাই স্থির করেছেন। কেহ তাঁর সঙ্গী নেই, পরামর্শদাতা নেই। রিভলভার সরবরাহ করেছেন ঢাকার পাঁচকড়ি সান্যাল (অবশ্য ঐ মহাপুরুষ কোনও কালে ধরাধামে অবতীর্ণ হননি)। চারু বলেছিলেন, আশু বিশ্বাসকে হত্যা করার ভার লটারীর সাহায্যে তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে। কারা লটারী করলে, কোথায় বা কবে যে হ'ল, সে তথ্য তাঁর মুখ দিয়ে আর প্রকাশিত হয়নি।

নিতান্ত ঘরোয়া কথার মধ্যে পাওয়া গেল—চারু ১৩০-নং রসা রোডে বাস করতেন। কলিকাতায় রয়েছেন অন্ততঃ বারো বৎসর; কিছুদিন হাওড়ার 'হিতৈষী প্রেসে' কাজও করেছেন। আশুতোষ-নিধনের সঙ্কল্প গ্রহণ করার পর টালিগঞ্জের এক জঙ্গলের মধ্যে রিভলভার-চালনা শিক্ষা করেছেন; কোনও দিন কেউ তাঁর সঙ্গে ছিল না। তারপর বেশ কয়েকটা দিন ধরে আলিপুর কোর্টে তিনি আশুর গতিবিধি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন। মাত্র এই হ'ল আশু-নিধন-পর্ব্বের প্রস্তুতি।

ঘটনার দিন আশু যে ঐ সময় সুবারবন কোর্টে আসবেন, সে সংবাদও অধ্যবসায় ও বুদ্ধি প্রয়োগে সংগ্রহ করতে তিনি ভোলেননি। উকিল আশুতোষ ঐ দিন, ১৯০৯ ফেব্রুয়ারী ১০-ই, এক জালমুদ্রার আসামীর মামলায় সরকারপক্ষে উপস্থিত হচ্ছিলেন।

হত্যা-অপরাধ ছাড়া, প্রকাণ্ড এক ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করতে গভর্ণমেণ্ট মালমশলা কিছুই সংগ্রহ করতে পারেনি। অতএব একা চারুচন্দ্র বসুকে নিয়ে

২৪-পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ করলেন—১৯০৯ ফেব্রুয়ারী ১৩-ই, ঘটনার তিন দিনের মধ্যেই।

হত্যার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে চারু বলেছিলেন—"আশু বিশ্বাসকে আমি দেশের শত্রু বলে মনে করি ; নিরীহ দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী-প্রমাণ সাহায্যে মামলা সাজিয়ে তিনি তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করে আসছেন।"

নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য সাক্ষী-প্রমাণ এবং উকিল-নিয়োগের কথা উঠলে, আসামী বলেছিলেন যে, তার কোনও প্রয়োজন নেই। এমন হাতে-গড়া লোকও নেই যারা এসে তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করতে পারে। তদন্ত শেষ হবার পর সার কথা বলে চারু তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন—"এটা বিধির নির্দেশ, আশু আমার হাতে মরবেন আর সেই কারণে আমার ফাঁসি হবে ; ব্যতিক্রম হবার কথা নয়।"

তার পরের প্রক্রিয়া অতি সংক্ষিপ্ত। মামলা দায়রায় সোপর্দ্দ হ'ল ফেব্রুয়ারী ২২-এ এবং পরদিনই সমাপ্ত হ'ল, অর্থাৎ রায় প্রদত্ত হ'ল।

চারুর ফাঁসি হবে। আসামী জিজ্ঞাসা করলেন—"কালই তো? বিলম্বের কারণ কিছুই নেই।" তিনি অপরাধ কবুল করেছেন, তারপরে আবার হাইকোর্টে মামলা পাঠাবার প্রয়োজন খুঁজে আবিষ্কার করতে পারেননি চারুচন্দ্র।

বলা বাহুল্য, সপ্তাহান্তে হাইকোর্ট সেসন আদালতের হুকুম বহাল রেখেছিল মার্চ ২-রা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে, ১৯০৯ মার্চ ১৯-এ বীরের মৃত্যু আলিঙ্গন করে দেশমাতৃকার সুসন্তানদের তালিকায় অক্ষয় নাম লিখে রেখে গেছেন চারুচন্দ্র।

কত শত লোকেরই না সেদিন জীবনাবসান হয়েছে। বিস্মৃতির তিমিরে সে-সব বিলীন হয়ে গেছে। আর 'চারু' নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অন্ততঃ ক্ষীণ শিখা বিস্তার করে আজও জাগরূক রয়েছে।

ঘটনা-প্রবাহ

ঢাকা ঃ ১৯০৯ জানুয়ারী ১-লা নবাব-কাছারি থেকে একসঙ্গে তিনটে বন্দুক চুরি যায়। গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে এটিকে বৈপ্লবিক কার্য্য বলে পরিগণিত হয়েছে।

হুগলী ঃ মাসুপুর— ঘটনাস্থল হরিপাল থানায়। জন-দশ-বারো যুবক মাসুপুর গ্রামে গোপাল ঘোষ ও মোহিনী দাসদের দুটো পাশাপাশি বাড়ী আক্রমণ করে ১৯০৯ ফেব্রুয়ারী ২৭-এ এবং অনুমান শ'-পাঁচেক টাকা সংগ্রহ করে সরে পড়ে।

২৪-পরগণা ঃ নিতাড়া— গভীর রাত্রে, ১৯০৯ এপ্রিল ২৫-এ, একদল যুবক ডায়মণ্ডহারবার থানার অধীনস্থ নিতাড়া (ন্যাতড়া) গ্রামে রামতারণ মিত্রের বাড়ী হানা দেয়। সকলেরই মুখোস-পরা এবং দু'-তিনজনের হাতে রিভলভার। ভয় দেখিয়ে চাবী আদায় করে আক্রমণকারীরা মোটমাট হাজার আড়াই টাকা

পেয়েছিল। যাবার সময় বলে যায় যে, টাকাটা ইংরেজ-বিতাড়নের কাজে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বেশ কয়েকজন যুবককে আসামী করে ডাকাতি মামলা আরম্ভ হয়। তার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (এম্. এন্. রায়) হলেন অন্যতম। ১৯০৯ জুন ১-লা, এক হাজার টাকা জামিনে তিনি মুক্ত হন। এক বৎসর টানা-হেঁচড়ার পর, ১৯১০ জুন ২-রা সকলকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছিল।

খুলনা ঃ নাংলা

এ-সময়ে খুব বড় সোরগোল উঠেছিল নাংলা (খুলনা, টালা থানা) ডাকাতি নিয়ে। ১৯০৯ আগষ্ট ১৬-ই তারিখে মথুরানাথ পোদ্দারের বাড়ী কয়েকজন যুবক দলবদ্ধ হয়ে লুঠপাট করেন। পুলিশ দশ জনকে ধরে চালান দেয়। স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে ১৯১০ মার্চ ১৪-ই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। এঁদের মধ্যে অবনীভূষণ চক্রবর্ত্তী স্বীকারোক্তি করলে, রাজসাক্ষী হিসাবে সর্ত্তাধীনে মামলার দায় হতে অব্যাহতি লাভ করেন। পরে ১৯১০ মার্চ ১৫-ই অবনী স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেন।

তখন অপর আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা চালাবার মত সাক্ষী-প্রমাণ না থাকায়, মার্চ ১৬-ই সকলের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করলে, আসামীরা মুক্তিলাভ করেন।

অবনীর স্বীকারোক্তি তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করে, নথিপত্র ১৯১০ জুন ১৬-ই হাইকোর্টে প্রেরণ করা হয়। ডাকাতির দায়ে হাইকোর্ট জুন ২৭-এ অবনীকে সাত বৎসর দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ দেয়।

নাংলা (খুলনা) ডাকাতি মামলা প্রত্যাহার করলে, মনে হয়েছিল, অভিনয়ে যবনিকাপাত ঘটল। ব্যাপারটা ঠিক তা হয়নি। ১৯১০ জুন ২-রা, ১৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ট্রাইবিউন্যালে পিনাল-কোডের ১২১-এ ধারা (সম্রাটের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান) অনুসারে 'নাংলা ষড়যন্ত্র মামলা' রুজু করা হয়। প্রায় তিন মাস মামলা চলবার পর ১৯১০ আগষ্ট ৩০-এ রায় প্রকাশিত হয়। তাতে দু'জন মুক্তিলাভ করেন, আর

(১) অবনীভূষণ চক্রবর্ত্তী, (২) বিধুভূষণ দে, (৩) অশ্বিনীকুমার বসু, (৪) নগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, (৫) কালিদাস (কালীপদ) ঘোষ, (৬) শচীন্দ্র মিত্র—প্রত্যেকের সাত বৎসর দ্বীপান্তর ;

(৭) নগেন্দ্রনাথ সরকার, (৮) সুধীরকুমার দে, (৯) কিনু (প্রিয়নাথ) পৈ—পাঁচ বৎসর দ্বীপান্তর ;

(১০) ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত, (১১) অতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তিন বৎসর দ্বীপান্তরের দণ্ড প্রাপ্ত হন।

সাজার পরিমাণ বিচারে এ-সময় একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যে সবাই ফিরতে পেরেছিলেন, এক কালিদাস ছাড়া। সেলুলার জেলে রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

খুলনা ঃ হোগলবানিয়া— ছোট্ট ব্যাপার। বৈটাখালা থানার হোগলবানিয়া গ্রাম। ১৯০৯ সেপ্টেম্বর ২৪-এ একদল যুবক রিভলভার নিয়ে রাত্রিকালে এক বাড়ীতে চড়াও হয়। বাধা দিতে গিয়ে এক ব্যক্তি আহত হয়। প্রায় রিক্তহস্তে ডাকাত-দলকে ফিরে আসতে হয়। মামলা করবার মত আসামী আবিষ্কার করা যায়নি।

ঢাকা ঃ রাজেন্দ্রপুর

বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিল ঢাকার কয়েকটি যুবক। ১৯০৯ অক্টোবর ১১-ই, রাত্রি সাড়ে আটটার সময় সাতটা থলেতে ভরে সনাতন পালের ২৩,০০০ টাকা নারায়ণগঞ্জ থেকে কারৈদ গদিতে যাচ্ছিল, ট্রেনে তিনজন লোকের হেপাজতে। ঢাকায় সাত-আটজন যুবক ট্রেনে ওঠে, এবং ট্রেন যখন রাজেন্দ্রপুর ষ্টেশন থেকে সবে ছেড়েছে তখন তারা টাকার থলিযুক্ত গাড়ীতে উঠে পড়ে। রাজেন্দ্রপুর আর শ্রীপুর ষ্টেশনের মাঝে তারা হঠাৎ একজন রক্ষীকে গুলি মারে, অপর দু'জনকে ছোরা দ্বারা আঘাত করে। তৃতীয় ব্যক্তির আঘাত গুরুতর না হওয়ায়, জানালা গলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আক্রমণকারীরা ছ'টা থলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। একটা থলে একজন আহত ও ভূপাতিত দারোয়ানের দেহের তলায় থাকায়, সেটা ডাকাতদের লক্ষ্য এড়িয়ে যায়। এর মধ্যে তিন হাজার টাকা ছিল ও পরে তল্লাসীর ফলে আরও ৮,৮৬৪ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।

সন্দেহক্রমে ১৯১০ নভেম্বর ১১-ই সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯১১ এপ্রিল ১৮-ই ঢাকায় দায়রা কোর্টে যে মামলা আরম্ভ হয়, তা'তে জুরীরা তাঁকে নির্দ্দোষ বলে সাব্যস্ত করেন। জজ সে-মত গ্রহণ না করে হাইকোর্টে নথিপত্র পাঠিয়ে দেন। আগষ্ট ৮-ই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয়।

মামলার এক আসামী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ফেরার ছিলেন; ১৯১০ জানুয়ারী ১০-ই তাঁকে গ্রেপ্তার করে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জে দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়। ফলাফল জানা নেই।

ফরিদপুর ঃ দরিয়াপুর— রাত্রি একটার সময় পাঁচ-ছয়জন যুবক রিভলভার, হাতুড়ি, টর্চ প্রভৃতি নিয়ে, ১৯০৯ অক্টোবর ১৬-ই মনোমোহন মিত্রের বাড়ী চড়াও হয়। প্রায় বিনা প্রতিরোধেই ডাকাতরা হাজার তিনেক টাকা নিয়ে উধাও হয়।

নদীয়া ঃ হলুদবাড়ী

আসামীদের সাজার দিক থেকে বিচার করতে গেলে, দৌলতপুর থানার অধীনে হলুদবাড়ী গ্রামের ডাকাতির ব্যাপারের গুরুত্ব অনেক।

ডাকাতি হ'ল ১৯০৯ অক্টোবর ২৮-এ, মাঝরাত একটার সময়, ভক্তমল আগরওয়ালা আর সীতানাথ সাহার দুটো পাশাপাশি গদিতে। জন-দশ-বারো লোক মিলে মাত্র হাজার-দেড়েক টাকা পেয়েছিল।

সন্দেহক্রমে পুলিশ ধরলে অনেককে, আর মামলার জন্য চালান দিল দশ জনকে ১৯০৯ ডিসেম্বর ১৪-ই। এ মামলা দায়রায় গেল না। ১৯০৯ নভেম্বর ২৯-এর '৩৫৬৯-পি.'-নং আদেশে মামলা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে প্রেরিত হ'ল। অভিযোগ পিনাল-কোড (দণ্ডবিধি আইন)-এর—হত্যার চেষ্টা আর ডাকাতি।

১৯১০ জানুয়ারী ১৯-এ মামলা স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের এক্তিয়ারে চালান দেওয়া হলে, এপ্রিল ৪-ঠা মামলা শুরু হয়। ২০-এ মামলা শেষ হয় এবং এপ্রিল ২৫-এ রায় ঘোষণা করা হয়। সাজার বহর ছিল ঃ

(১) শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (২) উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, (৩) অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৪) গণেশচন্দ্র দাস, (৫) কিরণচন্দ্র রায়—এই পাঁচজনের প্রত্যেকের আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

সুশীলকুমার বিশ্বাস অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিলেন ; তাঁকে সাত বছর ও শৈলেন্দ্রকুমার দাসকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। একজনের বিপক্ষে মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং একজন বিচারে মুক্তিলাভ করেন।

হলুদবাড়ী আসামীদের মধ্যে 'হাওড়া গ্যাং কেসে' (হাওড়া পাইকারী মামলায়) শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সুশীলকুমার বিশ্বাস—প্রত্যেকের দু'বছর সশ্রম এবং অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র দাস ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—প্রত্যেকের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

হলুদবাড়ী মামলার সাজা শুরু হবে পূর্ব্বের শাস্তির কাল শেষ হলে ; অর্থাৎ দু'জনের আরও দু'বছর এবং বাকী তিনজনের এক বছর করে দণ্ডকাল বেশী ভোগ করার সহজ ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়েছিল।

ঢাকা ঃ রাজনগর— টাকার পরিমাণে বড় ডাকাতিগুলির মধ্যে 'রাজনগর ডাকাতি' স্থান পাবার যোগ্য। মাণিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত রাজনগরে কয়েকজন ধনী সুদখোরের বাস বলে গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল। রাত্রি ন'টা নাগাদ একদল যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হানা দেয়। নগদ কুড়ি হাজার এবং অন্যান্য সম্পত্তির দাম প্রায় আট হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। কয়েকজন যুবককে ধরে টানাটানি করা হয় ; শেষ পর্য্যন্ত মামলা আর ওঠেনি।

ত্রিপুরা ঃ মোহনপুর— খুব বেশী হাঙ্গামা করতে হয়নি। ১৯০৯ ডিসেম্বর ১১-ই, মতলব থানার মোহনপুর গ্রামের ঘটনা। রাত্রি ৯-টা নাগাদ বিশ-পঁচিশজন লোক নৌকা করে দশ-আনি বাজারে উপস্থিত হয় এবং দোকানপাট লুঠ করতে শুরু করে। আক্রমণকারীদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র থাকায় বাধা দিতে কেউ সাহস করেনি। প্রায় সাড়ে ষোলো হাজার টাকা সংগ্রহ করে লুঠেরারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঢাকা ঃ মালখানগর— অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছু কিছু অপকর্ম্ম সংঘটিত হয়েছে। ষাট বছরের ব্যবধানে কোনও ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমানের দৃষ্টিতে বিচার করার অসুবিধা আছে। তবুও যেটা একেবারে শোচনীয় তাকে পালিশ করে যুক্তির বিচারে সুন্দর করা যায় না।

ঢাকার মালখানগর পোষ্ট-অফিস লুঠের ব্যাপারে এইরকম বেদনাদায়ক এক ঘটনা ঘটেছিল। সম্পূর্ণ অনর্থক, সেইজন্য অনুতাপের তীব্রতাও খুব বেশী। মাটির পোঁতার ওপর খড়ের ছাউনি-ঘরে পোষ্ট-অফিস অবস্থিত। ১৯০৯ নভেম্বর ১৫-ই কয়েকটি যুবক সিঁদেল-চোরের মত পোঁতার (উঁচু ভিতের মেঝে) মধ্যে গর্ত্ত করে ঘরে প্রবেশ করে। পিয়ন শিবচরণ দে-র হাত-পা একসঙ্গে বেঁধে ক্ষুর দিয়ে তাঁর গলা কেটে দেয়। তারপর পোষ্টমাষ্টার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে ঢুকে তাঁরও গলায় ক্ষুর চালায়। এদিকে সিন্দুক ভাঙ্গতে না পারায় সবই বিফল হয়।

পরে এই মৃতদেহ দুটি আর-এক পিয়নের নজরে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে আসর সরগরম করেছিল বটে, কিন্তু আসামীদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

ত্রিপুরা ঃ এবার লুঠ থেকে লাটের সন্ধানে। ১৯০৯ নভেম্বরের শেষদিকটায় পূর্ব্ব-বাঙ্গলার ছোটলাট ত্রিপুরা গিয়েছিলেন। তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্য তিনজন যুবক পিছু নিয়েছিল। ঘটনাটা পুলিশের নজরে পড়ে। দিল এক মামলা জুড়ে। ব্যাপার খুব বেশীদূর গড়াতে পারেনি। দু'জনকে এক বছরের জন্য জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ করা হয়।

যশোহর ঃ বুইকারা— নওয়াপাড়ার অন্তর্গত বুইকারা গণ্ডগ্রাম। ১৯০৯ ডিসেম্বর ২৭-এ বেশ কয়েকজন যুবক অভয়চরণ সিংহের বাড়ীতে হামলা করে এবং নগদে অলঙ্কারে প্রায় হাজারখানেক টাকা সংগ্রহ করে সরে পড়ে।

প্রতিশোধ

ঢাকা ঃ গুপ্তচর সন্দেহে বীরেন গাঙ্গুলীকে হত্যা করে একটি নৌকার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ক'দিন পরে পুলিশের নিকট এ-সংবাদ আসে।

বরিশাল ঃ মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার এক লোক খুঁজে বার করেছিল পুলিশ। সেই লোক ঢাকায় জন্মাষ্টমীর দিন ছোরা-মারা মামলায় সরকারপক্ষে

সাক্ষী দেয় এবং পরে আবার ফরিদপুর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কতকগুলি লোকের নামে গোপন সংবাদ দিয়ে আসে। কথাটা কানাঘুষায় কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ১৯০৯ জুন ৩-রা দু'-তিনটি লোক রাত্রিকালে ফতেজংপুর (ফরিদপুর)-এর বাসায় গিয়ে প্রকৃত অপরাধীর নিরীহ ভাই প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়কে ছোরার আঘাতে হত্যা করে। বেচারা প্রিয়র মাত্র ষোলোবছর বয়স ; বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র ছিল।

বাঙ্গলার বাইরে

কেবল বাঙ্গলার কথাই বলা হচ্ছে। তার বাইরেও হিংসাত্মক কাজ চলেছে ; লক্ষ্য সেই এক—ভারতের স্বাধীনতা। বিবরণের সঙ্গতি-রক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্র ও দুইটি বিরাট ঘটনার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। প্রথমটি ঘটে সুদূর লণ্ডন-এ (১. ৭. ০৯) আর দ্বিতীয়টি নাসিক-এ (১. ১২. ০৯)। প্রথমটি এত গুরুতর না হলেও বিদ্রোহী মনোভাবের সুষ্ঠু অভিব্যক্তি ; সে-কারণে একবার উল্লেখ থাকার প্রয়োজন আছে।

বাঙ্গলায় যখন শ্বেতাঙ্গদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, তখন ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী বাঙ্গালী মনেও বিক্ষোভ জমতে শুরু করেছে।

১৩৭-নং হুইটফিল্ড ষ্ট্রীট (Whitfield Street) থেকে ১৯০৯ জানুয়ারী ১৪-ই বাঙ্গালী যুবক কুঞ্জলাল ভট্টাচার্য্য ভারত-সচিব লর্ড মর্লি-কে এক পত্র লেখেন। মর্ম্মার্থ ঃ ইংরেজের জাতীয় ঔদ্ধত্য ভারতে বর্ত্তমান অশান্ত অবস্থার প্রধান কারণ।

এই কাজের জন্য লী ওয়ার্ণার (Lee Warner)—বোম্বাই সরকারের প্রাক্তন চীফ্ সেক্রেটারী এবং এইসময়ে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য, ক্ষেপে যান এবং ইণ্ডিয়া-অফিসে কুঞ্জকে অশালীন ও মিথ্যা ('indecorous and false') বিবৃতির জন্য ১৯০৯ জানুয়ারী ১৪ হতে ২২-এর মধ্যে এথেনীয়াম ক্লাবের সামনে কুঞ্জকে কটু ও অসম্মানকর ('abusive and insulting') উক্তি প্রয়োগ করায়, প্রত্যুত্তরে কুঞ্জ ওয়ার্ণারকে (সরলা দেবীর ভাষায়) "কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম" প্রয়োগ করলে, ওয়ার্ণার ফেব্রুয়ারী ৪-ঠা বো (Bow) ষ্ট্রীট পুলিশ কোর্টে কুঞ্জর নামে নালিশ করেন। ১২-ই কুঞ্জকে ছ'মাসের জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ (bound down) হতে হয়।

লণ্ডনে বড় বড় কাণ্ড হয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কার্জ্জন ওয়াইলি (Curzon Wyllie) ও ও'ডায়ার (O'Dwyer) নিধন। শেষের ঘটনা যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে।

কার্জ্জন ওয়াইলি ঃ ভারত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মুক্তির পথ-সন্ধানে ব্যস্ত। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মার লণ্ডনে আগমনকাল থেকে ভারতের অভাব-অভিযোগের প্রচার চলতে থাকে। হরদয়াল, বিনায়ক সাভারকর, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির আগমনে আসর সরগরম হয়ে ওঠে। পত্রিকা চলছে ; সময় সময় সভা-সমিতিতে মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। ভারতের স্বার্থবিরোধী বিষয় নিয়ে নানা কথা সময়-অসময়ে উত্থাপিত হয়ে থাকে।

চতুর ইংরেজের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ায় এসব কাজ বন্ধ করার উপায়ও ছিল না—স্বাধীন মতের দেশ। ওদিকে ইংরেজ একেবারে নিশ্চেষ্টও থাকেনি। ভারতের "লবণ-ভোজী" ঝানু ইংরেজ বেছে বেছে ভারতীয় ছাত্রদের "স্বার্থরক্ষার" জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করতো। মূলতঃ তাঁরা এইসকল আগন্তুকদের মতিগতি ও গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন এবং গোপনে ভারতে অবস্থিত অভিভাবকদের সতর্ক করতেন।

এহেন পুরুষ ছিলেন কার্জ্জন ওয়াইলি। পাঞ্জাব হতে আগত এক ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্র মদনলাল ধিংড়া এ-ব্যাপারটা ধরে ফেলেন। তাঁর মাথায় খুন চাপলো; উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গোপনে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। পিস্তল ও রিভলভার যথাকালে সংগৃহীতও হ'ল। মদনলাল সুযোগ-সুবিধা-মত শ্যামাজীর ইণ্ডিয়া-হাউসে যাতায়াত করতেন এবং সেখানকার কার্য্যবিধির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সেখানে ১৯০৮ মে ১০-ই—১৮৫৭ সালের সিপাহী-অভ্যুত্থানের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের নাম চিরস্মরণীয় করবার ব্যবস্থা-গ্রহণের কথা ছিল। মদনলাল সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মন তাঁর তৈরী; হাতে মারাত্মক হাতিয়ার। "বিলম্বেনালং"। ১৯০৯ জুলাই ১-লা ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভা; ওয়াইলির সেখানে উপস্থিত থাকার কথা। মদনলাল এ সুযোগ পরিত্যাগ করেননি। যন্ত্রে ঐকতান-বাদন শেষ হয়েছে,—মদনলালের রিভলভার বার-পাঁচেক গর্জ্জে উঠলো। বুলেটের আঘাতে আহত ওয়াইলির মুখ বিকৃত হয়ে গেল।

মদনলালের বিচার অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। আদালতে এক জবানবন্দীতে তিনি হত্যার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে অপরাধ মেনে নেন। বিনা আড়ম্বরে ১৯০৯ আগষ্ট ১৭-ই পেণ্টর্নভিল কারাগারে মদনলালের ফাঁসি হয়ে যায়।

জ্যাক্শন (Jackson): বাঙ্গলার বাইরে, এমনকি ভারতের বাইরে বিপ্লবাত্মক কাজ চলেছে। এ একটা সময় যখন ভারতের স্বাধীনতার চিন্তা ফুটেছে ভারতের নানা অংশে এবং অত্যাচারী শাসকের অপসারণের জন্য একই পথ অবলম্বিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের র‍্যাণ্ড-হত্যা এ পথের প্রথম নমুনা।

এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ফের বিস্ফোরণ আত্মপ্রকাশ করলো ১৯০৯ সালে। বিপ্লবী সংস্থার নাম হ'ল 'অভিনব ভারত' এবং মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে তার শাখা ছড়িয়েছিল। দেশের স্বার্থের ক্ষতিকর কোনও ব্যবস্থা সভ্যদের খরদৃষ্টি অতিক্রম করতে পারতো না এবং তারা সে-সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রতিবিধানের জন্য তৎপর ছিল।

"স্বদেশী গাথা"-রচনার অপরাধে দামোদর সাভারকরকে জজ জ্যাক্শন

দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। নাসিকের কয়েকটি যুবকের নিকটে এ দণ্ড অতি কঠোর এবং দেশের জাতীয়তা-ভাব-প্রসারের পরিপন্থী বলে মনে হয়। তখন গুপ্ত-সমিতিতে জ্যাক্‌শন-হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে নাসিকে জ্যাক্‌শনের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় তাঁর বিদায়-অভ্যর্থনার ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে বিজয়ানন্দ থিয়েটার হল্‌-এ ১৯০৯ ডিসেম্বর ২১-এ। তাঁর আততায়ীরা হল্‌-এর মধ্যে উপস্থিত হয়ে মৃত্যুর দূতের মতন অপেক্ষা করে রয়েছে।

সভা আরম্ভ হবার কিছু আগেই জ্যাক্‌শন উপস্থিত হয়ে তাঁর নির্দ্দিষ্ট চেয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন—এমন সময় এক আততায়ী তাঁকে বুলেট-বিদ্ধ করে। প্রথমটি ব্যর্থ হলে, পর পর পাঁচ-ছয়টি বুলেট তাঁর দেহের নানা স্থান বিদ্ধ করে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই জ্যাক্‌শনের জীবনাবসান হয়।

যথাকালে আসামীদের হাকিমের এজলাসে কাঠগড়ায় খাড়া করা হয় এবং হাইকোর্টের স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের ১৯১০ মার্চ ২৯-এ প্রদত্ত রায়ে তিনজনের মৃত্যুদণ্ড, তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও একজনের দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯১০ এপ্রিল ১৯-এ থানা জেলে দণ্ডপ্রাপ্ত তিনজনের ফাঁসি হয়ে যায়।

শাসন-সংস্কার

উদারনৈতিক (Liberal) দলের লর্ড মর্লে (Lord Morley) যখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ভারত-সচিব হলেন, তখন ভারতের মডারেট মহলে একটা বড় আশার সঞ্চার হয়েছিল—ইংরেজের দাক্ষিণ্য খুব বেশী মাত্রায় পাওয়া যাবে। কর্ণপরিতৃপ্তিকর ভাষণ মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগলো। কাজের বেলায় তার কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু ভারতের, বিশেষ করে বাঙ্গলার অশান্ত অবস্থা চলছে, সে-কারণে মর্লে ভারতের বড়লাট মিণ্টোর সঙ্গে আলোচনা করে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব পাঠান। মিণ্টো ছিলেন মুশ্লিম-দরদী, যথাসাধ্য উস্কানি দিয়ে বাজার গরম করে রেখেছিলেন, সুতরাং এই শাসন-সংস্কার মঙ্গলের পরিবর্ত্তে দারুণ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯০৮ নভেম্বর ২৭-এ মর্লের মন্তব্য (Despatch) ভারতে প্রেরিত হয়। তৎপূর্ব্বেই ১৯০৭ আগষ্ট মাসে ভারত-সচিবের পরামর্শদাতা সমিতি (India Council)-তে (সার) কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী মনোনীত হয়েছিলেন। তদপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা—১৯০৯ মার্চ ২৩-এ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড) বড়লাটের শাসনযন্ত্রের (Executive Committee) মধ্যে আইন-সচিব নিযুক্ত হন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম উঠেছিল, কিন্তু মিণ্টোর টুপির মত কালো ("as black as my hat") বলে তিনি মনোনয়ন পাননি।

পরে ১৯০৯ মে ২৫-এ 'ভারত সংস্কার বিল' পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদন লাভ করে। সব আটঘাট বেঁধে তাকে ভারত-শাসন-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে নভেম্বর ১৫-ই

পর্য্যন্ত লেগে যায়। সামান্য যদি কিছু লাভ হয়ে থাকে তো সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হওয়ায় পাকিস্তান-সৃষ্টির বীজ সেটা নষ্ট করে। মিণ্টোর মত ভারতের সর্ব্বনাশ-সাধন আর কেউ—ডালহাউসি, ওয়েলেস্‌লি প্রভৃতি লাটেরা—করেননি।

এ প্রসঙ্গে নিতান্ত অবান্তর হবে না বলে একটা কথা বলে রাখা যাক্। মর্লে সম্বন্ধে আশান্বিত হবার কিছু কারণ অবশ্যই ছিল। মিণ্টোর 'উপদ্রব' কিছুটা সংযত রাখতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায়, নিতান্ত অসম্ভব না হলে, হস্তক্ষেপ করা ইংরেজ সাম্রাজ্য-নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলে, অনেক কিছু উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যখন ভারতবর্ষে চণ্ডনীতি দুর্দ্দান্তভাবে চলছে এবং 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড' দেওয়াই জাতীয়তা-আন্দোলন-দমনে ভারত সরকারের নীতি বলে গৃহীত হয়েছে, তখন ভারত-সচিব একেবারে স্থির থাকতে পারেননি। মিণ্টোকে তিনি লিখলেন (১৯০৮ সাল) যে, তিনি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তির অশনিপাতের মত সাজার বহর ("thundering sentences") লক্ষ্য করছেন। * * * * ঐসকল কঠোর সাজা বরাবর চলতে পারে না। সেজন্য তিনি লাট-বাহাদুরকে এ-শ্রেণীর সাজার পরিণামের প্রতি খরদৃষ্টি রাখতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন ("I do, therefore, urgently solicit your attention to the wrongs and follies")। শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই হবে, কিন্তু কঠোর শাস্তিকে নিদারুণ করা শৃঙ্খলা-রক্ষার পথ নয়; এতে বরং ফল বিপরীত হবে এবং এই পথেই বোমার আবির্ভাব হবে" ("Excess of severity is not the path to order. On the contrary, it is the path to the bomb.")।

ভারত-সচিবের আশঙ্কাই শেষ পর্য্যন্ত রূপ ধারণ করেছিল।

ব্যাপক ক্ষেত্রে (১৯১০)

সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের অত্যাচার রোধ করবার জন্য নানাপ্রকার নিরোধক আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছে। অপরাধের জন্য বিচারে আসামীদের দণ্ড দেওয়া চলছে, কিন্তু মনে হচ্ছিল পুলিশ এইসব পথে বিশেষ লাভবান হচ্ছে না। আলিপুর ষড়যন্ত্রে হাত পেকেছে, একসঙ্গে অনেকগুলি আসামী বা সন্দেহভাজন লোককে শাস্তি দেবার সুযোগ দেখে গভর্ণমেণ্ট এই সময় বড় বড় তিনটে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় ১১৪ জনকে। আর, সন্দেহে ধরপাকড় কত হয়েছে তা বলা বড় কঠিন। কা'কে-কা'কেও প্রাথমিক তদন্তের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আর কিছুই নয়, কতকটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করা আর বাকীটা লোককে "দাগী" করে দেওয়া, যাতে পুলিশের খরদৃষ্টির মধ্যেই থাকে, আর নতুন ঘটনা হলে, ঐ 'মার্কা-মারা'দের ধরে তাদের বিরুদ্ধে ফ্যাঁসাদে ফেলা যেতে পারে।

বীর বালক

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত ঃ আলিপুরের ষড়যন্ত্র মামলার জের মনে করলেই এই ঘটনার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত বুঝতে কষ্ট হয় না। ঐতিহাসিক মামলার আসামীদের দণ্ডবিধানের জন্য যাঁরা খুব তৎপর ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পুলিশের ইন্সপেক্টর সামস্-উল্-আলমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মামলার পর সফল পরিসমাপ্তিতে সরকারী নেকনজর তাঁর ওপর ঝরে পড়েছে। জীবনে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে প্রায় রাতারাতি তিনি ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে যান। এহেন সময় দৈবদুর্ব্বিপাক তাঁর সকল আশা সমূলে উৎপাটন করে ছাড়লো।

এই পুলিশ-সাহেবটিকে আলিপুর মামলার আসামীরা ভালভাবেই চিনতেন। এ'র সম্বন্ধে সে-সময় একটি প্রচলিত ছড়া গজিয়ে উঠেছিল ঃ

"তুমি সরকারের শ্যাম
আমাদের শূল
(কবে) তোমার ভিটেয় চরবে ঘুঘু
দেখবে চোখে সরষে-ফুল ॥" ('নির্বাসিতের আত্মকথা')

অল্পকালের মধ্যে সত্যি সত্যি তাঁর চোখে সরষে-ফুল ফুটে উঠেছিল। শাসনযন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ আলম-সাহেব শরীর-রক্ষী নিয়ে চলাফেরা করতেন। কিন্তু যাঁকে যমে টানছে তাঁর বিপদ ঘটবার জন্য শতছিদ্র খুলে যায়। লখীন্দরের নিশ্ছিদ্র

ঘরেও কালনাগিনী প্রবেশ করে দংশন করেছিল। নিয়তি তাঁর মৃত্যুর জন্য যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন।

১৯০৯ সালের ডিসেম্বর নাগাদ আলম-সাহেব হাইকোর্টে আলিপুর মামলার রেফারেন্স (reference)-এর সরকারী তদ্বির-কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯১০ জানুয়ারী ২৪-এ বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কাছারীর কাজকর্ম্ম শেষ করে পূর্ব (দক্ষিণ) দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার জন্য এগিয়ে চলেছিলেন,—তাঁর সামনে চলেছেন এ্যাডভোকেট-জেনারেল আর পিছনে চলেছে আলমের অস্ত্রধারী দেহরক্ষী।

আলম-সাহেব প্রায় পা বাড়িয়েছেন প্রথম ধাপে নামবার জন্য। হঠাৎ একটি স্বল্পবয়স্ক যুবক সামনে এসে উপস্থিত ; হাতে তাঁর রিভলভার। আলমের সান্ত্রী সেটা দেখতে পেয়েছিল। আততায়ী চক্ষের নিমেষে রিভলভার উঁচু করে প্রায় আলমের গা ছুঁইয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন। আহত হয়ে আলম চীৎকার করে উঠলেন—"পাকড়ো", এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের ছড়িটা আততায়ীকে আঘাত করার জন্য সান্ত্রীকে দিলেন আর নিজে চিৎপাত হয়ে মেঝেয় পড়লেন। বোঝা গেল গুলিটা তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে ; সঙ্গে-সঙ্গেই আলমের ভবলীলা সাঙ্গ হ'ল।

বীরেন পিছু ফিরেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছেন ;—"খুন ! খুন !"—বলে চীৎকার উঠে পড়েছে। বীরেন সিঁড়িতে বাধা পাননি, সরাসরি পূব-দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়তে গিয়ে দেখতে পেলেন দরজাটা বন্ধ এবং দরজার বাইরে জনতা দাঁড়িয়ে। একটা গুলি ছোড়ায়, লোক পাতলা হয়ে পড়লো আর বীরেন তার পরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েই রাস্তা ধরে উত্তর দিকে ছুটতে লাগলেন।

এক অশ্বারোহী পুলিশ তাঁর পিছনে ধাওয়া আরম্ভ করে। বীরেনের বিপদ বেশী হ'ল লোকের ভিড় ঠেলে দৌড়ানো। অতি কষ্টে হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে (কিরণশঙ্কর রায় সরণী) পৌঁছুলে, এক দারোয়ান পিছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে। বীরেন ধরা পড়ার ঠিক আগে পুলিশকে তাক্ করে একটা গুলি ছোড়েন, কিন্তু সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। অশ্বারোহী পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তখন বীরেনের হাতে ছিল দু'ঘরা '৩৮০ নলের ওয়েব্লি রিভলভার, সঙ্গে ছোরা বা ছুরি একখানা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক তদন্ত। চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোনও কষ্টই হ'ল না, ১৯১০ জানুয়ারী ২৭-এ, যখন তিনি আসামীকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। কালবিলম্ব না করেই হাইকোর্ট বিচার আরম্ভ করলো জানুয়ারী ৩১-এ।

এসব বীরত্বকাহিনী ক'জন শুনতে চায় ! বীরেনের পক্ষে কোনও আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন না। আসামীর পক্ষ-সমর্থনে উকিল, ব্যারিষ্টার, সাক্ষী প্রভৃতি কিছুই নেই। ১৮-১৯ বছরের যুবক বীরেন বললেন যে, তিনি আলমকে মেরেছেন। মৃত্যুদণ্ডের আসামী, সুতরাং প্রধান বিচারপতি আসামীর পক্ষে এক ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু জজকে তিনি বলেন যে, সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

ঐ একদিনেরই ব্যাপার। জুরিদের আর অন্তরালে গিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করতে হ'ল না, সেখানে বসেই সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করে মত দিলেন। জজ-সাহেব কালবিলম্ব না করেই ফাঁসির হুকুম দিলেন। রায় শুনে আসামীর মুখ স্বর্গীয় বিভায় ভরে গেল; স্মিতহাস্য—ঠোঁট দুটিতে পদ্মদলের সুষমা ফুটে উঠলো। মৃত্যু-বিভীষিকা লজ্জা পেয়ে অন্তর্হিত হ'ল। এজলাস-শুদ্ধ লোক বিস্ময়ে হতবাক্; "বর্ম্ম আবরিত দ্বারীর চোখে", অর্থাৎ কঠোরতম হিয়ার মানুষের চোখে দু'ফোঁটা শোক-আনন্দের অশ্রু ফুটে বেরুলো।

হাসিমুখে, লঘু ও ত্বরিত-পদে কাঠগড়া থেকে আসামীর পিঁজরার মধ্যে লাফ মেরে তিনি প্রবেশ করলেন—যেন দীর্ঘ প্রবাস থেকে বাড়ী ফেরার জন্যে পাল্‌কি চড়তে যাচ্ছেন।

এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি বিচলিত হননি, যেন এ অভিনয় তিনি মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিলেন এবং অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে (জীবনের) রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ালেন। ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিসম্পন্ন রাজপুরুষরা ভাবলে ইংরেজ-শাসনের ভিত থেকে একখানা মূল পাথর সরে গেল।

আজ অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। যখন আতঙ্কে তালু শুষ্ক হয়ে যাবার কথা, ক্ষুধা বিদায় নিয়ে গলার মধ্যে উদ্বেগ ডেলা হয়ে ঠেলে ওঠে, তখন মধ্যাহ্ন-কর্ম্মবিরতির সময় ফাঁসির আসামী বললেন যে, তাঁর কচুরি, সন্দেশ আর রসগোল্লা খাবার ইচ্ছা করছে। সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তার জন্য সে-ব্যয়ভার বহন করেছিল। স্বয়ং টেগার্ট এ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পরম পরিতৃপ্তিতে বীরেন খাবার খেয়ে আবার ফাঁসির হুকুম শোনবার জন্য তদ্গত হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গেলেন।

তাঁর মামলার রায় আর ফাঁসির তারিখের মধ্যে পুলিশ এক অপকর্ম্ম করে। একটা সংবাদপত্রের পাতা নতুন করে ছাপিয়ে বীরেনকে দেখানো হয় যে, অন্যান্য লোক তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশকে গোপন তথ্য সরবরাহ করেছে এবং তার মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আছেন।

বীরেন এতে মর্ম্মাহত হন। অব্যবস্থিত মনের অবস্থায় পুলিশের প্ররোচনায় বীরেন বলেন যে, যতীন মুখোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশে তিনি এই কাজ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে যতীন মুখোপাধ্যায়কে আসামী খাড়া করে প্রেসিডেন্সী জেলে এক মামলা শুরু করা হয়। যতীন্দ্রনাথ এ-সময় 'হাওড়া গ্যাং কেস'-এর আসামী, জেল-হাজতে দিন কাটছে। বীরেনের জবানবন্দীর ওপর নির্ভর করে প্রেসিডেন্সী জেলের মধ্যেই এজলাস খাড়া করা হ'ল। ১৯১০ ফেব্রুয়ারী ১৯-এ যতীনের আত্মীয়দের কাছে খবর গেল যে, যতীনকে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরদিনই মামলা। বীরেনের জবানবন্দী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীনের ব্যারিষ্টারকে বলা হ'ল বীরেনকে জেরা

করতে। ব্যারিষ্টার আপত্তি জানালেন—তাঁর মক্কেলের কাছ থেকে তিনি মামলার কোনও বিবরণই শোনার সময় ও সুযোগ পাননি।

হাকিম নাছোড়বান্দা। কারণ বীরেনের ফাঁসির দিন আসন্ন। ব্যারিষ্টারের অনুরোধে মামলা খানিকক্ষণ মুলতুবী রাখা হ'ল। ব্যারিষ্টার ও পুলিশ কমিশনার ছুটলেন ছোটলাটের কাছে, ফাঁসির দিন পিছিয়ে দেবার জন্য। তাঁরা বিফল হলেন। যথাকালে বীরেনের ফাঁসি হয়ে গেল।

গভর্ণমেণ্ট-পক্ষে যুক্তি হ'ল—যখন খোদ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ, তখন জেরা না হলেও সে-বিবৃতি যতীনের মামলায় লাগবে। ব্যাপারটা হাইকোর্টে পাঠালে, জজেরা বলে দিলেন, সেটা আইনমতে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। ফলে, যতীন সে-যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন।

বীরেনের একটা সন্দেহ ছিল যে, কোথায় যেন কি গোল পাকিয়ে গেছে। "দাদা" কখনও তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না। পরে তিনি সমস্ত ঘটনার মধ্যে পুলিশের অপকর্ম্মের ইঙ্গিত পান। তখন অনুশোচনায় তিনি ভেঙ্গে পড়েন। ফাঁসির হুকুম এই একরারের তুলনায় তাঁর কাছে বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণার কাছে পিপীলিকার কামড়ের মত মনে হয়েছিল। তিনি কাতরভাবে যতীন্দ্রনাথের ক্ষমা-ভিক্ষা চেয়ে লোক মারফত জানিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, যতীন্দ্রনাথ জানতেন নীচ প্রতারণার কবলে না পড়লে বীরেনের মুখ থেকে কোনও কথা আদায় করা সম্ভব হয়নি।

১৯১০ ফেব্রুয়ারী ২১-এ অকুতোভয় বীরেন্দ্রের পবিত্র দেহ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসিকাষ্ঠে লটকে দেওয়া হয়।

আজ যে-ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলজ্বল করছে, সে-সময় সাধারণ লোকের কাছে এর কদর তো হয়ইনি, একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ঘটনাটি উল্লেখ করে সম্পাদকীয় মন্তব্য করে (২৫. ১. ১০):

"The terrible outrage committed yesterday shows that these diabolical terrorists are determined not to give peace to the country. Alas, how to convince them that the consequences of these terrible deeds in succession are causing an amount of misery which is beyond the power of endurance of the nation already bent down as it is under a mountain of suffering of various other kinds."

অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

খুলনা-যশোহর ষড়যন্ত্র মামলা

এক মহেশা ছাড়া—নন্দনপুর, ধূলগ্রাম, সোলেগাতি প্রভৃতি কয়েকটি ছোট-বড় ডাকাতির ব্যাপারে, পুলিশ আসামী ধরতে পারলে না। অগতির গতি তখন একটা ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হ'ল। প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ হয়—১৯১০

অক্টোবর ২১-এ। কুড়ি জনের মধ্যে আঠারো জনকে নিয়ে প্রাথমিক তদন্ত চলে। মামলা ১৯১০ ডিসেম্বর ১০-ই হাইকোর্টে পাঠানো হয়। হাইকোর্টে শুনানি আরম্ভ হ'ল ১৯১১ এপ্রিল ২-রা। ঐ তারিখেই শেষ পর্য্যন্ত সকলকেই মুচলেকাবদ্ধ করে ছেড়ে দেওয়া হয়; যদি আবার অপরাধের সংবাদ পাওয়া যায় তাহলে তাঁদের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড ভোগ করতে হবে। আসামীদের মধ্যে যে তিনজন অন্য মামলায় দণ্ডিত হয়েছেন, তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়নি।

অন্যান্য মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত তিনজন আসামীর ক্ষেত্রে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে নারাজ হয়। ষড়যন্ত্রের আসামী-তালিকায় এঁদের নামও ছিল।

বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তীর, পলাতক অবস্থায়, রাজসাহী অস্ত্র আইনে ১৯১০ মার্চ ১৯-এ তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী ও হেমচন্দ্র গাঙ্গুলী মহেশা ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত হন।

ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্যের 'মহেশা অতিরিক্ত (সাপ্লিমেণ্টারী) মামলা'য় তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

ঘটনা-প্রবাহ

খুলনা ঃ সোলেগাতি— দামুরিয়া থানার অধীনে সোলেগাতি গ্রামে রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ১৯১০ ফেব্রুয়ারী ৭-ই দশ-বারোজন লোক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে হানা দেয়। বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি, শ'দুই টাকা মাত্র লুণ্ঠিত হয়।

যশোহর ঃ ধূলগ্রাম— ১৯১০ ফেব্রুয়ারী ১১-ই ধূলগ্রাম-এর (থানা অভয়নগর) চরণ ঋষির বাড়ী থেকে হঠাৎ হট্টগোল উঠলো—"ডাকাত পড়েছে"। রাত্রি তখনও খুব বেশী হয়নি। কিন্তু ভয়ে বিশেষ কেউ বাধা দিতে এগিয়ে আসেনি। লুঠেরারা গহনা ও নগদে ছ'হাজার টাকার বেশী নিয়ে চম্পট দেয়। যথারীতি তল্লাসী প্রভৃতি চললো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মামলা করবার মত তথ্য পাওয়া যায়নি।

বাখরগঞ্জ ঃ মোহনগঞ্জ— রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় জন-বিশেক লোক কোতোয়ালী থানার মোহনগঞ্জ গ্রামে ১৯১০ মার্চ ৪-ঠা আক্রমণ করে। গহনাপত্রে মোটমাট দেড় হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়।

হাওড়া ষড়যন্ত্র

পাইকারী হারে আসামী ধরে মামলা খাড়া করার মতলব কাজে লাগানো শুরু হয়ে গেছে। রাজদ্রোহের আসামীব ব্যাপার; নানা স্থানের ঘটনা বা সঙ্ঘ এক পাত্রে সিদ্ধ করলে সবই একাকার হয়ে যাবার কথা। এই সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে গভর্ণমেণ্ট 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা' (gang case) জুড়ে দেয়। ধরা যে কতজন হয়েছিল, তার হিসাব করা শক্ত। তবে প্রায় শতাধিক হবে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

লোক ছাড়া, একেবারে গোছা ধরে (groups) গভর্ণমেণ্ট টান মেরেছিল। একটু "অতি বুদ্ধি" হয়ে পড়ে। সরকারী উকিল বললেন, এগারোটা ভিন্ন ভিন্ন দল এই একই মামলার আসামী। স্থানের দূরত্ব অনেক, আর দলগুলি ভাগ করলে দেখা যায়—(১) শিবপুর, (২) কুরচি, (৩) খিদিরপুর, (৪) চিংড়িপোতা, (৫) মজিলপুর, (৬) হলুদবাড়ী, (৭) কৃষ্ণনগর, (৮) নাটোর, (৯) ঝাউগাছা, (১০) 'যুগান্তর', (১১) 'ছাত্র ভাণ্ডার', (১২) রাজসাহী (রামপুর বোয়ালিয়া) গ্রুপ।

তোড়জোড় তো মন্দ হ'ল না। সব ফাঁক বন্ধ করে মামলা সাজানো হ'ল। প্রাথমিক তদন্তের পর, ১৯১০ জুলাই ২০-এ মামলা হাইকোর্টে দায়ের হয়ে গেল ছ'চল্লিশ জনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ—সম্রাটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-আয়োজন বা বিদ্রোহ। ১৯১০ ডিসেম্বর ১-লা থেকে মামলা আরম্ভ হয়।

শুনানির সময় পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। আসামী ভুবন মুখোপাধ্যায় পাগল হওয়ায় আসামী-তালিকা থেকে বাদ পড়েন এবং চারুচন্দ্র ঘোষ মারা পড়ায় রক্ষা পেয়ে যান। রায় প্রদত্ত হয় ১৯১১ এপ্রিল ১৯-এ। তেত্রিশজন মুক্তি পান। আর, হলুদবাড়ী ডাকাতি মামলার অভিযুক্ত ছ'জনের মধ্যে শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কিরণচন্দ্র রায় দু'জনের দু'বছর করে এবং চারজনের (শৈলেন্দ্রকুমার দাস, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গণেশচন্দ্র দাস) এক বছর করে দণ্ড বাড়িয়ে দেওয়া হয়। পূর্ববদণ্ডকাল শেষ হলে নতুন দণ্ডভোগ শুরু হবে।

মোট আসামী-তালিকার মধ্যে ছ'জনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত এক গুরুতর অভিযোগ ছিল: দশম জাঠ সেনা-বিভাগের কা'কে-কা'কেও রাজানুগত্য থেকে ভাঙ্গিয়ে আনার চেষ্টা। সেসন আদালতে ১৯১১ এপ্রিল ২৮-এ মামলা রুজু হয়। কিন্তু মূল মামলার হাইকোর্টের রায় পড়ে গভর্ণমেণ্ট এপ্রিল ২৮-এ মামলা প্রত্যাহার করে।

মামলায় সাজা পেয়েছেন অল্পসংখ্যক আসামী। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এ মামলা নাকি আশাতিরিক্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। সিডিসন কমিটির রিপোর্ট (পৃঃ ৪৪) বলেছে—"The continuance of the proceedings .... over a period of 12 months against 50 accused persons was followed by a complete cessation of *Bhadralok* dacotities in the districts around Calcutta."

ঢাকা ষড়যন্ত্র

ঢাকা ও আশপাশের ডাকাতিতে গভর্ণমেণ্ট খুব বিব্রত হয়ে উঠেছিল। তখন 'সর্ব্বৌষধি মহৌষধি'-রূপ 'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা'র আয়োজন, সম্পূর্ণ হ'ল। অভিযোগটা গুরুতর, দণ্ডবিধি আইনের ১২১-এ, সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা এবং সে-সম্পর্কে ষড়যন্ত্র। গভর্ণমেণ্টের মতে—"a case of wide and gigantic conspiracy to subvert the British Government in near future."

১৯১০ জুলাই থেকে ধরপাকড় আরম্ভ হয়। মাসখানেকের মধ্যে ধৃত লোকের সংখ্যা ৬০-এ উঠে গেল। গভর্ণমেণ্ট চেয়েছিল আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এবং সে-উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হয়েছিল। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ৫৫ জন আসামীর হাজির হবার কথা আগষ্ট ১৫-ই তারিখে। তার মধ্যে ৪৫ জন উপস্থিত হন। প্রাথমিক তদন্ত আগষ্ট ১৮-ই শুরু হয়ে কয়েকদিন বন্ধ থাকে। সেপ্টেম্বর ৩০-এ 'কেঁচে গণ্ডুষ' হ'ল।

তাড়াতাড়ি শুনানি শেষ হবে এবং বিচারকদের ওপর পুলিশের প্রভাব কম হবে বলে আসামীরা স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে বিচারের জন্য অক্টোবর ২৮-এ এক দরখাস্ত করেন। নভেম্বর ১৮-ই সেটা নাকচ করে দেওয়া হয়।

সেসনে মামলা সোপর্দ্দ হ'ল নভেম্বর ২২-এ। শুনানি আরম্ভ হয় ডিসেম্বর ১২-ই, আর নিয়মিত চলতে থাকে—১৯১১ জানুয়ারী ৬-ই পর্য্যন্ত। মে ৭-ই এ্যাসেসররা আসামীদের নির্দ্দোষ বললেও জজ-সাহেব যে সাজা দিলেন সেটা সব দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর বলেই মনে হয়।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ঃ

(১) পুলিনচন্দ্র দাস, (২) আশুতোষ দাশগুপ্ত ও (৩) জ্যোতির্ম্ময় রায়।

দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ঃ

(১) অশ্বিনীকুমার ঘোষ, (২) গুরুদয়াল দাস, (৩) চারুচন্দ্র সেন, (৪) যোগেশচন্দ্র রাউত, (৫) ক্ষীরোদচন্দ্র গুহ, (৬) বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (৭) রাধিকাভূষণ রায়, (৮) নিশিভূষণ বসু, (৯) নিতাইচন্দ্র বণিক্য, (১০) প্রফুল্ল-চন্দ্র সেন, (১১) রাধিকামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, (১২) সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, (১৩) সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়, (১৪) সারদাচরণ দাশগুপ্ত, (১৫) শান্তিপদ (ওরফে প্রমথনাথ) মুখোপাধ্যায়, (১৬) ভূপতিনাথ সেনগুপ্ত, (১৭) ক্ষীরোদচন্দ্র গুহ ও (১৮) মাণিক্যচন্দ্র গুহ।

সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ঃ

(১) বিজয়চন্দ্র রাহা, (২) শচীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) সুরেশচন্দ্র সেন, (৪) অক্ষয়কুমার দত্ত, (৫) অবনীমোহন গাঙ্গুলী, (৬) বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, (৭) গোপালচন্দ্র ঘোষ, (৮) গোপীবল্লভ চক্রবর্ত্তী, (৯) হেমচন্দ্র সেন, (১০) যদুনাথ দাস, (১১) নিশিভূষণ মিত্র, (১২) নৃপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, (১৩) পরেশচন্দ্র সেন ও (১৪) প্রমোদবিহারী দাস।

কেবল সুখেন্দ্রমোহন সেনের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

মোট ৩৫ জনের পক্ষে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। বিজয়চন্দ্র রাহা উন্মাদ হয়ে যাওয়ায় আর আপীল হয়নি। আপীলের শুনানী আরম্ভ হয়—১৯১২ জানুয়ারী ১৫-ই ; রায় বেরোয় এপ্রিল ২-রা। পরিবর্ত্তিত হলেও, ১৪ জনের সাজা বহাল থাকে এবং ২১ জন মুক্তি পান।

শেষ পর্য্যন্ত দণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ঃ

পুলিনচন্দ্র দাসের সাত এবং আশুতোষ দাশগুপ্ত ও জ্যোতির্ম্ময় রায়ের ছয় বছর করে দ্বীপান্তর ;

গুরুদয়াল দাস ও বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড ;

রাধিকাভূষণ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদচন্দ্র গুহ ও ভূপতিমোহন সেনগুপ্ত—প্রত্যেকের তিন বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড ;

গোপীবল্লভ চক্রবর্ত্তী, নিশিভূষণ মিত্র, নৃপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রমোদবিহারী দাস—প্রত্যেকের দু'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড।

গভর্ণমেণ্ট বিজয় রাহার সাজা দু'বছর কমিয়ে দেয়।

ঢাকা ঃ মুন্সীগঞ্জ— ঢাকা অঞ্চলে উৎপাত চলছিল এবং পুলিশ বিব্রত হয়ে উঠেছিল। সন্দেহক্রমে, ১৯১০ সেপ্টেম্বর ৫-ই মুন্সীগঞ্জ-এ 'চৌধুরীদের বাসা' তল্লাসী করা হয়। একটা টিন-কানাস্তারার মধ্যে খানিকটা দেশী বারুদ-মশলা আর এগারোটা বোমা পাওয়া যায়। তা ছাড়া বোমার ফর্মুলা, সাংকেতিক অক্ষরে কিছু লেখা এবং বিভিন্ন কাজের ভারপ্রাপ্ত তেরোজনের নাম। আর যায় কোথায়! সব গ্রেপ্তার। মামলা উঠলো, দশজন মাঝপথে ছাড়া পেলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিন জন রয়ে গেলেন। সেসন আদালতে বিস্ফোরক-আইনে ১৯১১ এপ্রিল ১০-ই কেবল ললিতচন্দ্র চৌধুরীর দশ বছর দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

খুলনা ঃ নন্দনপুর— মোটা সুদে টাকা ধার দেওয়ার বদনাম ছিল বিশ্বনাথ করের। ১৯১০ মার্চ ৩০-এ, পনেরো-ষোলোজন লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মধ্যরাত্রে গিয়ে বিশ্বনাথের বাড়ীতে হাজির। বাধা বিশেষ পেতে হয়নি, বরং ডাক-হাঁক আর অস্ত্রের ব্যবহার সম্ভাবনায় প্রতিবেশী বিশেষ কেউ আসেনি গৃহস্বামীর বাড়ীতে। নগদে ও গহনায় প্রায় ১৩,০০০ টাকার মত লুণ্ঠিত হয়েছিল।

যশোহর ঃ মহেশা— ঘটনাস্থল মহেশা গ্রাম, মামুদপুর থানার অন্তর্গত উমাচরণ ঘোষের বাড়ী। ১৯১০ জুলাই ৫-ই জন-সাতেক যুবা বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন বলে বাড়ীর মালিককে দিয়ে সদর দরজা খুলিয়ে নেয়। হাতে অস্ত্রশস্ত্র, সাজপোশাক "রণং দেহি"-গোছের ; সুতরাং আগন্তুকদের উদ্দেশ্য বুঝতে আর বিলম্ব হ'ল না। জবরদস্তি হাজার আড়াই টাকা নিয়ে তারা চম্পট দেয়।

ডাকাতির অভিযোগে দায়রা মামলা উঠলো ১৯১০ আগষ্ট ২৭-এ, আর রায় বেরুলো অক্টোবর ৮-ই। এতে পাঁচজনের সাজা হয় ; এঁদের দু'জন যশোহর-খুলনা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। হেমচন্দ্র গাঙ্গুলীর ছ'বছর, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচ বছর আর সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—প্রত্যেকের তিন বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য পলাতক ছিলেন। ১৯১১ এপ্রিল ৫-ই ওয়েলিংটন (রাজা সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারে গ্রেপ্তার হন। পরে 'মহেশা অতিরিক্ত (সাপ্লিমেণ্টারী) মামলা'য় ১৯১১ মার্চ ৬-ই তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

ময়মনসিংহ ঃ গোলোকপুর— কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত গোলোকপুর গ্রামে জমিদার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে ১৯১০ জুলাই ১০-ই দেখা গেল দুটা দো-নলা 'গাদা' বন্দুক আর একটা দূরপাল্লার বন্দুক (রাইফেল) চুরি গেছে। চোর ধরা পড়েনি।

ঢাকা ঃ ঢাকার পুলিশের সি.আই.ডি. ইন্সপেক্টর শরৎচন্দ্র ঘোষ। তাঁর ওপর বিপ্লবীদের নজর পড়ে। ১৯১০ সেপ্টেম্বর ১-লা সন্ধ্যার পর তিনি তাঁর যুগীনগর বাসা থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছেন, হাতে খরিদ-করা ছোট-খাটো জিনিস। সেসন কোর্টের সামনে আসতেই একজন লোক তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তিনি সামান্য আহত হন।

দু'জন যুবকের নামে মামলা রুজু হয় হাইকোর্ট সেসনে। ১৯১১ মে ৪-ঠা তাঁরা অব্যাহতি পান।

ঢাকা ঃ হলদিয়া হাট— সন্ধ্যা সবেমাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে, আঁধার নেমে এসেছে। ১৯১০ সেপ্টেম্বর ৩০-এ, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত প্রায় ত্রিশজন ভদ্রলোক লোহাজং থানার অন্তর্গত হলদিয়া হাট-এর কিছু দোকানপত্র লুঠ করে চলে যায়। বিপদাশঙ্কা ছাড়া এতগুলি লোকের মজুরি পুষিয়েছে বলে মনে করা ভুল হবে। সর্ব্বসাকুল্যে হাজার-দেড়েক টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যেতে হয়েছিল।

ফরিদপুর ঃ কালার গাঁ— লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ বিচারে অপরাপর প্রায় সকল ডাকাতিকে অতিক্রম করে 'কালার গাঁ ডাকাতি'। স্থানটি ভেদারগঞ্জ থানার এলাকায় অবস্থিত। ডাকাত-দল সংখ্যায় প্রায় পঁচিশ জন। ১৯১০ নভেম্বর ৭-ই রাত্রি আটটা নাগাদ ডাকাতরা দুটো 'ঘাসী' নৌকো করে ঘরিষা খাল বেয়ে এসে ধনী পাট-ব্যবসায়ী ঈশ্বরচন্দ্র পালের উপর আক্রমণ চালায়। লুঠের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক সাড়ে বারো হাজার টাকা।

বাখরগঞ্জ ঃ দাদপুর— বৎসরের শেষ ডাকাতি, ১৯১০ নভেম্বর ৩০-এ ; ডাকাত-সংখ্যা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ (বেশী হওয়াও সম্ভব)। খুব বেশী রাত হয়নি, তবে শীতকাল ; রাত্রি আটটা নাগাদ ডাকাতরা মহেন্দিগঞ্জ থানার দাদপুর গ্রামের দুর্গামোহন রায়-চৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করে এবং নগদে গহনায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

মরণ-যজ্ঞ

কালাচাঁদ বসু : পুলিশের হেফাজতে বিপ্লবী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তির মৃত্যু বাঙ্গলার ইতিহাসে অনেকগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। খুব গোড়ার দিকের একটি ঘটনা থেকে সমস্ত বিধি-বিধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

১৯১০ সালে, ডাকাতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে, খুলনা জেলার সাতক্ষীরায় পুলিশ কালাচাঁদ বসুকে গ্রেপ্তার করে সেপ্টেম্বর মাসে। সাতক্ষীরায় এক তৃতীয় শ্রেণীর জেলে তাঁকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন কিছু কিছু খবর পায়। একদিন হঠাৎ প্রচারিত হ'ল, কালাচাঁদকে কারাকক্ষে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশবাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেল। কয়েকদিন দারুণ তল্লাসীর পর কালাচাঁদ ধরা পড়ে কল্যাণপুরের নিকট এবং তাঁকে মাগুরা জেলে সতর্ক প্রহরায় বন্দী করে রাখা হয়। একবারের অভিজ্ঞতার ফলে পুলিশের সতর্কতা বহুগুণ বেড়েছে ; কাজেই জীবিত অবস্থায় জেল থেকে পলায়ন অসম্ভব।

পুলিশের হেপাজতে কালাচাঁদের কি হ'ল জানতে পারা গেল না। হঠাৎ একদিন সাতক্ষীরা মহকুমার এক নিভৃত অঞ্চলে ঝোপের মধ্যে কালাচাঁদের গলিত শব আবিষ্কৃত হ'ল। ধুমধামের সঙ্গে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে গভর্ণমেণ্ট লেগে গেল।

চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ পড়লো—আসামীকে আবিষ্কার করতে হবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গেলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে—কিন্তু যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো হবে, তার মধ্যে ভূত আশ্রয় করে আছে। যারা এই খুনের জন্য দায়ী তাদেরই হাতে তদন্তের ভার, ফল যা হবার তার ব্যতিক্রম হয়নি। আততায়ী খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রতিশোধ

ঢাকা : শান্তশিষ্ট লোকটি রাম দাস ; কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। হঠাৎ একদিন সে রাজনীতি-চর্চ্চায় মনোযোগী হয়ে উঠলো, এবং 'ঢাকা সমিতি'তে যোগও দিয়ে ফেললো। ক্রমে দলের খবর জানবার জন্যে অত্যুৎসাহী বলে লক্ষ্য করা গেল। তখন বিপ্লবী-দল থেকে রামের উদ্দেশ্যটি আবিষ্কার করবার জন্য বিপ্লবী-দলের গুপ্তচর পিছনে লাগলো। শীঘ্রই দেখা গেল রামচন্দ্র ডেপুটী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অফ্‌ পুলিশের বড়ই আস্থাভাজন ব্যক্তি।

এ অপকর্ম্ম সহ্য করা যায় না। জুলাই ১৯-এ ঢাকা শহরের ওপরেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ঝরঝরে ব্যবস্থা, কারও বিরুদ্ধে মামলা করা সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন রূপে (১৯১১)

ঘটনার ধারা লক্ষ্য করলে সহজেই মনে হয় বিপ্লবীরা এ-সময় গুপ্তচর ও পুলিশ কর্ম্মচারী হত্যার দিকে কিছু বেশী মনোযোগ দিয়েছে। অনেক সময় খুব বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়নি, কারণ পল্লী অঞ্চলে একজন কা'কেও নিভৃত স্থানে ডেকে এনে খুন করলে, আসামী ধরা বা সনাক্ত করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। ১৯১১ সালে সাত জনকে হত্যা করা হয়েছে। মাত্র একটিতে আসামীকে নিয়ে টানাটানি হয়েছিল; সে-ও আবার হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পায়। দেখা যাচ্ছে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এতটা ক্ষতি সত্ত্বেও বিপ্লবীদল অটুট থেকে গেল। কিছুটা সাহসও সঞ্চিত হয়ে থাকবে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতি সামান্য ব্যাপার নিয়েও বিপ্লবীরা কতকটা যেন "হাত পাকাবার" জন্যে গোলমাল সৃষ্টি করেছে এবং টানাটানি, মামলা ও দণ্ডভোগ কপালে জুটেছে।

ঘটনা-প্রবাহ

ঢাকা ঃ সোনারং— পূর্ব্ব-বাঙ্গলার বিপ্লব-ঘটনায় সোনারং ন্যাশনাল স্কুলের নামের পরিচয় কিছু থেকে যাবে। পূর্ব্ববঙ্গের 'অনুশীলন দল'-এর অবিসম্বাদিত নেতা পুলিন দাস ছিলেন এই স্কুলের শিক্ষক। স্কুলটি ১৯০৮ সালে স্থাপিত; পাঠ্য ছিল এনট্রান্স পরীক্ষার মান; ছাত্র-সংখ্যা ৬০-৭০ মাত্র। শরীরচর্চ্চা, লাঠি ও ছোরা খেলা, লোহার ও কাঠের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। বাছাই শিক্ষকদের পরিবেশে ছাত্রদের মনে বেশ একটু বেপরোয়া ভাব গড়ে উঠেছিল।

পোষ্ট-অফিসের পিয়ন ডাকবিলি করতে যাচ্ছে—১৯১১ জানুয়ারী ২১-এ; ছোট পোষ্ট-অফিসের ডাক; টাকাপয়সা পিয়নের কাছে বেশি থাকার কথা নয়। হঠাৎ কয়েকজন লোক তাকে মারপিট করে তহবিল ছিনিয়ে নেয়—হিসাবে দেখা গেল সর্ব্বসাকুল্যে ৫৫ টাকা। পুলিশী তদন্তে বোঝা গেল আক্রমণকারীরা সোনারং স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র।

মোট চৌদ্দজনকে আসামী করে জুন মাসে মহকুমা হাকিমের এজলাসে এক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। হাকিম একজনকে ছ'মাস এবং অতিরিক্ত দু'মাস (মোট আট মাস), চারজনকে চার মাস হিসাবে, দু'জনকে দু'মাস হিসাবে সশ্রম কারদণ্ড দেন এবং তিনজনকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। দায়রা জজের কাছে আপীলে আট

মাসের সশ্রম কারাদণ্ড বহাল রেখে দু'জনকে এক মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড, চারজনকে পঁচিশ টাকা করে জরিমানা করে, চারজনকে মুক্তি দেন। আট-মাস-দণ্ড-প্রাপ্ত যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরে মৌলভীবাজার বোমা-দুর্ঘটনায় নিহত হন ; পরে সে-কথা বলা হয়েছে।

যা টাকা লুঠ করা হয়েছিল তার বহুগুণ টাকা মামলায়, জামিনে এবং জরিমানায় খরচ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা সামান্য হলেও, এ নিয়মে অর্থ-সংগ্রহের পথটা যে অধিকাংশ সময় লাভের চেয়ে ক্ষতির ভাগ বেশী করেছে, তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই মামলার জের গড়িয়েছিল অনেকদূর। এতে সরকারপক্ষে সাক্ষী দেওয়া এবং তথ্যাদি সরবরাহ করতে গিয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাতে হয়েছে।

ফরিদপুর ঃ পণ্ডিতচর— লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ দিয়ে ডাকাতির গুরুত্বের একটা বিচার করাই সাধারণ নিয়ম। সে-হিসেবে পণ্ডিতচর গ্রামের চন্দ্রকুমার পালের বাড়ীতে ১৯১১ ফেব্রুয়ারী ৫ তারিখের ডাকাতি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। প্রাণে কেউ মরেনি ; টাকা যায় সাড়ে পাঁচ হাজার।

ঢাকা ঃ গোয়াডিয়া— সন্দেহ পড়েছিল সোনারং স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের ওপর। লোহাজঙ্গ থানায় মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী ১৯১১ ফেব্রুয়ারী ২০-এ জন পঁচিশ লোক ঢুকে লোকজনকে মারধোর করে নগদে ও অলঙ্কারে সাড়ে সাত হাজার টাকা নিয়ে পালাতে সমর্থ হন।

ডালহাউসি স্কোয়ারে বোমা

বাচ্ছা ছেলে, মাত্র কৈশোর কেটেছে—১৬ বছর বয়স। সাহস সঞ্চয় করে পুলিশের বড়গোছের অফিসার (ডেন্‌হাম)-কে মারবার জন্য ১৯১১ মার্চ ২-রা (৪-৪৫ মিঃ) ডালহাউসি স্কোয়ার (বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) বোমা ছুড়েছিলেন। বোমা সাহেবের ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে পড়ে, কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তির পরমায়ুর জোরে বোমা ফাটেনি।

ছেলেটির নাম ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ; ডেন্‌হাম-সন্দেহে পি.ডব্লু.ডি.-র কণ্ট্রাক্টর মিঃ কাউলের গাড়ীতে বোমা ফেলেন। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, দুর্দান্ত শক্তিশালী বোমা। অকুস্থানেই ননীগোপাল ধরা পড়ে যান।

মার্চ ৯-ই হাইকোর্ট স্পেশ্যাল সেসনে ননীগোপালের নামে মামলা ওঠে। অপরাধ মেনে লওয়ায়, ২৭-এ মার্চ তাঁকে ১৪ বছরের দ্বীপান্তর-বাসের সাজা দেওয়া হয়। এ-সম্পর্কে চন্দননগর ও চুঁচুড়ার কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ননীগোপালের মুখ থেকে একটি কথাও আদায় করা যায়নি। সুতরাং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ক্রমে মুক্তি দেওয়া হয়।

কিশোর ননীগোপাল সেলুলার জেলে কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অমানুষিক দৈহিক সহনশক্তি ও দুর্দ্দমনীয় মনোবল দেখিয়েছেন।

ময়মনসিংহ ঃ সুয়াইকর— মদনগঞ্জ থানার অখ্যাত গ্রাম সুয়াইকর। ধনী লোকদের বসবাস আছে বলে কোনও "দুর্নাম"ও নেই। কিন্তু ১৯১১ মার্চ ৩১-এ জন-পনেরো সশস্ত্র যুবক নন্দনকুমার পালের বাড়ী থেকে ১,২০০ টাকা লুঠ করে নিয়ে সরে পড়ে।

বাখরগঞ্জ ঃ লক্ষ্মণকাটি— গৌরনদী থানা এলাকায় অবস্থিত এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম লক্ষ্মণকাটিতে কয়েকজন বিত্তশালী লোকের বাস। ১৯১১ এপ্রিল ২২-এ মধ্যরাত্রে প্রকাণ্ড একদল, সংখ্যায় ৩০ জনও হতে পারে, রাখালচন্দ্র ধূপীর বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর লোক বাধা দিতে চেষ্টা করে বিফল হয়। অলঙ্কার বাদে কিঞ্চিদধিক ১০,০০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়েছিল।

ময়মনসিংহ ঃ চারহাসা— অনুমান ২৫-৩০ জন লোক কোতোয়ালী থানার চারহাসা গ্রামের তরীপ সেখের বাড়ী মধ্যরাতে আক্রমণ করে ও কিঞ্চিদধিক দু'হাজার টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়।

ময়মনসিংহ ঃ সরারচর— বাজিতপুর থানার গণ্ডগ্রাম। সেখানে জন-দশেক সশস্ত্র যুবক ১৯১১ জুলাই ২৭-এ ভগবানচন্দ্র ভূঁইয়ার বাড়ী আক্রমণ করে।

এ-সম্পর্কে জিতেন্দ্রকান্ত লাহিড়ীকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হয়। ডাকাতির অভিযোগে আসামীকে ১৯১১ সেপ্টেম্বর ২৩-এ পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ঢাকা ঃ সিন্‌হেয়ার— সিন্‌হেয়ার (মাণিকগঞ্জ থানা) গ্রামের গায়ে প্রায় বিশটি যুবক-সহ ১৯১১ সেপ্টেম্বর ৫-ই রাত্রি ৭-টা ও ৮-টার মধ্যে একটা নৌকা এসে লাগলো। পূর্ব্ব-কল্পনা-মত আগন্তুকরা দুটো দলে ভাগ হয়ে পড়ে। একটা দল চললো পোষ্ট-অফিসের দিকে, আর একটা দল যুধিষ্ঠির মণ্ডল আর বলাই মাড়োয়ারীর গদির দিকে রওনা হয়ে যায়। হৈচৈ একটা উঠলো, কিন্তু পোষ্ট-অফিস থেকে প্রায় ৪০০ টাকা, আর দুই গদি থেকে ৭,৫০০ টাকা সংগ্রহ করে ডাকাতরা চলে যায়।

ময়মনসিংহ ঃ কুলিয়াচর— এবার বাজিতপুর থানার কুলিয়াচর বাজার হ'ল লক্ষ্যস্থল। মস্তবড় দল, ডাকাত-সংখ্যা ৩৫ বা ৪০ জন হবে। ১৯১১ অক্টোবর ৩-রা একেবারে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। পোষ্ট-অফিস, পাট-বিক্রয় কেন্দ্র, দু'জন সাহাদের গদি সবই একই সময় আক্রান্ত হয়। তোড়জোড় যতটা, সে-হিসাবে লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ নিতান্ত কম, অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক তিন হাজার টাকা।

রংপুর ঃ বালিয়াগ্রাম— ধনের অপবাদে কুড়িগ্রাম থানার যদ্দি ব্যাপারীর

বাড়ী আক্রান্ত হয়—১৯১১ নভেম্বর ৬-ই রাত্রি দু'টায়। গহনা শ'-দুই টাকা, আর নগদে হাজারখানেক টাকা খোয়া যায়।

নোয়াখালি: চৌপল্লী— বিত্ত যেমন ছিল, তেমনি তাকে লুকিয়ে রাখবার বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল চৌপল্লী থানা ও গ্রামের শ্যামাকান্ত আইচের। জন-পঁচিশ যুবক ১৯১১ ডিসেম্বর ৩১-এ বাড়ী চড়াও হয় রাত্রিকালে। বহুতর ভীতিপ্রদর্শন ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও সে-বাড়ী থেকে শ'-দুই টাকার বেশী সংগ্রহ করা যায়নি।

ত্রিপুরা গ্রাম ও থানা বড়কান্তায় একটা ডাকাতি হয় এবং শ'-দুই টাকা লুঠ হয়। পুলিশ একে রাজনৈতিক ঘটনা বলে।

মরণ-যজ্ঞ

চারু ঘোষ (হাওড়া): 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা' খাড়া করা হয়েছিল—বেশ কতকগুলি লোককে আইনের নামে কয়েদী করে রাখার জন্য। হাইকোর্ট বাদ সেধেছিল—পুলিশ ষড়যন্ত্র প্রমাণ করতে পারেনি। সুতরাং প্রায় সবাই ফস্কে গিয়েছিল।

এই মামলা সম্পর্কে চারুচন্দ্র ঘোষকে ১৯১০ মার্চ ২৪-এ গ্রেপ্তার করা হয়। তখন চারু অত্যন্ত অসুস্থ। স্বাস্থ্যের দুরবস্থার জন্য জামিনে তাঁর মুক্তির জন্য ব্যর্থ আপীল করা হয়। মরণাপন্ন অবস্থায় ১৯১১ জানুয়ারী ৪-ঠা পর্য্যন্ত তাঁকে নিত্য আদালতে হাজির থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের রায়ে, মামলার দিন হাজির হওয়ার যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পান।

এ অবস্থা যখন চলছে তখন চারুর নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয় এবং জামিনে মুক্তির জন্য আবার দরখাস্ত করা হয়। রায় প্রকাশিত হবার আগেই ১৯১১ এপ্রিল ১৬-ই চারুচন্দ্র ইহধাম পরিত্যাগ করে গভর্ণমেণ্টকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ (পাবনা): বাঙ্গলায় বিপ্লব-আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্ম্মীদের মধ্যে বহু সুসন্তানের পরিচয় পাওয়া গেছে। যেখানে সহকর্ম্মীর জন্য অকাতরে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে দধীচির কীর্ত্তিকেও ম্লান করে দিয়েছে, এমন উদাহরণ বিরল নয়। তবে পার্থক্য একটু আছে। দধীচির দান শিক্ষিত, এমনকি দূর পল্লীর অশিক্ষিতের কাছে অপরিজ্ঞাত নয়, দেবতারা জানতেন এবং তা প্রচার করতে কৃপণতা করেননি। আর এক্ষেত্রে সে-কাজে কোনও পরিচয়ই কারও জন্য রেখে যাওয়া হয়নি। যদি কেউ সাক্ষী থেকে থাকেন, প্রকাশ হলে নানা বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনায় অতি মহান্ আত্মত্যাগের কাহিনীকেও সম্পূর্ণরূপে গোপন করে রেখে যেতে হয়েছে।

দলপুষ্ট করবার জন্য বা কোনও নবীন আগন্তুকের আগ্রহাতিশয্যে তাকে দলে ভর্ত্তি করতে হ'ত এবং যথাকালে উপযুক্ত বিবেচিত হলে দলীয় কার্য্যে নিয়োগ করাই

ছিল রীতি। ১৯১১ সালে বৈপ্লবিক কাজে শিক্ষানবিশী করবার জন্য পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামের নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী আর অবিনাশচন্দ্র রায় এক নবীন যুবককে সঙ্গে করে চলেছেন লক্ষ্যস্থানের দিকে। পথ পড়েছে জঙ্গলাকীর্ণ ভাদরা গ্রামের ভিতর দিয়ে। সন্ধ্যা সবেমাত্র পার হয়ে গেছে। বেশ খানিকটা যাবার পর দেখা গেল পথের পাশের ঝোপ থেকে এক বাঘ লাফ দিয়ে যুবকের ওপর পড়বার জন্য প্রস্তুত। নরেন্দ্র সেটা লক্ষ্য করেছেন এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। বাঘ লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে, চক্ষের নিমিষে তিনি দু'পক্ষের মাঝখানে পড়ে যুবককে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন, আর বাঘ তাঁর ওপরে পড়লো ; যুবক রক্ষা পেয়ে গেল। বাঘের সঙ্গে নরেন ও অবিনাশের অসম সংগ্রাম বেধে গেল। গোড়াতেই নরেন্দ্র মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হওয়ায় সেই স্থানেই দেহত্যাগ করলেন। অবিনাশচন্দ্র রায়ের পিঠে বাঘের থাবার দুই প্রকাণ্ড ক্ষতচিহ্ন পঞ্চান্ন বছরের ব্যবধানে আজও বর্ত্তমান।

বাঘ তার শিকার ফেলে প্রস্থান করার পর নরেনের মৃতদেহ নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। জঙ্গলের মধ্যে কোনও রকমে একটা কবর খুঁড়ে তার মধ্যে ফেলে অবিনাশ ও যুবক প্রস্থান করলেন। প্রচার করে দিতে হ'ল যে, নরেন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন।

প্রতিশোধ

কলিকাতা ঃ ১৯১১ ফেব্রুয়ারী ২-রা। সিকদার বাগান লেনে গোয়েন্দা-বিভাগের শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আবাসস্থল। পৌনে ৮-টা নাগাদ শ্রীশ এক বন্ধুর সঙ্গে বাসায় আসছেন, এমন সময় খুব কাছে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে একজন গুলি ছোড়ে। বুলেট শ্রীশের লিভারের কাছে প্রবেশ করে। শক্তিমান পুরুষ গুরুতর আহত হয়েও, বেশ খানিকটা দূরে কাকার ডাক্তারখানায় পৌঁছান। তখনই তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে শ্রীশ ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঢাকা ঃ মনোমোহন দে পাইকারী দরে পুলিশের পক্ষে সাক্ষী দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র আর মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলায় বড় সাক্ষী। এপ্রিল ১০-ই রাত্রি ১১-টার সময় মনোমোহন বাড়ীতে (রাউতভোগ, ঢাকা) আরামে নিদ্রা যাচ্ছেন। বাইরে থেকে তাঁর নাম ধরে কে ডাকছে। মনোমোহনের মনে সন্দেহ ও ভয় জন্মেছে, ফলে দরজা বন্ধ করে তিনি বাড়ীর মধ্যে বসে রইলেন। তখন আগন্তুকরা কুড়ুল দিয়ে দরজা ভেঙ্গে জোর করে তাঁর ঘরে ঢোকে এবং বিছানার মধ্যেই তাঁকে রিভলবার থেকে তিনবার গুলি করে। একটা বুলেট বুকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়।

ময়মনসিংহ ঃ গোয়েন্দা-বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর রাজকুমার রায়—১৯১১

জুন ১৯-এ সন্ধ্যার পর একজন সঙ্গীর সঙ্গে এসে থানার সামনে নিজ বাসায় ঢুকতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় হঠাৎ পিছন থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। সাক্ষী (কোর্ট ইন্সপেক্টর) দেখতে পেলেন একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

ঢাকা ঃ সোনারং স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষী ছিলেন—দফাদার রসুল দেওয়ান আর আমেরি দেওয়ান। ১৯১১ জুলাই ১১-ই, আঁধার নেমে এলে, একজন লোক এসে রসুলকে বাইরে ডাকে এবং আসার সঙ্গে সঙ্গে দু'-তিনটে গুলি মারে। রসুল চীৎকার করে বলেন যে, কে মেরেছে সেটা তিনি দেখেছেন এবং দরকার হলে সনাক্ত করে দিতে পারেন। তখন আততায়ী ফিরে এসে আরও তিন-চারবার গুলি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে রসুলের মৃত্যু ঘটে।

একই রাত্রিতে এবং অনুরূপ উপায়ে বাড়ী থেকে ডেকে দরজায় এনে দফাদার আমেরি দেওয়ান আর সরকারপক্ষের পাইকারী সাক্ষী কালীবিনোদ চক্রবর্ত্তীকে হত্যা করা হয়। আমেরি গুলি দ্বারা আহত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

কালীবিনোদকে ছোরা দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করা হয়। চার দিন হাসপাতালে যন্ত্রণা-ভোগের পর, তিনি জুলাই ১৫-ই মারা যান।

বরিশাল ঃ শহরের উপর পুলিশ-ইন্সপেক্টর মনোমোহন ঘোষকে ১৯১১ ডিসেম্বর ১১-ই গুলি করে হত্যা করা হয়। কেবল এই কাজের জন্য ঢাকা থেকে হত্যাকারীরা এসেছিলেন এবং কার্য্যসিদ্ধি হলে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

বাঙ্গলার বাইরে

এ্যাশ-হত্যা (মাদ্রাজ) ঃ শান্তশিষ্ট মাদ্রাজ স্রোতের বাইরে থাকতে পারেনি। ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে সফল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ; ১৯০৯ সালে পুনরাবৃত্তি। বাঙ্গলায় ঘটে গেল ১৯০৮ সালে, যদিও আন্দোলনের অশান্ত ভঙ্গী আগে থেকেই প্রকট হয়েছে। মাদ্রাজে একটু বিলম্ব হয়েছে, আর একটাই হয়েছে। পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা তোলপাড় হয়ে গেল, উত্তরপ্রদেশ খানিকটা দোলা খেলো, বিহারে বাঙ্গলার প্রভাব—বায়ু-হিল্লোলে জলের মন্দমধুর তরঙ্গ দেখা গিয়েছিল। অন্যান্য অঞ্চলের কথা আলোচনার স্থান এটা নয়।

১৯১০ সালে টিউটিকোরিন (তুতিকরিন)-এ যুবকদের মধ্যে দেশের দুর্দ্দশা নিরাকরণের পথ ভাবতে ভাবতে 'ভারতমাতা এ্যাসোসিয়েশন' সংস্থা গড়ে ওঠে। টেনকাসি, সেনকোট্টা, পুলানুর প্রভৃতি স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেরই মধ্যে ভাব-বিনিময়ের ফলে টিন্নেভেলির (তিরুনেলভেলি) কালেক্টর উইলিয়াম এ্যাশ (Ashe)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গুপ্ত-সমিতির যুক্তি যে, এ্যাশ স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীকে দুষ্টবুদ্ধি খেলিয়ে ধ্বংস করেছেন, আর জাতীয়তাবাদী নেতাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড দিয়ে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত করেছেন।

যেমন মতলব তেমন কাজ। তোড়জোড় সব পূর্ণাঙ্গ করা হ'ল। এ্যাশ-এর বদলির হুকুম মাত্র এসেছে। তিনি তিরুনেলভেলি থেকে যাত্রা করে মনিয়াণ্ডি জংশন ষ্টেশনে গাড়ী বদল করবার জন্যে সস্ত্রীক অপেক্ষা করছেন। তাঁর গন্তব্যস্থানে যাবার গাড়ী এসে দাঁড়ালে, তিনি পূর্ব্বের গাড়ী থেকে নেমে সদ্য-আগত গাড়ীতে গিয়ে উঠেছেন, এমন সময় কামরার মধ্যেই গুলি এসে তাঁর বাঁ-দিকে কণ্ঠার হাড়ের নীচেই বুকের মধ্যে প্রবেশ করে। হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলেও তাঁর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আততায়ীকে তাড়া করে চলে প্ল্যাটফর্মের লোকরা ; নিকটে যেতে কারও সাহস হয়নি। অবশেষে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে এসে এক শৌচাগারে প্রবেশ করে আততায়ী আত্মহত্যা করে। অপর কয়েকজনকে ধরে বিচার চলে ; সকলেরই হ্রস্ব-দীর্ঘ কারাবাস ঘটে।

মিলিত বাঙ্গলা

বাঙ্গলা-বিভাগ নিয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, শেষটা দাঁড়ালো বিদেশী শাসনের সর্ব্বক্ষেত্রের প্রতি বিদ্বেষ। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বুঝতে পেরেছিল যে, 'পার্টিশন' রদ না হলে বাঙ্গলা অশান্তই থাকবে এবং ঝামেলা বেড়েই চলবে। সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একটু তোষণের পথ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কাল তখন সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সে-হিসাবে ভাল-মনেই বা চাপে পড়েই হোক্, সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড ১৯১০ মে ৬-ই দেহত্যাগ করলে, তস্য পুত্র পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাট হয়ে বসলেন। মৃত সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিতে ভারতের শোকজ্ঞাপন ও নূতন সম্রাটের সিংহাসন-অধিরোহণ উৎসবে যোগদান করে বড়লাট হার্ডিঞ্জ ১৯১০ নভেম্বর ১৮-ই ভারতে পদার্পণের পর সুসংবাদ দেন যে, ভারতের শাসন-সংস্কারের কিছুটা আসন্ন। সম্রাট ১৯১১ ফেব্রুয়ারী ৬-ই লাটের উক্তির সমর্থন জ্ঞাপন করেন। আগষ্ট ২৩-এ ভাঙ্গা বাঙ্গলা জোড়া লাগার সম্ভাবনার সংবাদ ভারতে পৌঁছায়। পরেই মার্চ ২৬-এ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ভারতে উপস্থিত থেকে, ১৯১১ ডিসেম্বর ১২-ই দরবার অনুষ্ঠিত হবে বলে সংবাদটা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। সম্রাট লণ্ডন থেকে রওনা হন নভেম্বর ১১-ই এবং বোম্বাইতে অবতরণ করেন ডিসেম্বর ২-রা।

সাড়ম্বরে দরবার অনুষ্ঠিত হ'ল। দ্বিধা-বিভক্ত বাঙ্গলা জুড়ে দিয়ে এক 'প্রেসিডেন্সী'-তে পরিণত করা হয় এবং বিহার, উড়িষ্যা ও আসামকে কেটে নিয়ে যথাক্রমে একজন ছোটলাট (লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর) ও একজন চীফ্‌ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

একে মডারেট-দল এক বিরাট জয় বলে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন বিশেষ স্তিমিত হ'ল না।

সমান তালে (১৯১২)

বিপ্লব-আন্দোলন কিছুটা উৎপাত সৃষ্টি করেছে এবং ইংরেজের টনক নড়েছে বলা যেতে পারে, কিন্তু এ-সময় জনমতের যে সামান্য মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে—বঙ্গভঙ্গ-রদ ও ভারতীয় বিধান-পরিষদের যৎসামান্য সম্প্রসারণ প্রভৃতি, তার পিছনে কংগ্রেসের দাবীকে প্রধান স্থান দিতে হয়।

বিপ্লবীদের সে-দিকে মন দেবার অবকাশ ছিল না। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, পুলিন প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্র হতে স্থানান্তরিত হওয়ায়, স্থানীয় নেতাদের হাতে আন্দোলন-পরিচালনার ভার গিয়ে পড়ে। এঁদের মধ্যে অনেকেই অসমসাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও দায়িত্ববোধের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করে বয়ঃকনিষ্ঠরা এগিয়ে এসেছেন।

দলের নেতা এবং সাহসী সহচর অনেকেই জেলখানায় বন্দী, সাধারণের মনে ত্রাস তার প্রভাব বিস্তার করেছে, তাহলেও পূর্ব্ব-বাঙ্গলার নানা জেলায় বৈপ্লবিক ঘটনার বিরাম ছিল না। সংগ্রামের চিন্তা ক্রমেই নতুন নতুন যুবকদের মধ্যে যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটা ছোট-বড় ডাকাতি এবং কয়েকটা খুন থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঢাকা ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলে উৎপাত অবাধে চলেছে। কুমিল্লার ডাকাতির ষড়যন্ত্র উপলক্ষ করে গভর্ণমেণ্ট বেশ কয়েকজন কর্ম্মীকে লম্বা কারাবাসের ব্যবস্থা করেছিল।

অর্থ-লুণ্ঠনের সঙ্গে অস্ত্র-সংগ্রহের চেষ্টাও চলতে থাকে।

ঘটনা-প্রবাহ

কুমিল্লার এক ঘটনা এ ব্যাপারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯১২ অক্টোবর ২৭-এ কোতোয়ালী থানার সাব-ইন্সপেক্টর টের পান শশীভূষণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র এক পত্র পেয়েছে যে, আগামী নভেম্বর ১-লা কোনও এক বাড়ীতে ডাকাতি হবে।

পুলিশের টনক নড়ে উঠলো। চারিদিকে গুপ্তচর ও গোয়েন্দা-পুলিশের সতর্ক প্রহরা রাখার ব্যবস্থা হ'ল। নির্দ্দিষ্ট তারিখে কতকগুলি লোককে গভীর রাত্রে মোক্তার দুর্গাচরণ পালের অন্ধকার বাড়ীতে ঢুকতে দেখা গেল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পুলিশ দেখল যে, আর নতুন লোক কেউ যাচ্ছে না।

বাড়ী ঘেরাও হ'ল ; সঙ্গে সঙ্গে তন্নতন্ন খানাতল্লাসী। এক জায়গার শিকার সংখ্যায় দাঁড়িয়ে গেল বারোজন। বাড়ীর মধ্যে থেকে ডাকাতির মালমশলা, মুখোশ, লাঠি, বড় হাতুড়ি, দুটো রিভলভার, একটা '১২ নল (bore)-এর কামান, টোটা, বারুদ, ছোরা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হ'ল। তা'ছাড়া কয়েকজনের নাম ও তাদের কার কাছে কি

হাতিয়ার দেওয়া আছে, তার তালিকা পাওয়া গেল। বারোজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি আর আনুষঙ্গিক সব ছেঁকে নিয়ে পুলিশ মহানন্দে মোক্তার-বাড়ী থেকে রওনা দিল।

মাসকয়েক ধরে পুলিশ খুঁটিনাটী তল্লাসী শেষ করে তেরোজনকে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য হাজির করে। মামলা চলার কালে প্রমাণের অভাবে একজনকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯১৩ মার্চ ১২-ই দায়রা জজ বারোজনের প্রত্যেককে সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। একযাত্রায় পৃথক্ ফল তাঁর মনঃপূত হ'ল না।

দণ্ডিত আসামীরা হাইকোর্টে আপীল করলেন। শুনানি শেষ হলে, হাইকোর্ট জুলাই ১১-ই রায় দিয়েছিল ; দু'জন মুক্তি পান, আর—

(১) প্রসন্নকুমার দে রায়, (২) হরিচরণ শীল, (৩) রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, (৪) কালাচাঁদ দে রায়, (৫) কুমুদবন্ধু নাগ, (৬) রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৭) দেবেন্দ্রনাথ বণিক, (৮) নয়নরঞ্জন বসু, (৯) শর্ব্বরীকান্ত (ওরফে ব্রজেন্দ্রলাল) চক্রবর্ত্তী, (১০) প্রভাসচন্দ্র কর্ম্মকার—এই দশজনের পূর্ব্বদণ্ড বহাল রেখে দিয়েছিল।

ঢাকা ঃ লাঙ্গলবাঁধ— নবাবগঞ্জ থানায় গ্রাম লাঙ্গলবাঁধ—গৃহস্বামী পিয়ারীমোহন নন্দী। জন-পনেরো যুবক ১৯১২ নভেম্বর ১৪-ই হাজির হয়ে হাতুড়ি মেরে দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর ভিতরে চলে যায়। মালিকের নিকট লোহার সিন্দুকের চাবী আদায় করে অলঙ্কার ও নগদে হাজার ষোলো টাকা নিয়ে সরে পড়ে। ধর্ম্মপ্রাণ লোক তারা, যাবার সময় "হর হর, বম্ বম্" ধ্বনি দিয়ে অন্তর্ধান হয় এবং বোমা ফাটায় আর বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ে কয়েকটা।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতির কোনও কিনারা করতে পারে না। মামলা-মোকদ্দমা হ'ল না। এক্ষেত্রে পরিণতি একটু নাটকীয় রকম ঘটেছিল। ঢাকা উয়াড়ির এক রায়বাহাদুর—এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদাধিকারী, পুত্র গিরীন্দ্রমোহন দাসের গতিবিধিতে একটু সন্দিহান হয়ে পড়েন। ১৯১২ নভেম্বর ২৭-এ, পিতা গিরীন্দ্রকে ডেকে তার বাক্স খুলতে আদেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত-সমিতি ও তাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সব তথ্য প্রকাশ করে বলতে হুকুম করলেন। পিতা একেবারে নাছোড়বান্দা। সুতরাং নিরুপায় হয়ে গিরীন একদিনের সময় চেয়ে নিল।

পরদিন (নভেম্বর ২৮-এ) গিরীন্দ্র এক সহকর্ম্মী সঙ্গে করে হাজির ; আর রায়বাহাদুর হাজির করলেন পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে। বাক্স খোলা হ'ল সকলের সামনে ; দেখা গেল বহু কার্তুজ, বারুদ, গুলি আর টোটা-তৈরীর সরঞ্জাম ; এর সঙ্গে লাঙ্গলবাঁধ-ডাকাতিতে লুণ্ঠিত বহু রূপার গহনা।

বিচার আরম্ভ হয় ১৯১৩ সালে ; রায় বেরুলো জানুয়ারী ২-রা ও ফেব্রুয়ারী ২২-এ ; অস্ত্র-আইনে দেড় বছর আর ডাকাতির মাল রাখার জন্য পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় গিরীন্দ্রের।

কুমিল্লা ঃ ডাকাতির প্রচেষ্টা— চারিদিকের উপদ্রবে পুলিশ অত্যন্ত সজাগ হয়ে পড়েছে এবং কোনও সন্ধান পেলে, সূত্র ধরে বিপ্লবীর খোঁজে চারিদিকে তোলপাড় করে ছাড়ছে। অনেক সময় নিরাশ হতে হয়েছে, আবার কখনও টানা-জালে দু'চারটা রুই-কাতলা ধরা পড়ে হিংসাত্মক আক্রমণ-প্রচেষ্টা বানচাল করতেও সমর্থ হয়েছে।

রাজধানীর রঙ্গ

ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করে মিণ্টো যখন বিদায় নিলেন, তখন শাসন-সংস্কার ভারতের ওপর চেপে বসেছে। সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্ব্বাচন রূপ গ্রহণ করছে। সে-সবের কুফল ঢাকবার কতকটা চেষ্টা হচ্ছে ভাঙ্গা-বাঙ্গলা জোড়া দিয়ে। দরবারের হাঙ্গামা চুকেছে বছরখানেক আগেই ; দিল্লীতে রাজধানী হ'ল সেটা সাড়ম্বরে প্রচার করার কাজ বাকী।

তোড়জোড় ভালরকমেই চলছে—মন কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন, বাঙ্গলা হয়তো এখন সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপ্লবীদের আয়োজন চলছে। সারা উত্তরভারতে ফল্গুর স্রোত বইছে বাঙ্গলা থেকে পাঞ্জাবেরও সীমানা ছাড়িয়ে। বোমা যাচ্ছে বাঙ্গলা থেকে, অন্ততঃ শিক্ষাটা দস্তুরমত রপ্তানী হচ্ছে। বোমা-প্রস্তুত-প্রণালী-সম্বলিত একই ফর্মু'লা রাজাবাজার (কলিকাতা), দিল্লী ও লাহোরে পাওয়া যাচ্ছে। শক্তিশালী ঘাঁটিও সব গড়ে উঠছে। নির্ভীক, আত্মভোলা, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাহীন যুবকের দল ধীরে ধীরে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সকল কেন্দ্রের নির্দ্ধারিত নেতা আছেন, আর সবার ওপরে রয়েছেন রাসবিহারী বসু। সব মিলে স্থির হয়েছিল এক নির্দ্দিষ্ট দিনে বিরাট অভ্যুত্থান ; কিন্তু সেই দিন, জার্ম্মানীর ভাষায় 'der tag' আবির্ভূত হবার আগের ঘটনাও বিপ্লবী ইতিহাসেরও এক বিরল দৃষ্টান্ত। একাধারে এবং একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, দুর্জ্জয় সাহস, অটুট স্থৈর্য্য, স্থির লক্ষ্য, আত্মগোপনে কুশলতা প্রভৃতি গুণের সমন্বয় সাধারণতঃ দেখা যায় না। অথচ ১৯১২ ডিসেম্বর ২৩-এ বড়লাট হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে যে বোমা ফেলা হয়, সেইটাই এসকলের মিলনক্ষেত্র।

বিরাট আয়োজন। সপত্নীক লাট চলেছেন দিল্লীকে ভারতের প্রধান নগরী বলে ঘোষণা করতে। নগরী তখন পাঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের শাসনে। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে, এটাই হ'ল পূর্ব্ব-বৎসরে সম্রাটের নির্দ্দেশের ফল।

স্পেশ্যাল ট্রেনে করে লাট ও তাঁর পত্নী বেলা ১১-টায় সিমলা থেকে দিল্লী স্টেশনে এসে পৌঁছুলেন। ভারতের, বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও আশপাশের রাজন্যবর্গ ও তাঁদের প্রতিনিধি-দল, সামরিক ও অসামরিক প্রধান রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ পুলিশ, সৈন্য ও

দেহরক্ষীর দল, ব্যাণ্ড ও আরও কত কি! গণনাতীত দর্শক, হাতী, ঘোড়া, যানবাহন, মোটর সব মিলিয়ে অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ। রাস্তার আশপাশের বাড়ীর ওপর মানুষ ভর্ত্তি, তিল-ধারণের স্থান নেই। শীতের মিঠে-রোদ আলো আর আরাম বিতরণ করছে। দেখে মনে হবে ভারতবর্ষে দুঃখ-দৈন্য ও অভাব-অভিযোগ কিছুই নেই।

পত্নীসহ লাট হার্ডিঞ্জ ট্রেন থেকে নেমে এলেন। যথারীতি অভ্যর্থনা হ'ল। করমর্দ্দন, বাক্য ও শিষ্টতা বিনিময়, পরিহাস ও সৌজন্য ছড়িয়ে পড়েছে; ওধারে পুরাতন ফোর্ট থেকে হচ্ছে তোপধ্বনি। ব্যাণ্ড বেজে উঠলো, আর ইংরেজ-পরিচালিত কাগজওয়ালাদের মতে "ভারতের জাতীয় সঙ্গীত" অর্থাৎ "Rule Britannia"-র সুর ভেসে উঠলো।

পঞ্চাশটি হাতী; তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশালকায় এবং শিক্ষিত করী ফরিদ-কোট দরবার থেকে এসেছে। তার সজ্জা ও আভরণের তুলনা কোথাও দেখা যায়নি। তার পিঠে বিরাট হাওদা,—লাট ও পত্নী তা'তে বসলেন। অপরগুলির ওপর মর্য্যাদা অনুযায়ী রাজন্যবর্গ এবং সরকারী ও বে-সরকারী মাননীয় সম্ভ্রান্ত অতিথিকুল।

সঙ্কেতধ্বনি হ'ল—বিরাট মিছিল চলতে শুরু করলো। শ'-তিনেক গজ পথ যাবার পর লাটের হাতী চাঁদনীচকে ঘড়িঘরের কাছে এসেছে, অপরপাশে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বিরাট অট্টালিকা। কাতারে কাতারে দু'পাশে লোক দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে মিছিল দেখছে। উৎসাহ ও আনন্দের সোরগোল সারা অঞ্চলকে মুখরিত করে ফেলেছে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এক বিরাট শব্দে দিগন্ত প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। একবার নিমিষের জন্য মনে হয়েছিল খুব নিকটে হাজারখানেক পটকা কেউ একসঙ্গে ফাটিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মিছিল কিছু সময়ের জন্য থেমে গেল। লক্ষ লক্ষ লোক বিস্ময়বিমূঢ়। মিনিটখানেক পার হবার পর বোঝা গেল লাটের হাওদা লক্ষ্য ক'রে কে একটা বোমা ফেলেছে; কিছুটা হলদে ধোঁয়া উঠছে।

মোটা, পুরু রূপোর চাদর-মোড়া হাওদার খানিকটা উড়ে গেছে। ছত্রধারী বলরামপুর রাজ্যের মহাবীর সিং মারা গেছে এবং হাওদার গায়ে তার প্রাণহীন দেহ ঝুলছে। লাটপত্নী হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়ে গেলেন, কিন্তু ত্বরিতে আপন আসনে সোজা হয়ে বসলেন। চোখে ধোঁয়া আর ধোঁয়া, কানে লেগেছে তালা,—একটা অস্বাভাবিক বিহ্বল ভাব। সম্পূর্ণ সম্বিৎ ফিরতে বেশ কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল।

ছত্রধারীর পরই ভীষণভাবে আহত হয়েছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ নিজে। হাওদার বাইরের পিঠে বোমা ফেটেছে। তাঁর দেহের নানা স্থানে বোমার মধ্যস্থিত লোহার টুকরো প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ দাব্‌না (shoulder blade)-র আঘাতটা কিছু গুরুতর। দৈর্ঘ্যে প্রায় চার ইঞ্চি আর গভীরতায় হাড় পর্য্যন্ত। পেশী সব ছিন্নভিন্ন।

ঘাড়ের আরও একস্থানে বড় আঘাত-চিহ্ন। দেহের অন্যান্য স্থানে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পাছায় অনেকগুলো লোহার টুকরো গভীর মাংসের মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছে।

হাতী দাঁড়িয়ে গেছে। লাট বলে উঠলেন সঙ্গিনীকে—"মনে হচ্ছে একটা বোমা", বলেই, "চলো" বলে মিছিল এগিয়ে যাবার আদেশ যে দিলেন, সেটা প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। লাটপত্নী ততক্ষণে সমস্ত অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন। মিছিল থামাতে বলে নিকটস্থ উচ্চপদাধিকারী অফিসারদের বললেন যে, আঘাতের গুরুত্ব বিবেচনায় লাটকে হাতী থেকে নামিয়ে সদ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বিরাটকায় হাতী, রোগীর দেহের ওজন এবং ক্ষতের অবস্থা বিবেচনায়, তাঁকে নামিয়ে মোটরে তোলা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার হ'ল না। তবে শেষ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুরূপে যে হ'ল, সেটা বেশ বোঝা গেল।

আরও দুটি লোক বোমার টুকরোর আঘাতে প্রাণ দেয়। হাওদার মোটা কাঠ ও রূপোর পুরু চাদর ছিন্নভিন্ন হয়ে লাটের প্রাণরক্ষা করেছে।

আততায়ী ধরবার জন্য খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল। পথের ওপর এত ঘন মানুষ দাঁড়িয়েছে যে, তার মধ্যে থেকে ছুড়ে ফেলার দূরত্বের মধ্যে হাত তুলে একটা মারাত্মক অর্থাৎ নিতান্ত ছোট আকারের নয়, বোমা ফেললে নিশ্চয়ই কারও নজরে পড়তো। গুজব ছড়িয়ে পড়লো—পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দোতালার বারান্দা থেকে পড়েছে। সেখানেও উপস্থিত লোকদের তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাদ চলেছিল। কিন্তু বোমা কাকেও ফেলতে দেখেছেন এ-কথা কেউ বলতে পারলেন না। ভৌতিক কাণ্ড!

আসামী ফেরার। ধরে দেবার পুরস্কারস্বরূপ লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি ছড়িয়ে পড়লো। শেষ পর্য্যন্ত সব বাদ-সাদ দিয়ে গভর্ণমেণ্ট থেকে মোট এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়। এ টাকা বেঁচে গেল। আসামীর সন্ধান কেউই দিতে পারলেন না। সাজা হওয়া দূরের কথা, কেউ ধরাও পড়লো না। ঘটনার পর থেকে লোকমুখে বসন্ত বিশ্বাসের নাম-ই আততায়ী বলে প্রচলিত ছিল। এর কিছুদিন পরে সিঙ্গাপুর অঞ্চলে রাসবিহারী বসু এক বক্তৃতায় দাবী করেন যে, তিনি স্বহস্তে এই বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। সমস্যা জটিল ছিল, জটিলতর হ'ল মাত্র।

এ সম্বন্ধে শেষ তথ্য যা পাওয়া গেছে ('বিচিন্তা' ঃ কার্ত্তিক ১৩৭৮, পৃঃ ৫৮ ; লেখক শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ), সেটা এইরকম ('দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম আসামী) লালা হনুমন্ত সহায় বলছেন—

"আসল ব্যাপার হচ্ছে এই ঃ বড়লাট হাতী চড়ে যাচ্ছিলেন চাঁদনীচক দিয়ে। ঘণ্টাঘরের কাছে মহাবীরপ্রসাদ গুপ্তর দোকানের সামনে বোমা ফেলা হয়। বোমা রাসবিহারী ফেলেননি, যদিও এই ব্যাপারে তিনিই ছিলেন উদ্যোগী। কোনও বাড়ীর ছাদ থেকে, মেয়েদের মধ্যে থেকে মেয়ে সেজেও কেউ বোমা ফেলেননি। বোমাটি ফেলেছিলেন বাঙলাদেশের বসন্তকুমার বিশ্বাস, রাস্তা থেকেই, কোন ছদ্মবেশ ধারণ করে নয়।"

এর পরই লাহোরে ১৯১৩ মে ১৭-ই লরেন্স গার্ডেনে এক বোমা ফাটে এবং একজন সাইকেল-আরোহী সরকারী পিয়ন তার ফলে নিহত হয়। তখন কাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। পরে সূত্র ধরে কয়েকজনকে ১৯১৪ সালে 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা'য় আসামী করা হয়। রাসবিহারী ফেরারী আসামী। অপরাপর তিনজন আসামীর সঙ্গে অবাধবিহারী, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসকে বিচারশালার কাঠগড়ায় খাড়া করা হয়েছিল। নিম্ন আদালত সব পার হয়ে, ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ১০-ই পাঞ্জাব চীফ কোর্ট প্রধান আসামীদের ফাঁসির হুকুম দেয়। প্রিভি-কাউন্সিল আপীল নাকচ করে—১৯১৫ মার্চ ১-লা। আর, মে ১১-ই আম্বালা জেলে ঐ চারজনের ফাঁসি হয়ে যায়। হার্ডিঞ্জ-হত্যা-প্রচেষ্টার এই পরিণতি ঘটে।

ঢাকা ঃ বৈগুণতেওয়ারী— বৈগুণতেওয়ারী (থানা ও গ্রাম)-তে হরলাল সাহার বাড়ীতে ১৯১২ জানুয়ারী ২৩-এ প্রায় জন-পনেরো লোক রাত্রি ১০-টার সময় চড়াও হয়ে হাজার-তিনেকের মত টাকা নিয়ে উধাও হয়।

বরিশাল ঃ মহেন্দিগঞ্জ— ফেব্রুয়ারী ১০-ই বাখরগঞ্জের সহাসপুর গ্রাম-পঞ্চায়েত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাসের বাড়ী থেকে একটি দো-নলা গাদা-বন্দুক এবং শ'-আড়াই টাকা চুরি যায়। যথারীতি এ অপরাধের কোনও কিনারা হয়নি।

ঢাকা ঃ আয়নাপুর— ঘেওর থানার আয়নাপুর গ্রামে ১৯১২ ফেব্রুয়ারী ২-রা তারিখে অনুষ্ঠিত ডাকাতিতে ধনী ব্যবসায়ী গোপেশ্বর সাহার বাড়ী থেকে অলঙ্কার ও নগদে সাত হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়।

বাখরগঞ্জ ঃ কুশাঙ্গল— অর্থ অপেক্ষা বন্দুকের দিকে যে ডাকাতদের লক্ষ্য বেশী, সেটা বোঝা যায়, কুশাঙ্গল গ্রাম ও থানায় অবস্থিত জানকীনাথ পালের বাড়ী থেকে এপ্রিল ১৭-ই একটি সরকারী বন্দুক চুরির ঘটনা থেকে। বন্দুক পেয়েই লুণ্ঠনকারীরা খুশি, টাকা-পয়সার দিকে আর নজর দেওয়ার প্রয়োজন হ'ল না।

বীরাঙ্গল ঃ একটু বড়রকমের ডাকাতি হয়েছিল বাখরগঞ্জের বীরাঙ্গল গ্রামে ১৯১২ মে ২৩-এ, ধনী ব্যবসায়ী কালীকুমার সাহার বাড়ীতে। এখানে ডাকাতদের সঙ্গে বাড়ীর লোকের ভালরকম সংঘর্ষ হয় এবং গৃহস্বামী ও তাঁর ভাই গুরুতর আহত হন। পঞ্চাশের বেশী ডাকাতদের লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ আট হাজার টাকার মত।

কাকুরিয়া ঃ বহু বহু ক্ষেত্রে ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করে ডাকাতদের নিরাশ হতে হয়েছে; বিপদের ঝুঁকি তো সব সময়ই বিদ্যমান। বাখরগঞ্জের মহেন্দিগঞ্জ থানার কাকুরিয়া গ্রামে মনিরুদ্দিন সেখের বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল ১৯১২ এপ্রিল ১৯-এ। মাত্র ষাটটি টাকার মত লাভ হয়েছিল বলে প্রকাশ।

ঢাকা ঃ পানাম— লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য দিয়ে বিচার করতে গেলে, ঢাকার নারায়ণগঞ্জ থানার পানাম গ্রামে রাত্রি ১-টার সময় গৌরচন্দ্র সাহার বাড়ীতে—১৯১২

জুলাই ১১ তারিখের ডাকাতির স্থান ওপরে গিয়ে ওঠে। উভয়পক্ষেই আহত হবার সংবাদ পাওয়া যায়। গৃহস্থের একজনের অবস্থা একটু গুরুতর হয়ে পড়ে। ডাকাতদের সংখ্যা ত্রিশ বা আরও কিছু বেশী। নোট ছিল ৯,৯০০ টাকার, নগদ ৫,০০০ টাকা, ২৫-খানা গিনি এবং ২৫০-খানা সোনার মোহর। একুনে প্রায় ২০ হাজার টাকা খোয়া যায়।

বাখরগঞ্জ ঃ প্রতাবপুর— জন পঁচিশ যুবক রাত্রি ১১-টা নাগাদ, ১৯১২ জুলাই ১৫-ই কোতোয়ালী থানার দিগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বাড়ীতে হানা দিয়ে কমবেশী সাড়ে সাত হাজার টাকা নগদে ও অলঙ্কারে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এখানে দস্তুরমত খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যায় এবং ডাকাতদের মধ্যে দু'জন খুব গুরুতরভাবে আহত হয়।

ঢাকা ঃ কোনা— টাকার দিক থেকে অত্যন্ত ছোটখাটো ব্যাপার ; লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ একশতও নয়। ঘটনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দশ-বারোজন ছেলে নভেম্বর ১৮-ই ঢাকার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত কোনা গ্রামের পোষ্ট-অফিসে হানা দিয়ে, পোষ্টমাষ্টারকে ভয় দেখিয়ে চাবি আদায় করে। ছোট পোষ্ট-অফিস—টাকা-পয়সা কিছুই পাওয়া যায়নি বললেই হয়।

প্রতিশোধ

মেদিনীপুর ঃ হত্যা-প্রচেষ্টা— গুপ্তচর বলে কাকেও সন্দেহ হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মেদিনীপুর সহরের আবদুর রহমান বলে একজনের পুলিশে বিপ্লবীদের সম্পর্কে গোপন সংবাদ সরবরাহ করার গুজব রটে। ডিসেম্বর ১৩-ই সন্ধ্যার সময় তার বাড়ীতে বোমা পড়ে। রহমান-সাহেবের কপাল ভাল ; কেউ আহত হয়নি।

মেদিনীপুরের চেষ্টা বিফল হলেও অন্যান্য স্থানে কয়েকটা খুন হয়েছে।

ঢাকা ঃ চাঁদারফুল গ্রামের সুকুমার চক্রবর্ত্তীর গুপ্তচর বলে বদনাম রটে যায়। বিপ্লবী যুবকরা তাকে হত্যা করে পথের কাঁটা দূর করবার পরামর্শ করে। সুযোগও জুটে যায়। ঢাকা সদরে পুলিশকে তথ্য-সরবরাহ-মানসে সুকুমার—১৯১২ ফেব্রুয়ারী ১১-ই বাড়ী থেকে রওনা হয়, পরের দিন সহরে পৌঁছুবে। তার সে-ইচ্ছা আর পূর্ণ হয়নি। ১২-ই তারিখেই তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ একটা জনমানবহীন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

কুমিল্লা ঃ এসে জুটেছিল প্রথমদিকে, কিন্তু পরে দলত্যাগ করেছে, সেরূপ উদাহরণ অনেক ছিল। তাদের কোনও হানি হয়নি, সামান্য "ভীতু" নাম ছাড়া। যারা একেবারে ডিগবাজি খেয়ে পুলিশের কবলে গিয়ে পড়েছে, স্বভাবতঃই তাদের ওপর আক্রোশ পড়বার কথা।

ফেণীর অধিবাসী সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী এই দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত। একদিন বিপদ তার ঘনিয়ে এল। কয়েকটা দিন ধরে তার পাত্তা পাওয়া যায় না; আত্মীয় ও 'আপন জন' পুলিশ তার খোঁজ করতে লেগে গেল। জুনের মাঝামাঝি সারদার মুণ্ডহীন গলিত শব আবিষ্কৃত হ'ল। বেশ কিছুদূরে এক পুষ্করিণীর মধ্যে তার ছিন্নমুণ্ড পেয়ে বোঝা গেল এটি 'সমিতি'র প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা ঃ অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গোপন সংবাদ রাখা এবং গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ঢাকার এক হেড-কনষ্টেবল রতিলাল রায় কিছুদিন থেকে একটা নির্দ্দিষ্ট এলাকায় প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরে বেড়াতেন। পাঁচ দিন চৌকি দেবার পর রতিলাল ঊর্দ্ধতন অফিসারকে মহা আনন্দে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি কয়েকজন বিপ্লবীকে ঐ স্থানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন। মনে বড় আশা, এইবার একবার জালে ফেলতে পারলে একটা সুনাম হবে, ভাগ্য ফিরে যাবে।

এই অবস্থায়, ১৯১২ সেপ্টেম্বর ২৪-এ রতিলাল বিকালের দিকে ঢাকার গোপালনগর অঞ্চলে এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরুতে বেরুতে সওয়া সাতটা বেজে গেল। মন্থরগমনে রতিলাল বাড়ীর দিকে চলেছেন, এমন সময় মিনিট দশেকের মধ্যে পিছনদিক থেকে অজ্ঞাত আততায়ী ঝুলনবাড়ী লেনে রিভলভার দ্বারা মতিলালের পিঠে গুলি করে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর "স্বদেশী ডাকাত" ধরিয়ে দেবার কাজ চিরকালের জন্য মিটে যায়।

ষড়যন্ত্রের প্রসার

দুটি বিপ্লবী আস্তানায়—কুমিল্লায় ১৯১২ নভেম্বর ১-লা ও ঢাকার ওয়াড়িতে ১৯১২ নভেম্বর ২৭ তারিখে অস্ত্র-আবিষ্কারের ফলে গভর্ণমেণ্ট বেশ একটু বিচলিত হয়ে ওঠে। ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রায়ই এসে পৌছুচ্চে, তার মধ্যে আবার এতগুলি শিক্ষিত ও সরকারী উচ্চপদাধিকারী কর্ম্মচারীদের বাড়িতেও, অর্থাৎ কিনা "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা"য় হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য প্রস্তুতির অনুপ্রবেশ এখন খানিকটা নতুন সমস্য সৃষ্টি করেছে।

পূর্ববঙ্গের কয়েকটি বিপ্লব-অধ্যুষিত জেলায় জাঁদরেল পুলিশ কর্ম্মচারীরা মিলিত হলেন—১৯১৩ সালের একসময়। ভদ্রঘরের সন্তান কর্তৃক ডাকাতি ও খুনখারাপি ছিল আলোচ্য বিষয়। মারাত্মক ঘটনা ছাড়া, হস্তলিখিত বা মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রিকা অতি গোপনে প্রচার করার মধ্যে তাঁরা অতি সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় লক্ষ্য করেন এবং প্রায় হতাশভাবে বলেন যে, ধরপাকড়, জেল-জরিমানা এ-তরঙ্গ রোধ করতে পারছে না, বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপ সমানে অনুসৃত হচ্ছে ("The revolutionary

movement is active as ever"),—আর চলছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সমগ্র ঢাকা বিভাগ, খুলনা ও কলিকাতায়।

প্রশ্ন হ'ল, 'পার্টিশান' তো চলে গেছে এবং আশাও করা গিয়েছিল পূর্ব্ববঙ্গে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকাণ্ডে ভাঁটা পড়বে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলি সুসংবদ্ধ, আর সরকারী গুপ্ত-তথ্য-সংগ্রহের জন্য অতি দক্ষ এক বিভাগ বর্ত্তমান ("enquiries into these cases showed very clearly that a society possessing an excellent organisation coupled with a trained intelligence department is at work")।

সব বিচার করলে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, কেন্দ্রীয় এক সংস্থা সব পরিচালনা করছে। যুবকদের মধ্যে অসন্তোষ ও রাজানুগত্য বিলোপের চেষ্টা হচ্ছে অপর লক্ষ্য ("great efforts were being made to tamper with the loyalty of the youth of the country and to spread the spirit of disloyalty and anarchy among them")।

নূতন শাসন-ব্যবস্থা

যখন ১৯১১ ডিসেম্বর ১২-ই বাঙ্গলা, বিহার, ওড়িষ্যা এবং আসামের নব রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের কথা প্রচার করা হয়, তখন থেকে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ দেবার তোড়জোড় চলতে থাকে। কার্য্যতঃ পার্লামেণ্টে ১৯১২ জুন ২৫-এ নতুন বিল পাশ করার পর, আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন শাসন-ব্যবস্থা কার্য্যকর হয়। বাঙ্গলার লাট ও তাঁর শাসন-সভা, আইন-সভা ও সভ্য সব মিলে এক বিরাট সোরগোল গড়ে তোলেন। মডারেটরা বিশেষ আনন্দিত হন, কিন্তু উগ্রদল যে আর ক্ষান্ত হতে পারেননি তার প্রমাণের কোনও অভাব ছিল না।

ঐকতানে (১৯১৩)

বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ড পুরোদমে চলতে শুরু করেছে। ধরপাকড়, জেল, জরিমানা ও থানায় নির্ম্মম নির্য্যাতন হ'ল সহচর। তবুও বাঙ্গলার নানা স্থান থেকে ডাকাতি আর খুনখারাপির সংবাদও সরকারী দপ্তরে এসে পৌঁছচ্ছে। বোমার ব্যবহার ক্রমেই ব্যাপক হচ্ছে এবং তার ধ্বংসশক্তিও বহুল পরিমাণে যে বেড়ে গেছে, সে-সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট আর বিপ্লবীদল বেশ বুঝতে পেরেছে। বোমার মহিমা 'সন্ধ্যা' অনেক আগেই প্রচার করেছিল।

শ্রীহট্ট ঃ মৌলভীবাজার

১৯১৩ মার্চ ২৭-এ শ্রীহট্টের মৌলভীবাজারে বিপ্লব-সংগঠনের পক্ষে এক দারুণ বিপর্য্যয় ঘটে। রাত্রে বোমা-ফাটার এক বিরাট শব্দ শোনা গেল। সকালবেলা দেখা গেল মহকুমা হাকিম (S.D.O.) গর্ডনের উঠান-ঘেরা তারের বেড়ার ধারে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে আছে। চেনবার কোনও উপায় নেই ; পৈতা দেখে বোঝা গেল ইনি ব্রাহ্মণ-সন্তান। কাছে দুটো রিভলভার পড়ে আছে। কেবল যে একটি দুঃসাহসিক জীবন গেল তা নয়,—বহুব্যয়ে, বহুকষ্টে ও বিপদের বোঝার মধ্যে সংগৃহীত দু'-দুটো আগ্নেয়াস্ত্র পুলিশের কবলে পড়লো।

এই রিভলভার দুটোর মধ্যে একটার আবার একটু ইতিহাস আছে। ১৯০৬ জানুয়ারী ৩১-এ কলিকাতার কমিশনার-অফ্-পুলিশ পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করেন— ১৩-নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে অবস্থিত বন্দুক-বিক্রেতা 'ম্যাণ্টন কোম্পানী'র দোকান থেকে ১০টি রিভলভার ও একটি পিস্তল চুরি গেছে। তার মধ্যে একটি রিভলভারের নম্বর ছিল ১৯০৫০ ; নির্ম্মাতা 'ম্যাণ্টন কোম্পানী'। কেউ যদি ধরিয়ে দিতে পারে, তাকে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। 'ম্যাণ্টন কোম্পানী' অনুরূপ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কোনোটাই কাজে লাগেনি।

মৃত যোগেনের কাছে প্রাপ্ত দুটি রিভলভারের মধ্যে একটি ম্যাণ্টনের প্রস্তুত— নং ১৯০৫০, অর্থাৎ ১৯০৬ সালে অপহৃত একটি রিভলভার বিপ্লবীদের হাতে পড়েছিল। চোরাই মাল বাজারে বিক্রী হয়েছে এবং সতর্ক বিপ্লবীরা তার সন্ধান পেয়ে গোপনে একসময় কিনে রেখেছে।

যোগেনের বাড়ী ময়মনসিংহের বারহাটা থানার দিয়াপাড়া গ্রামে। তার অপর নাম হরেন্দ্রজীবন ঘোষ। তাকে সনাক্ত করা এবং তার গুপ্ত ইতিকথার বিবরণ দিতে

পারলে, ১৯১৩ আগষ্ট ১-লা তারিখের 'আসাম গেজেটে' পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ; কিন্তু টাকা নেবার যোগ্যতা কেউ অর্জ্জন করতে পারেনি।

গর্ডনের ওপর হামলার বিশেষ কারণ বিবৃত করা দরকার। সিলেটে আসবার আগে গর্ডন ছিলেন শিলচরে। সেখানকার 'জগৎসী আশ্রম' সম্বন্ধে হাকিম গর্ডনের কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে, ঐ আশ্রমটি মূলতঃ একটি বিপ্লবের কেন্দ্র। প্রচার হয়েছিল যে, মঠাধিকারী বলেছেন তিনি ইংরেজ-শাসন মানেন না। বলা বাহুল্য, এ সংবাদে গর্ডন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির বিক্রম বুঝিয়ে দেবার জন্য ফাঁক খুঁজতে থাকলেন।

একটা সুযোগ জুটে গেল। স্থানীয় কয়েকজন লোক পুলিশে রিপোর্ট দেয় যে, আশ্রমটা নানা কদাচারের কেন্দ্র এবং সেখানে একটি কিশোরকে বলপূর্ব্বক আটক রাখা হয়েছে। শেষের এ নালিশটা করে কিশোরটির দাদা। আশ্রমের নামে মামলা চলছে,—পরে দেখা গেল যে, মিথ্যা নালিশের অভিযোগে ঐ "দাদা" লোকটির কারাদণ্ড ঘটেছিল। এতে আশ্রমের দুর্নাম কেটে যায়।

"বন্দী" ছেলেকে আশ্রমের দূষিত আবহাওয়া থেকে উদ্ধার করার জন্য ১৯১২ জুলাই ৬-ই গর্ডন সদলবলে আশ্রমে খানাতল্লাসী চালাতে গেলে বাধা পান। সে-কারণে পরদিন (৭·ই) লাঠি ও বেয়নেট-ধারী পুলিশ নিয়ে আবার হাজির। তল্লাসীর নামে দানবীয় লীলা চলতে থাকে। জিনিসপত্র ভেঙ্গে-চুরে তছনছ করা হ'ল ; ঠাকুরঘর, রসুই-ঘর কিছুই বাদ গেল না। স্ত্রীলোকদের চুল ধরে আছড়ে ফেলে দেওয়ায় মাথা ফেটেছে, বিবস্ত্রা হয়ে পড়ে গেছে ; ঘর-দালানের মেঝেতে চাপ-চাপ রক্ত জমে গেছে। আশ্রমবাসীরা যাতে বুঝতে পারে ইংরেজ-রাজ সমান তেজে শাসন করছে, তার কোনও ক্ষয় হয়নি, সে-প্রমাণের কোনও ত্রুটি হ'ল না।

এতেও শেষ নেই। আশ্রমের এক সাধু, স্বামী যোগানন্দ (পূর্ব্বনাম মহেন্দ্রনাথ দে)-কে গুলিবিদ্ধ করা হয়। মহেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ· ও বি·এস্·-সি ডিগ্রীধারী। স্বদেশপ্রেম তাঁকে অধিকার করে ছাত্রাবস্থা থেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করে তিনি কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তাঁর উগ্র মত কর্ত্তৃপক্ষ বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি পদত্যাগ করে চলে যান।

কলিকাতা ত্যাগ করে তিনি হবিগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। তাঁর বাড়ী সিলেট-এর (শ্রীহট্ট) হবিগঞ্জে। তাঁর সংস্পর্শে এলে যুবকরা একটু অন্যরকম হয়ে যেত। কিংস্‌ফোর্ড-এর আদেশে বেত্রাঘাত-জর্জ্জরিত, আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী এবং প্রাগপুর ডাকাতি সম্পর্কে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত সুশীল সেনের তিনি শিক্ষক। হবিগঞ্জ বিদ্যালয় ত্যাগ করে তিনি 'জগৎসী আশ্রমে' যোগ দেন। ৭-ই থেকে ১৬-ই জুলাই পর্য্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে তিনি পরাজয় স্বীকার করেন।

বন্ধুবান্ধবের নিকট ইংরেজের অনাচারের বিরুদ্ধে বিরামহীন শত্রুতা করে যাবার নির্দ্দেশই হ'ল তাঁর শেষ অনুরোধ।

গর্ডনের প্ররোচনায় জগৎসী-আশ্রমের বিরুদ্ধে যে মামলা পরিচালিত হয়, তাতে সরকারপক্ষের চূড়ান্ত পরাজয় হয়।

গর্ডন গেলেন বদলি হয়ে। বিপ্লবীদের লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দেওয়াই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। এই একই উদ্দেশ্যে কিংস্‌ফোর্ডকে সরানো হয়েছিল কলিকাতা থেকে মজঃফরপুরে। সেখানে দুই তরুণের এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যোগেন্দ্রর অকালমৃত্যু ঘটে। যোগেন্দ্রর মৃত্যু সম্পর্কে অনেকরকম কল্পনা করা হয়। এটা ঠিক, যোগেন্দ্র প্রথমে গর্ডনের কোয়ার্টারে আসে; সেখানে তাঁকে না পেয়ে ইয়োরোপীয় ক্লাবে গিয়ে খোঁজ করায়, জানতে পারেন গর্ডন নিজ আবাসে ফিরে গেছেন। এ তথ্য পাওয়া যায় ক্লাবের এক বেয়ারার কাছ থেকে; তাকে সন্ধ্যার পর এক 'বাবু' এ-কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

যোগেন বিফল হয়ে গর্ডনের আবাসে এসে শ্রম ও সময় বাঁচাবার জন্যে তারের বেড়া টপকাতে গিয়েছিলেন। সেই সময় পায়ে তার আট্‌কে তিনি অকস্মাৎ পড়ে যান এবং সঙ্গে যে সাংঘাতিক বোমা ছিল সেটা বিদীর্ণ হয়ে যোগেন্দ্রর মৃত্যু ঘটায়।

নিজেদের সম্পূর্ণ গোপন রেখে এঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। যোগেন্দ্রর পরিচয় কেউ দিতে পারেননি। পরে অন্য এক মামলায় সরকারী সাক্ষীর মুখে এ-কথা প্রকাশ পায়।

এই গর্ডনকে ধাওয়া করে লাহোরে লরেন্স গার্ডেনে মারবার চেষ্টা হয়। পরিবর্ত্তে মরে এক চাপরাশী, আর তৎসংক্রান্ত মামলায় বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসী হয়। দীর্ঘজীবী গর্ডন সুস্থ শরীরে যথাকালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বরিশাল ষড়যন্ত্র

পর পর কয়েকটা ডাকাতি, যেমন—কাকুরিয়া (১৩.৪.১২), কুশাঙ্গল (১৭.৪.১২), বীরাঙ্গল (২৪.৫.১২) প্রভৃতি সংঘটিত হ'ল, অথচ তার কিনারা কিছুই করা গেল না, তখন যথানিয়মে বরিশালে এক বিরাট ষড়যন্ত্র মামলার তোড়জোড় চলতে লাগলো। ধরপাকড়ের আর অন্ত নেই, সন্দেহমাত্রেই এক এক করে জন-পঞ্চাশ "স্বদেশী"-ভাবাপন্ন যুবককে বিচারের যূপকাষ্ঠে ফেলবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'ল।

জাল গুটিয়ে আনবার শেষে, ১৯১৩ মে ২৬-এ মোট চুয়াল্লিশ জন আসামীকে এক স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট খাড়া করে প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ হয়েছিল, জুন ১৭-ই। তখন সাত জন পলাতক। হাকিম মোট আটাশ জনকে দায়রা সোপর্দ্দ করলেন এবং সে-মামলা শুরু হ'ল নভেম্বর ২১-এ। এর মধ্যে দায়রায় দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। টানাপোড়েনে দুশ্চিন্তা, অর্থনাশ, উকিল প্রভৃতির সাহায্যের অসুবিধার কথা

বিবেচনায় বড় ক'রে দেখা দেয়। ১৯১৪ জানুয়ারি ১৫-ই বারোজন আসামী অপরাধ স্বীকার করে নেন। ২২-এ তারিখে দু'জন এ্যাসেসর-সহ দায়রা-জজ চৌদ্দ জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত বারোজনের মধ্যে—

(১) রমেশচন্দ্র আচার্য্য (ওরফে কালিদাস রায়) ও (২) যতীন্দ্রনাথ রায় (ওরফে দেবেন্দ্রনাথ রায়, ফেগু, মাখন)—প্রত্যেকের বারো বছর দ্বীপান্তর ;

(৩) নিবারণচন্দ্র কর, (৪) যতীন্দ্রমোহন ঘোষ (ওরফে চন্দ্র, নসা), (৫) রোহিণী (ওরফে মণী) গুহ—প্রত্যেকের দশ বছর দ্বীপান্তর ;

(৬) প্রিয়নাথ আচার্য্য ও (৭) গোপালচন্দ্র মিত্র—প্রত্যেকের সাত বছর দ্বীপান্তর ;

(৮) কুমুদবন্ধু নাহা ও (৯) দেবেন্দ্রচন্দ্র বণিক্য—প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ;

(১০) শৈলেশমোহন মুখোপাধ্যায়, (১১) নিশিকান্ত ঘোষ ও (১২) চণ্ডীচরণ বসু—প্রত্যেকের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

কুমুদ নাহা ও দেবেন বণিক্য 'কুমিল্লা ডাকাতি'র জন্য প্রস্তুতি-মামলায় দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। বর্ত্তমান সাত বছর কারাদণ্ডের মধ্যেই অতিরিক্ত মেয়াদ লোপ করে ঐ দু'বছর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই মামলায় যে ক'জন পলাতক ছিলেন, 'বরিশাল অতিরিক্ত (supplementary) মামলা'য় দায়রা জজ ১৯১৫ নভেম্বর ২৯-এ একজনের ১৫ বছর ও চারজনের প্রত্যেকের ১০ বছর দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়। ১৯১৬ জুলাই ১৩-ই প্রদত্ত রায়ে দু'জন মুক্তিলাভ করেন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর ১৬ বছর দ্বীপান্তরের বদলে ১০ বছর করা হয়। মদন ভৌমিকের পূর্ব্ব-দণ্ড ১০ বছর দ্বীপান্তর বহাল থাকে। খগেন্দ্র চৌধুরীর ১০ বছর দ্বীপান্তর হ্রাস করে ৬ বছর করা হয়। 'বরানগর ডাকাতি মামলা'য় ১৯১৪ জুন ১৫-ই প্রদত্ত রায়ে তাঁর যে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ ছিল, বর্ত্তমান সাজা তার ওপর যোগ দিলে, তাঁরও মোট ৯ বছর কারাদণ্ডভোগ ঘটে।

চণ্ডীচরণ কর দোষ স্বীকার করলে, ১৯১৫ মে ৩০-এ, ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ লাভ করেন।

রাজাবাজার

রাজাবাজারে তৈরী বোমা খুব প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল ; যথাপরিমাণে পাওয়া যেত আর বিস্ফোরণ-শক্তিও ছিল প্রচণ্ড। এই বোমার পরিচয় ধরে পুলিশ প্রমাণ করে যে, কলিকাতা থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত বিপ্লবীদের একটা যোগসূত্র আছে। মাণিকতলা

বাগানে যে বোমা তৈরী হ'ত এর পাকা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সমস্ত বাগান তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করা হয়েছিল, অস্ত্রশস্ত্রও ধরা পড়ে অনেক, কিন্তু বোমার খোল পাবার সংবাদ নেই। হেমচন্দ্র কানুনগো ও উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈরী করতেন আর তখন বোমা হ'ত চন্দননগরে। মনে হয়, রাজাবাজারের বোমা সবাইকে সবরকমে টেক্কা দিয়েছিল।

বাড়ীটা ২৯৬।১-নং আপার সার্কুলার রোডে (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সরণী)। কয়েকজন যুবক সেখানে বাস করে; বাইরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ খুব কম। ১৯১৩ নভেম্বর ২১-এ বাড়ীটার ওপর পুলিশ-হামলা হয় এবং বাড়ীর প্রত্যেক অংশে জোর খানাতল্লাসী চলে। দেখা গেল এ-স্থানটি বোমা-তৈরীর এক বিরাট কারখানা। সেখানে মালমশলা, তৈজস এবং বোমা-তৈরীর অন্যান্য উপকরণ প্রচুর। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-শক্তি-সম্পন্ন বোমা-তৈরীর ফর্ম্মুলা এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, বই ইত্যাদি, অর্থাৎ কোনও কিছুরই অভাব নেই।

ধরপাকড় শুরু হয় "কারখানা"র ভেতর থেকে এবং বাইরেতেও বেশ কিছু; তার মোট সংখ্যা শীঘ্রই ত্রিশ অতিক্রম করে গেল। কয়েদীদের পুলিশ-হাজত-বাস হ'ল তো বটেই, উপরন্তু পুলিশের প্রায় দিবারাত্র প্রশ্নবাণ চললো।

এ পর্ব্ব সারা হলে, আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে নভেম্বর ২৫-এ জন-চারেক, এবং আর দু'জনকে ২৮-এ আসামী করে হাজির করা হয়। মামলা বিস্ফোরক আইন (Amended Explosive Substances Act IV of 1909) অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর ১৯১৪ মার্চ ১০-ই মামলা দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়। সেসন আরম্ভ হয় মার্চ ৩০-এ এবং রায় প্রদত্ত হয় জুন ৯-ই। তাতে অমৃত, ওরফে শশাঙ্ক হাজরার পনেরো বছরের দ্বীপান্তরের এবং সঙ্গের আসামী পাঁচজনের দশ বছর হিসাবে দ্বীপান্তর আদেশ হয়। এর ওপর ষড়যন্ত্র অপরাধে পাঁচজনের মধ্যে দু'জনের প্রত্যেকের আর দশ বছর সমকালীন-ভোগ দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

মামলা হাইকোর্টে আপীলে গেলে, ডিসেম্বর ৭-ই শুনানি আরম্ভ হয়। ১৯১৪ ফেব্রুয়ারী ২৫-এ অমৃত হাজরার পনেরো বছর দ্বীপান্তরের আদেশ বহাল থাকে। অপর সকলে কপালগুণে মুক্তিলাভ করেন।

ঘটনা-প্রবাহ

ঢাকা ঃ ভরাইকর— বিপ্লবীদের অর্থের প্রয়োজনের অন্ত নেই, আর ডাকাতি 'অগতির গতি'। ১৯১৩ ফেব্রুয়ারী ৪-ঠা ঢাকার টঙ্গিবাড়ী থানার ভরাইকর গ্রামে পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত এক সাব-ইন্সপেক্টর কালীপ্রসন্ন মল্লিকের বাড়ীতে ডাকাতিতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা খোয়া যায়। কয়েকজনকে ধরপাকড় করে একটা মামলা খাড়া করা হয়। তাতে মাত্র একজনের দু'বছরের কারাদণ্ড ঘটে।

ময়মনসিংহ : ধূলদিয়া— লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ-খুনও হয়েছে। নিরীহ অজ্ঞ গ্রামবাসী প্রতিবেশীর সাহায্যে এসে প্রাণ দিয়েছে। তারা দেশোদ্ধারের কাজে কোনোরূপ প্রতিবাদক হচ্ছে এ-কথা মনে করেনি। এসেছে সামাজিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে। ময়মনসিংহের কাটিয়াদি থানার ধূলদিয়া গ্রামে মোহিনীকিশোর সাহার বাড়ীতে ফেব্রুয়ারী ৪-ঠা, রাত্রি ১১-টা নাগাদ জন-বারো যুবক চড়াও হয়। চীৎকার শুনে গ্রামবাসীরা এসে পড়ে। ধরা পড়ার সম্ভাবনায় লুণ্ঠনকারীরা রিভলভার ও বোমা ছোড়ে। প্রতিবেশীদের একজন ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং আরও তিনজন গুরুতররূপে আহত হয়। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ন'হাজার টাকা।

ঢাকা : আলিমুদ্দি— ঢাকার নারায়ণগঞ্জ থানার আলিমুদ্দি গ্রামে, ১৯১৩ মার্চ ৩১-এ, গৌর সাহার বাড়ীতে ডাকাতি হয়। দশ-বারোজন লোক রাত্রি দু'টার সময় গিয়ে হাজির হয়। বিদায়ের সময় গোটা পঞ্চাশ টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আসতে হয়। ভুল সংবাদ ছিল এই ডাকাতির মূলে।

ফরিদপুর : গোপালপুর ও কাওয়াকুরি— মাদারিপুর থানা এলাকায় দুটি ডাকাতি সংঘটিত হ'ল পর পর দু'মাসে। ১৯১৩ এপ্রিল ৩-রা মধ্যরাত্রিতে একদল যুবক রামমোহন কুণ্ডুর বাড়ীর সদর দরজা ভেঙ্গে বাড়ীতে ঢুকে টাকা লুঠপাট করে।

পরের মাসে, মে ২৯-এ কাওয়াকুরি গ্রামে পূর্ণচন্দ্র নাহার বাড়ীতে ৩০।৪০ জন লোকের একদল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চড়াও হয়। "হর হর, বম্ বম্" বলে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ বরে। বিশেষ প্রতিরোধ হয়নি। হাজার-পাঁচেক টাকা পাওয়া গিয়েছিল।

এই দুই ডাকাতি জড়িয়ে 'মাদারিপুর ষড়যন্ত্র মামলা' খাড়া করা হয়। এক-পাল স্কুলের ছেলে আর বাইরের জন-ত্রিশকে ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। আসামীদের মধ্যে বঙ্গমায়ের তিন ত্যাগী বীর—চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তও ছিলেন।

সংখ্যায় ৪৬ জন আসামীকে চালান দেওয়া হয়। দু'দফায় মোট দশ জনকে মুক্তি দিয়ে, ছত্রিশ জনকে নিয়ে মামলা শুরু হ'ল ১৯১৪ জানুয়ারী ২৬-এ। পরেই ফেব্রুয়ারী ১৪-ই মামলার দিন, আসামী-সংখ্যা কমে দাড়াল পঁচিশ। একদিকে হাজতে আসামীদের দিন কাটছে, অপরদিকে পুলিশ মামলা গুছিয়ে তুলতে চেষ্টা করে চলেছে। শেষ পর্য্যন্ত সাক্ষী-প্রমাণ-সংগ্রহে হতাশ হয়ে, এপ্রিল ২০-এ সকল আসামীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

ঢাকা : কামরাঙির চর— রূপগঞ্জ থানার কামরাঙির চর এক ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে জানকীনাথ পোদ্দারের বাস। ঘটনা হ'ল—রাত সাড়ে দশটা নাগাদ, ১৯১৩ জুন ২৮-এ ; প্রাপ্তির পরিমাণ সওয়া দু'হাজার টাকা।

২৪-পরগণা ঃ চাত্রাবারিয়া— খগেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ী থেকে ১৯১৩ নভেম্বর ৭-ই জনকয়েক লোক ভয় দেখিয়ে হাজারখানেক টাকা নিয়ে পালায়।

ময়মনসিংহ ঃ কেদারপুর— খুনখারাপির জন্য 'কেদারপুর ডাকাতি'তে খুব বদনাম হয়েছিল। নগরপুর থানা এলাকায় কেদারপুর গ্রাম। সন্ধ্যার কিছু পরে, সাড়ে আটটা নাগাদ, ১৯১৩ আগষ্ট ১৬-ই, ধনী জমিদার আশুতোষ সাহা তাঁর নায়েব ও তহবিলরক্ষক (cashier)-কে নিয়ে বসে আলাপ করছিলেন। এমন সময় অতর্কিতে জন পঁচিশ যুবক এসে উপস্থিত। ভয় দেখিয়ে তারা সিন্দুকের চাবী আদায় করে; তার পর লুণ্ঠন চলতে থাকে। ফলে ডাকাতরা প্রায় বিশ হাজার টাকা নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে একখানি নৌকায় চড়ে তারা চম্পট দেয়। রাত্রের চৌকিদার গড়ু সেখ ডাকাতদের গুলিতে প্রাণ হারায়। তা'ছাড়া জন-পাঁচেক গ্রামবাসী গুলির দ্বারা কম-বেশী আহত হয়েছিল।

ময়মনসিংহ ঃ সরারচর— বাজিতপুর থানার সরারচর (কমলপুর) গ্রামে দ্বিতীয় দফা ডাকাতি সংঘটিত হয়—১৯১৩ নভেম্বর ২৪-এ; প্রথমবার হয়েছিল— ১৯১১ জুলাই ২৭-এ। এবার দুর্ভোগে পড়লেন মোহনকিশোর বণিক্য। মারাত্মক অস্ত্র দেখিয়ে লুণ্ঠন-কার্য্য সম্পাদিত হয়। ডাকাতদের হাতে আন্দাজ সাড়ে চার হাজার টাকা পড়ে।

ত্রিপুরা ঃ খারামপুর— দ্বারিকানাথ গোপের বাড়ী ব্রাহ্মণবেড়িয়া থানার খারামপুর গ্রামে। ১৯১৩ ডিসেম্বর ৩-রা জনকয়েক যুবক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা করে এবং ছ'হাজারের মত টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

ত্রিপুরা ঃ পশ্চিমশিং— কোতোয়ালী থানা এলাকায় অখ্যাত এক গ্রাম পশ্চিমসিং। সেখানেও লুঠেরাদের নজর পড়লো রামসুন্দর নাথ ও যদুচন্দ্র নাথের বাড়ী দুটির ওপর, ১৯১৩ ডিসেম্বর ১৯-এ। যুবকদের দলে ছিল ত্রিশজনের ওপর। রামসুন্দরের বাড়ী থেকে তিন হাজার টাকার মত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বাড়ীতে বিফল হানা দেওয়া হয়েছিল।

ভদ্রেশ্বর ঃ ভদ্রেশ্বর থানার কোনও ক্ষতি হয়নি, যদিও ১৯১৩ ডিসেম্বর ৩০-এ তার ওপর একটা বোমা পড়েছিল। নিতান্ত থানার ওপর বোমা বলে খবরটা একটু ফলাও হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তা না হলে কোনও সোরগোল উঠত না।

প্রতিশোধ

বেছে বেছে নানা স্থানে গোপনে শত্রু-নিপাতের ব্যবস্থা হয়েছে। মৃত বা আহত মোটামুটি পুলিশ ও গুপ্তচর। বলা বাহুল্য, প্রকাশ্য পুলিশের চেয়ে গুপ্তচরের ওপর বিপ্লবীদের রাগ ছিল বেশী।

মেদিনীপুর : মেদিনীপুরের আবদর রহমানের ওপর বিপ্লবীদের প্রচণ্ড আক্রোশ। কিন্তু খোদাতালার মর্জি অন্যরূপ, অদৃশ্য থেকে তাঁকে রক্ষা করে যাচ্ছেন। ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে, ডিসেম্বর ১৩-ই তাঁর বাড়ীতে একবার বোমা ফেলা হয়, কিন্তু রহমানের কোনও ক্ষতি হয়নি ; হয়তো কিছু লাভই হয়ে থাকবে সরকারী দয়ায়। বিপ্লবীরা এতে নিরুৎসাহ হননি। ১৯১৩ ডিসেম্বর ৯-ই, রহমান-সাহেব মহরমের মিছিলের সঙ্গে যাচ্ছিলেন—একটা বোমা এসে পড়লো তাঁর কাছে। ভাগ্যগুণে এবারও তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেন।

বাজিতপুর : এখানে ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তাঁকে পুলিশ গুপ্তচররূপে ব্যবহার করবার ব্যবস্থা করে। খবরটা বিপ্লবীদের কাছে চাপা থাকেনি। ফলে, ১৯১৩ ডিসেম্বর ১৯-এ ময়মনসিংহের সসেরদীঘি অঞ্চলে তাঁকে হত্যা করা হয়। কেউ ধরা পড়েনি।

ঢাকা : 'ঢাকা সমিতি'র সভ্য বলে পরিচয় দিয়ে বেড়াতেন দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ। ১৯১২ নভেম্বর মাসে এক স্বর্ণকারের বাড়ী ডাকাতি হয় ; সে-সম্পর্কে যাঁরা ধরা পড়েন, তার মধ্যে দেবেন্দ্রও ছিলেন। আত্মীয় কর্ত্তৃক প্রভাবিত হয়ে তিনি সহ-আসামীদের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি করেন। তিনি যে কুমিল্লার ডাকাতি সম্পর্কে গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন, সে-কথাও প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ, ১৯১৩ জানুয়ারী ১৪-ই, যখন একলা আনন্দ-মোহন নাহার বাড়ীর সামনে এসেছেন তখন অতর্কিতে চার-পাঁচজন লোক তাঁকে আক্রমণ করে। তাঁর দেহে প্রায় দশ জায়গায় ক্ষত ছিল। তার মধ্যে রিভলভারের গুলির আঘাতও ছিল। ঘটনাস্থলেই দেবেনের মৃত্যু হয়।

কলিকাতা : কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তির কাছে দাঁড়িয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধি লক্ষ্য করার ভার হরিপদ দে-র ওপর পড়েছিল। হরিপদ ছিলেন গুপ্ত-পুলিশ-বিভাগের এক কনষ্টেবল। এভাবে বেশ কিছুদিন চলছে,—কিন্তু তিনি যে বিপ্লবী-দলের লক্ষ্যস্থল হয়েছেন এবং তাঁর ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে, এ বিষয় তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। ১৯১৩ সেপ্টেম্বর ২৯-এ, তিনজন যুবক পশ্চিমের গেট দিয়ে প্রবেশ করে হরিপদর প্রতি পর পর তিনটি গুলি ছোড়ে ; তৃতীয় গুলির আঘাতে হরিপদর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শবব্যবচ্ছেদে দেখা গেল দুটি গুলি তাঁর দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত, আর তৃতীয় গুলি তাঁর দক্ষিণ কণ্ঠার হাড় ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহ রেল-ষ্টেশনের সন্নিকটে সি.আই.ডি. পুলিশের ইন্সপেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীর বাসা। ১৯১৩ সেপ্টেম্বর ৩০-এ, সান্ধ্যভ্রমণ সেরে,

বঙ্কিমচন্দ্র আরামে বসে হুঁকার সাহায্যে গভীর মৌতাতে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ একটা পিক্‌রিক-এ্যাসিড-বোমা তাঁর সামনে এসে পড়ে বিরাট শব্দে ফেটে গেল। বোমার টুকরায় বঙ্কিম গুরুতরভাবে আহত হয়ে ঘটনাস্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঢাকা ঃ পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে ১৯১৩ নভেম্বর ১৬-ই ঢাকার বাঙ্গলা-বাজারের কাছে বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্যকে গুলি মেরে হত্যা করা হয়। বসন্ত 'বাজিতপুর মামলা'য় এক বছর জেলও খেটেছিলেন। পরে মোহে পড়ে গোপনে বন্ধুদের খবর নিয়ে পুলিশকে যোগাতেন।

বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় (১৯১৪—১৯১৬)

অস্ত্র-সংগ্রহ

বিপ্লবাত্মক কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমে বিস্তারলাভ করে চলেছে। মোটামুটি পন্থা একই, ইতর-বিশেষ লক্ষ্য করবার মত কিছু নয় ; পরিবর্ত্তনের আভাষ সুস্পষ্ট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটবার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিল ; জার্ম্মানীর বলসঞ্চয় ও তার প্রয়োগ-চেষ্টায় ব্রিটেন ভয়গ্রস্ত। কূটনীতি-চালে ইংরেজ দল পরিপুষ্ট করে চলেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র, বিশেষতঃ জার্ম্মানীর ভয়ে সন্ত্রস্ত রাজন্যবর্গের সঙ্গে গোপন আলোচনা অবিরাম চলতে শুরু হয়েছে।

বাঙ্গলার বিপ্লবী-চিন্তানায়করা ভারতের বাইরে বিপ্লব-কেন্দ্র গঠন করে বিদেশী শক্তির সাহায্যলাভের চিন্তা এর কিছু আগে হতেই আরম্ভ করেছিলেন। বাঙ্গলার বিপ্লবচিন্তা শিকড় গেড়ে বসবার পর যে-সকল ছাত্র উচ্চশিক্ষা-লাভার্থ ১৯১১ সালের আগেই বিদেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের কারও কারও মনে এ-চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল। জার্ম্মানীর মতিগতি তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি এবং নিজেদের উদ্দেশ্য-সাধনের উপযুক্ত সুযোগ তাঁরা খুঁজছিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ব্যাপারটা খুব বেশী গড়াতে পারেনি। তবে ভারত-জার্ম্মান যোগাযোগের কথা স্বতন্ত্রভাবে বিবৃতি করার প্রয়োজন।

অন্য দিকের কথা। বাঙ্গলার বুকে কলিকাতায় বসে বড়-দরের অস্ত্র-সংগ্রহের কথা এক অভাবনীয় ব্যাপার। চন্দননগরের ভেতর দিয়ে অস্ত্র-আসা প্রায় বন্ধ। পুলিশের তৎপরতায় অপরিহার্য্যরূপে দু'-একটি অস্ত্র ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া হচ্ছিল। তার ওপর ছিল খানাতল্লাসীর উপদ্রব। রিভলভার-সংগ্রহ ক্রমেই দুষ্কর হয়ে উঠলো। খালি বোমার ওপর নির্ভর করা যায় না, কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে তার শেষ ফল অনেকসময় নির্ভরযোগ্য নয়।

তখন বৌবাজারের মলঙ্গা লেনের ছোট একদল বিপ্লবী বিষম বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এক নতুন পন্থা অবলম্বন করেন। গভর্ণমেণ্ট বলতে বাধ্য হয়েছে—"an event of the greatest importance in the revolutionary crime of Bengal"। ঘটনাটি প্রায় সিনেমার ফিল্ম বললেই হয়।

কলিকাতার এক খুব বড়-দরের আগ্নেয়াস্ত্র-আমদানীকারক—আর. বি. রডা কোম্পানী ; ২-নং ওয়েলেস্‌লি প্লেসে তাদের অফিস। তাদের অন্যান্য কর্ম্মচারীর মধ্যে ছিলেন বৌবাজারের ১৪-নং শ্রীনাথ দাস লেনের শ্রীশচন্দ্র মিত্র, ওরফে "হাবু"।

চাকুরির সন্ধান করতে করতে, বাঙ্গলার বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণে, ১৯১৩ সালের আগষ্টে হাবু মাসিক ১৬৲ (ষোলো টাকা) বেতনে 'রডা কোম্পানী'র কাজে নিযুক্ত হন। কাজ হ'ল—কাষ্টম্‌স্‌ অফিস থেকে কোম্পানীর পক্ষে আমদানী মাল খালাস করা। হাবুবাবুর অফিসের পরিচয় "কাষ্টম্‌স্‌ সরকার"।

বন্দুক-গুলি-বারুদ আমদানী করা যাদের ব্যবসা, তাদের হামেশাই বিদেশ (অর্থাৎ ব্রিটেন) থেকে মাল আমদানী করতে হয়। এবারও তাই নতুন কিছু নয়। তিব্বতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে ১৯১৪ জুন ২৩-এর এক অর্ডার পেয়ে, 'রডা কোম্পানী' তাদের বারমিংহ্যামে অবস্থিত অফিসে মাল-সরবরাহের জন্য নির্দ্দেশ দেয়। 'হোর মিলার কোম্পানী'র ট্যাক্‌টিসিয়ান (Tactitian) নামক জাহাজে পেটিতে ভরে মাল এলে, আগষ্ট ২১-এ ২০২ পেটি লরীতে চাপিয়ে সরকারী গুদামে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং আমদানীকারক 'রডা কোম্পানী'কে যথারীতি খবর দেওয়া হয়। তখন কাষ্টম্‌স্‌-সরকারের ওপর মাল-খালাসের হুকুম হ'ল এবং সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রও হাবুবাবু বুঝে নিলেন। আগষ্ট ২৬-এ শ্রীশচন্দ্র রওনা হলেন দোদুল্যমান হৃষ্টচিত্তে।

সমস্ত মাল নিয়ে আসতে সাতখানা গরুর গাড়ীর প্রয়োজন। পূর্ব্ব-পরিকল্পনামত ছ'খানা হ'ল বাইরের সাধারণ-ভাড়া-খাটা গাড়ী আর শেষখানি নিজেদের গাড়োয়ান-চালিত স্বতন্ত্র একখানি। তার চালক হলেন শ্রীহরিদাস দত্ত। (ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ঃ 'সবার অলক্ষ্যে', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯)

শ্রীশ মিত্র মহাশয় রওনা দিলেন গাড়ীর শোভাযাত্রা করে। অস্বাভাবিক কিছুই নয়। ছ'খানা গোযান ১৯২ পেটি মাল নিয়ে ভান্সিটার্ট রো-তে কোম্পানীর গুদামে এসে পৌঁছুলো; আর সপ্তমখানা উধাও হ'ল, সঙ্গে শ্রীশ মিত্র মহাশয়ও।

এই পিস্তল-চুরির খবর জানাজানি হলে, গভর্ণমেণ্ট কয়েকজনকে ধরে দুটো মামলায় আসামী খাড়া করে। গোড়ার দিকে বন্দুক-চুরি-সংক্রান্ত মামলায় সাক্ষী দিতে গিয়ে পুলিশ এরসাদ দোসাদকে সপ্তম গোযানের চালকরূপে হাজির করে। সে তার জবানবন্দীতে বলে যে, কাষ্টম্‌স্‌ গুদাম থেকে মাল-বহনের আশায় সে নিকটেই প্রায় অপেক্ষা করে। ঘটনার দিন তার গাড়ীতে দশ পেটি মাল চাপিয়ে, সরকারবাবু সঙ্গে সঙ্গে এসে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস ('বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ'-এর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ) আর 'পেপার কারেন্সী'-র (তার মতে "ব্যাঙ্ক"-এর) কাছে অপেক্ষা করতে বলেন। তারপর ওয়েলিংটন (রাজা সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারে জলকল (water-works)-এর দিকে যেতে বলেন। গাড়ী সেখানে পৌঁছুলে, জলকলের পশ্চিমে অবস্থিত এক লোহা-লক্কড়ের দোকানের বড় উঠানে সরকারবাবু ও আর-একজন গাড়ী থেকে মালগুলি ঠেলে মাটিতে নামালে, তার গাড়ী খালাস হয়ে যায়। এক টাকা মজুরি পেয়ে সে বিদায়গ্রহণ করে। শ্রীশচন্দ্রের ভালরকমই জানা ছিল এই কয় পেটিতে পঞ্চাশটি মসার (Mauser)-পিস্তল ও ·৩৫০ মাপ নল-যুক্ত বন্দুকের ছে'চল্লিশ হাজার কার্ত্তুজ রয়েছে। এই পিস্তলগুলির

সুবিধা ছিল যে, এদের আধার যে-বাক্সটা সেটাকে পিস্তলের বাঁট হিসাবে জুড়ে নিলে, সেটি দূরপাল্লার রাইফেলের মত কাঁধের ওপর রেখে, লক্ষ্যে গুলি নিক্ষেপ করা যায়। 'সিডিশন কমিটী'র রিপোর্ট (পৃঃ ৬৬) অনুযায়ী ঃ

"The pistols were so constructed and packed that by attaching to the butt of the box containing the pistols, a weapon was produced which could be fired from the shoulder in the same way as a rifle."

লোহার দোকানের উঠান থেকে ঠিকা-ঘোড়ার-গাড়ী করে পঞ্চাননতলা ও পরে জেলিয়াপাড়ায় পৌঁছিলে, সব পেটিকে নামিয়ে স্বতন্ত্র দু'-তিন পেটি ভাগে অন্যত্র পাচার করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন বলে অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভুজঙ্গভূষণ ধরের নাম পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই চক্রান্তের পিছনে ছিলেন আরও কয়েকজন বিপ্লবী। তাঁদের কারও কারও পরিচয় মামলার আসামী হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। আবার কেউ কেউ একেবারে গায়েব হয়েছিলেন। তন্মধ্যে ১-নং নিতাই বাবু লেনের শ্রীশচন্দ্র পালের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপে রডা-বন্দুক-চুরি গুরুত্ব হিসাবে স্বল্পমেয়াদী হলেও, আসামীদের দণ্ডের পরিমাণ এখানে উল্লেখ থাকার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

বুধবার, আগষ্ট ২৬-এ, মাল পোর্ট-গুদাম থেকে বেরিয়ে ভান্সিটার্ট রো-তে কোম্পানীর গুদামে পৌঁছেচে ; কেবল দশ পেটি কম। কোম্পানীর কর্ত্তারা তিন দিন অপেক্ষা করে, শনিবার (২৯-এ) ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট থানায় চুরির খবর জানালে, পুলিশ-মহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তিন দিনের অবসর বিপ্লবীদের পক্ষে মহা সুযোগ উপস্থিত করেছিল।

হাবুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুলো সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫১২ ধারা মতে। হাবু তখন যাকে বলে "পগার পার"। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ১৯১৪ সেপ্টেম্বর ৫-ই—(১) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩৯-নং মলঙ্গা লেন ; (২) কালিদাস বসু, ৭-নং হালদার লেন ; (৩) গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪।৩-নং মলঙ্গা লেন ; (৪) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪।৩-নং মলঙ্গা লেন ; (৫) ভুজঙ্গভূষণ (দাস) ধর ও (৬) বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, ২৭।১-নং শিবনারায়ণ দাস লেন—এঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের নানা ধারা (খুনের জন্য প্রস্তুতি, বিশ্বাসভঙ্গ) মতে মামলা রুজু হয়। সরকারী সাক্ষীর জবানবন্দী সওয়াল হয়ে যাবার পর বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অক্টোবর ৯-ই মামলা প্রত্যাহৃত হয়।

অপরদিকে অক্টোবর ২০-এ এক মামলা দায়ের হয়—৪৬-নং বৈঠকখানা রোডের হরিদাস (ওরফে কুঞ্জ, ওরফে অতুল্য) দত্ত, আশুতোষ রায়, প্রভুদয়াল মাড়োয়ারী

ও উপেন্দ্রনাথ সেনের বিরুদ্ধে। হরিদাসকে, ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করা ছাড়া, অস্ত্র-আইনে স্বতন্ত্র এক মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। এখানে প্রভুদয়াল ও উপেনকে মুক্তি দেওয়া হয়। অভিযোগের কারণ একই হওয়ায়, ১৯১৪ অক্টোবর ২০-এ দুই মামলাই একসঙ্গে যুক্ত হ'ল। ১৯১৫ মার্চ ৩০-এ অনুকূল, গিরীন ও আশু রায়কে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাঁরা মুক্তি পেলেন। আর হরিদাস, কালিদাস, নরেন ও ভুজঙ্গ এঁদের প্রত্যেকের দু'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হরিদাসকে দ্বিতীয় মামলায় মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টের আপীলে ১৯১৫ আগষ্ট কালিদাস, নরেন ও ভুজঙ্গর সাজা বজায় থাকে। হরিদাসের সাজাটা, ১৯১৬ জানুয়ারী ১৩-ই, কমিয়ে এক বছর সাত মাস করা হয়। কিন্তু সরকারপক্ষ হরিদাসের দ্বিতীয় মামলায় নির্দ্দোষিতার বিপক্ষে আপীল করে, ১৯১৫ জানুয়ারী ১৪-ই। হাইকোর্ট পুনর্বিবচারের আদেশ দেয়—মে ২৫-এ। ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে আগষ্ট ৩১-এ পুনরায় দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডভোগের নির্দ্দেশ ছিল, অর্থাৎ মোট তিন বছর সাত মাস, আর সমস্ত বিচারের কালটা 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি' বলে ধরে নিয়ে সান্ত্বনালাভ করতে হয়।

শ্রীশচন্দ্র প্রথমে আশ্রয় নেন রংপুরের নাগেশ্বরী গ্রামে। সেখান থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তখন তো অনুসন্ধান ভাল করে হয়ইনি। পরের কোনও চেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ায়, মনে করতে হয়, হাবু দেশমাতৃকার আপ্রাণ সেবায় যশের কোনও আকাঙ্ক্ষা না-রেখেই নিঃশেষে প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে অগণিত দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা লাভ করছেন।

'রডা'র মাল চলে গেল বাঙ্গলার জেলায় জেলায়। তখন আর দল বিচার করার সময় ছিল না। হয়তো প্রয়োজনবোধও হয়নি। বড় বড় কর্ম্মকেন্দ্র, যাদের হাতে গুরু কর্ত্তব্য ন্যস্ত আছে, তাদের সবাই দু'-পাঁচটা পিস্তল ও উপযুক্ত-সংখ্যক কার্ত্তুজ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। অন্ততঃ নয়টি গ্রুপের হাতে যে পড়েছিল সে-প্রমাণের অভাব নেই। পরে অন্ততঃ চুয়ান্নটি ডাকাতি ও খুনের ব্যাপারে 'মসার-পিস্তল' ব্যবহৃত হয়েছে। বিপ্লবীদের দুর্ভাগ্য, ১৯১৭ মে মাসের মধ্যে ২৬,৬৯২-টি তাজা ও ১০৭-টি ব্যবহৃত কার্ত্তুজ (তন্মধ্যে ১৯১২ সেপ্টেম্বর, ২৯-এ শিবঠাকুর লেন থেকে ২৮,০০০ 'মসার-কার্ত্তুজ'), ৩১টি পিস্তল পুলিশের হাতে পড়ে। কিছু বে-হাতে পড়ে এবং হেপাজতকারী পুলিশের ভয়ে জলে ফেলে বা অন্যরকমে নষ্ট করে দেয়।

'কোমাগাটা মারু'

ভারতের সমুদ্র-উপকূলে অসংখ্য জাহাজ এসেছে, গেছে। তাদের নাম আজ আর কারও মনে নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু 'কোমাগাটা মারু' নামটি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকাল জ্বলজ্বল করতে থাকবে। ঘটনাটা

বাঙ্গলার সঙ্গে বিশেষ জড়িত নয়, কিন্তু তার যাত্রীদের রক্তে বাঙ্গলার মাটী লাল হয়েছিল একদিন এবং সে-দিনটি প্রতি বাঙ্গালী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

ভারতীয় বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, আমেরিকা, মধ্য-ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে অল্প-বিস্তর মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তার বহিঃপ্রকাশের প্রদীপ্ত চিহ্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়ে গেছে। কানাডা এই প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। সেখানে শিখ অধিবাসী ছিল অনেক, এবং বহু বৎসর ধরে তাদের মধ্যে গদর-বীজ উপ্ত হয়েছে আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে। গদর-পার্টির প্রচার কানাডার শিখদের মধ্যেও বিপ্লবী মন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল, আর এর সঙ্গে যোগ হয়ে ছিল কানাডা সরকারের আচরণ। কেবল ভারতীয় হওয়ার অপরাধে তাদের নানারকম অবিচার ও অসম্মানকর আচরণ সহ্য করতে হ'ত, এবং তার সঙ্গে জাতি হিসাবে নিকৃষ্টতার অপবাদ দিয়ে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ছিল কানাডা সরকারের বিশেষ পরিচয়।

উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা ক্রমে চেপে আসতে থাকে এবং কোনও ভারতীয় আর কানাডায় যাতে প্রবেশ করতে না পারে, সেরূপ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। কানাডা-বাসী শিখরা এর প্রতিকারের চেষ্টা করে বিফল হলে, ভ্যাঙ্কুভারে তারা দলবদ্ধ হয়ে যথাবিধি ব্যবস্থা-গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়।

কানাডা সরকার একটু বিচলিত হয়ে শিখদের দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য নানারূপ অসাধু পন্থা অবলম্বন করতে চেষ্টা করে। এধারে ১৯১০ মে ৯-ই তারা এক আইন পাশ করে, যার ফলে কানাডা-বাসে অভিলাষী প্রত্যেক ভারতীয়কে দুই শত টাকা নগদ সঙ্গে করে আসতে হবে এবং তার নিজ দেশ থেকে এক-টিকিটে সরাসরি জাহাজে এসে কানাডা পৌঁছুতে হবে ; পথে এসব যাত্রীর ওঠা-নামা চলবে না। সকলেই জানতো যে, ভারতবর্ষ থেকে ছেড়ে কোনও জাহাজ পথে না থেমে সরাসরি কানাডা যায় না।

পাঞ্জাবীরা তখন বিশেষ অসুবিধায় পড়ে যায়। এ-সময় মালয় সিঙ্গাপুরের ধনী কণ্ট্রাক্টর গুরদিৎ সিং 'কোমাগাটা মারু' নামে এক জাপানী জাহাজ কিনে, তাতে ৩৭২ জন যাত্রী নিয়ে কানাডায় ভ্যাঙ্কুভারে পৌঁছান, ১৯১৪ মে ২৩-এ। কানাডা গভর্ণমেণ্ট নিজ সৈন্য দিয়ে জাহাজখানা ঘিরে ফেলে যাত্রীদের অবতরণে বাধা দেয়। প্রায় দু'মাস এ-অবস্থায় থাকার পর কানাডা থেকে জবরদস্তি জাহাজকে কানাডার বন্দর-ত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা হয়। দুই দলের সংঘর্ষ তখন অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। শিখদের মারমুখী ভাব দেখে শক্তের ভক্ত কানাডা-সরকার খাদ্য ও পানীয় দিয়ে 'কোমাগাটা মারু'কে ভিন্ন স্থানে যাবার অনুরোধ জানায়।

জাহাজ ভ্যাঙ্কুভার ছাড়ে, ১৯১৪ জুলাই ২৩-এ। পরে পরে হংকং, কোবে,

ইয়োকোহামা প্রভৃতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কোথাও যাত্রী নামতে দেওয়া হ'ল না। ভয়ানক গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠলে, ইংরেজ-পরিচালিত ভারত-সরকার জাহাজকে কলিকাতা আসার নির্দ্দেশ জারি করে।

পথে নানা ঝামেলা কাটিয়ে, জাহাজ ১৯১৪ সেপ্টেম্বর ২৮-এ বজবজ এসে পৌঁছায়। যাত্রীদের বোঝানো হয় যে, সেখান থেকে সবাইকে ট্রেনে করে পাঞ্জাবে পাঠানো হবে। এ সংবাদে গুরদিৎ সিং বিস্মিত হয়ে পড়েন এবং কারণ জানবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেও বিফল হন। যাত্রীদের জাহাজ থেকে শান্তভাবে নামবার আদেশ দেওয়া হয়। ইতিকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে যখন যাত্রীরা আলোচনায় ব্যস্ত তখন একজন ইংরেজ অফিসার জাহাজে উঠে ১৫ মিনিটের মধ্যে সকলকে জাহাজ খালি করে দিতে বলে। স্বেচ্ছায় না নামলে, বুলেট চলবে সে-কথা বলতে ভুল হয়নি। প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার করে সময়টা স্মরণ করিয়ে দেওয়া চললো এবং নির্দ্দিষ্ট কালের শেষে ধাক্কা দিয়ে, লাথি মেরে নামাবার চেষ্টা চলতে লাগলো। জাহাজ থেকে জেটিতে যাবার জন্য মাত্র একখানা তক্তা পাতা ছিল, যার সাহায্যে প্রায় তিন শত লোককে নামতে হবে।

ক্ষুধার্ত্ত ও বিভ্রান্ত যাত্রীদের বলা হল যে, তাদের স্পেশ্যাল ট্রেনে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে একখানা ট্রেনে জন-ষাটেক যাত্রীকে তুলে দিতেই, ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন রওনা হয়ে গেল। অবশিষ্ট যাত্রীরা এর কারণ বুঝতে না পেরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা যে করবে সে-সুযোগও পেল না। আদেশ পাওয়ামাত্র দণ্ডায়মান একখানা ট্রেনে না উঠলে বন্দুকের গুলির সাহায্যে সে-কাজে বাধ্য করা হবে, সে-কথাও বলা হ'ল। যখন গভর্ণমেণ্টের হুকুম দেখতে চেয়ে তারা কিছুই পেল না, তখন তারা হেঁটে কলিকাতার দিকে রওনা হয়ে পড়ে।

উপস্থিত কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে যে পুলিশ ছিল তাদের সংখ্যা ছিল কম, সুতরাং বাধা দিতে চেষ্টা করার সুযোগ ছিল না।

বড় রাস্তা ধরে প্রায় তিন মাইল চলে যাবার পর অপরদিক থেকে তিন-চারখানা মোটরগাড়ী আসতে দেখা যায়। একজন নিজেকে লাটের প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে, শ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ যাত্রীদের বজবজ ষ্টেশনে ফিরে যেতে বলেন এবং তাদের বক্তব্য শুনে যথাবিহিত ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন। মোটরে করে শস্ত্রধারী বহু পুলিশ ইতিমধ্যে এসে পড়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট একটু সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছেন।

সেপ্টেম্বর ২৯-এ, রাত্রের অন্ধকার নেমে গেছে ; তখন ৭-টা। সকল যাত্রী ঘুরে ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে আসার পর, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের কথা উত্থাপন আর না করে তৎক্ষণাৎ আবার জাহাজে চড়ার হুকুম জারি হ'ল। তারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ট্রেনে উঠতে চাইলে, বলপূর্ব্বক তাদের জাহাজে চড়াবার চেষ্টা চলে। তখন শিখরা মরিয়া হয়ে

উঠেছে ; জাহাজে তারা ফিরে যাবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে ২৪-পরগণার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ডোনাল্ডের (Donald) হুকুমে গুলি ছুটতে শুরু হয়ে গেল। নিরস্ত্র শিখ-যাত্রী। দু'-তিনজনের কাছে স্বল্পপাল্লার পিস্তল ছিল মাত্র। অসমশক্তির দ্বন্দ্ব। বলা বাহুল্য, শিখেদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিল কুড়িজন এবং তাদের প্রত্যেকেই জাঠ। দু'জনকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বাকী আঠারো জন ছিলেন ঃ

অমৃতসর ঃ

(১) টেহল সিং (হাসপাতালে মৃত্যু), (২) শিব সিং, (৩) রুর সিং, (৪) লছমন সিং ও (৫) শিব্বন সিং ;

ফিরোজপুর ঃ

(৬) ভগৎ সিং, (৭) নারায়ণ সিং, (৮) রুর সিং (পিতা—শের সিং) ;

জলন্ধর ঃ

(৯) অর্জ্জুন নিং, (১০) ইন্দর সিং, (১১) রতন সিং ;

লুধিয়ানা ঃ

(১২) ঈশার সিং, (১৩) মস্তা সিং ;

ফরিদকোট ঃ

(১৪) কাকুর সিং, (১৫) কেহর সিং ;

নাভা ঃ

(১৬) ভজন সিং ;

পাতিয়ালা ঃ

(১৭) চন্নন সিং।

(১৮) ইন্দ্র সিং (জলে ডুবে মৃত্যু)।

বে-পরোয়া গুলি চলায় শিখ যাত্রীরা ইতস্ততঃ পালিয়ে যেতে থাকে।

টেহল সিং ছাড়া, গুরুতর আহত অবস্থায় আটজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। কড়া পুলিশ-পাহারায় তারা হাসপাতালেই বন্দী ছিল।

দু'শ' জনের বেশী লোককে গ্রেপ্তার করা হয় সদ্য-গৃহীত (যুদ্ধের অজুহাতে) 'অবাঞ্ছিত লোকের অনুপ্রবেশ' আইনে। জন-ত্রিশের কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি ; তন্মধ্যে স্বয়ং গুরদিৎ সিং অন্যতম।

শিখেদের শত্রুপক্ষে মরেছে লুধিয়ানা পুলিশের মান সিং ও সাওয়ান সিং ; কলিকাতা পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ঈষ্টউড (Eastwood) ; এবং ঈ. বি. রেলের লোকো-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট লোম্যাক্স (Lomax)।

চব্বিশ-পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর ছোটলাট উইলিয়ম ডিউক ছিলেন 'রয়্যাল ফিউজিলিয়ার্স'-এর ক্যাপ্টেন মুর (Moore) সমভিব্যাহারে। লাঠি ও বেয়নেট-ধারী পুলিশ ও খাস মিলিটারী মিলিয়ে মোট ছিল শ'-দুয়ের ওপর। 'রয়্যাল ফিউজিলিয়ার্স' সৈন্যদল একাই ছিল দেড়শ'।

পলায়মান যাত্রীদের অবস্থা অবর্ণনীয়। রাত্রির অন্ধকারের কিছু সুযোগ থাকলেও, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। ক্ষুধাতৃষ্ণা, পথশ্রম, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগত-প্রাণ। তা হলে কি হয়? ব্রিটিশ রাজশক্তি পরাজয় স্বীকার করতে পারে না। তার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারলে, হতভাগা ভারতকে বশে রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, ভারত থেকে বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে কামানের খোরাক সৈন্য যোগাড় করতে হবে; যোগান দিতে হবে। আরও হবে যুদ্ধ-সরঞ্জাম ও সেনাদলের খাদ্য সরবরাহ করতে। সুতরাং ইংরেজ তখন নির্ম্মম নিষ্ঠুর। সুবিচার তখন 'শিকেয়' উঠিয়ে রাখতে হয়েছে।

কিন্তু এর ফল গুরুতর হয়েছিল বলে মনে করাই সঙ্গত। বাঙ্গলা তো বটেই, পাঞ্জাব আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। আমেরিকা, কানাডা ও দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত শিখদের মন তিক্ত হয়ে ওঠে। পরের ক'বৎসর ধরে সেই বেদনা ও বিক্ষোভ রূপ নেয় বিরাট গুপ্ত-ষড়যন্ত্রে—সংগ্রামের প্রস্তুতিতে। এ-সম্বন্ধে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছেদ শেষ করা যাক্ঃ

"The movement which was largely related to economic, social and religious matters veered towards the political in an intensified form. The *Komagata Maru* incident from the beginning to the end will be reckoned as one of those that accelerated the pace of the freedom movement in India". (*The Roll of Honour*, p. 269)

ভারত-জার্ম্মান ষড়যন্ত্র

ইয়োরোপে প্রলয় আরম্ভ করবার আগে জার্ম্মান সরকার খোঁজ করছিল জার্ম্মানীতে অবস্থিত ইংরেজের শত্রুদের। ভারতে ইংরেজ-বিদ্বেষ তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সুতরাং সে-দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং যারা বিপ্লব ঘটাতে পারে বলে মনে হয়েছে তাদের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর খবর রেখে চলেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের অন্ততঃ তিন-চার বছর আগে থেকেই জার্ম্মানী এ-বিষয়ে তার মনোভাব গোপন করতে চেষ্টা করেনি। ভারতের জাতীয় শান্ত আন্দোলন স্বায়ত্তশাসনের দাবী অতিক্রম করে পূর্ণ-স্বাধীনতাকামী হয়ে ওঠা সম্ভব এবং বঙ্গ-বিভাগের পর থেকে হিংসাত্মক পথে পরিচালিত হতে পারে, সে-লক্ষণ বাঙ্গলায় আগেই অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। তখন জার্ম্মানীর প্রধান চেষ্টা হ'ল যাতে এ-হিসাবে ভারতবর্ষের অন্ততঃ কিছুসংখ্যক বিপ্লববাদীদের সঙ্গে হাত মেলানো সম্ভব

হতে পারে। মিলনোন্মুখ দুই ধারা যখন এক হবার চেষ্টায় লেগেছে তখন একটিই স্রোতস্বিনী হবে। যখন জার্ম্মানী আর বাঙ্গালী বিপ্লবীরা মিলতে চাইলেন তখন দুই-পক্ষেই সুযোগ ও অতি আগ্রহশীল লোকের অভাব হ'ল না।

গভর্ণমেণ্ট পর্য্যায়ে না হোক্, নিজস্ব চেষ্টায় ভারতীয় বিপ্লবীরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জার্ম্মানীর সহযোগিতায় বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বাইরে থেকে শক্তিদান করা। এখানে 'গদর পার্টি' ও 'গদর পত্রিকা'র উদ্ভব। সংক্ষেপে হলেও, স্বতন্ত্রভাবে সে-পরিচয় পরে দেওয়া আছে।

জার্মানীতে যে-সব ভারতীয় ছাত্র ছিল তাদের প্রত্যেকের আচার-আচরণ ও মতিগতি সম্বন্ধে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখতো। ইংরেজ-বিদ্বেষ যাদের প্রবল ছিল এবং প্রকাশ্যভাবে অপরকে সে-মনোভাব জানাতো, তাদের ওপর লক্ষ্য ছিল বেশী। এদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে জার্ম্মান উচ্চমহলের কর্ম্মচারীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং পারস্পরিক সাহায্য সম্বন্ধে একটা প্রারম্ভিক আলোচনা হয়। গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৯১৪ সালের শেষদিকটায়। জার্ম্মান পররাষ্ট্র-বিভাগের পক্ষে উইজেনডঙ্ক (Wiesendonk) আলোচনা শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিব জিমারম্যান (Zimmerman)-এর সাক্ষাৎ সংযোগ ছিল। হরদয়াল, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চম্পকরমণ পিলাই এবং এম. জি. প্রভাকর মিলে এক সংগঠন গড়ে তোলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হেরম্বলাল গুপ্ত ও আবদুল হাফিজ আসেন সিকাগো থেকে; আর বরকতুল্লা আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগর উপকূল (Pacific Coast) থেকে। সর্ব্বপ্রথমে সংস্থার নাম হয় 'বার্লিন-ভারত সমিতি' (Berlin-India Committee)। এখন থেকে জিমারম্যান, উইজেনডঙ্ক ও ওপেনহাইম (Oppenheim) প্রায়ই সব অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতেন। সর্ত্ত ছিল, যে অর্থসাহায্য জার্ম্মানীর কাছে পাওয়া যাবে সেটা ঋণ, ভারত স্বাধীন হলে পরিশোধ করবে; ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে জার্ম্মানীকে বিশেষ সুবিধা দিতে হবে; জার্ম্মান ইঞ্জিনীয়ার ও প্রফেসর এসে এই দুই ক্ষেত্রে অধিক-সংখ্যায় নিযুক্ত হবে। যুদ্ধ যখন বেধে গেল তখন ভারতীয়রা জার্ম্মানীতে বসে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রচার করবার অনুমতি ও সুযোগ-সুবিধা চেয়ে প্রস্তাব জানায়। অবশ্য সম্মতি পেতে বিলম্ব হয় না। জার্ম্মান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের যোগসাজসে কাজ চালাবার কথা। 'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ' (Indian Independence League) নামে সংস্থা গঠিত হয় এবং বিশিষ্ট কয়েকটি ছাত্র—তামিলনাদ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রদেশের যুবকই তাতে স্থান পায়। কেবল প্রচারপত্র দ্বারা ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়াও, ভারতীয় বন্দী সৈন্যের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করে ইংরেজের শত্রু হিসাবে পরিণত করা এবং অর্থসাহায্য দিয়ে ইংরেজ-প্রভাব-মুক্ত দেশ থেকে পত্র-পত্রিকা ছাপিয়ে

চারিদিকে পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব ভারতীয়দের উপর বহুলাংশে এসে পড়ে।

এসবের বাইরে বাঙ্গালী বিপ্লবীরা আরও একটা নতুন পথে পা বাড়িয়েছিলেন। প্রয়োজনের তুলনায় 'রডা' থেকে প্রাপ্ত চোরাই পিস্তলের সংখ্যা নিতান্ত কম। প্রথমদিকেই প্রচুর টোটা পুলিশের হস্তগত হয়, পরে বেশ কয়েকটা পিস্তলও। তা ছাড়া, মনে হয়েছে, এখানে-ওখানে দু'-চারটে খুনখারাপি করে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হতে অনন্তকাল লেগে যাবে ; চাই ব্যাপক অভ্যুত্থান, আর সেজন্য অবশ্য প্রয়োজন প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র।

বিপ্লবী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর জার্ম্মান সমর-প্রধানরা আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত তাদের ঘাঁটি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যাঙ্কক, ব্যাটাভিয়া, সাংহাই প্রভৃতি কেন্দ্রে বাঙ্গালী বিপ্লবীরা নির্দ্দিষ্ট জার্ম্মান অফিসারদের সঙ্গে দেখা করেন এবং সংবাদ পান যে, অস্ত্রাদি ভারতে প্রেরণের সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে ; সমস্ত জাহাজ ভারত অভিমুখে শীঘ্র যাত্রা করবার ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। এর উপর জার্ম্মানীর নিকট থেকে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় এবং সাংহাই ও অন্যান্য স্থান থেকে ভারতে অর্থ-প্রেরণের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

বাঙ্গালী ও তাদের ভিন্ন-প্রদেশীয় সঙ্গীরা জার্ম্মানীর ভিতরে বসে বাঙ্গলার বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ সমর্থন করতে লাগলেন। আর এদিকে মাত্র কয়েকটি নির্ভীক যুবক নানা উপায়ে ভারত ত্যাগ করে দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত জার্ম্মান কনসাল প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে বিপ্লব-সংক্রান্ত কার্য্যের ক্ষেত্র প্রসারে যত্নবান হন।

এর পিছনে ছিল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। তিনি চিংড়িপোতার ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে দূরপ্রাচ্যে পাঠাবার চিন্তা করতে লাগলেন। ফণীন্দ্র যতীন্দ্রনাথের কাছে ১৯০৭-০৮ সালে দার্জ্জিলিঙে অপর দু'-তিনটি যুবকের সঙ্গে গীতার পাঠ গ্রহণ করতেন। ফণীন্দ্র অত দূরে একা যেতে ভয় পান। তখন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে পাঠানো হয়, ১৯১৫ এপ্রিলে। নরেন্দ্র সেখানে ব্যাটাভিয়া ও সাংহাইয়ে জার্ম্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করেন ; ফিরে এসে সব খবর পৌঁছে দিয়ে আগষ্ট মাসে ফণীন্দ্রকে নিয়ে যান। এবারও প্রায় সব কাজই একা নরেনকে করতে হয়। ফরাসী হোটেলে থাকাকালে নভেম্বরের শেষে ফণীন্দ্র গ্রেপ্তার হন। তখন তাঁর নাম ছিল উইলিয়ম আর্থার পাইন (William Arthur Pyne)।

এদিকে বাঙ্গলায় বসে স্বতন্ত্রভাবে অস্ত্র-সংগ্রহ-প্রচেষ্টা চলতে থাকে কলিকাতায় 'শ্রমজীবী সমবায়'কে কেন্দ্র করে। তার সঙ্গে জার্ম্মান মাল এসে পড়ার সম্ভাবনায়

তোড়জোড় খুব জোরালো হয়ে উঠলো। হাতে যথাপরিমাণ অস্ত্র এসে পড়লে বিপ্লবীরা সমগ্র উত্তর-ভারতে ব্যাপক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

জার্ম্মানী তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে পূর্ণভাবে। 'ম্যাভেরিক' নামে তৈলবাহী জাহাজখানি জার্ম্মানী কিনে নিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে খালি পাঠিয়ে দেয়। গম্য স্থান হ'ল জাভা। পথে অপর এক অস্ত্রবাহী জাহাজ 'এ্যানি লারসেন' (Annie Larsen) থেকে প্রচুর দূরপাল্লার বন্দুক, টোটা প্রভৃতি তুলে নিয়ে ভারতের দিকে রওনা হবার ব্যবস্থা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে দুই জাহাজের মিলন ঘটেনি। শূন্য-'ম্যাভেরিক' জাভার দিকে চলে যায়। অপরদিকে 'এ্যানি লারসেন' ওয়াশিংটন পৌঁছুলে, সেখানকার কাষ্টম্‌স্ অফিসাররা জাহাজ পরীক্ষা করতে উঠে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করে এবং সে-সকল অস্ত্র আমেরিকান সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে।

তৃতীয় জাহাজ 'হেন্‌রী এস্' (Henry S) ম্যানিলা থেকে সাংহাই যাচ্ছিল বন্দুক, গোলা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। সে-জাহাজখানিও এখানে ধরা পড়ে যায় এবং সব মালপত্র আমেরিকার পক্ষে দখল নেওয়া হয়। মোট কথা, একখানি জাহাজও ভারতবর্ষে পৌঁছুতে পারেনি।

কেবল আগ্নেয়াস্ত্র নয়, বাঙ্গলায় পাঠাবার জন্য জার্ম্মানী বেশ কিছু টাকা বিপ্লবীদের হাতে দিয়েছে। জাভা, মালয়, পেনাঙ প্রভৃতি অঞ্চলে ঘোরাফেরার জন্য খরচপত্র জার্ম্মানী যুগিয়েছে। 'শ্রমজীবী সমবায়' ছাড়া, ৪১-নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে 'হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স' নামে টাকা নেবার এক কেন্দ্র খোলা হয়। ১৯১৫ জুলাই 'হ্যারি এ্যাণ্ড সন্স' পাঁচশ' টাকা জমা দিয়ে 'হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক'-এ এক একাউণ্ট খোলে। ইতিমধ্যে খবর এসে যায়, ব্যাটাভিয়ার 'হংকং এ্যাণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্ক' থেকে টেলিগ্রাফিক নির্দ্দেশে আট হাজার গিল্ডার (guilder)-এর বদলি-মূল্য হিসাবে দশ হাজার টাকা কলিকাতার সাংহাই-ব্যাঙ্কে ১৯১৫ জুলাই ১৩-ই থেকে এসে পড়ে আছে। সুতরাং এই টাকা উঠিয়ে নেবার জন্য ব্যাঙ্কে নিজ নামে একাউণ্ট খোলা প্রয়োজন। এ ছাড়া, ব্যাটাভিয়ার 'চার্টার্ড ব্যাঙ্ক' তাদের কলিকাতা কেন্দ্রে আগষ্ট ১৪-ই সংবাদ পাঠায় যে, 'হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স'কে যেন ন'হাজার ছ'শ' টাকা দেওয়া হয়।

এইভাবে হঠাৎ বিদেশ থেকে টাকা আসার কারণ বোঝাবার চেষ্টায় বলা হয়— 'হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স' ব্যাটাভিয়ার ৫১ ও ৫২-নং হাই (High) ষ্ট্রীটে অবস্থিত কে. এ. জে. চোটিরমল (Chotirmull) কোম্পানীর সঙ্গে চিনি আমদানী ও দেশীয় পণ্য রপ্তানীর কারবার করছে। টাকা আসার সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সতর্ক হয়ে ওঠে এবং ১৯১৫ আগষ্ট ৭-ই 'হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স'-এর অফিস খানাতল্লাসীর পর হরিকুমার চক্রবর্ত্তী ও তাঁর দুই কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। ব্যাঙ্কে রক্ষিত অবশিষ্ট টাকা ভারত-সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

জার্ম্মান জাহাজ প্রচুর মাল নিয়ে আসবে। ভারতীয় কোনও প্রকাশ্য বন্দরে

মাল খালাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং সুন্দরবনের রায়মঙ্গল, হাতিয়া (সন্দীপ), বালেশ্বর (ওড়িষ্যা) প্রভৃতি স্থানে সে-সকল নামাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তখন নানা কেন্দ্রে হাতিয়ার ছড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ ইংরেজের শক্ত ঘাঁটিসমূহ আক্রমণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাখা হয়। কোন্ বিপ্লবীর ওপর কি কাজের ভার পড়বে, কে কোন্ ঘাঁটি আক্রমণের নেতৃত্ব করবে—সবিস্তারে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

জলপথে মালপত্র আনার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোক্তারা অন্য পন্থার কথাও ভেবেছিলেন ও সে-পরিকল্পনাকে কাজে প্রয়োগের কথাও স্থির করেছিলেন। এক চীনাকে তাঁরা আবিষ্কার করেন। কিছু মবলগ টাকা, ১২৯-টি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ও ২০,৮৩০ কার্ত্তুজ পাঠিয়ে দেন। কলিকাতার ৯০।২-এ-নং হ্যারিসন (মহাত্মা গান্ধী) রোডে অবস্থিত 'শ্রমজীবী সমবায়'-এর কর্ম্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পৌঁছে দেবার কথা। পদে পদে ব্যর্থতা এসে সব ভণ্ডুল করে ছাড়ছে ; এখানেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। প্রতিপক্ষের তৎপরতায় চীনা গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং সব মালপত্র ও টাকাকড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিপদের ওপর বিপদ। এক বাঙ্গালী কর্ম্মী ধরা পড়েন এবং তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত কাগজপত্রের মধ্যে বহু নাম ও ঠিকানা পুলিশ জেনে ফেলে।

অসাফল্যের সম্ভাবনা সব সময়েই বর্ত্তমান। অচিন্তনীয় বিপদ ফাঁদ পেতে বসে আছে। আবার, জেনেশুনে তারই মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার লোকও পাওয়া গেছে। আজ তাঁদের সকলের নাম পাবার উপায় নেই। জার্ম্মানীতে বসে যাঁরা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে Berlin-India Committee, Indian National Party—পরে Indian Independence League গড়েছিলেন, তাঁদের কথা বিস্তারিত লেখার সুযোগের অভাব ; তাই সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। বাঙ্গলায় বসে ঘাঁটি আগলাচ্ছেন ও পরামর্শ দিচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি।

এ-সম্পর্কে ভারতের বাইরে দূরপ্রাচ্যে যাঁরা জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষা ও মালপত্র পাঠাবার বিলি-ব্যবস্থায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (সি. মার্টিন), জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, হেরম্বলাল গুপ্ত, অবনী মুখোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ও মাত্র অপর দু'-একজন। জার্ম্মানীতে বসে সর্ব্বপ্রথমে এ অসম্ভব কাজে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের কথা সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমদিকে এসে পড়েন—তারকনাথ দাস, ধীরেন সরকার, ডঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, পারাঞ্জপে, সুখথাঙ্কর, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ দত্ত (দাউদ আলি খাঁ), কারসাম্প প্রভৃতি আরও কয়েকজন।

ঘটনা-প্রবাহ

ডাকাতি এবং নরহত্যা ও হত্যা-প্রচেষ্টার সংবাদ মিলিয়ে একসঙ্গে দেওয়া যাক্ ঃ

ত্রিপুরা ঃ গোঁসাইপুর— বৎসরের প্রথম আক্রমণ নবিনগর থানার গোঁসাইপুর গ্রামের সাহা-শ্রেণীর শরৎচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে। ১৯১৪ মে ৮-ই, রাত্রি সাড়ে-এগারোটা নাগাদ প্রায় ২৫।৩০ জন যুবক একসঙ্গে হানা দেয়। শরতের পুত্র নবদ্বীপকে গুরুতর প্রহাদের পর আটক করে আনুমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ডাকাতরা প্রস্থান করে।

ময়মনসিংহ ঃ বেতাকি— পরের ঘটনা নেত্রকোণা থানার বেতাকি গ্রামে। ধনী ব্যবসায়ী চৈতন্য সাহার বাড়ীতে ১৯১৪ আগষ্ট ২৮-এ মাঝরাত্রে জন-পঁচিশ ডাকাত এসে উপস্থিত। হৈ-হল্লা যথেষ্ট হ'ল। ডাকাত ধরা পড়লোনা কেউ। চৈতন্যের ক্ষতির পরিমাণ অলঙ্কার ও নগদে প্রায় আঠারো হাজার টাকার মত।

ওড়িষ্যা ঃ জাজপুর— বাঙ্গলার সংলগ্ন কটক জেলায় জাজপুর গ্রাম। বাঙ্গলার ডাকাত সেখানেও ধাওয়া করেছে লুণ্ঠনের আশায়। ১৯১৪ সেপ্টেম্বর ২০-এ, রাতের মাঝামাঝি একদল যুবক, পনেরো থেকে কুড়ি জন, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চৌধুরী সদানন্দ মহান্তির বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর লোকরা, বিশেষতঃ সদানন্দ নিজে বিপুল বাধা দেন। ডাকাতরা মালিককে নির্ম্মমভাবে বেঁধে ফেলে রেখে, কমবেশী সাড়ে ছয় হাজার টাকা লুঠ করে।

২৪-পরগণা ঃ মামুরাবাদ— দু'হাজার টাকাও পাওয়া যায়নি, অথচ সর্ব্বপ্রথম মসার-পিস্তল এই ডাকাতিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। দেগঙ্গা থানার মামুরাবাদ গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের বাড়ী নভেম্বর ৭-ই ডাকাতির হানা হয়। টাকাকড়ি বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি ;

ময়মনসিংহ ঃ উক্রাশাল— ডাকাতি ক্রমেই ব্যাপক হয়ে উঠছে। তবে পূর্ব্ববঙ্গেই বেশী। তার মধ্যে আবার ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা দুটি অধিকমাত্রায় বিব্রত। কাতিয়াদি থানার উক্রাশাল গ্রামের কৃষ্ণকুমার দের বাড়ীতে নভেম্বর ১৩ই রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ আন্দাজ কুড়িজন লোক মামুলি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হানা দেয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বলে অনুমান করা হয়।

ত্রিপুরা ঃ রাধানগর— থানা হোমনা, গ্রাম রাধানগর। ত্রিশ থেকে চল্লিশ জনের মত ডাকাত দুর্গাচরণ কৈবর্ত্ত (দাস)-এর বাড়ীতে ১৯১৪ ডিসেম্বর ১৮-ই বোমা ও রিভলভার নিয়ে গভীর রাত্রে উপস্থিত হয়। তাদের আগমনবার্ত্তা সূচিত হ'ল বিরাট

শব্দের তিনটি বোমা-বিস্ফোরণে। বাড়ীর লোক হক্‌চকিয়ে যায়। ভয় দেখিয়ে মোট পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আগন্তুকরা সরে পড়ে।

ময়মনসিংহ ঃ দারাকপুর— ঘুরে-ফিরে আবার ময়মনসিংহ। ফুলপুর থানার অন্তর্গত দারাকপুর গ্রামের নিত্যচরণ মোদকের বাড়ীতে ১৯১৪ ডিসেম্বর ২৩-এ, রাত্রি দু'টার সময় প্রায় ত্রিশজন লোক উপস্থিত। বোমা ও বন্দুকের আওয়াজে সমস্ত গ্রাম ত্রস্ত হয়ে উঠলো। আক্রমণকারীদের 'রণসজ্জা' দেখে গ্রামবাসীদের কেউ এগিয়ে বাধা দিতে সাহস করলে না। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ এবার বেশ ভারী রকম, প্রায় তেইশ হাজার টাকা।

এসকল ছাড়াও ডাকাতির বহু বিফল-চেষ্টা হয়েছে ; তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

জানুয়ারী (১৯১৪)-তে ময়মনসিংহ জেলার চালিয়ার-চর থানা ও গ্রাম ;

ফেব্রুয়ারী ঃ হুগলী জেলার বৈদ্যবাটী ;

আগষ্ট ঃ ২৪-পরগণা জেলার বরাহনগর ;

অক্টোবর ঃ ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর ;

ডিসেম্বর ঃ ২৪-পরগণা জেলার আড়িয়াদহ,
ময়মনসিংহ জেলার উস্তি

—প্রভৃতি স্থানে ডাকাতি-হানার সংবাদ আছে।

মরণ-যজ্ঞ

শ্রীশচন্দ্র পাল ঃ ঢাকার প্রাক্তন ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যালেন ছুটিতে স্বদেশ যাচ্ছিলেন। ১৯০৭ ডিসেম্বর ২৩-এ গোয়ালন্দে তাঁর ওপর হিংসাত্মক আক্রমণ হয় এবং তিনি পিঠে গুরুতররূপে গুলিবিদ্ধ হন। জীবন-সংশয়, কিন্তু শেষ পর্যান্ত রক্ষা পেয়ে যান। আততায়ীকে ধরা সম্ভব হয়নি। ভিড়ের মধ্যে তিনি কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন। পরে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গিয়েছিল—আসামী হলেন শ্রীশচন্দ্র পাল।

ঘটনার পর শ্রীশচন্দ্র সাধুর বেশে সাত বৎসর কাটিয়েছেন। কিছু পুলিশ বরাবরই তাঁর রাজনৈতিক যোগসাজসের বিষয়ে সন্দিহান ছিল। ১৯১৪ সালে এক অজুহাতে তাঁর ভাগ্যে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হবার পর তাঁকে এক অস্বাস্থ্যকর স্থানে অন্তরীণ রাখা হয়। 'বিপ্লবী বাংলা'র গ্রন্থকার শ্রীতারিণী চক্রবর্ত্তী বলেন—সেইখানেই শ্রীশচন্দ্রের জীবনান্ত ঘটে।

ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ যুবক ভোলানাথ প্রথমে কি-ভাবে এসে জুটেছিলেন তার সন্ধান আজ আর পাবার উপায় নেই। তবে জানা আছে—তাঁর বাড়ী ছিল

তারকেশ্বরের কাছে টেগরা গ্রামে। সিমলার 'অনুশীলন সমিতি' থেকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়। দু'জনে এক পথের পথিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে ভোলানাথ শ্যাম (থাইল্যাণ্ড)-এর অভিমুখে একাই যাত্রা করেন। যুদ্ধ যখন বেধে গেল, ভোলানাথের নিকট কানাঘুষা কথা এসে পৌঁচেছিল যে, যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে জার্ম্মানীর কাছ থেকে ভারতের বিপ্লব-আন্দোলনে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

ভোলানাথ নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেননি; মায়ের বন্ধন-শৃঙ্খল যেন তাঁকেই পিষ্ট করছিল। তিনি ধীরে ধীরে জার্ম্মান ঘাঁটিতে যাওয়া-আসা শুরু করেন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হলে, তিনি আশ্বাস পান যে, কোনও দায়িত্বপূর্ণ লোক ভার নিলে, কাজ দ্রুত অগ্রসর হবে।

ভোলানাথ রওনা দিয়ে ১৯১৪ নভেম্বর মাসে এসে কলিকাতা পৌঁছুলেন। ডিসেম্বর ১-লা থেকে ৮-নং বেচু চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীটের এক মেসে আশ্রয় নেন। সেখানে ১৯১৫ মার্চ ৩১-এ পর্য্যন্ত ছিলেন। পরে অন্যত্র যান। ফেব্রুয়ারী ৬-ই নরেন্দ্র ও আর-একজনের সঙ্গে ২-নং ছিদাম মুদী লেন (অতুলকৃষ্ণ ঘোষের বাসা) থেকে তাঁদের বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

দূরপ্রাচ্যে জার্ম্মানদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানতে পারেন যে, অস্ত্র ও অর্থসাহায্য সম্বন্ধে অন্যসূত্রেও কথাবার্ত্তা চলছে জোর। ভোলানাথের কাজ হ'ল— আর একটা যোগসূত্র-স্থাপন এবং কলিকাতায় ফিরে সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করা।

নরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভোলানাথ সব অবস্থা জ্ঞাপন করলে, সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ, অতুলকৃষ্ণ প্রভৃতিকে নিয়ে এক আলোচনা-সভা বসে। সেখানে দুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম, একটি কেন্দ্র (হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স) যার ভিতর দিয়ে চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে; আর দ্বিতীয়তঃ, যতীন্দ্রনাথের নির্ব্বাচিত একজন কর্ম্মী তখনই শ্যাম, সাংহাই ও ব্যাটাভিয়ার দিকে রওনা হয়ে যাবে। এ কার্য্যের ভার নরেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়েছিল।

কলিকাতায় পাকা লোক রইলেন অনেক, কিন্তু ফরাসী চন্দননগর দিয়ে যেমন অনেক গোপন কাজ পরিচালনার সুবিধা হ'ত, বিশেষ করে পলাতকদের আশ্রয় নিয়ে, সেইভাবে ভারতে ওলন্দাজ-অধিকৃত অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করতে পারলে ইংরজের শ্যেনদৃষ্টি কিছুটা এড়ানো যেতে পারে, এই ভেবে বিনয়ভূষণ দত্ত ও ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯১৫ ডিসেম্বর ১৭-ই কলিকাতা ছেড়ে রওনা দেন।

বিনয়ের কাছে ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 'কোড' ও 'সাইফার' (code and cypher)-এ পত্রাদি প্রেরণের সঙ্কেত দিয়েছিলেন। কলিকাতায় ঠিকানা ছিল: সুধীরকুমার ঘোষ, ৭৬-১-নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। এটি

ডাঃ যাদুগোপালের গোপন ঠিকানা। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিনয়ভূষণ গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং সেইসূত্রে বহু সংবাদ পুলিশের হস্তগত হয়।

ভোলানাথের জন্য খোঁজাখুঁজি চলতে থাকে। আগষ্ট ১৪-ই তাঁর গ্রামের বাড়ী খানাতল্লাসী হয়, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় না। এদিকে ভোলানাথ গোয়া পোঁচেছেন। সেখান থেকে মার্টিনের সংবাদ পাবার চেষ্টায় এক টেলিগ্রাম করে বসেন। মার্টিনের নাম তখন পুলিশের কাছে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে গেছে; তাঁকে কে এই টেলিগ্রাম করেছে, সেই খোঁজ করতে গিয়ে গোয়ায় ভোলানাথের সন্ধান পায়। তখন ইংরেজ সরকার গোয়া-কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিয়ে ভোলানাথের গ্রেপ্তার সাধন করে। আরও চাপে পড়ে তারা গোয়ার রাজ্যসীমা পার করে তাঁকে ভারতীয় পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।

তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। পৈশাচিক অত্যাচার চলতে থাকে গোপন তথ্য আদায় করবার আশায়। একটি কথাও পাওয়া গেলনা ভোলানাথের মুখ থেকে। কিন্তু পুলিশ তাতে নিরস্ত হয়নি। অত্যাচার উত্তরোত্তর বেড়েই চলতে লাগলো। হয়তো শেষ পর্য্যন্ত সহনশক্তির বাইবে গিয়ে পড়ে কিছু প্রকাশ করে ফেলতে হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি পরিধানের ধুতির সাহায্যে গারদের মধ্যে ১৯১৬ জানুয়ারী ২৭-২৮ রাত্রে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যু সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি চলে আসছে সেটা ভারত সরকারের প্রচারিত তথ্য। সাধারণ লোকে অন্য ধারণা করে আছে, যেটা ইংরেজ-শাসনের পক্ষে কলঙ্কময়।

প্রতিশোধ

কলিকাতা ঃ ডিটেকটিভ পুলিশের (সি.আই.ডি.) অফিস কর্ম্মচারী দিয়ে ভরে উঠেছে। তার মধ্যে কুশলতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে; চাকরিতে যথারীতি উন্নতি হচ্ছে।

এঁদের একজন, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, তৎপরতার সঙ্গে বিপ্লবীদের অজানা ঘাঁটির সন্ধান করতে সক্ষম হয়েছেন। এইসকল কেন্দ্র ও তাদের গোপন অধিবাসীর পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান নিয়ে বেড়ানোয় তিনি সিদ্ধহস্ত। সব তথ্য যেন তাঁর নখদর্পণে। তাঁর গুরুকার্য্যে সাহায্য করবার জন্য দেহরক্ষীর সঙ্গে বেশ কয়েকজন অস্ত্রধারী সহকর্ম্মীরও ব্যবস্থা হয়েছে।

তাঁর পশ্চাতে আবার শনি-দেবতা লোক নিযুক্ত করেছেন বাছাই কয়েকটি বিপ্লবীকে। তাঁরা শিকারের লোভে স্থির লক্ষ্যে ঘুরে বেড়ান। দিনের পর দিন, হয়তো মাসের পর মাস বিফল হয়ে ঘুরে মরতে হচ্ছে। পুলিশের কর্ম্মচারী তাদের কাজের জন্য নিয়মিত মাহিনা পাচ্ছে; উন্নতির দিকে অবিচলিত পদক্ষেপে

এগিয়ে চলেছে। আর তাদের পিছনে যাঁরা ঘুরে মরছেন তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধন ও বিপদের কথা কে ভেবে দেখছে ?

পূর্ব্বকথায় আসা যাক্। ১৯১৪ জানুয়ারী ১৯-এ, নৃপেন্দ্র অফিস থেকে বেরিয়ে এক বন্ধু-বাড়ী ঘুরে হ্যারিসন রোড - চিৎপুর রোড মোড়ে ট্রামে চেপেছেন। বলা বাহুল্য, দেহরক্ষী তো কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরছে। রাত্রি প্রায় ৭-৪৫ মিনিটে নৃপেন্দ্র গ্রে ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে নেমেছেন। অনুসরণকারী তাঁর 'যম' ঠিক পরের গাড়ী থেকে পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা রিভলভারের মুখ থেকে অগ্নিশিখা দেখা দিল, একটা শব্দও হ'ল, আর নৃপেন্দ্রের দেহ রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়লো।

ঘটনাস্থল থেকে কুমারটুলি থানা একশ' গজও নয়। আর, বড় মোড়ে পুলিশ তো দাঁড়িয়ে আছেই। তাদের সঙ্গে নৃপেন্দ্রের দেহরক্ষী দেখলে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এক যুবক ছুটে পালাচ্ছে। কয়েকজন পিছে ধাওয়া করে ছুটলো। পথে একটা গুলি-ছোটার আওয়াজও হ'ল এবং পশ্চাদ্ধাবনকারীদের একজন আহত হয়ে পড়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত যাকে গ্রেপ্তার করা গিয়েছিল, বার বার তিনবারের বিচারেও তাকে সাজা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

চট্টগ্রাম ঃ "অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ" প্রবচনের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় চট্টগ্রামে, ১৯১৪ জুন ১৯-এর এক ঘটনা থেকে। সদরঘাটে রাত্রি ৮-টায় ধলঘাট-নিবাসী সত্যেন্দ্রনাথ সেন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। 'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা'র এক সাক্ষীর সঙ্গে সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে ফিরে আসছিলেন। সন্দিগ্ধমন সদাই ত্রস্ত এবং অসম্ভব সতর্কতা ছিল তাঁর সঙ্গীর। দূরে লোকের পশ্চাৎ-অনুসরণের শব্দ তাঁর কানে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন একজন লোক তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়বার উপক্রম করছে। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং রক্ষা পান, আর গুলিটা সত্যেনের দেহে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ঢাকা ঃ "খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে"। গরীব গৃহস্থ-ঘরের সন্তান। রাজনীতির কোনও ঝামেলার মধ্যেই ছিল না। সঙ্গী, আত্মীয় ও পরিচিতের সঙ্গে সমানভাবেই মেলামেশা করে। হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল, সে কোনও কোনও 'দাগী' লোকের সঙ্গলাভের জন্যে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে। সন্দেহ হ'ল, রামের এ হঠাৎ পরিবর্ত্তন কেন ? গোপনে তার চাল-চলন লক্ষ্য করা শুরু হ'ল এবং বোঝা গেল "টিকটিকি" পুলিশের এক উচ্চস্তরের অফিসারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। তখন আপদ অপসরণ করবার জন্য ঢাকা সহরের বুকের ওপর, ১৯১৪ জুলাই ১৭-ই বাক্ল্যাণ্ড বাঁধের ওপর রামদাসকে রিভলভার-সাহায্যে হত্যা করা হয়। গুপ্তচর হিসাবে তার কাজ করার পরিসমাপ্তি সেইখানেই হয়ে গেল।

কলিকাতা ঃ মুসলমানপাড়া— কথায় বলে ঃ "রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?" কথাটা ফলে গেল দু'-দু'বার পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে।

বসন্তর প্রভাবে পড়ে ঢাকায় রামদাস নিহত হয়। বসন্তও শেষ পর্য্যন্ত বাদ পড়েননি। ১৯১৪ জুলাই ১৯-এ ঢাকা সহরে বসন্তকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা কয়েকটা গুলি চালায়। সেবার রক্ষা পেলেন পুলিশসাহেব ; সঙ্গের এক দেহরক্ষী গুলির আঘাতে প্রাণ হারায়, আর একজন গুরুতররূপে আহত হয়।

অদ্ভুত উপায়ে বসন্ত দ্বিতীয়বারও রক্ষা পান। ঐ বছরই নভেম্বর ২৫-এ সন্ধ্যা ৭৷৷০-৮-টার মধ্যে ১০।৪।৪-নং মুসলমানপাড়া লেনে বসে আরও তিন-চারজন পুলিশ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর থেকে ডাক আসায় ভিতরে উঠে গেছেন ; সঙ্গীরাও সব বেরিয়ে পড়লেন। এমন সময় বিকট শব্দে এক বোমা ফাটলো ঘরের মধ্যে। বসন্তর দেহরক্ষী রামভজন বোমার টুকরো লেগে গুরুতররূপে আহত হন। পা-দু'খানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং দেহের আরও নানা স্থানে আঘাত লেগেছে। দু'দিনের মধ্যেই হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনাস্থলের শ'তিন গজ দূরে এক যুবককে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। প্রচুর রক্তক্ষরণের জন্য চলচ্ছক্তিহীন। পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে। সুস্থ করে তুলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। কিন্তু ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারায় মুক্তি পান।

বার বার তিনবার। সেটা ১৯১৬ জুলাই ১-লা তারিখের ঘটনা ; যথাস্থানে বিবৃত হবে।

বিক্ষুব্ধ পাঞ্জাব

বাংলার মত পাঞ্জাব ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রস্তুত ছিল। মাঝে মাঝে প্রকাশ্য সংঘর্ষ হয়েছে, পুলিশ ও বিপ্লবী দু'পক্ষই হতাহত হয়েছে ; আর ছিল মামলা করে পাইকারী দরে ফাঁসি দেবার পালা।

বাঙ্গলার ইতিহাসে পাঞ্জাবের সমস্ত ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সুযোগ নেই ; অন্য-ভাবে ভিন্ন পুস্তকে নিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। কতকগুলি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ না করলে কাহিনীর এই অংশটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, সে-কারণে কয়েকটি ঘটনার পরিচয় রেখে দিতে হয়।

বিপ্লবীদের কর্ম্মতালিকায় প্রধান স্থান ছিল গভর্ণমেণ্টের বেতনভুক্ ভারতীয় সৈন্যদের গভর্ণমেণ্টের প্রতি মন বিরূপ করে নিজেদের দলে টেনে আনা এবং অভ্যুত্থানকালে তাদের সাহায্য গ্রহণ করা। এ-বিষয়ে কর্ম্মীরা বহুল পরিমাণে সফল হয়েছিল। Twelfth Cavalry, 128th Pioneers, 23rd Cavalry

Regiment, 7th Rajputs প্রভৃতি সেনা-বিভাগের মধ্যে প্রচুর কাজ হয়েছিল। কেবল এই প্রচেষ্টায় প্রায় কুড়িজনের ফাঁসি হয়।

উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র-সংগ্রহ, এবং দলের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য সরকারী ও বেসরকারী অর্থ-লুণ্ঠন, পুলিশ ও পদস্থ কর্ম্মচারী হত্যা, পুল ভেঙ্গে ট্রেন-চলাচল-ব্যাহত, যোগাযোগের সকল পথ-রোধ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটা, বোমা-প্রস্তুত প্রভৃতি কাজে তারা আত্মনিয়োগ করেছিল। এসকল কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন আরও চৌদ্দজন ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করেন।

আমেরিকা, কানাডা, দূরপ্রাচ্য ও ইয়োরোপ তো বটেই, তুর্কী, আফগানিস্তান প্রভৃতি রাজ্যেও "গদর" বা বিপ্লবের সঙ্গে পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

সকলরকম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার রোধকল্পে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নিয়ে স্বতন্ত্র মামলা হয়েছে, তার ওপর বড়রকম ষড়যন্ত্র (Conspiracy) মামলা হয়েছে পর পর তিনটি। প্রথম মামলার রায় প্রকাশিত হয়—১৯১৫ সেপ্টেম্বর ১৩-ই। এতে চব্বিশ জনের ফাঁসি এবং ছাব্বিশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। বাকী বহু লোকের বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ফাঁসির চব্বিশ জনের মধ্যে সতেরো জনের দণ্ড বড়লাটের আদেশে দ্বীপান্তরে পরিণত হয় এবং বাকী সাত জনের ১৯১৫ নভেম্বর ১৭-ই ফাঁসি হয়। (*The Roll of Honour*, pp. 272—290)

পলাতক কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এবং নূতন আসামী জুড়ে দিয়ে দ্বিতীয় মামলা শুরু হয়—অক্টোবর ২৯-এ। মোট ৭৪ জনকে আসামী করে মামলার যাত্রা আরম্ভ হয়। ১৯১৬ মার্চ ৩০-এ রায় প্রকাশিত হয়; ছ'জনের মৃত্যু, পঁয়তাল্লিশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং আট জনের নানা মেয়াদের সাজা হয়েছিল।

এতেই পরিসমাপ্তি হয়নি। তৃতীয় মামলা রুজু হয়—১৯১৬ নভেম্বর ৮-ই। স্বল্পমেয়াদী বিচার। রায় বেরিয়েছিল—১৯১৭ জানুয়ারী ৫-ই। ছ'জনের ফাঁসির আদেশ হয়; এর মধ্যে একজনের সাজা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। আর কয়েকজনের নানা মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণদণ্ডাদেশের সঙ্গে সর্ব্বরকম সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

এর বাইরে দু'-একজন আসামীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মামলা ও সাজা হয়েছে। মোট কথা, পাঞ্জাব নিয়ে গভর্ণমেন্টের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না এবং নির্ম্মমভাবে বৈপ্লবিক অপরাধ-দমনে অবতীর্ণ হয়েছিল।

"গদর" বা বিপ্লব

বাঙ্গলার বৈপ্লবিক ইতিহাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নয় বলে, কিছু না লিখলে বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হ'ত না, তবে কাহিনীর সঙ্গতি-রক্ষার জন্য "গদর" সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে হচ্ছে।

'কোমাগাটা মারু' ও বজবজের কথা লিখতে গিয়ে 'গদর পার্টি'র প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে—দেশের বাইরে, বিশেষ করে আমেরিকা ও কানাডায় উদ্ভূত এই দলের দান অপরিসীম। আদি উদ্যোক্তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যে কেউ গিয়েছিলেন, ঠিক তা নয়। প্রধান লক্ষ্য—বিদেশে শিক্ষালাভ, আর হয়তো কারও-বা ছিল জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা।

কালিফোর্ণিয়ার বার্ক্‌লে অঞ্চলে ১৯০৭ সালে কয়েকটি ছাত্র এসে জোটেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে এঁদের মধ্যেই স্থির হয়—অধ্যয়নের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করতে হবে। এঁদের প্রচেষ্টায় নানারকম প্রতিষ্ঠান, যথা—'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ', 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অফ্‌ দি প্যাসিফিক কোষ্ট্‌', 'হিন্দুস্থানী এ্যাসোসিয়েশন'—ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এ-সময় কোনও কোনও সভ্যের মনে সামরিক শিক্ষালাভের কথাও উঠেছিল, কিন্তু কাজ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

আমেরিকায় যখন এই অভিযান চলছে, তখন কানাডা ও জার্ম্মানীতেও, বিশেষ করে জার্ম্মানীতে বিপ্লব-সংস্থা গড়ে উঠছে। জার্ম্মানদের সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপিত হওয়ায় সমুদ্রপারের সমচিন্তাধর্ম্মীর মধ্যেও কেবল ভাবের আদান-প্রদান নয়, বিভিন্ন কার্য্যক্রমের আলোচনা এবং কার্য্যক্রম গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

আমেরিকার পোর্টল্যাণ্ড ও সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো-তে খুব বড় কেন্দ্র গড়ে ওঠে। পাণ্ডুরং খানখোজে, তারকনাথ দাস, হরদয়াল, কাশীরাম প্রভৃতি আরও অনেকে মিলে সংগঠনে শক্তিসঞ্চার ও কর্ম্মক্ষেত্র-বিস্তারে সহায়তা করেন। অতিরিক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে ওরেগন ও ওয়াশিংটন কেন্দ্রদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্য্যারম্ভের পর বার বার মেলামেশা এবং আলোচনার ফলে ইংরেজ-বিদ্বেষ-প্রচার, বিদেশে তো বটেই, ভারতবর্ষেও একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দলবদ্ধ হয়ে যে অপূর্ব্ব সংগ্রামী সমাবেশ ঘটেছিল, তার কথা চিন্তা করলেই বোঝা যায়—যখন "লক্ষ্য ও মোক্ষ এক" তখন ছোটখাটো অন্তরায় আপনা হতেই দূর হয়ে যায়।

চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে রূপায়িত করবার জন্য ১৯১৩ নভেম্বর ১-লা তারিখে 'গদর' বা বিদ্রোহ-পত্রিকা সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলায় 'যুগান্তর' ১৯০৬ সালে যা করেছিল, এই 'গদর'-পত্রিকা বিদেশে সেই কাজ করেছে। ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু ও গুজরাটীতে পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। গুপ্তভাবে তা ভারতে আসতে আরম্ভ করে এবং ইংরেজের পক্ষে সংগ্রামে নিযুক্ত হতে পারে এমন ভারতীয় সৈন্য যে-সকল স্থানে অধিকসংখ্যক অবস্থান করে, সে-সব অঞ্চলে পত্রিকা প্রেরিত হ'ত। "ইংরেজ-হত্যায় পাতক নেই, উপরন্তু ধর্ম্মকার্য্য ; ভারতে অবস্থিত ইংরেজ-অরিকে যে-কোনও কৌশলে হত্যা কর, নচেৎ বিতাড়িত কর"—এই ছিল প্রতিপাদ্য বিষয়। ক্রমে

আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয় যে, ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে সেখানে একটা বড়রকম অভ্যুত্থানের জন্য জমি তৈরী করা,—আপাততঃ বেতনভুক্ সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে ইংরেজের আনুগত্যের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে প্রধান লক্ষ্য বলে ধরা হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হ'ল। আমেরিকা ও কানাডা হতে ভারতগামী জাহাজে দলে দলে প্রবাসী শিখ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন শুরু করে দিলে। আমেরিকায় বসে যে-ভাষায় ইংরেজকে আক্রমণ চলছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের সম্ভাবনায় আমেরিকা-সরকার সে-বিষয়ে বেশ সতর্ক হয়ে উঠেছিল। আমেরিকার নানা সহরে সভা-সমিতি চলছে,—আমেরিকাও সে-সকলের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছে। কালিফোর্ণিয়ার সাক্রামেণ্টো-তে ১৯১৩ ডিসেম্বর ৩০-এ যে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বহু দূর-দূরান্তর থেকে এসে উপস্থিত ভারতবাসীর সংখ্যা বহু সহস্রে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকার পুলিশ লক্ষ্য করতে ভুল করেনি যে, সে-সভায় হোমরা-চোমরা কয়েকজন জার্ম্মান উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিলেন।

এরপর আর আমেরিকা-সরকার স্থির থাকতে পারেনি। জার্ম্মানীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া থেকেই তো আমেরিকার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল তার জ্ঞাতিভাই, পূর্ব্বপুরুষ ইংরেজদের ওপরে। তার ওপর নিজেকেই সে-মহা-আহবে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হ'ল। সুতরাং আর নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে থাকা চলে না ; প্রকাশ্যে বা গোপনে সব আন্দোলন বন্ধ করবার জন ব্যাপক তোড়জোড় চলতে লাগলো। গ্রেপ্তারের উৎসব লেগে গেল। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, ওরেগন, সিকাগো, ওয়াশিংটন প্রভৃতি বড় বড় সহর থেকে বেপরোয়া ধরপাকড় চলছে। শতাধিক লোককে পুলিশ নিজ হেপাজতে এনে রাখলে। তার মধ্যে বাছাই করে বিয়াল্লিশ জনকে আসামী খাড়া করে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো-তে ১৯১৭ নভেম্বর ২০-এ এ-মামলার শুনানি শেষ হয়। কয়েকজন ফেরার ছিল ; তাদের অনুপস্থিতিতেই মামলা চলেছে। ১৯১৮ মে ২৪-এ এই মামলার রায় প্রদত্ত হয়। এই রায়ে জার্ম্মানদের নিয়ে বত্রিশ জনের বিভিন্ন-মেয়াদী কারাদণ্ড ঘটে। তার মধ্যে তিনজন ছিলেন বাঙ্গালী (যথাক্রমে সাজা ঃ তারকনাথ—২২ মাস, ধীরেন সরকার—৪ মাস, চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—৩০ দিন এবং জরিমানা ৫,০০০ ডলার)। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কর্ম্মক্ষেত্র হতে অপসারিত হলে, 'গদর'-সম্বন্ধে আমেরিকায় প্রায় সকল কর্ম্মের অবসান ঘটে।

পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, 'গদর' দলের লোক বর্ম্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, সাংহাই, ক্যাণ্টন প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মালয়ের সিঙ্গাপুরে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তার মধ্যে আদি গদর-পার্টির কর্ম্মীদের একটা বড় অংশ আছে। ভারতের মধ্যে পাঞ্জাবে যে সংগ্রাম চলতে থাকে আর ক্ষিপ্ত গভর্ণমেণ্ট ধরপাকড়, ষড়যন্ত্র মামলা, জেল ও ফাঁসিতে যে-সকল দেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাদের

মধ্যে আমেরিকা ও কানাডা-প্রত্যাগত গদর-দলের বহু সভ্য ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ১৯৪০ মার্চ ১৩-ই ইংল্যাণ্ডের কেন্‌সিংটনে যে যুবক—উধাম সিং ও'ডায়ারকে হত্যা করেন, তিনিও আমেরিকা-বাসকালে গদর-দলের লক্ষ্য ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে, ভারতে ফিরে, উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ফিরে ইংল্যাণ্ডে যান।

ব্যাপক অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবার আগেই বাঙ্গলার বিপ্লবীরা ইংরেজকে খুব ভালরকম ধাক্কা দেবার জন্য একটা বড় দল গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। প্রায় সব জেলাতেই খবর পাঠানো হয় এবং বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা হয়তো কয়েকজন একসঙ্গে বা উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করতে থাকে। একটি বড় প্রতিষ্ঠান এই গোষ্ঠীতে মিলতে চাইল না ; প্রায় একাই পড়ে রইল। এই সম্মিলিত দলের নেতা হিসাবে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে গ্রহণ করা হয়।

রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ এবং পরস্পরে, ক্বচিৎ হলেও, দেখা-সাক্ষাতে কর্ম্মপদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা হ'ত। মাঝে সাক্ষাৎ হয়নি কয়েক মাস। তখন রাসবিহারী কাশী এলেন এবং কলিকাতা থেকে যতীন্দ্রনাথ গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। রাসবিহারী ও যতীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত অনুচররা উত্তর-ভারতে ব্যাপক অভ্যুত্থান ও বিদেশ থেকে অস্ত্র-আমদানীর চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছিল। বাঙ্গলার বৈপ্লবিক ঘটনায় এই দুই মহাবীরের অবদানের কোনও পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

ইংরেজ-বিতাড়ন-মন্ত্র যখন গৃহীত হয়েছে এবং বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র-মেদিনী অর্থাৎ ভারতের মাটী ছেড়ে যাবার মতলব ইংরেজের নেই, তখন "বুনো ওলের" জন্য "বাঘা তেঁতুল"-বিধি প্রয়োগ করার জন্য বিপ্লবী নেতারা উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

বিশ্বযুদ্ধে তাল সামলাবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ ভারতীয় সৈন্যের একটা বড় অংশ অপরাপর যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। যা অবশিষ্ট এখানে ছিল, তার অধিকাংশই ভারতীয় সৈন্য এবং উপরতলার কয়েকজন ইংরেজ অফিসার—বড় নৈবেদ্য-থালের শিখরে একটি সন্দেশের মত অবস্থিত। ভারতের কোনও অংশে অশান্তির সূচনায় সেই ক'জনকে টেনে নিয়ে হাজির করা হ'ত। তার সঙ্গে ছিল আপৎকালীন নানা আইনের মারপ্যাঁচ।

বিপ্লবী নেতারা বুঝলেন যে, এই সুযোগ পরিত্যাগ করা চলে না। ব্যাপক একটা হামলা বেধে গেলে, এত সৈন্য পাওয়া যাবে না, যাতে সকল স্থানের বিদ্রোহ দমন করা যেতে পারে। কার্য্যোদ্ধারের জন্য গুপ্ত পরামর্শ চলতে থাকে এবং বিপ্লবী যুবকদের মধ্যে একটা "গুরুতর ঘটনা"র কথা কতকটা মুখে মুখে চালু হয়ে পড়ে। অস্ত্রশস্ত্র না হলে যুদ্ধের কল্পনা সবই বৃথা। বিদেশ থেকে যখন গোলাবারুদ, বন্দুক,

রাইফেল প্রভৃতি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে তখন দেশের মধ্যে যাতে দলভুক্ত বিশ্বাসী যুবক আহ্বান এলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে, তার ডাক দেওয়া হ'ল।

নাওশেরা থেকে লুধিয়ানা, জলন্ধর, কর্পূরতলা, লক্ষ্ণৌ, মীরাট, কাশী এবং এদের মাঝের সেনা-ছাউনীতে গিয়ে ইংরেজের বেতনভুক্ ভারতীয় সেনাদের "রাজার" প্রতি আনুগত্য বিদায় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল এবং বহুল পরিমাণে সফলতার সম্ভাবনাও হয়েছিল। বাঙ্গলা থেকে বিধ্বংসী বোমা উত্তর-ভারতের নানা স্থানে আমদানী যে হয়েছিল তার প্রমাণ মিললো বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা এবং পাঞ্জাবের লরেন্স গার্ডেনে বোমা-বিস্ফোরণে এক আর্দ্দালীর মৃত্যুতে।

চেষ্টা যে হচ্ছিল তার পরিচয় ঃ

"The principal programme was seduction of Indian soldiers from their allegiance to the king ; to secure arms and ammunitions from private and other sources including Government armoury, from soldiers' barracks and smuggling from outside. Money was to be obtained by raids on Government treasury or looting of private property. .... The movement of troops and supplies to the affected areas were to be stopped by wrecking of trains and railway bridges, communications to other stations to be dislocated by cutting off telegraph wires, etc. etc." (*The Roll of Honour*, pp. 282-3). এসকল তথ্য মামলায় সাক্ষীদের নিকট প্রাপ্ত এবং দলিল-দস্তাবেজ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

মজঃফরপুর, রাজাবাজার কারখানা, দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি সকল জায়গাতেই প্রাপ্ত বোমা একই ধরনের বা একই ফর্ম্ম্‌লায় প্রস্তুত বলে সাব্যস্ত করা হয়। মীরাটে সৈন্য-ছাউনীতে পিংলের নিকট যে বোমা ধরা পড়ে, তা-ও ঐ এক-শ্রেণীরই বোমা। এ ছাড়া, লুধিয়ানা জেলার ঝাবেওয়াল ও নাভা ষ্টেটের লোহটবাদি-তে উচ্চস্তরের বোমা-তৈরী শুরু হয়। ঐকালে আর একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ হয়। আমেরিকা ও কানাডায় বহু পাঞ্জাবী, বিশেষ করে শিখ বসবাস করতেন। এঁদের মধ্যে বেশ কিছুসংখক ছিল, যাঁরা বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সামরিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। হরদয়াল-প্রমুখ নেতাদের আন্দোলনের ফলে এঁদের অনেকেই দেশে ফিরে, প্রয়োজন হলে, স্বাধীনতা-যুদ্ধের সেনা-কটকে যোগ দিয়ে ইংরেজ-বিতাড়নে অংশগ্রহণ করতে চান। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। যে-ভাবে যে-জাহাজে সুযোগ হয়েছে—দলে দলে যুদ্ধার্থী পাঞ্জাবী এসে পৌঁছুলেন ভারতে ; অনেকেই অস্ত্র নিয়ে এলেন সঙ্গে। এইজাতীয় প্রচেষ্টায় 'কোমাগাটা মারু' ও তৎসংক্রান্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার বজবজ রেল-ষ্টেশনের ওপর ঘটে যায়, ১৯১৪ সেপ্টেম্বর ২৯-এ। সে-বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হয়েছে।

এই বিরাট সংগ্রামের পিছনে ছিলেন অনেকেই, বিশেষ করে অভ্যুত্থানের বিভিন্ন কেন্দ্রের নায়করা। তবে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসু—এঁরাই ছিলেন শিরোমণি। এঁদের সঙ্গে বিষ্ণুগণেশ পিংলে ও কাশীর শচীন্দ্রনাথ সান্যালের কথা সংক্ষেপে বলতেই হয়। হরনাম সিং প্রভৃতি আরও অনেকে ছিলেন; বাহুল্যভয়ে সব নাম উল্লেখ করা গেল না।

অশান্ত পাঞ্জাব উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে এবং স্থানে স্থানে গভর্ণমেণ্টের সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধছে। দু'পক্ষেই দু'-চারজন হতাহত হচ্ছে, আর মহাগুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ মামলা রুজু হচ্ছে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। সবাই জানে, এ প্রকাশ্য বিদ্রোহের ফল কি হতে পারে। এ যেন জীবন নিয়ে গেণ্ডুয়া-খেলা। কিন্তু কোথাও ভয়ের লক্ষণ নেই, কেবল যেন মহা আহ্বানের জন্য অত্যুগ্র উদ্বেগ।

ব্যবস্থা হ'ল—১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ২১-এ একই সময় উত্তর-ভারত আগুনের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। খবরটা ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল নানা কেন্দ্রে। এ মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা বিফল হ'ল। ভারতমাতার শৃঙ্খল-মোচনের কাল পূর্ণ হয়নি। পাঞ্জাবে কর্ম্মীদের মধ্যে এক নরাধম কোনও সূত্রে আভাষ পেয়ে যায় এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট সংবাদ পোঁছে দেয়। উত্থানের দিন এগিয়ে, ১৯-এ করা হ'ল। এমনিতেই গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত ছিল, সতর্কতার অবধি ছিল না, তার সঙ্গে গোপন তথ্য যোগ হওয়ায় গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হয়ে উঠলো। সুষ্ঠুভাবে মহাযুদ্ধ-পরিচালনায় কোনওরূপ ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য নানা আইন আগেই পাশ করিয়ে গভর্ণমেণ্ট আটঘাট দস্তুরমত বেঁধে রেখেছিল। স্থানে স্থানে সে-আইন প্রযুক্ত হচ্ছিলই, এখন একেবারে বিরাটাকার তুষারপ্রপাতের মত গড়িয়ে পড়লো কর্ম্মীদের ওপর। আইনের টানা-জাল পেতে রুই-কাতলা-চুনো-পুঁটি সব ছেঁকে তোলা আরম্ভ হ'ল; তল্লাসী ও গ্রেপ্তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ফৌজের মধ্যে তোলপাড় করে ফেলা হ'ল। সন্দেহভাজনদের এক কেন্দ্র থেকে বহুদূরে কোনও কেন্দ্রে পাঠানো হ'ল; কোথাও হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া, কোথাও-বা সামরিক বিচার বা কোর্ট-মার্শালে নিধন করা হ'ল। পিংলে-প্রমুখ বহু জোয়ানের ফাঁসি হয়েছে, শ'খানেক কালাপানি, আর দুই বা তিনগুণ অতি দীর্ঘ কারাবাসে প্রাণটা কোনও রকমে রক্ষা পেয়েছে মাত্র।

বিরাট বিপ্লবের ঢেউ ভারতের সীমা ছাড়িয়ে শ্যাম, মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্ম্মা অঞ্চলে উত্তাল তরঙ্গ তুলেছিল। স্থানে স্থানে সে-সংগ্রাম যে আকারে দেখা দেয় তাতে কোথাও কোথাও ইংরেজ প্রভুত্ব তিন থেকে সাত দিন পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছিল। সে আক্রমণ ইংরেজের পক্ষে নিজেদের শক্তিতে রোধ করা সম্ভব হয়নি। সে-যুগের "দোস্ত" জাপান এবং একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমেরিকার যুদ্ধ-জাহাজের সাহায্যে প্রাণ ও মান রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। একটু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ইংরেজ তার প্রতিশোধ

নিয়েছে ফাঁসির দড়ি আর রাইফেল-বুলেটের সাহায্যে শত শত স্বাধীনতাকামীর প্রাণ সংহার করে। পরপারে গেলে জাত বজায় থাকবে না,—ভারতের এই মহাসমরে কেবল জাতই অন্তর্হিত হয়নি, প্রাদেশিক পরিচয় সব লোপ পেয়েছিল জীবনের এপারেই। এই অবস্থার পূর্ণ পরিণতি দেখা গেছে নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এর সংগঠনে।

বাঙ্গলার দুই শ্রেষ্ঠ বীরের পরিণতি কি হ'ল, তার পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, রাসবিহারীকে জীবন্ত বা মৃত অবস্থায় হাজির করতে পারলে, গভর্ণমেণ্ট এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা-নিক্ষেপ এবং সমসাময়িক কালে যত বড় বৈপ্লবিক ঘটনা উত্তর-ভারতে ঘটেছিল সে-সবের নায়ক বলে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে ধরবার বহু তোড়জোড় করে। দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রাসবিহারী অন্যতম প্রধান আসামী।

সারা উত্তর-ভারতের পুলিশকে বেহাল করে রাসবিহারী নানা ছলনার সাহায্যে লাহোর থেকে কাশী, চন্দননগর, কলিকাতায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। যখন সঙ্গীরা ফাঁসি গেছে, বিচারে ও বিনা বিচারে বন্দী হয়ে গেছে, কাজ করবার আর সুযোগ নেই, তখনও গভর্ণমেণ্টকে আরও বোকা প্রতিপন্ন করে 'পি. এন্. টেগোর' নামে কলিকাতা থেকে ১৯১৫ মে ১২-ই 'সানুকীমারু' নামে জাপানী জাহাজ চড়ে কলিকাতা পরিত্যাগ করে মে ২২-এ তিনি সিঙ্গাপুর পৌঁছান।

জাপানে নানা বিপদের মধ্যে বাস করেও তিনি কি-ভাবে ভারতের সেবা করে স্বাধীনতা-লাভের প্রায় সর্ব্বোচ্চ ধাপ গড়ে দিয়ে গেছেন, সে-কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

বারাণসী ষড়যন্ত্র

(১৯১৫-১৬)

বাংলার বাইরে, পাঞ্জাব বাদে, বৈপ্লবিক দল বা হিংসাত্মক ঘটনা খুব বেশী দেখা যায় না। তা হলেও ছোট ছেটে কেন্দ্র এখানে-ওখানে গড়ে উঠেছে। এসবের মধ্যে যে দু'-একটা একটু বড় আকার ধারণ করেছে বা বড় করে পুলিশী-ছাপাঙ্কিত হয়েছে, তাদের মধ্যেও বাঙ্গলার যুবকদের দেখতে পাওয়া যায়।

বিপ্লবীদের মিলন-ক্ষেত্র বলে কাশী একটা সুনাম অর্জ্জন করেছিল। তিলক-মহারাজের কাল থেকে কাশীতে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে তার বিশেষ কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু উত্তর-ভারত ও বাঙ্গলার লোকের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সঙ্কীর্ণ এঁদো-গলির মধ্যে গোপনীয় স্থান আবিষ্কার করা সহজ বলে, বারাণসী বিপ্লব-তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়ে পড়েছিল।

১৯১৫ সালে কাশী ভারতীয় গোয়েন্দা-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; তার মূলে যুবক শচীন্দ্রনাথ সান্যালের এক বড় অংশ ছিল। ১৯০৮ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিতির অনুকরণে তিনি সেবক বা যুবক সমিতি গঠন করেন। পুলিশের নজর পড়তে, সে নাম বদলে অন্য নাম রাখলেও, শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক মান উন্নয়নের আড়ালে মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও ঝাপসা দৃষ্টি ছিল না। আর-এক দলের নাম ছিল 'স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন লীগ'।

শচীন্দ্রনাথ একটি বৈপ্লবিক দল গঠনে উৎসাহভরে লাগলেন বাঙ্গলার হট্টগোল লক্ষ্য করে। ১৯১১-১২ সালে তিনি শশাঙ্ক (অমৃত) হাজরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং রাজাবাজার বোমার 'কারখানা'র মাল প্রয়োজন হলে পাবার আর অসুবিধা রইল না। রাসবিহারীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ অনেক আগে হতেই ছিল, তারপর তিনি যখন প্রায় সমস্ত ১৯১৪ সালটি পুলিশের নাকের ডগায় বসে কাটিয়ে গেলেন তখন সংগঠন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠলো। দিল্লী ও পাঞ্জাব থেকে নেতারা এসে দেখাসাক্ষাৎ করে যেতেন, ফলে বিপ্লবের হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে একটা মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

শচীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মীরা বিশেষ করে—(১) বিদ্রোহাত্মক সাহিত্য ('স্বাধীন ভারত', 'লিবার্টি' পত্রিকা) ছড়াতে আরম্ভ করলেন। এতে প্রকাশ্য অভ্যুত্থান, ইংরেজ-রাজকর্ম্মচারী-হত্যা, সামনাসামনি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতি প্রভৃতির জোর সমর্থন করা হ'ত ;

(২) সেনা-ছাউনীর মধ্যে গিয়ে সৈনিকদের মন ভারাক্রান্ত করা এবং রাজানুগত্য ভঙ্গ করার চেষ্টা। এ কাজে বড় বড় ব্যারাকের প্রায় একটি-দুটিতে প্রভাবিত করা সম্ভব হয়েছিল ;

(৩) বিভিন্ন কেন্দ্রে বোমা বা বোমা-প্রস্তুত-বিদ্যা মীরাট, দিল্লী ও পাঞ্জাবে সববরাহ—এটা ছিল অন্যতম কাজ।

বাঙ্গলার মত ডাকাতি বা লুণ্ঠন, বোমা-ছোঁড়া বা খুনখারাপি কোথাও হয়নি। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর-বিভাগ এ-প্রচেষ্টার সংবাদ রাখতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে পত্রিকা দুটি এবং অন্যান্য সংক্ষিপ্ত প্রচার-পত্রিকা পুলিশের হস্তগত হওয়ায় যুক্তপ্রদেশ সরকার ১৯১৫ সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ করে দিয়েছিল। প্রায় ডজন আড়াই ধরে টালবাহানা, পরীক্ষা ও জবানবন্দী শেষ করে এক বড়রকমের ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হ'ল। প্রথমেই বলা হয় যে, এটা দিল্লী-পাঞ্জাব ষড়যন্ত্রের অংশ। নভেম্বর থেকে মামলা চলতে থাকে এবং ১৯১৬ ফেব্রুয়ারী ১৪-ই স্পেশ্যাল কমিশনার রায় প্রকাশ করেন। দুটো-একটা ছিটেফোঁটা বাদ যাবার পর সাজার পরিমাণ একেবারে গুরুতর হয়ে দেখা দেয়।

(১) শচীন্দ্রনাথের তিন দফা অভিযোগের প্রত্যেকটিতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

দণ্ড হয়। সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশও হয়। সুখের মধ্যে, তিন কেতা সাজা হলেও দণ্ডটা সমকালীন ভোগ করার কথা।

(২) গণেশীলাল খাস্তা ও (৩) দামোদরস্বরূপ (মাষ্টারজী)-এর সাত বছর করে সশ্রম ; (৪) লছমীনারায়ণ, (৫) নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, (৬) নগেন্দ্রনাথ দত্ত (গিরিজাবাবু) ও রাজপুতনার (৭) প্রতাপ সিং (বয়স ১৬।১৭)—এঁদের পাঁচ বছর করে সশ্রম ; (৮) আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (৯) বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, (১০) কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের তিন ও (১১) আর একজনের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। গিরিজাবাবুর অতিরিক্ত পাঁচশ' টাকার অর্থদণ্ড হয়।

মামলা চলার সময় কয়েকজন পলাতক ছিলেন এবং তাঁদের গ্রেপ্তারের জন্য সরকারী পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। পুলিশ তাঁদের তল্লাসী করে বেড়াতে থাকে। এই পলাতক-তালিকায় রাসবিহারীর নাম ছিল। তখন তো বটেই, সেই বড়লাটের ওপর বোমা পড়ার (১৯১২ ডিসেম্বর ২৩) পর থেকে কয়েকটা প্রদেশের ছোট-বড় শত শত পুলিশ খোঁজ করে চলেছে, কিন্তু সে-সিংহ কখনও ফাঁদে পড়েননি।

অপর দু'জন পরে গ্রেপ্তার হয়ে যান। (১২) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গৌহাটীতে ১৯১৮ জানুয়ারী ১১-ই আর (১৩) প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য বাঁকিপুরে ১৯১৮ ফেব্রুয়ারী ৪-ঠা গ্রেপ্তার হন। তাঁদের দু'জনকে নিয়ে 'বেনারস অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলা' জুড়ে দেওয়া হয়। ১৯১৮ মে ২২-এ নরেন্দ্রের সাত বছর ও প্রিয়নাথের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়েছিল, সে-কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। এসকল কয়েদীর ওপর কি দারুণ নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করা হয়েছিল, নলিনীর ব্যাপারে কিছুটা বোঝা যায়। ১৯১৮ মার্চ নাগাদ নলিনী বৃদ্ধা মাতাকে লেখেন যে, প্রায় দু'বৎসর নির্জ্জন কারাবাস এবং নিজেকেই প্রচুর পরিমাণ গম-ভাঙ্গা বা সূতালি পাকাতে হয়। বাগানে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে কাজ করতে দেওয়া হয় না। এতদিন একটানা নির্জ্জন কারাবাস কঠোর জেল-আইনের কোথাও বলে না। স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, দেহ অস্থিচর্ম্মসার।

তারপর আর বেশ কয়েক মাস খবর নেই। একটা বেনামা হিন্দী চিঠি নলিনীর মায়ের নিকট আসে যে, তাঁর ছেলের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ; সেজন্য মস্তিষ্কের অবস্থা বড়ই দুর্ব্বল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে মা তার করলেন। সংক্ষেপ এক উত্তর আসে যে নলিনী উন্মাদ ; তাকে বেরিলী উন্মাদাশ্রমে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বন্দী-জীবনের একটি ক্ষুদ্র আলেখ্য মাত্র। সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে গেলে স্বতন্ত্র মহাভারতের মত এক গ্রন্থের প্রয়োজন।

গিরিজাবাবুর কাহিনী এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। নগেন যৌবনকাল

থেকে রিভলভার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। বছর পনেরো বয়সে এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পিতার রিভলভার নিয়ে কৌতুক করবার সময় তাঁর বাঁ-পায়ের উরু ভেদ করে গুলি চলে যায়; বহুদিন কষ্টভোগের পরে তিনি আরোগ্যলাভ করেন।

শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জে ছাত্রাবস্থায় তিনি বঙ্গবিভাগ-আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। পরে তিনি রাসবিহারী বসুর অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে গণ্য হন। রাসবিহারীর সমগ্র পলাতক জীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং তাঁকে কলিকাতা বন্দর থেকে জাপানে যাওয়ার জাহাজে উঠিয়ে আসেন।

বারাণসী ছাড়া, 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা'য় তাঁর খোঁজ চলছিল। জেলে অবস্থান-কালে তাঁর রক্ত-আমাশয় হয় এবং ১৯১৮ সালে আগ্রা জেলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

'বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলা' হয়ে যাবার পর যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবী আন্দোলন বেশ ঝিমিয়ে পড়ে। বাঙ্গলা বা পাঞ্জাবের মত উপদ্রব ছিলই না। যা ছিল তাও নির্ব্বাপিতপ্রায়।

ঘটনা-প্রবাহ (১৯১৫)

এতাবৎ যে পদ্ধতিতে ডাকাতি চলছিল, তার পরিবর্ত্তন ঘটে বেশ খানিকটা। পুলিশ-অধ্যুষিত কলিকাতায় বড় হাঙ্গামা করতে অনেক সাহসের দরকার এবং কাজও উদ্ধার করতে হয় ত্বরিতে। আক্রমণ ও পলায়নের জন্য চাই দ্রুতগামী যান।

এসকল ত্রুটি অনেক পরিমাণে দূর করতে সমর্থ হন বিপ্লবীরা। তাঁরা নূতন পন্থা গ্রহণ করেন এবং লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে যায়। বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে। জার্ম্মান ষড়যন্ত্র বা ব্যাপক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার সঙ্গে পুলিশ-কর্ম্মচারীদের ওপর হামলার সংখ্যা ও বৈপ্লবিক ঘটনা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চেষ্টা সফল হয়েছে।

পুলিশ দস্তুরমত বিব্রত হয়ে পড়ে। প্রতিকারের উপায়স্বরূপ তারা কলিকাতার প্রায় সব বড়রাস্তার মোড় বা সংযোগস্থলে গাড়ীর গতি রোধ করবার জন্য রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং (level crossing)-এর ওপর নির্ম্মিত দ্রুত-ওঠা-নামানোর ব্যবস্থাযুক্ত 'কপাট' বসায়। ডাকাতি করে যাতে মোটর নিয়ে ঝট্ করে শহরের বাইরে চলে যেতে না-পারে, তার জন্য এই ব্যবস্থা। তা'ছাড়া যাতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা-বিচারে আটক-বন্দী করে রাখা যায়, সেরকম আইনও পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বিপ্লবীদের উৎপাত-রোধে অসমর্থ হয়ে গভর্ণমেণ্ট এই আইনটির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পাহাড় থেকে ঢল নেমেছে, তাকে আবার উৎসমুখে ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব। বাঙ্গলার হিংসাত্মক বিপ্লবে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

মামুলি খুচরো ডাকাতির সঙ্গে এ-সময় কয়েকটি বড় ধরনের ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল। সে-সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের কাজের ধারার পরিচয় থাকার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে।

যুদ্ধের সমস্ত সময়টা বাঙ্গলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা অত্যন্ত তীব্র হয়েছিল, বিশেষ করে ডাকাতি, খুন, জখম প্রভৃতি খুবই বৃদ্ধি পায়। সরকারী নীতিতে ষড়যন্ত্র মামলা জুড়ে দেওয়া চলেছে খুব ; তার আরম্ভ হয় বরিশালের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলার উদ্বোধনে।

বরিশাল (দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলা)

বরিশাল প্রথম ষড়যন্ত্র মামলার বড় আসামী কয়েকজন ফেরার ছিলেন ; সে-সময় এঁদের ধরা পড়ার জন্যে অপেক্ষা না-করেই প্রথম দফা মামলার শুরু ও নিষ্পত্তি হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ পলাতকদের ধরবার চেষ্টা সমানেই রেখেছিল এবং যথাসময়ে এক-এক-জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছিল।

পাঁচজন আসামী খাড়া করে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে দেওয়া হয়—১৯১৫ জানুয়ারী ৪-ঠা। সেখান থেকে মামলা দায়রায় যায়—মার্চ ২৪-এ। আসামী হলেন পাঁচ জন ঃ

(১) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, (২) মদনমোহন ভৌমিক, (৩) প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, (৪) রমেশচন্দ্র (দত্ত) চৌধুরী ও (৫) খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সেসনে মামলা শুরু হয় মে ২৪-এ এবং রায় দেওয়া হয় নভেম্বর ২৯-এ। তাতে একজনের ১৫ বছরের দ্বীপান্তর আর চার জনের প্রত্যেকের ১০ বছরের দ্বীপান্তর আদেশ হয়।

মামলার আপীল হ'ল হাইকোর্টে। ক'দিন শুনানির পর রায় প্রকাশিত হ'ল—১৯১৬ জুলাই ১০-ই। তাতে দেখা গেল দু'জন মুক্তিলাভ করেছেন আর তিনজনের দণ্ড বহাল আছে, অবশ্য দু'জনের ক্ষেত্রে পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস করা হয়েছে।

মোট দাঁড়াচ্ছে—

আসামী	দায়রা (রায়)	হাইকোর্ট
	১৯. ১১. ১৫	১০. ৭. ১৬
	দ্বীপান্তর	দ্বীপান্তর
ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী	১৫ বছর	১০ বছর
মদন ভৌমিক	১০ „	১০ „
খগেন চৌধুরী	১০ „	৭ „
রমেশ চৌধুরী	১০ „	মুক্তি
প্রতুল গাঙ্গুলী	১০ „	মুক্তি

খগেনের পূর্ব্বে তিন বছর সাজা হয়েছিল—১৯১৪ জুন ১৫-ই, বরানগর ডাকাতি মামলায়। বর্ত্তমান সাত বছর সাজা পূর্ব্ব-মেয়াদ শেষ হবার পর শুরু হবে—অর্থাৎ মোট দশ বছরই রয়ে গেল।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার জের রায়-দানের সঙ্গে মেটেনি ; বেশ কিছুদিন পরে পলাতক আসামী চণ্ডীচরণ কর গ্রেপ্তার হন। তখন চণ্ডী ক্লান্ত, মামলা চালাবার অর্থ-সঙ্গতি-হীন। সুতরাং অপরাধ কবুল করলেন। ১৯১৫ মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ত্রিপুরা ঃ বাগমারি— ধনীর ঘরে ডাকাতি—বাগমারি গ্রাম, থানা লখিমপুর। ১৯১৫ জানুয়ারী ২২-এ মধ্যরাত্রে জন-বিশেক যুবক গিরীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়ী চড়াও হয়। বাড়ীর চারজন পরিচারক ও পিওনকে হাত-পা বেঁধে একটা ঘরে বন্ধ করে ফেলে আগন্তুকরা হাজার-চারেক টাকা নিয়ে নিরাপদে প্রস্থান করে।

রংপুর ঃ কুরুল— রংপুরে লালমণির হাট থানার অখ্যাত গ্রাম কুরুল। জন-বিশ-পঁচিশ "ডাকাত" ১৯১৫ জানুয়ারী ২৩-এ গভীর রাত্রে সেখানে হাজির হয়। এত লোক মিলে এলে কি হয় ? হিসেবে ঠিকে-ভুল ; মালিক কালীনাথ সরকার নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। লুঠের পরিমাণ মাল-সমেত সাড়ে তিনশ' টাকা।

কলিকাতা ঃ গার্ডেনরীচ

কলিকাতার বুকের ওপর ভরা-দুপুরে (বেলা দু'টা নাগাদ) গার্ডেনরীচ (Garden Reach)-এ যে নূতনতর ডাকাতি হয়, তার তুলনা সে-কালে কোথাও ছিল না। ঘটনাটিতে নিখুঁত সংবাদ-সংগ্রহ এবং অতি দ্রুত কাজ উদ্ধার করার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ১২-ই 'বার্ড কোম্পানী'র এক সরকার দু'জন দ্বারোয়ান নিয়ে একখানা ১৫১-নম্বর-যুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকা-ঘোড়ার-গাড়ী করে বদরতলায় অবস্থিত তাদের 'সাউথ ইউনিয়ন মিল' নামে পাটকলের কর্ম্মচারীদের মাহিনা বাবদ ১০-টা পাটের থলি ভরে ১৮,৪০০ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল। যখন গার্ডেনরীচ ও সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে মান্ধাতার আমলের ছ্যাকড়া-গাড়ী এসে পৌঁছেচে তখন একখানা ট্যাক্সি (A-7) এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। সেখানে জন-ছয় বাঙ্গালী যুবক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল, উপরন্তু ট্যাক্সি (A-7)-তে এল আর চারজন। ঘোড়ার গাড়ীর সামনে ট্যাক্সি থামাতে, ঘোড়ার গাড়ী হ'ল অচল। ট্যাক্সি থেকে সব নেমে পড়লো। ঘোড়ার গাড়ীর দরজা খুলে, সরকার (নেপালচন্দ্র বেলাল) ও দ্বারোয়ানদের জোর করে নামিয়ে দিয়ে, সব থলি ট্যাক্সিতে উঠানো হ'ল। থলিগুলির ওজন মন্দ হবার কথা নয়। কারণ তাতে ছিল ৩৪০-খানা নোটে ৩,৪০০ টাকা,

চাঁদীর এক টাকা হিসাবে ১৩,৩০০ টাকা, আধুলি ৯৪০ টাকার আর বাকী সব চার-আনি, দুয়ানি ও ১,৯২০-টা ডবল-পয়সা।

সাত জনকে নিয়ে ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো সহরের দক্ষিণ দিকে, অর্থাৎ বারুইপুরকে উদ্দেশ্য করে। রাজপুরের কাছে একটা টিউব ফেটে গেলেও সেই অবস্থায় সুবুদ্ধিপুর পর্য্যন্ত মোটর চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খুব কাছেই বারুইপুর। সেখানে হরিসাধন নাথের দোকান থেকে একটা ঘোর নীল ও একটা ফিকে লালরঙের তোরঙ্গ যথাক্রমে পৌনে চার টাকা ও পাঁচ সিকিতে কিনে, তার মধ্যে টাকা-পয়সা ভরা হ'ল। ট্যাক্সিখানাকে স্থানীয় একজনের জিম্মায় রেখে, বলে যায় যে, কলিকাতা থেকে মেরামতের জন্য যন্ত্রপাতি আনতে যাচ্ছে।

বারুইপুর ষ্টেশন থেকে দু'খানা ঘোড়ার গাড়ী এনে তাতে টাকার বাক্স তুলে দেওয়া হলে, গাড়ী উত্তরভাগের দিকে চলতে থাকে। সেখানে প্রত্যেক গাড়ী-ভাড়া বাবদ সাড়ে পাঁচ টাকা দিয়ে তারা নৌকা ভাড়া করে ধোসার দিকে চলতে থাকে। পেচুয়াখালিতে এসে তারা নৌকা বদল করে টাকী গিয়ে উপস্থিত হয় ১৫-ই, বেলা ১১-টার সময়। আরও দুটো ট্রাঙ্ক কিনে, সবগুলোতে মাল সমানভাবে ভর্ত্তি করা হলে, একটা গরুর গাড়ী করে রেল-ষ্টেশনে পৌঁছে শ্যামবাজার যাবার জন্য দু'খানা ইণ্টার-ক্লাস টিকিট (নং ৩৭৯ ও ৩৮৪) কেনে। বাক্স-ক'টা বি. টি. বসুর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকলে পাতিপুকুর পৌঁছায় সেই রাত্রিতে আটটার সময়। তারপর দু'খানা দ্বিতীয় ও অপর একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া করে ২০-নং ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীটে সকলে হাজির হয়েছিল। এই বাড়ীর সন্ধান করে এসে পুলিশ রাধাচরণ প্রামাণিককে মসার-পিস্তল সমেত গ্রেপ্তার করে। গভর্ণমেণ্ট বিশেষ বিচলিত হ'ল ডাকাতির ধরন দেখে। কলিকাতার বুকে এ একেবারে নতুন পদ্ধতি। ধড়পাকড় চলতে লাগলো ; প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট থেকে ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮-ই গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২২-এ দু'জন মোক্তার কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও শশীভূষণ দাস প্রত্যেকে ৫০০ টাকার জামিন দাঁড়ালে, নরেনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মামলার দিন মার্চ ২-রা হাজির হবার কথা। মার্চ ১৬-ই খবর হ'ল আসামী ফেরার। জামিনদারদের তলব হলে, জামিনের টাকা, মোট এক হাজার, গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে তাঁরা রেহাই পেলেন। গোপনে এ টাকা তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। নরেন সেই যে উধাও, বহুকাল আর তাঁর পাত্তা পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রথমে সি. মার্টিন ও পরে এম্. এন্. রায় বলে জগতে পরিচিত হয়ে গেছেন।

মার্চ ২-রা এক মামলার শুনানি আরম্ভ ; নরেন বাদে আসামী আর ছ'জন। সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ-যোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণাভাবে সকলকে ছেড়ে দিতে হ'ল।

মামলার দু'জন আসামী সম্পর্কে বিধাতাপুরুষ কিছু ভিন্ন ব্যবস্থা করলেন। তাঁদের কথা পরে বলা হচ্ছে।

রাজসাহী ঃ ধরাইল— নাটোর থানার ধরাইল গ্রামে ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ২০-এ রাত্রি ৯-টার সময় এক দারুণ হৈচৈ পড়ে যায়। ডাকাত পড়েছে মহাজন বিনোদবিহারী চৌধুরীর বাড়ী। আন্দাজ জন ৩০।৩৫ লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ী আক্রমণ করে। অল্পবিস্তর বাধা দেবার চেষ্টাও হয়। বিনোদের এক দ্বারোয়ান নির্ভয়ে ডাকাতদের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে গুলির আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। লুঠের পরিমাণ নিতান্ত কম হয়নি ; অলঙ্কার ও নগদে মোটমাট প্রায় ২৫,০০০ টাকা।

কলিকাতা ঃ বেলেঘাটা— টাকা চাই। ডাক দিয়েছেন নেতা—"দাদা" যতীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়। একটা বড়রকম ডাকাতি হয়ে গেছে, সেটা বিদেশী কোম্পানীর টাকা, কাজেই বিপ্লবীদের মন বেশ প্রফুল্লই ছিল। আরও বহু টাকার দরকার, সুতরাং আরও একটা বড়দরের ডাকাতি সংঘটিত হয় বেলিয়াঘাটার চাউলপট্টি রোডে ললিতমোহন-বৃন্দাবন সাহার চালের আড়তে। ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ২২-এ একদল যুবক ট্যাক্সি করে গিয়ে হাজির ; তখন রাত্রি মাত্র ৯-৩০, হিসেবপত্র সেরে টাকা সব একসঙ্গে জড়ো করা হয়েছে ; নোট ও ধাতুমুদ্রাতে প্রায় ২০,০০০ টাকা। ক্যাশিয়ারকে পিস্তল দেখাতে সে ভয়ে ভয়ে টাকা ছেড়ে দেয়। মাল নিয়ে ডাকাতরা ভেগে পড়ে। ড্রাইভার গোলযোগ করায়, তার জীবননাশ করে পথের ধারে ফেলে রেখে, গাড়ী বেগে রওনা হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

২৪-পরগণা ঃ আড়িয়াদহ— বরানগর থানার আড়িয়াদহ গ্রামে রাত্রি ৯-৩০ নাগাদ জন আট বাঙ্গালী যুবক রিভলভার নিয়ে এপ্রিল ৬-ই হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী উপস্থিত হয়। বড় উদ্দেশ্যের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহারের সম্মিলন ঘটে এখানে। ডাকাতরা হরিচরণের স্ত্রীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখে আর হরিচরণকে লাথি মেরে ফেলে দেয়—মোট ৫০০ টাকার জন্য এত কাণ্ড !

ত্রিপুরা ঃ বলদা— মধ্যবিত্ত গৃহস্থ উপেন্দ্রচন্দ্র দে-র ত্রিপুরা কোতোয়ালি থানার বলদা গ্রামে বাস। ১৯১৫ এপ্রিল ১১-ই কুড়ি-পঁচিশ-জন যুবক রাত ১১-টার সময় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপেন্দ্রের বাড়ী লুঠ করতে যায়। বাড়ীর লোকদের মারধোর করে প্রায় ৪,০০০ টাকা উশুল করে। তাড়াতাড়ি চলে যাবার সময় ৫০০-টাকা-ভরা একটি থলি ফেলে রেখে যায়। উপেন্দ্রের নিকট এটা নিতান্ত "ঘর-পোড়া কাঠ"-এর মতন হ'ল।

নদীয়া ঃ প্রাগপুর-খলিলপুর

ডাকাতি অনেক হচ্ছে ; দু'-একটি প্রাণহানিও ঘটছে। কিন্তু নদীয়ার প্রাগপুর ডাকাতিতে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর জীবনান্ত ঘটে এবং দলের মহাক্ষতি হয়ে যায়।

১৯১৫ এপ্রিল ২৮-এ, দূর থেকে এক নৌকা এসে দৌলতপুর থানার প্রাগপুরে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে কোনও ঘটনা হয়নি। কিন্তু এপ্রিল ৩০-এ, হরিনাথ সাহার দোকানে রাত্রি ৯-টায় একদল লোক চড়াও হয়ে লুঠ করে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩,০০০ টাকা।

সোরগোল ওঠায় গ্রামবাসী এসে জোটে। তখন ডাকাতরা নৌকাতে নদী পার হয়ে খলিলপুর পৌঁছায়। এখানে তারা একটা পোড়ো গোয়ালঘরে রান্নার যোগাড় করে। সেটা একজন গ্রামবাসী দেখতে পায় এবং কৌতূহলবশতঃ নিকটস্থ একজনকে নাম ও নিবাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সদুত্তর না পেয়ে তার সন্দেহ হয় এবং ফাঁড়িতে খবর দেয়। পুলিশ এসে পড়লে, আগন্তুকরা নৌকায় উঠে পড়বার চেষ্টা করে। তাড়াতাড়ি একজনের হাতের বন্দুক পড়ে যায় এবং তার থেকে একটা বুলেট এসে মারাত্মকভাবে একজনকে আঘাত করে। নৌকা ছাড়বার সময় তারা আহতকে সঙ্গে উঠিয়ে নেয়।

সবাই উঠলেই নৌকা ছেড়ে সর্ব্বশক্তি দিয়ে দূরে যাবার চেষ্টা চলতে থাকে। পিছনে গ্রামবাসী চিৎকার করতে করতে ছুটেছে, পুলিশের লঞ্চ-ও এসে পড়েছে। পলায়নের আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে, সঙ্গে মরণোন্মুখ সতীর্থ। সৌভাগ্যক্রমে এ-সময় মেঘে আকাশ ঢেকে একেবারে অন্ধকার করে ফেলে। সঙ্গে প্রবল ঝড়। পালে হাওয়া লাগায় নৌকা তীরবেগে চলতে লাগলো এবং ক্রমশঃ শত্রুর নাগালের বাইরে পৌঁছে গেল।

গুলিদ্বারা আহত যুবকটি শ্রীহট্ট বানিয়াচং-এর সুশীলচন্দ্র সেন। কিংস্-ফোর্ডের হুকুমে বেত খেয়েছেন, 'আলিপুর বোমার মামলা'য় কোনওরকমে দ্বীপান্তর থেকে রক্ষা পেয়েছেন। সেই বীরবালক সুশীল যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন এবং তাঁকে নিয়ে সঙ্গীরা সব বিব্রত—তখন তিনি এক অভিনব অনুরোধ করে বসলেন। তাঁর কথা—বৃথা একটা মৃতদেহ ব'য়ে নিয়ে সকলকে বিপন্ন না করে তাঁর মুণ্ডটা কেটে নিয়ে, দেহটা জলে ফেলে দিতে; তাতে সনাক্ত করা সম্ভব হবে না। সকলেই পুলিশের হাত থেকে বেঁচে যাবে। তাঁর কথামত কাজ করা হয়েছিল। তাঁর মুণ্ড আর দেহ ভিন্নস্থানে পুঁতে ফেলা হয়; পুলিশ কোনও সন্ধান পায়নি।

এতবড় নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের পরিচয় ঐ খলিলপুরের চরে শেষ হয়ে গেল! এ ব্যথা কেবল সুশীলের নয়, সকল দেশবাসীর। তাঁর ছবি পাওয়া যায়, আমরা অন্তরে তাই পূজা করে নিজেদের ধন্য মনে করি।

সুশীল আত্মবিলোপের পথ বাত্‌লে অদৃশ্য হলেন। সঙ্গীরা সকলে পার পাননি। মে মাসের মাঝামাঝি জন-দশেক যুবককে প্রাগপুর ডাকাতি সম্পর্কে

গ্রেপ্তার করা হয়। স্পেশ্যাল কমিশনারের এজলাসে ডাকাতি, খুনের উদ্যোগ প্রভৃতি অভিযোগ পাঁচ জনের বিচার জুলাই ৪-ঠা আরম্ভ হয়েছিল ; আগষ্ট ১০-ই রায় প্রকাশিত হয়। একজন মুক্তি পান, আর চারজন—(১) ফণীন্দ্রভূষণ রায়, (২) ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল ও (৩) আশুতোষ লাহিড়ীকে এক দফায় ১০ বছর ও দ্বিতীয় দফায় সাত বছর সমকালীন-ভোগ দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। আর, (৪) গোপেন্দ্রলাল রায়ের আট বছর সশ্রম কারাদেশ হয়েছিল। সকলেই জীবিত অবস্থায় ফিরেছিলেন ; একযাত্রায় সুশীল সেনের পৃথক্ ফল হয়েছিল।

কুমিল্লা ঃ আওরাইল— মহাজন পাণ্ডবচন্দ্র কুণ্ডুর বাস সরাইল থানার আওরাইল গ্রামে। স্থানীয় লোকে বলে—লোকটি "টাকার কুমীর"। একদল "ভক্ত" ডাকাত "হরি হরি, বম্ বম্" বলতে বলতে ১৯১৫ মে ২৫-এ পাণ্ডবের বাড়ী আক্রমণ করে। ছয় জন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে বাক্স ও সিন্দুক ভেঙ্গে চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকার মত অলঙ্কার ও নগদ নিয়ে চলে যায়।

বাখরগঞ্জ ঃ গাজিপুর— বেশ বড়রকম, অন্ততঃ লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ বিচারে ডাকাতি হয়েছিল—১৯১৫ জুন ৫-ই, বাখরগঞ্জ ভোলা থানার গাজিপুর বন্দরে রাত্রি ১-টা নাগাদ। দলে বেশ পুরু, অন্ততঃ জন-পনেরো তো হবেই ; অস্ত্র-শস্ত্র-সজ্জাও দস্তুরমত। তিন বাড়ী একই রাতে লুঠপাট হয়, মালিকদের নাম অভয়চরণ কুণ্ডু, সীতানাথ কুণ্ডু ও হরলাল পাল। লোহার সিন্দুক প্রভৃতি ভেঙ্গে একাকার। শেষ পর্য্যন্ত হিসাবে দেখা গেল ১৫,০০০ টাকার মত খোয়া গেছে।

২৪-পরগণা ঃ আগড়পাড়া— সে-যুগের 'আগড়পাড়া ডাকাতি' নামকরা। ডাকাতরা হাতে-নাতে ধরা পড়ে, আর মামলার সময় খুনখারাপি হয়। এসব "স্বদেশী" ডাকাতদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হওয়া যে নিরাপদ নয়, আগড়পাড়া ডাকাতি ভাল করে প্রমাণ করে।

১৯১৫ আগষ্ট ২-রা ক্ষেত্রমোহন পাল আগড়পাড়া রেল-ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামেন ; সঙ্গে ছিল ১,০৮০ টাকার নোট। পাঁচ-ছ'জন যুবক সেখানে প্রস্তুত ছিল এবং ক্ষেত্রকে আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নেয়। ট্রেন থেকে বহু যাত্রী নেমেছে, ক্ষেত্রের চীৎকার শুনে একজন একটি আক্রমণকারীর পিছনে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতে সমর্থ হয়। দেখা গেল, আসামী হচ্ছেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী।

বারাকপুর মহকুমা-হাকিমের কাছে আগষ্ট ২৬-এ হাজির করা হলে, স্পেশ্যাল কমিশনারের আদালতে বিচারের হুকুম হয় এবং সেপ্টেম্বর ৬-ই বিচার আরম্ভ হয়ে ১৮-ই রায় প্রদত্ত হয় ঃ আসামীর পাঁচটি বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ।

এ-মামলা-সংক্রান্ত আর একটা ঘটনার উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। বিপিনের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট মামলা করছে এবং তারা যে সাক্ষী ডাকছে অবশ্যই সেটা আসামীর

বিপক্ষে। একটি সাক্ষী প্রভাস মিত্র, তার বয়স মাত্র ১৬। আসামীর সহচররা সাবধান করে দিল যে, এ-কাজে বিপদ আছে। গভর্ণমেণ্টের সাক্ষী, সুতরাং প্রভাসের ফেরার উপায় ছিল না।

আগষ্ট ২৫-এ, এক সুবেশ যুবক আগড়পাড়ায় এক বাড়ীতে রাত্রি ১০-টায় এসে প্রভাসের পিতা মুরারিমোহন মিত্রের নাম করে ডাকে। ভদ্রলোক এক শিশু কোলে করে এসে দরজা খোলামাত্র তাঁকে গোটা-ছয়েক গুলি দিয়ে আঘাত করে আততায়ী সরে পড়ে। মুরারির প্রাণহীন দেহ সেইখানেই লুটিয়ে পড়ে। শিশুটিরও আঘাত লেগেছিল ; শেষ পর্য্যন্ত সে সেরে ওঠে।

রিভলভার ছুড়েই লোকটি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের দিকে ছুটে যায়। সেখানে একখানা মোটর ও দুই বন্ধু অপেক্ষা করছিল। গাড়ী যখন আরোহী-সমেত ছাড়ে তখন এক পুলিশ সন্দেহক্রমে বাধা দিতে যায়। তাকে একটা গুলিতে আহত করে গাড়ী উধাও হয়ে যায়।

ত্রিপুরা ঃ হরিপুর— প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে হরিপুর ডাকাতি সংঘটিত হয়— নাসিরনগর থানার কৃষ্ণপ্রসাদ রায়ের বাড়ী। অবস্থাপন্ন লোক, জন-পরিজনও কিছু আছে। ১৯১৫ আগষ্ট ১৪-ই মাঝরাত্রে বাড়ীতে "ডাকাত পড়েছে"—হৈহৈ রব উঠলো। বাড়ীর লোকরা যথাশক্তি বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। আক্রমণকারীরা মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত। শক্তিমান পুরুষ দ্বারোয়ান জগদ্বন্ধু সাহা প্রথমদিকেই গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হ'ল প্রাণহীন অবস্থায়। মালিক কৃষ্ণকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে প্রাণটা বাঁচিয়েছিল। আমলারা কয়েকজন গুরুতররূপে আহত হয়। একটা দূরপাল্লার রাইফেল, একটা রিভলভার আর প্রায় ১৮,০০০ টাকা ডাকাতদের হাতে আসে। খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ফল কিন্তু কিছুই দাঁড়ায়নি। কেবল কথা হ'ল—সব "ভদ্রলোক" ডাকাত।

ময়মনসিংহ ঃ চন্দ্রকোণা— এবার গৃহস্থবাড়ী ছেড়ে বাজার-লুঠ। সুতরাং ফলটাও খুব ভারী, জন-ত্রিশেক লোক একসঙ্গে জুটেছে। ঘটনাস্থল নালিতাবাড়ী থানার চন্দ্রকোণা বাজার ; তারিখ ১৯১৫ সেপ্টেম্বর ৭-ই। বাজারে এক দোকানে সুখলাল সাউনি ও পাঁচজন লোক রাত্রে শুয়ে আছে। দরজা ভেঙ্গে ডাকাতরা দোকানে ঢুকে পড়লে প্রচুর বাধা পায়—দস্তুরমত একটা খণ্ডযুদ্ধ। ডাকাতদের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। দোকানের প্রতিরোধকারীরা কম-বেশী আহত হয়ে নিরস্ত হয়ে পড়ে। এখান থেকে ডাকাতরা নগদ ১১,০০০ টাকা আর দোকানে রক্ষিত সরকারী একটা বন্দুক আর বেশ কিছু কার্ত্তুজ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

শেষ এইখানেই নয়। জন-ত্রিশেক লোকের "কাজ" চাই। আরও ন'টা

দোকানের মূল্যবান সব জিনিস লুঠ করে; বিশেষ বাধা আসেনি। বন্দুকের শব্দে দোকানীরা সবাই পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

নদীয়া ঃ শিবপুর

প্রাণহানি এবং আসামীদের সাজা ও লুঠের বহর বিচারে 'শিবপুর ডাকাতি' খুব বড় একটা ঘটনা বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। আয়োজন খুব বড় করেই হয়েছিল, কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি সাহসী কর্ম্মী প্রায় বিশ বছরের জন্য কারান্তরালে আবদ্ধ থাকায়, বাইরের কাজ বহুলাংশে ব্যাহত হয়ে পড়ে। ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহের অসুবিধা শিবপুরের ঘটনা থেকে বেশী করে নজরে পড়ে।

নদীয়া জেলা, থানা কোতোয়ালি, গ্রাম শিবপুর; তারিখ ঃ ১৯১৫ সেপ্টেম্বর ৩০-এ; কাল ঃ মধ্যরাত্রি; ধনী মহাজন কৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ী। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় ২২ থেকে ২৫ জন। প্রত্যেকেরই পরিধানে সামরিক বেশ এবং প্রত্যেকেই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; সঙ্গে মসার-পিস্তল ছিল।

গৃহস্বামী ও লোকজন প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে সম্পূর্ণ বিফল হয়। গ্রামবাসী দল বেঁধে শক্তিমত বাধা দিতে চেষ্টা করতে থাকে।

নৌকা ঠিকই ছিল, ডাকাতরা সেটা চড়ে পালাবার ব্যবস্থা করেছে। ঘটনাস্থল ছাড়বার মুখেই বাধা পেয়ে একজনকে গুরুতর আহত করে ডাকাতরা এগুতে থাকে। গ্রামবাসীরা বীরপুর পর্য্যন্ত ন'মাইল সোরগোল তুলে চলেছে। তাদের নিরস্ত করবার জন্য মাঝে মাঝে গুলি চলে এবং একে একে (১) রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (২) কেদার সরকার ও (৩) চারু দাস নিহত হয়।

জঙ্গীপুর পর্য্যন্ত এসে তারা নদীর অপর পারে চলে যায় এবং সেখান থেকে তিন দলে বিভক্ত হয়।

ধরপাকড় প্রচুর চলতে লাগলো; ১৯১৫ ডিসেম্বর ৪-ঠা সরকারী আদেশে এক স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হয়।

জন-ষোলো লোক ধরে শেষ পর্য্যন্ত বারো জনকে আসামী খাড়া করে ১৯১৫ ডিসেম্বর ১৩-ই মামলার আরম্ভ, আর ১৯১৬ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই রায় প্রদত্ত হয়। এর মধ্যে তিন জন মুক্তি পায় আর বাকী ন'জনের সাজা হয়। একজন রাজসাক্ষী হওয়ায় মুক্তিলাভ করে।

(১) হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য দশ বছর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন; (২) ভূপেন্দ্র-কুমার ঘোষ, (৩) সত্যরঞ্জন বসু (ওরফে সতীশচন্দ্র ঘোষ), (৪) শচীন্দ্র (সচ্চিদানন্দ) দত্ত (ওরফে হেমচন্দ্র সরকার), (৫) নিখিলরঞ্জন গুহ রায়, (৬) যতীন্দ্রনাথ নন্দী, (৭) সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, (৮) সানুকূল চট্টোপাধ্যায়, (৯) নরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ লাভ করেন।

কলিকাতা ঃ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট— বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলীর অঙ্গ হিসাবে ডাকাতিকে বড় স্থান দিলে, বলতে হয়, এ-সময়টা সেদিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৫ নভেম্বর ১৭-ই ছ'জন যুবক কলিকাতার বুকে রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় ৮০।১-নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে (বিধান সরণী) 'রক্ষিত এণ্ড ব্রাদার্স'-এর দোকানে ঢুকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে আন্দাজ ৮০০ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

ময়মনসিংহ ঃ মাটিয়া— কিশোরগঞ্জ থানার মাটিয়া গ্রামের রাজনারায়ণ গোপের বাড়ীতে ১৯১৫ নভেম্বর ২১-এ সন্ধ্যার পর জন-পনেরো যুবক চড়াও হয়ে মাত্র ২০০ টাকা নিয়ে যায়। যে বিপদ মাথায় করে এ-কাজে যেতে হয়েছে, তার তুলনায় যে এ-ক'টা টাকা কিছুই নয়, সে-কথা ভেবে দেখারও বোধ হয় সময় ছিল না। নেশা চেপেছে, একজন কিছু সংবাদ ও খানিকটা উৎসাহ দিয়ে ছেড়ে দিলে আর না-হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বী ('রাইভ্যাল') দল একটা করেছে, আমরা কিছু না করলে আর 'ইজ্জত' থাকে না, সে-কারণেও ছোটখাটো ডাকাতি যে না-হয়েছে, তা নয়।

রসুলপুর ঃ ময়মনসিংহেরই আর একটা নগণ্য লুণ্ঠন। গফরগাঁও থানার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম রসুলপুর, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রসন্নকুমার দে-র বাড়ী। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ, ১৯১৫ নভেম্বর ২৬-এ, ১৫।২০ জন "ভদ্রলোক" ডাকাত হাজির হয়ে মাত্র ২৭৫ টাকা পেয়ে অন্তর্দ্ধান করে।

কলিকাতা ঃ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট

গার্ডনরীচ ও বেলেঘাটা এ-দুটো বড় ডাকাতি কলিকাতার বুকের ওপর সংঘটিত হওয়ায় পুলিশ একটু বেইজ্জত হয়েছিল। এর পরে 'কর্পোরেশন (সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ষ্ট্রীট ডাকাতি'তে বিপ্লবীদের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া তো যায়ই, উপরন্তু টাকা-পয়সার দিক থেকেও বিশেষ সুবিধা হয়।

কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে নামকরা রোকড়ের দোকান—অলঙ্কার-নির্ম্মাণ, গহনা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি বন্ধক রাখা, চোটায় টাকা ধার দেওয়া প্রভৃতি কাজ চালাতো ফকিরচাঁদ দত্তর দোকান। ডিসেম্বর ২-রা মোটরগাড়ীতে এসে মাত্র ৫।৬ জন অকস্মাৎ হাজির হয়েই রিভলভার বার করে এবং ভয়-বিহ্বল লোকদের সামনে থেকে গহনাপত্র এবং নগদ টাকাকড়ি চক্ষের নিমিষে গাড়ীতে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল ক্ষতির পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। যতদূর অনুমান করা যায়—যারা গার্ডেনরীচ এবং বেলিয়াঘাটা ডাকাতিতে সংশ্লিষ্ট ছিল, এ লুণ্ঠনকারীরা অন্য দল থেকে এলেও, গার্ডেনরীচ ও বেলিয়াঘাটার পদ্ধতিটা অনুসরণ করেছিল।

কলিকাতা ঃ শেঠবাগান— আবার কলিকাতার ভিতরেই এক গৃহস্থবাড়ীতে ডাকাতি। একেবারে সন্ধ্যার ঠিক পরেই, সওয়া সাতটা, ১৯১৫ ডিসেম্বর ১৪-ই ছ'জন যুবক পিস্তল নিয়ে ১৩-নং শেঠবাগান লেনের কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী হানা দেয়। তিনজন অস্ত্র নিয়ে বাড়ীর ভিতরে যায় আর তিনজন পিস্তল হাতে বাইরে চৌকি দিতে থাকে। একেবারে বঞ্চিত হতে হয়নি। ৫-খানা প্রতিটি এক হাজার টাকার, ৬৫-খানা ১০-টাকার নোট এবং নগদ ৮৫০ টাকা লাভ হয়েছিল।

ময়মনসিংহ ঃ বালিয়াচাপড়া— কাটিয়াদি থানার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম বালিয়া-চাপড়া। ১৯১৫ ডিসেম্বর ২২-এ সন্ধ্যার মুখে, তখনও ভাল করে আঁধার নামেনি, ২০।২৫ জন "ভদ্র" যুবক রামচরণ সাহার দোকানে জোর করে ঢুকে সব তোলপাড় করে যায়। তাদের সঙ্গে উধাও হয় সামান্য কিছু অলঙ্কার ও ৮৫০ টাকা।

কলিকাতা ঃ চাউলপট্টি রোড— নিতান্ত শীতকাল, তাইতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে ; আশেপাশের লোকজন একটু জড়সড়, রাস্তায় কর্পোরেশনের আলো জ্বলছে (অবশ্য তাতে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না)। বেলা ৫-৪৫ মিঃ, ১৯১৫ ডিসেম্বর ২৭-এ, ৫০-নং চাউলপট্টি রোড বাসার জ্যোতিষচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় রেসের মাঠে "বুক-মেকারের" কাজ করে একটি থলিতে ৭৫০ টাকা নিয়ে সবেমাত্র ফিরেছেন। এহেন সময় দুই যুবক অতর্কিতে হাজির হয়ে জ্যোতিষকে মসার-পিস্তল থেকে এক গুলি মারে, তলপেটে লেগে তিনি পড়ে যান ; সতীশ ভয়ে প্রায় হতজ্ঞান। তাঁদের থলি ছিনিয়ে নিয়ে যুবকরা চলে যায়। জ্যোতিষ পরে সেরে ওঠেন।

ত্রিপুরা ঃ কারাতোলা (পাটনাই)— বছরের শেষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল ত্রিপুরার চান্দিনা থানার কারাতোলা গ্রামে। পাড়াটার নাম পাটনাই আর সেখানে বাস করতো অবস্থাপন্ন চাষী নিয়ামতুল্লা। ডিসেম্বর ২৯-এ রাত্রি ১১-টা নাগাদ ১৫।১৬ জন যুবক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে। লুণ্ঠন-কার্য্যে তারা বাধা পেয়েছিল ; উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে। বাড়ীর মালিককে এবং তাঁর মুন্সী ফরাজ আলিকে রিভলভারের গুলির সাহায্যে হত্যা করে ; নিয়ামতুল্লার দুই ছেলেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে রাখে। লুণ্ঠিত সম্পদের পরিমাণ সঠিক পাওয়া যায় না ; অনুমান ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা।

বালেশ্বর (বুঢ়াবালঙ)

বাঙ্গলাদেশে বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনার মধ্যে বালেশ্বর জেলার বুঢ়াবালঙ (বুড়িবালাম) নদীতীরে প্রকাশ্য সংগ্রাম এবং তার সঙ্গে দারুণ বিপর্য্যয়-কাহিনী মনে আসে।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারী চাকরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, তাঁর

রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের জন্য। তিনি বৈপ্লবিক কাজে অনেক বেশী সময় ও মনোযোগ দেওয়ার সুযোগে তৎকালীন ছোট-বড় অনেক দলের অবিসংবাদিত নেতা বলে পরিগণিত হন। তাঁকে হাওড়া ষড়যন্ত্র ও পুলিশ-অফিসার সাম্‌স্‌-উল-আলম্‌ হত্যার মামলায় জড়ানো হয়েছিল। বাঙ্গলার বিপ্লবের ইতিহাসে বীর্য্য, শৌর্য্য ও নেতৃত্বের পরাকাষ্ঠা এবং সহকর্ম্মীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেমের পরিচয় রেখে যাবেন বলে সে-দুটো মামলা হতেই তিনি মুক্তিলাভ করেন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেলে (১৯১১ সাল), তাঁর সরকারী চাকুরীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যতীন্দ্র নামে কণ্ট্রাক্টারি করতেন, কিন্তু কয়েকটি সাহসী অনুচরের সাহায্যে এ-সময় তিনি অক্লান্ত অতন্দ্র সেনাপতি, তাঁর কেবলমাত্র ইচ্ছাপ্রকাশ হলে বীর সৈনিকরা অকুতোভয়ে মহাবিপদের সম্মুখীন হতে দ্বিধা করেনি ; প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে মৃত্যুকে পরিহাস করেছে।

জার্ম্মানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ অন্য লোক স্থাপন করলেও, দূরপ্রাচ্য থেকে অস্ত্রশস্ত্র ভারতে আনবার ব্যবস্থার ভার তাঁকেই নিতে হয়েছে। ভক্তরা অকাতরে সমুদ্র, পাহাড়, মরু ও কান্তার লঙ্ঘন করেছে, হিংস্র-পশু-অধ্যুষিত জঙ্গলের মধ্যে অকুতোভয়ে বিচরণ করেছে, বিষধর সাপের সঙ্গে এক-গাছের ওপর বাস করেছে। তাদের কাছে জেল, জুজু আর ফাঁসির ভয় নির্ব্বাসিত হয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের সময় একটা বড় হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টার কথা বারে বারে বলা হচ্ছে, কারণ এর যে গুরুত্ব তখন মনে হয়েছিল, তার কিছুটাও সফল না হওয়ায় স্মৃতির পাতা থেকে মুছে যাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে হয়তো এত বড় ব্যাপারে না গেলেও হ'ত। সে-বিচার এখন আর করার প্রয়োজন নেই। যে বিরাট কল্পনা রাসবিহারী ও যতীন্দ্রনাথ করেছিলেন, সেটা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, এবং বিফলতার মধ্যেও যে গৌরব থাকে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

যতীন্দ্রনাথের কয়েকটী সহচর কলিকাতা ও সহরতলী একেবারে তোলপাড় করে ছেড়েছিলেন। সরকারী মতে গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটা ডাকাতি, মসজিদবাড়ী ও হেদুয়ার খুন প্রভৃতি সবই তাঁর অনুচর দ্বারা সাধিত হয়েছে। তিনি আত্মগোপন করে চলেছিলেন। নীরদ হালদার (নিহত হন ঃ ২৪.২.১৫) খবর দিলেন—যতীন্দ্র বেঁচে আছেন এবং কলিকাতাতেই তাঁকে দেখা গেছে। তখন পুলিশ একেবারে উঠে-পড়ে লেগে গেল তাঁকে ও তাঁর পলাতক সাথী ক'জনকে ধরবার জন্যে। ক্রমে কলিকাতা থাকা দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো, আর তার সঙ্গে ওড়িষ্যার বালেশ্বর উপকূলে কিছু জার্ম্মান অস্ত্রশস্ত্র খালাস করা যেতে পারে—এই দুই কারণে তিনি বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় ওড়িষ্যায় মহুলদিয়া (কপ্তিপদা) অঞ্চলে "গা-ঢাকা" অবস্থায় রইলেন ; প্রথমে সঙ্গী ছিলেন নীরেন আর মনোরঞ্জন, চিত্তপ্রিয় অল্প কয়েকদিন পরে সেখানে যান ; জ্যোতিষ পাল যান আরও পরে।

কলিকাতা ছেড়ে যাওয়ার পরের বিবরণ ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ('বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', পৃঃ ৪২৭) লিখেছেন ঃ "দেশকর্ম্মী মাখন সেনের সাহায্যে তাঁকে বাগনানের হেডমাষ্টার অতুল সেনের কাছে পাঠানো হয়। ··· পরে তাঁরা মেদিনীপুর তমলুক সহরে যান। সেখান থেকে ······ কুমার আড়া গ্রামে যান। ······ দাদাকে বালেশ্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাওড়া ষ্টেশন থেকে ফণী চক্রবর্ত্তী, ভূপতি মজুমদার ও আর একজন তিনখানি সাইকেল ও পাঁচখানা টিকিট নিয়ে ওঠেন। পাঁশকুড়া ষ্টেশনে দাদা ও নরেন ভট্টাচার্য্য এসে যোগ দেন। ভূপতি মজুমদার বালেশ্বর ষ্টেশন থেকে ফেরেন। বাকিরা বালেশ্বরে থাকেন।" শ্রীনলিনীকান্ত কর আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সেখানে জমি দিয়ে কুঁড়েঘর করবার সাহায্য করেছিলেন মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। পাঁচ পলাতক বীর দু'ভাগে ছিলেন—মহুলদিয়ায় যতীন্দ্র, চিত্ত ও মনোরঞ্জন, আর পাঁচ-ছ' মাইল দূরে তালদিহাতে যান নীরেন ও জ্যোতিষ। জঙ্গলের পণ্য সংগ্রহ করে ব্যবসা, ক্ষেতখামার, দোকান পত্তন করাই যেন তাঁদের উপজীবিকার পথ।

বালেশ্বর থেকে ৩৫ মাইল দূরে কপ্তিপদায় ঘাঁটি গাড়বার আগে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য বালেশ্বরে সাইকেল, ঘড়ি, গ্রামোফোন এবং তৎসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির এক দোকান খোলা হয় ; নাম 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' (Universal Emporium)।

এখানে ছোট একটি ঘটনার উল্লেখ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নীরেন আর মানারঞ্জন যৌবনে ভরপুর দুই অসমসাহসিক যুবক। কলিকাতা ছাড়বার আগে যে-ক'টা বড় দরের ডাকাতি ও খুন হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেক ঘটনাতেই তাঁরা দু'জনে অংশগ্রহণ করেছেন। উন্মুক্ত আকাশ যাঁদের কাছে সীমাহীন মনে হচ্ছে না, অশ্রান্ত উদ্বেল সমুদ্র যাঁদের চিত্তের চঞ্চলতার কাছে উপেক্ষণীয় বলে মনে হবে, এমন ক'টি দুর্দ্দান্ত প্রাণী ক্ষুদ্র অন্ধকার প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রাণরক্ষাকল্পে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হওয়ায়—মুক্তির জন্য যে-কোনও বিপদবরণে প্রস্তুত, সে-অবস্থায় যখন পুলিশের দৃষ্টি থেকে দিগন্তপ্রসারী উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে পড়লেন, নীরেন আর মনোরঞ্জন,—তখন তাঁরা "দাদা"র একটু আড়ালে নর্ত্তন-কুর্দ্দন জুড়ে দিলেন ; গলা ছেড়ে গানের দু'চার কলি আউড়ে দিলেন। তাঁদের যৌবনসুলভ স্ফূর্ত্তি যেন বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের মত উচ্ছল হয়ে উঠলো। মনোরঞ্জনের হাতে এক মসার-পিস্তল, যেন খেলার গুল্‌তি, লাট্টু কি ডাংগুলি,—এমনিই তাঁরা এই প্রাণান্তকারী বস্তুটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

নীরেনকে মনোরঞ্জন "পরিহাসবিজল্পিতং" জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাঁর মরতে ভয় করে কিনা। 'মসার'টা তখন নীরেনের দিকে তাক করা রয়েছে। নীরেন বলেছিলেন যে, বাজে কথায় কাজ নেই, "পরীক্ষা প্রার্থনীয়"। মনোরঞ্জন তাঁর প্রশ্নটা আবার যাচাই করে নিলেন, আর মনে জানেন যে, পিস্তলে নিশ্চয়ই টোটা নেই—

অন্তঃসারহীন ফাঁকা। সেই বিশ্বাসে দিলেন ঘোড়া টিপে। সর্ব্বনাশ! "দুম" করে আওয়াজ; একটা বুলেট ছুটে গিয়ে লাগলো নীরেনের হাঁটুর ঠিক নীচে। মাংসের ভিতর ঢুকে ওপার দিয়ে বেরিয়ে ছুটে চলে গেল। নীরেন হাসছেন, মনোরঞ্জন একেবারে হতভম্ব। কোথায় ডাক্তার? কোথায় বদ্যি? ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে সঙ্গে ছিল কুইনিনের বড়ি; গুঁড়ো করে ক্ষতস্থানে টিপে বেঁধে দেওয়া হ'ল। চলাফেরায় যেটুকু অসুবিধা, তা'ছাড়া নীরেন আর কোনও 'টুঁ' শব্দটি পর্য্যন্ত করলেন না। গোপনপথে সংবাদ কলিকাতায় এলে, প্রকৃত চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। গুলি হাড়ে লাগেনি, সুতরাং বিনা হাঙ্গামায় যথাকালে ক্ষত শুকিয়ে নীরেন নিরাময় হয়ে উঠেছিলেন।

"দাদা" সঙ্গীদের নিয়ে আছেন সেখানে খানিকটা মনোকষ্টে। কর্ম্মময় জীবন থেকে বাধ্য হয়ে দূরে সরে থাকা তাঁর পক্ষে বড় ক্লেশদায়ক হয়ে উঠেছে। জার্ম্মান অস্ত্রশস্ত্র আসার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। আশপাশে বিশেষ লোকজন নেই, মেলামেশার সুযোগ নেই, বিশেষ করে তাঁদের কোনও গুরু প্রয়োজনই নেই। ক'টি যুবক নিয়ে কালক্ষেপ করা। তাঁরা শরীরচর্চ্চা করেন, পিস্তল ছোড়েন, গাছে চড়েন, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি ও নকল দ্বৈরথ সমরেরও মহড়া দেন।

অবস্থা খুব বেশীদিন এভাবে চললো না, বিপদ ঘনিয়ে আসতে আরম্ভ করে দিল। 'হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স' অফিস খানাতল্লাসীর সময় কাগজপত্র থেকে আবিষ্কৃত হয় ঐ কোম্পানীর কারবার, বিশেষতঃ টাকাকড়ির লেন-দেন ব্যাটাভিয়ায় অবস্থিত এক সি. এ. মার্টিনের সঙ্গে চলছে এবং ঘটনাসূত্রে পুলিশ টের পায় যে, এই লোকটি ১৯১৫ জুন ১৫-ই মাদ্রাজে এসে পৌঁছেচে।

ঐ তারিখেই "যাদুগোপাল মুখার্জী, ৬২-নং বেনিয়াতলা লেন, কলিকাতা"র ঠিকানায় এক টেলিগ্রাম আসে: "এখানে পৌঁছেচি, আজ রাত্রেই বালাশোর রওনা হচ্ছি; আশা আছে সেখানে কাকেও দেখতে পাবো। —হোয়াইট।" (Arrived here, starting to-night (for Balasore) to see somebody there. White".)

এই টেলিগ্রাম-ই বিপদ শীঘ্র টেনে এনে দিয়েছিল। পুলিশের বুঝতে আর বাকী রইলোনা যে, বালেশ্বরে গুপ্তভাবে কেউ কেউ বাস করছেন। এদিকে কানাঘুষা চলছে, যতীন হয়তো বালেশ্বরে গেছেন। দুটো সংবাদ যোগ করে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি ঘুরে গেল বালেশ্বর অভিমুখে। পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর নেবার ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে ধোঁয়ার আবরণ ধীরে ধীরে কাটতে লাগলো।

খুচোখাচা কাঁচা শিকারীদের বাঘ ধরতে পাঠানো চলে না; নামকরা শিকারী চাই, তা না হলে শিকারীরই প্রাণনাশের সম্ভাবনা। সুতরাং ১৯১৫ সেপ্টেম্বর ৩-রা পুলিশের বড় বড় হোমরা-চোমরা—টেগার্ট, ডেনহাম ও বার্ড বাছাই-করা পুলিশ নিয়ে রওনা হলেন বালেশ্বরের দিকে। 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'-এর খবর তো জানাই

ছিল। বালেশ্বর পৌঁছেই 'এম্পোরিয়াম' খানাতল্লাসী হ'ল সেপ্টেম্বর ৫-ই। মানুষ যারা ছিল সব বস্তাবন্দী অর্থাৎ গ্রেপ্তার হয়ে গেল ; আপত্তিজনক মালপত্র বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। মেঝেতে মাটীর ওপর গোপালবাবুর এক পত্র পাওয়া গেল 'এম্পোরিয়াম'-এর কর্ম্মাধ্যক্ষকে লিখিত। দোকানের মালিক সরাসরি বলে দিলেন—গোপাল রায়কে তিনি চেনেন না। পুলিশ ছাড়বার পাত্র নয়। স্থানীয় লোকদের কাছে খোঁজ পাওয়া গেল যে, গোপালবাবু দোকানের মালিকের বন্ধু, মাঝে মাঝে দোকানে আসেন এবং কপ্তিপদায় মহুলদিয়া মৌজায় (নীলঘেরী ষ্টেট) তাঁর ইজারা-নেওয়া জমি আছে। ('গোপাল'—শ্রীনলিনীকান্ত কর-এর ছদ্মনাম)।

কপ্তিপদা-মুখে পাড়ি জমালেন পুলিশপুঙ্গবরা—ডেনহাম ও বার্ড ; ময়ূরভঞ্জ দরবারে গিয়ে যানবাহন চাইলেন কপ্তিপদা যেতে হবে। হাতী সংগ্রহ করে, তাই চড়ে যাত্রা হ'ল শুরু ; মহুলদিয়া "আশ্রম" থেকে বেশ কিছুটা দূর থেকে যখন গলার ঘণ্টা বাজিয়ে হাতী চলেছে, সাহেব ও পুলিশ হস্তিপৃষ্ঠবাহী ও পদাতিক, তখন স্থানীয় লোকরা কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সংস্কারবশে তাদের মনে হয়েছিল যে, এই অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গে "সাধুদের" সেই নূতনতর কুঁড়েখানার সঙ্গে হয়তো কোনও যোগসূত্র আছে।

খবর দিতেই হবে সেই কুটীরবাসী প্রাণী তিনটিকে, যাঁদের তারা শক্তি, সেবা ও করুণার "অবতার" বলে জানে। এ ক'মাসেই (ছ'মাসের সামান্য বেশী) যে তাঁরা আপন হতেও আপন হয়ে পড়েছেন ! তাদের আপদে-বিপদে ও ভয়ডরে একবার খবর পেলেই যে "সাধুবাবা" ছুটে আসেন, সঙ্গে থাকে এক বা দু'জন চেলা। প্রাণপণ ছুটে তাদেরই একজন এসে খবর পৌঁছে দিল যে, সিপাইরা এদিকে আসছে ; লক্ষণ মোটেই শুভ নয়।

হাতিয়ার নিয়ে "দাদা" তৎক্ষণাৎ রওনা দিলেন, সঙ্গে চিত্ত ও মনোরঞ্জন। তিনি ইচ্ছে করলে হয়তো চলে যেতে পারতেন নিরাপদ পথে, কারণ বেশ খানিকটা সময় তিনি পেয়েছিলেন। তা হয় না ; তালদিহাতে আছেন নীরেন আর জ্যোতিষ, তাঁদেরও সঙ্গে নিতে হবে। পিছনে যমদূত ধাওয়া করে আসছে। সাড়ে পাঁচ মাইল হেঁটে গিয়ে তাঁদের পেলেন এবং একসঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব যেন মহাপ্রস্থানের পথে পাড়ি জমালেন।

যথাকালে পুলিশকর্ত্তারা সদলবলে ৬-ই রাত্রে মহুলদিয়া পৌঁছে, ভোররাত্রে তল্লাসী জুড়ে দিলেন তন্ন তন্ন করে। কাগজপত্র যা পাওয়া গেল তার সবই হস্তগত করা হ'ল। তার মধ্যে বিশেষ করে ছিল পেনাং-এ এক পত্রিকার জুলাই-এর এক 'কাটিং' (পত্রিকার কর্ত্তিতাংশ)। তাতে ছিল সন্দেহজনক ম্যাভেরিক-এর বোঝাই মালের খবর। আর একটা ছিল—সুন্দরবনের রায়মঙ্গল এলাকার এক নক্সা-চিত্র। এতে বিশেষ করে দেখানো ছিল ষ্টীমারে রায়মঙ্গল যাবার গতিপথ। আরও ছিল

কিছু বুলেট ও বারুদ, ক'টা তরবারি, ধনুক ও তীর, একটা আত্মরক্ষার সরঞ্জাম এবং তিনটি সঙ্কেত জানাবার নিশান (signalling flags)।

এই খানাতল্লাসী দলে ছিলেন বালেশ্বরের জেলা-শাসক। সন্দেহভাজন লোকদের যখন পাওয়া গেল না, তখন দিকে দিকে মহকুমা, থানা, জমাদার, চৌকিদার, দফাদার, ডাক ও রেল-বিভাগ, নৌকার মাঝি, হাটের আড়তদার প্রভৃতি সকল ঘাঁটি ও লোকদের কাছে সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল যে, "বাঙ্গালী ডাকাত" ঘুরে বেড়াচ্ছে; সে-সম্পর্কে কোনও খবর পেলেই যেন নিকটস্থ থানা, ফাঁড়ি, সরকারী কর্ম্মচারী, ডাকঘর প্রভৃতি স্থানে সেটা অবিলম্বে পৌঁছে দেয়। ময়ূরভঞ্জ দরবারকে এ-বিষয়ে দৃষ্টি রাখবার আদেশ দেওয়া হ'ল—যেন সে-রাজ্য থেকে আসামীরা কোনরকমে বেরিয়ে যেতে না পারে। সমগ্র বড়রাস্তার ওপর চৌকি বসে গেল। গ্রামবাসীদের কাছে ডাকাতের বিবরণ দিয়ে, ধরে দেবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হ'ল।

পঞ্চবীর বেরোলেন তালদিহা থেকে। আগে রেল-লাইন পৌঁছে, পরে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করতে হবে। লাইনের প্রায় কাছাকাছি হরিপুর-আড়িয়া গ্রামের কাছে এসে বুঝলেন জাল ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূর। সাধারণ লোকেও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে; যে-কোনও সময়ে বিপদ ঘটতে পারে।

ফিরলেন তাঁরা উল্টো দিকে—উপযুক্ত পথের সন্ধান হ'ল লক্ষ্য। সেপ্টেম্বর ৯-ই সকালের দিকে তাঁরা বুড়িবালাম (বুঢ়াবালঙ) নদীতীরে এসে নৌকা ডেকে পার হবার জন্য এগিয়ে গেলেন। নৌকা ভাড়া করতে বেশ কিছু সময় কেটে গেল। তাঁরা পার হচ্ছেন, ইতিমধ্যে একজন ছুটে গিয়ে স্থানীয় দফাদারকে খবর দেয় যে, "ডাকাত"-দের দেখা গেছে। এরই মধ্যে একজন এগিয়ে এসে নবাগতদের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করে। উপেক্ষা পেয়ে এবং যে উত্তর পেলে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে, তারা পিছু পিছু চলতে আরম্ভ করে।

"দাদা" সঙ্গীদের নিয়ে বাঁধের রাস্তা ধরে চলেছেন। গোবিন্দপুর গ্রামের কাছে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। পিছু নেবার লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ভয় দেখাবার জন্য পিস্তল দেখানো হ'ল। তারা দেখে এঁরা মারেন না; খুব বেশী হয়তো, পিস্তলের দু'-একটা ফাঁকা আওয়াজ করেন, কিন্তু তাতে লোকের ক্ষতি হয় না। শেষটা পশ্চাদ্ধাবনকারীদের একজন এসে পথ রুদ্ধ করে থানায় যাবার জন্য জিদ ধরে। তাদের একরকম ঠেলে দিয়ে "দাদা" ও সঙ্গীরা বেলা ১১-টা নাগাদ দামুদা গ্রামে এসে পৌঁছান। এখানে উপদ্রব আরও বাড়ে এবং মনোরঞ্জনের পিস্তলের গুলিতে আহত হয়ে একজন পড়ে যায়।

আবার যাত্রা শুরু। বাঁধ-রাস্তা ছেড়ে তাঁরা মাঠের দিকে নেমে পড়েন এবং পায়ে হেঁটে একটা ছোট নদী পার হয়ে চষাখন্দ গ্রামে এসে পৌঁছান। নিরুপায় হয়ে নদীর উঁচু বাঁধ বা পাড়ের পিছনে একটা প্রকাণ্ড উইঢিবির পিছনে তাঁরা আশ্রয়

গ্রহণ করেন। এতক্ষণে বালেশ্বর থেকে দূরপাল্লার বন্দুকধারী পুলিশ এসে পড়েছে। তখন দু'পক্ষেই গুলি-বিনিময় চলতে থাকে। পুলিশের কতজন মরলো সে-খবর উপেক্ষা করে বলতে হয়—বাঙ্গলামায়ের গৌরবের ধন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরের মৃত্যু বরণ করেন, সেপ্টেম্বর ৯-ই।

"দাদা" নিজে গুরুতর আহত। গুলি লেগে চিত্তর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে; প্রাণহীন রক্তাপ্লুত দেহটা একহাতে তিনি নিজ কোলে তুলে নিলেন। অন্য হাতে পিস্তল-ছোড়া চলছে; তাঁর তলপেটে এসে গুলি লাগলো; লুটিয়ে পড়লেন। জ্যোতিষের বুকের ভিতর গুলি প্রবেশ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন সেনাপতি যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিলেন। নীরেন ও মনোরঞ্জন হাত উঁচু করে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি জ্ঞাপন করলেন।

মৃত, মরণোন্মুখ, আহত এবং অনাহত সকলকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হ'ল,—"দাদা" ও জ্যোতিষ পেলেন বালেশ্বর হাসপাতালে স্থান, রক্ষী-পরিবৃত অবস্থায়। সকালে সামান্য চেতনা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে "দাদা" দাঁত দিয়ে ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজ প্রাণপণে দূর করে দিতে চেষ্টা করলেন। প্রবলবেগে রক্তক্ষরণ হতে লাগলো; অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় দেশপ্রেমিক, অমিততেজা বীর সেনাপতি, মরণজয়ী, বাঙ্গলামায়ের প্রিয়তম সন্তান চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হলেন—পরদিন চিরস্মরণীয় সেপ্টেম্বর ১০-ই ভোর পাঁচটায়।

জ্যোতিষ সেরে উঠেছিলেন—অদৃষ্টে তাঁর অভাবনীয় দুঃখভোগ আছে বলে। সেপ্টেম্বর ২২-এ তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। তখন নীরেন ও মনোরঞ্জনের স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের কাছে অক্টোবর ১-লা বিচার আরম্ভ হয়—দণ্ডবিধি আইনে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন, খুন, অস্ত্র-আইন-ভঙ্গ ইত্যাদি অপরাধে বিচার। তাঁদের পক্ষ সমর্থন করতে আসবার সাহস কুলিয়ে উঠলোনা উকিল-মহলে। এ-সময় কল্পনাতীত সাহস দেখিয়ে প্রতিবাদী উকিল দাঁড়িয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ফলই ফলেছিল। অক্টোবর ১৬-ই রায় প্রদত্ত হয়। তাতে নীরেন আর মনোরঞ্জনের ফাঁসি এবং জ্যোতিষের ১৪ বছরের জন্য দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। আপীল বা লাটের কাছে আবেদন করে ফল কি দাঁড়ায় বোঝবার জন্য কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে দুই বন্ধুকে ১৯১৫ নভেম্বর ২২-এ বালেশ্বর জেলে বলি দেওয়া হয়।

বাকী রইলেন জ্যোতিষচন্দ্র পাল। যথাসময়ে তাঁকে আন্দামান পাঠানো হয়েছিল। সেলুলার জেলের অমানুষিক অত্যাচারে অভিযুক্ত লোকটি পাগল হয়ে যান। তখন তাঁকে বহরমপুর জেলে এনে যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তিনি নিরাময় হয়ে ওঠেন। বাড়ীর লোক এসে দেখাসাক্ষাৎ করে যেতেন, এবং একবার তিনি নিজ ব্যবহারের জন্য কিছু বস্ত্রাদি দিয়ে যাবার কথা বলেন।

ইতিমধ্যে জেল থেকে তাঁর মুক্তির দিন-তারিখ তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়; আর বোধ হয় মাত্র সপ্তাহ-দুই বাকি। সুতরাং বাড়ীর লোক যখন সাক্ষাৎ করে, তিনি হৃষ্টচিত্তে আনীত মালপত্র ফিরিয়ে দেন। কঠিন-রোগ-মুক্ত হয়েছেন, কালাপানি থেকে ফিরে এত বৎসর বাদে বাড়ী ফিরবেন, সংশ্লিষ্ট সকল লোকই আনন্দে ভরপুর।

কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে হয়তো একটু শ্লেষের হাসি হেসেছিলেন। একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাত! সম্ভাব্য মুক্তির চার-পাঁচ দিন পূর্ব্বে বহরমপুর জেল থেকে টেলিগ্রাম গেল—কয়েদী গুরুতর পীড়িত। আত্মীয়রা দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু সাত ঘণ্টা পার হয়নি, আর-এক তারবার্ত্তা জানিয়ে দিলে "সব শেষ"! মৃত্যুর তারিখ ঃ ১৯২৪ ডিসেম্বর ৪-ঠা। রোগের নাম কিছু জানানো হয়নি; প্রথম খবর ঃ "Very seriously ill." এ অবস্থায় পাঠক যে-কোনও রোগের নাম দিতে চান, দিতে পারেন; তবে রোগের কাহিনী যে অত্যন্ত সন্দেহজনক, সে-কথা লোকে তখন বলেছে এবং এখনও সেই মত-ই বলবৎ আছে।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ ঢাকার বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে পুলিশ বড় বিব্রত হয়ে পড়ে। সন্দেহ হচ্ছে—অনেক বিপ্লবাত্মক ঘটনার সঙ্গে তাঁর সংস্রব আছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ঠিক ফাঁদে ফেলা যাচ্ছে না। অতএব জীবিকার্জ্জনের উপায়হীন ("no ostensible means of livelihood") বেকারদের অভিযুক্ত করার আইনে (Sec. 110 Cr.P.C.) তাঁকে ১৯১৫ এপ্রিল ২৭-এ তিন বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়।

মরণ-যজ্ঞ

সরোজভূষণ দাস ঃ বেলিয়াঘাটার ১৩-নং কাঁকুড়গাছিতে তাঁর বাসস্থান। ইচ্ছায় বা অজ্ঞাতে গভর্ণমেণ্ট এমন "চিকিৎসা"র ব্যবস্থা করলে, যার ফলে রোগীর প্রাণ-হানি ঘটে।

১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ১২-ই 'গার্ডেনরীচ ডাকাতি' সংঘটিত হয়। বে-পরোয়া ধরপাকড়ের মধ্যে কলিকাতা মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক সরোজভূষণ দাসকে গ্রেপ্তার করে জেল-হাজতে আটক রাখে—১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ১৫-ই থেকে। ১৮-ই পর্য্যন্ত তাঁর দেহে কোনও ব্যাধি ছিল না।

সাধারণ প্রথামত জেলের মধ্যেই সরোজকে টীকা দেন জেলের ডাক্তার। কয়েকদিনের মধ্যে সরোজের দেহে উৎকট বসন্ত দেখা দেয়। গভর্ণমেণ্ট একটু বিব্রত বোধ করেছিল। আত্মীয়রা জামিনের দরখাস্ত করতে গভর্ণমেণ্ট আপত্তি করেনি; হয়তো ডাক্তারের রিপোর্টে যা ছিল, তাতে আপত্তি করার প্রয়োজন ছিল না। ১৯১৫ মার্চ ২-রা জামিনের বাধা-নিষেধ অতিক্রম করে আসামী পরপারের যাত্রাপথে রওনা দিলেন। গভর্ণমেণ্ট স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে পরিত্রাণ পেয়েছিল।

রাধাচরণ প্রামাণিক ঃ এ'কে 'গার্ডেনরীচ মামলা'য় জুলাই ২-রা অতিরিক্ত আসামী খাড়া করা হয় ; কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এমন সময় ২০-নং ফকিরচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট থেকে ফেব্রুয়ারী ২৪-এ একটা মসার-পিস্তল আর কয়েকটা কার্ত্তুজ-সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলায় ২৭-এ মে হীরালাল বিশ্বাস (ওরফে টে'পা) ও রাধাচরণ প্রত্যেকের দু'বছর করে কারাদণ্ড হয়। হীরালাল হাইকোর্টে আপীল করলে, সেপ্টেম্বর ২৭-এ সেটা নাকচ হয়।

বাঘে ছুঁয়েছে, নিষ্কৃতি নেই। রাধাচরণের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ আনা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রাথমিক তদন্ত শেষ হলে, মামলা গেল দায়রায়, আগষ্ট ১৭-ই। দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা মতে নভেম্বর ২২-এ আসামীর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

এটা তো হ'ল বিচারের ব্যাপার। অবিচার ও তার প্রতিরোধে—মর্য্যাদা-রক্ষার কথা অনেক বেশী শিক্ষণীয়—বড়ই গৌরবের।

বছর দুই জেলে কাটাবার পর রাধাচরণের চক্ষুর পীড়া দেখা দেয়। জেলের নিয়মেই দণ্ডিত ব্যক্তি জেলের অধ্যক্ষকে তাঁর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তর পেয়েছিলেন যে, তাঁর মত খুনে ডাকাতরা অন্ধ হয়ে গেলে ভালই হবে। রাধাচরণ সিদ্ধান্ত নিলেন, জেলে থাকাকালে তিনি আর সরকারী ডাক্তার দেখাবেন না ; তাদের ওষুধ গ্রহণ করবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর মারাত্মক রক্ত-আমাশয় রোগ দেখা দিল। জেলের বন্ধুবান্ধব সকলেই ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মুখ থেকে যে-কথা বেরিয়েছে তার আর নড়চড় হবে না। রাধাচরণকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না ; দুরন্ত রোগের যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতে লাগলেন। রোগের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল এবং ১৯১৭ ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন আত্মসম্মান-রক্ষা ও প্রতিজ্ঞা-পালন করতে একটি অমূল্য জীবনের অবসান ঘটে গেল।

প্রতিশোধ

একদিকে ডাকাতি চলেছে অর্থ-সংগ্রহের জন্য, অন্যদিকে "আপদ" দূর করার চেষ্টাও সমানে চলেছে। ইয়োরোপে ইংরেজ বিপন্ন, সুতরাং ভারতবর্ষে নানারকমে তাকে বিব্রত করার সুযোগ গ্রহণ করাই সমর-কৌশল। কমপক্ষে আটজন নিহত হয়েছে, তার মধ্যে জন-চার পুলিশের লোক ; একজন পুলিশ ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। বাকী চারজনের মধ্যে একজন সরকারী সাক্ষীর পিতা ঃ আক্রোশের ফল। বাকীটা গুপ্তচর বলে বা ঐরূপ সন্দেহে হত্যা করা হয়।

খুন ক'টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক্ ঃ

কলিকাতা ঃ যতীন্দ্রনাথকে খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে। পর পর কতকগুলি বৈপ্লবিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে যতীন্দ্রনাথকে পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ; তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমে পুলিশের ধারণা হ'ল তিনি বাঙ্গলার বাইরে চলে গেছেন, হয়তো-বা কোনও দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকবে।

এইরকম সময়ে তাঁর অবস্থান ছিল ৭৭-নং পাথুরিয়াঘাটার একটা বাড়ীতে। সন্ধান পেয়েই হোক বা আকস্মিকভাবেই হোক, ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ২৪-এ নীরদ হালদার বলে একটি লোক (চাঁদনীর দর্জ্জী-দোকানের কর্ম্মী বলে পরিচিত) সকালের দিকে ৭-৩০ মিঃ নাগাদ দোতালার এক কামরায় গিয়ে হাজির। সেখানে যতীন্দ্রনাথকে দেখে (শিকার পেয়ে যাবার আনন্দে) বলে ওঠে—"আরে, যতীন (-বাবু)! এখানে ?" অর্থাৎ যাঁকে নানা স্থানে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাঁকে নীরদ (সৌভাগ্যক্রমে) আবিষ্কার করতে পেরেছে। নীরদের আনন্দের রেশ অন্তর্হিত হবার আগেই "দাদা"র সঙ্গী চিত্তপ্রিয় (রায়চৌধুরী) 'মসার'-এর এক গুলি ছোড়েঃ উদ্দেশ্য হত্যা। আহত নীরদ পড়ে গেল, কিন্তু মরেনি। মেয়ো হাসপাতালে ২৬-এ তার মৃত্যু ঘটে। ইতিমধ্যে সে পুলিশের প্রয়োজনীয় তথ্য বিবৃত করবার মত যথেষ্ট চেতনা লাভ করেছিল। যতীন বেঁচে আছে এই খবরটি দিয়ে চিরবিদায় নিলে।

রংপুর ঃ সারা বাঙ্গলায় সন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে—দু'পক্ষই সমানে চালিয়েছে। রংপুরের ঘটনা ঃ সেখানকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বিপ্লবীদের কাছে প্রকাণ্ড অন্তরায় বলে পরিগণিত হ'ল। গুপ্ত-সভায় আলোচনার শেষ ফল—রায়সাহেব নন্দকুমার বসুকে ইহজগৎ থেকে সরিয়ে দিতে হবে, তা না হলে পথ নিষ্কণ্টক হচ্ছে না। ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই, নন্দ বাড়ীর মধ্যে সন্ধ্যার পর সাড়ে সাতটা নাগাদ বিশ্রাম করছেন। একজন এসে নন্দকে ডেকে বাইরে আসতে বলে। ইতস্ততঃ করতে করতে নন্দ বাইরে আসছেন, আর তিনি দৃষ্টি-গোচর হওয়ামাত্র তাঁকে লক্ষ্য করে কে বা কারা তিন-চারবার রিভলভার থেকে গুলি ছোড়ে। নন্দ কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান। তাঁর দেহরক্ষী বাহাদুর সিং সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। আততায়ী তিনজনের মধ্যে একজনকে ধরতে গেলে, অপর একজন গুলি করে এবং সকলেই পালাতে সক্ষম হয়। বাহাদুরের আঘাত গুরুতর হয়েছিল, সে-যাত্রা আর রক্ষা পায়নি।

কলিকাতা ঃ চারিদিকে ধরপাকড়ের হিড়িক চলেছে, গোপন তথ্য উদ্ধারের কাজে "টিকটিকি" পুলিশের তৎপরতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশের দক্ষতার পরীক্ষা-অধ্যায় চলেছে। সি.আই.ডি. ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের খুব "নাম"-যশ। সম্প্রতি তিনি ফড়িয়াপুকুর থেকে নরেন ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করে ঊর্দ্ধতন পুলিশের কাছে বাহবা লাভ করেছেন।

পদে পদে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করছে বলে, "দাদা" (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) চাইলেন সুরেশকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। "দাদা" চেয়েছেন, তাঁর 'সৈন্যদলে' সাড়া পড়ে গেল। সুরেশ পলাতক বা সন্দেহভাজন লোকদের ওপর নজর রাখেন। এখন সুরেশের খোঁজ চলতে লাগলো। সুরেশের গতিবিধি হেদুয়াকে (আজাদ হিন্দ্ বাগ) ঘিরে চলছে। আসে যায়, তাঁকে ধরতে পারা যাচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনের তারিখ পড়েছে—১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ২৮-এ ; লাটসাহেব দুপুরে বক্তৃতা দিতে আসবেন। তাই পথঘাট যথাসম্ভব নিরাপদ রাখবার জন্য হেদুয়া অঞ্চলের তদারক করছেন আর্দালী-সহ দারোগা সুরেশচন্দ্র সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ। দু'দলই পরস্পরকে খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। প্রায় একই সময়ে সুরেশচন্দ্র আর "দাদা"র প্রিয় শিষ্য, পুলিশের "দাগী" চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর দৃষ্টি-বিনিময় হয় কিছু তফাত থেকে।

সুরেশ তাঁর আর্দালীকে চিত্তকে নিকটে ডেকে আনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। চিত্তের চিত্তও যেন ঠিক তাই চাইছিল। নিকটে আসতেই সুরেশ তাঁকে ডান হাত দিয়ে বেষ্টন করে যেন আপ্যায়ন করতে গেলেন। চিত্ত সঙ্গে সঙ্গে সামনে ঝুঁকে পড়ে কোমর থেকে রিভলভার বার করে সুরেশের তলপেটে গুলি ছুড়লেন, কিন্তু 'ঘোড়া' (ট্রিগার) আটকে যাওয়ায় গুলি আর ছুটলো না। সুরেশ তখন যেন "লৌহভীম" আঁকড়ানোর মতন চিত্তকে ধরে রয়েছেন, যাতে ফস্কে না যায়, অন্যদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। সব অবস্থা বুঝে নিমেষের মধ্যে চিত্তর সঙ্গী নরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী সুরেশের পিছনে এসে তাঁর পিঠে গুলি করে। চিত্তকে তখন আর ধরে রাখা সম্ভব নয় ; হাত শিথিল হয়ে আসছে। চিত্ত তখন বন্ধন-মুক্ত। নরেনের আরও তিনজন সঙ্গী সুরেশের দেহ গুলির আঘাতে ভীষ্মের শরশয্যার অবস্থা করে ছেড়ে দিল। সুরেশের দেহরক্ষী শিউপ্রসাদ তার প্রভুকে রক্ষা করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং খণ্ডযুদ্ধের পর তৃতীয় দিনে দেহত্যাগ করে।

কুমিল্লা ঃ "অব্যাপারেষু ব্যাপারম্" ; যার যা কাজ তার বাইরে কিছু করতে গেলে বিপদ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। কুমিল্লা জেলা-স্কুলের প্রধানশিক্ষক শরৎকুমার বসু ছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় রাজভক্ত এবং শিক্ষকতা ছাড়া, ছেলে ধরিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর অতিরিক্ত কাজ। সে-যুগের হাওয়ায় ছেলেরা যা করে, তিনি সেটা পছন্দ করতে পারেন না।

১৯১৫ জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে, 'রাজানুগত্য ও এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী' (Loyalty and Ambulance Corps) শিরোনামায় এক প্রবন্ধ-সম্বলিত পত্রিকা স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্দেশে প্রেরিত হয়। সেটা শরৎকুমারের কাছে বিশেষ আপত্তিকর বলে পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং প্রচারের দায়িত্ব আছে বলে পুলিশের কাছে দু'জন ছাত্রের নামও জানিয়ে দেন।

১৯১৫ মার্চ ৩-রা, শরৎ পড়ন্ত অপরাহ্ণ ছ'টার সময় বাইরে থেকে বাড়ী-মুখে আসছিলেন। যখন নানুয়ার দীঘির উত্তরে এবং ইউসুফ স্কুলের সন্নিকট হয়েছেন তখন তিনজন লোক সাইকেলে করে খুব কাছে এসে শরৎকে বারকয়েক গুলিবিদ্ধ করে চম্পট দেয়। শরতের পরিচারক সঙ্গে ছিল, তাকেও আঘাত লাগে। মরণ-বাঁচনের টানাটানির মধ্যে কয়েকটা দিন বেঁচে থেকে অবশেষে মরণেরই জয় ঘোষিত হ'ল।

ময়মনসিংহ ঃ কলিকাতা থেকে খবর ময়মনসিংহে পৌঁছেচে যে, পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষ স্থানীয় মামলার তদ্বির উপলক্ষ্যে সেখানে যাচ্ছেন। যতীন ছিলেন ঝানু অফিসার ; হাওড়া ও খুলনা ষড়যন্ত্র মামলার মাল-মশলা সংগ্রহের ভার ছিল তাঁর ওপর।

ময়মনসিংহে ঘটনার তারিখ—১৯১৫ অক্টোবর ৯-ই। সন্ধ্যা ৭-টা নাগাদ যতীন একটি ছেলে কোলে নিয়ে সদর দরজার দিকে মুখ করে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বসে-ছিলেন। জন-তিনেক লোক এসে তাঁর স্ত্রীকে চলে যেতে বললে, তাদের কি জরুরী কথাবার্ত্তা আছে। মহিলা সম্পূর্ণ আড়াল হননি, দমাদম গুলি চললো। একটা যতীনের কপাল, আর একটা তলপেট ফুঁড়ে চলে গেল। শিশুটিরও একটি গুলি লাগে। যতীন সঙ্গে-সঙ্গেই মারা যান ; শিশুটি পরে মাত্র কয়েকদিন বেঁচে ছিল। আততায়ীরা নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

কলিকাতা ঃ পুলিশ, বিশেষতঃ সি.আই.ডি.-বিভাগে নানারকম পরিশ্রম-সাপেক্ষ, কোনও সময় বা দারুণ বিপজ্জনক কাজে কর্ম্মচারীরা লিপ্ত থাকে, সুতরাং সুযোগ-সুবিধা থাকলে সন্ধ্যার পর সঙ্গী পেলে একটু খেলা বা গল্পগুজবে কাটাতে চেষ্টা করাই স্বাভাবিক।

৯৯-নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, এক পুলিশের বাসা। সেখানে সন্ধ্যার পর আর তিনজন, সবই পুলিশ, এলে একটু পাশা-খেলায় কাটে। যথানিয়মে ১৯১৫ অক্টোবর ২১-এ পাশা-খেলা চলছে। রাত্রি সাড়ে দশটা হয়েছে—গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠে বাড়ী যেতে চাইলেন। গৃহস্বামী বললেন যে, "এ-হাত"টা শেষ করে যাওয়াই ভাল। তবে, রাত-ভিতের ব্যাপার, রাস্তার দিকের সদর দরজাটা খোলা রয়েছে, বন্ধ করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। কথা শেষ হতেই একজন উঠে দরজার দিকে এগিয়েছেন, এমন সময় একজন লোক পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় প্রশ্ন করলেন যে, তিনি গিরীন বন্দ্যোপাধ্যায় কিনা। উত্তরের অপেক্ষা নেই, গুলি চললো। দ্বিতীয় গুলিতে আলো ভাঙ্গলো।

খেলা ফেলে সবাই ভিতরের উঠানের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছেন। পিছনে পিছনে এখন একজনের স্থলে আরও তিনজন আততায়ী। ভিতরের বারান্দায় পড়েই

সবাই সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছেন, আর পিছে ধাওয়া করছে আগন্তুক দল। সমানে গুলি ছুটছে, গিরীনের বুকের ডানদিক আর বাঁ-দিকের পাছা গুলিবিদ্ধ হয়েছে। সিঁড়ির উপরের শেষ ধাপে পৌঁছেই তিনি ভূতলশায়ী হলেন। গিরীন একবার বেঁচেছিলেন মুসলমান পাড়ায় বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় বোমার আঘাত থেকে। কাল তখনও পূর্ণ হয়নি। আজ চারজনেরই আহত বা মৃত হওয়ার কথা—গুলি তো চলেছে এলোপাথাড়ি আর অন্ধকারে। এবার গিরীনের ডাক এসেছিল, বাকী সকলকে রেখে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করলেন।

কলিকাতা ঃ কথায় বলে—"দশানন সীতাকে হরণ করলেন আর সমুদ্রের বন্ধন-দশা ঘটলো"। বড় বড় অফিসার, বিশেষতঃ যাঁরা বিপ্লব-কার্য্যে বাধাস্বরূপ, তাঁদেরই হত্যা করাই হ'ল কর্ম্মসূচী। কিন্তু সঙ্গে ছোটখাটো কন্ষ্টেবল প্রভৃতি প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে।

অক্টোবর ১৯১৫ সালের শেষ সপ্তাহে কলিকাতার সারপেণ্টাইন লেনের এক বাড়ী থেকে জন-তিনেক যুবককে বিপ্লবী সন্দেহে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। তাতে 'সাহেব'দের ক্ষুধা মেটেনি। সে-বাড়ীর খোঁজখবর যারা নিতে আসবে তারা ধৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। কাজেই ফাঁদ পাতা রইল এবং চৌকি দেবার জন্য কল্লাপনাথ পাঠক নামে এক কন্ষ্টেবলকে সেখানে খাড়া করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৫ নভেম্বর ৩০-এ জন-তিনেক যুবক ধীরভাবে কল্লাপের একেবারে পিঠের কাছে এসে রিভলভার থেকে গুলি করে। কাজ সেরে যখন আক্রমণকারীরা ফিরছে তখন দেখে পিছনে একজন লোক আসছে, তাকেও এক গুলি ; অথচ সে সেণ্ট পল হোস্টেলের পাচক মাত্র। লোকটি ঘটনা-দুর্ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতো না। তিন-দিনের মধ্যে দু'জনেরই মৃত্যু ঘটে।

ময়মনসিংহ ঃ ঝোঁকের মুখে কিছু যুবক দেশসেবার মোহে এসে দলে জুটেছিল। সবাই যে পালিয়ে গেছে তা নয়, টিঁকে গেছে অনেকে। কিন্তু বিপদ ঘটিয়েছে তারা, যাদের পুলিশ নিজেদের কাজে লাগিয়েছে প্রতিষ্ঠানের ভিতরের খবর বার করবার জন্যে। যারা এ-কাজে এসেছে, টাকা পেয়েছে সবাই, কিন্তু যখন আসল ব্যাপার বিপ্লবী সঙ্গীদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে তখন জীবন দিয়ে বিশ্বাসঘাতকার অপরাধ পরিশোধ করতে হয়েছে।

এরকম যারা ছিল, তার মধ্যে একজন হচ্ছে ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রথম-দিকটায় ময়মনসিংহের বাজিতপুর দলে যোগ দেয়, কিন্তু প্রলোভনের বশে সে পুলিশের কবলে পড়ে যায়। প্রথমে সন্দেহ, পরে কতকটা নিশ্চিৎ হয়ে পূর্ব্বতন সঙ্গীদের মধ্যে, ১৯১৫ ডিসেম্বর ১৯-এ, ময়মনসিংহের সসেরদীঘিতে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়।

স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র

কাজে খুব বিরাট কিছু না হলেও, বিপ্লব-জগতের সম্পূর্ণ এক নতুন চিন্তা স্বল্পকালের জন্য হলেও এক বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতা-লাভের জন্য বিপ্লবীরা সংগ্রামে লিপ্ত। ইংরেজ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হতে কতদিন লেগে যাবে তার স্থিরতা নেই। কিন্তু আমরা যে স্বাধীন, দুই স্বাধীন দেশে সমপর্য্যায়ে যুদ্ধ চলছে—এটা প্রতিপন্ন করবার জন্য "স্বাধীন ভারত-সরকার" গঠিত হয়েছিল। জার্ম্মানীতে অবস্থিত 'বার্লিন কমিটী'র পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়েছিল। এ দলে অপরাপর যাত্রীর সঙ্গে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও মৌলভী বরকতউল্লা ছিলেন। জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট ও ইস্তাম্বুলের এন্‌ভার পাশার পরিচয়পত্র থাকায়, ১৯১৫ অক্টোবর ২-রা আফগানিস্তানে পৌঁছুলে তাঁরা সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা মৌলভী ওবায়েদুল্লার সঙ্গে মিলিত হন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের তরফে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে (সাহায্যের) চুক্তি-সম্পাদন, ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ-পরিচালনা প্রভৃতি যে-কোনও স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের মত ১৯১৫ ডিসেম্বর ১-লা কাবুলে 'স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহেন্দ্রপ্রতাপ, প্রধান-সচিব বরকুতউল্লা ও রাষ্ট্র-বিভাগীয় (Home) সচিব হলেন ওবায়েদুল্লা। এখানে বিশেষ কাজ হয়নি। কিন্তু এই ঘটনা পরবর্ত্তী কালে (১৯৪২ অক্টোবর ২১) নেতাজীর ঐতিহাসিক (অস্থায়ী) স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র-স্থাপনের সঙ্কেত বহন করে এনেছিল।

প্রতিরোধক আইন (১৯১৫)

সারা বাঙ্গলা থেকে বৈপ্লবিক লুঠতরাজ ও হত্যার সংবাদ আসতে লাগলো। বিপ্লবীদের মধ্যে সতর্কতা ও দক্ষতা খুব বেশী বেড়েছে, ফলে বে-আইনী ঘটনার সঙ্গে জড়িত লোককে আর ধরে আটক করা বা তড়িঘড়ি সাজা দেবার ব্যবস্থা না-করলে চলে না। নিশ্চিন্ত নির্বিবরোধে যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য নানারকম আইন চালু করা হয়; তন্মধ্যে ১৯১৫ মার্চ ১৫-ই ঐ সালের নং ৪ (Defence of India Criminal Law Amendment Act IV) আইন পাশ করিয়ে বে-পরোয়া ধরপাকড় এবং বিনা-বিচারে আটক-বন্দী রাখবার ব্যবস্থা হয়। গুপ্তচরের রিপোর্টের ওপর সমস্ত গভর্ণমেণ্ট চলছে। আগে আটক, পরে অনুসন্ধান।

যে-সকল অপরাধের আশঙ্কায় আইন গৃহীত হ'ল, সে-তালিকা অতিদীর্ঘ। যুদ্ধ-চলাকালে এবং তার পরেও ছ'মাস এই আইন বলবৎ রাখা হয়েছিল। যুদ্ধ-সংক্রান্ত অর্থাৎ সৈন্য, সেনা-বিভাগ, সৈন্যদের অবস্থিতি, সরকারী গোপন ব্যবস্থা, যুদ্ধোদ্যমে বাধা, সৈন্য-ফুসলানি, শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষা-প্রচেষ্টা প্রভৃতি যা-কিছু সবই—"অপরাধ"। বলা বাহুল্য, বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র-আমদানী-প্রচেষ্টা এর

মধ্যেই পড়ে যায়। আইনের সতর্কতার মধ্যে ছিল—"ইংরেজ হারছে" এ-কথা প্রকাশ্যে বলা তো দূরের কথা, ঘরেও আলোচনার খবর যদি 'স্পাই' আনে, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। রেল প্রভৃতি সকলরকম যানবাহনের নিরাপত্তা-রক্ষা, ষ্টেশন, পোতাশ্রয়, বিমান (-পোত) বন্দর, পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি সরকারী সকল ঘাঁটির ক্ষতির চেষ্টা (কার্য্যে বা বাক্যে) নিষিদ্ধ হয়েছিল। যাকে যখন ইচ্ছা ধরপাকড়, নির্ব্বাসন, নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ-নিরোধ, বিস্ফোরক বা হত্যার সহায়ক যে-কোনও প্রকার অস্ত্রশস্ত্র রাখা, গোপন পরামর্শ প্রভৃতি সন্দেহে গ্রেপ্তার—সব মিলিয়ে যে উৎকট অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে-বস্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করে রাখবে।

যুদ্ধের মধ্যে যে বিপদ মাথায় করে বিপ্লবীরা তাঁদের কাজ চালিয়েছেন, তাতে তাঁদের মানসিক শক্তি, বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯১৫ মার্চ ১৮-ই তারিখে ভারত-রক্ষা আইন (Defence of India Act) পাশ হয়। তাতে প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ-সাধন করা হয়, তাই নয়,—বিচারক্ষেত্রে সমস্ত চিরাচরিত কার্য্যবিধির নির্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

"ডি. আই. এ." (Defence of India Act) একটা সাধারণ কথার মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছিল। দূর গ্রামে এক শান্ত পল্লীতে হঠাৎ একদিন কালা-পোষাকের দফাদার-চৌকিদার থেকে সাদা মোটা-জিনের কোট-প্যাণ্ট-টুপি ও ভারী-বুট-যুক্ত লালমুখের পুলিশ অতি প্রত্যূষের নিদ্রা ভাঙিয়ে গ্রামকে সচকিত করে তুললো। যারা কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, তারা বলাবলি করেছে যে—"ডি.আই.এ." এসেছে। হাজারে হাজারে যুবক ধরা পড়েছে। কেউ কারাগৃহে, কেউ জনমানবহীন অস্বাস্থ্যকর জলায় জঙ্গলে সাপ, শেয়াল ও নেড়কে-অধ্যুষিত অঞ্চলে অন্তরীণ হয়েছে।

যে-আইনে আটক, তার অক্টোপাস্-চিত্র অতি কঠোর। পল্লীর দিকে থানার কাছে বা বেশ কিছু দূরে একা আহারাদি সমস্ত ব্যবস্থা নিজে করে নিয়ে, থানায় নিত্য, হয়তো-বা দিনে দু'বার হাজিরা দেওয়া আছে। স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথা বলা চলে না, বে-আইনী কাজ, অতএব সাজা; বেড়াতে (একাই) গিয়ে ফিরতে দেরী হয়েছে, স্পাই এসে বলেছে দারোগার অমনোনীত লোকের সঙ্গে আলাপ করেছে, কার বাড়ী জল খেয়েছে, কোনও লাইব্রেরী বা স্কুলে প্রবেশ করেছে, ইত্যাদি সব কাজই বে-আইনী—অতএব সাজা—দু'মাস, ছ'মাস, বৎসরাধিক কালের জন্য সশ্রম হাজতবাস। বিনা বিচারে বন্দী, কিন্তু তাদের জেলখানার আসামীর মত আচরণ করতে হবে। 'সরকার সেলাম' দিতে হবে—জেল-কর্তৃপক্ষ এলে, উঠে দাঁড়াতে হবে, গণনার সময় ফাইল বা লাইন মারতে হবে। সব বিবরণ দেবার প্রয়োজনও নেই, সম্ভবও নয় —পান থেকে চুন খসলেই "অপরাধ", আর সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড। কত অসম্মানকর ক্ষুদে কানুনের বিরুদ্ধে সম্ভ্রমের মাথা তুলে দাঁড়াতে কত যুবক সাজার মধ্যে সাজা পেয়েছে তার হিসাব কে রাখে?

অন্তরীণ থাকার দুরবস্থার বাকী কথাটা বলে রাখা যাক্। দূর-পল্লী—যাতায়াতের রাস্তা নেই বললেই হয়, অনেক ক্ষেত্রে বর্ষায় নৌকো ছাড়া গতি নেই। অর্থের অভাব; যা আসবার কথা, সময়ে আসে না (হয়তো দারোগাবাবু খরচ করে ফেলেছেন), ব্যয়-সঙ্কুলান হয় না। তার ওপর আছে রোগ। সে-দুরবস্থার কাহিনী অবর্ণনীয়। স্থানীয় লোকে সেবা করতে সাহস পায় না। ডাক্তার নেই; যদি-বা হাতুড়ে কেউ থাকেন, দারোগার অনুমতি ছাড়া কেউ আসতে পারেন না। যদি দেখে যান, যোগাযোগ রাখে কে? টাকাই-বা আসে কোথা থেকে? দূর হাসপাতালে পাঠাবার কথা চিন্তাই করা যায় না। অনন্ত ঝামেলা। ক্বচিৎ কেউ যেতে পেয়েছে। নিজে সদরে চিকিৎসার জন্য গিয়ে জেলের দণ্ড ভোগ করেছে অনেকে; তখন অন্তরীণে "মুক্ত" অবস্থায় থাকার চেয়ে জেলখানা পছন্দ করা ছিল স্বাভাবিক।

সঙ্গে ছিল হৃদয়হীন দারোগা, ক্ষুদে দারোগা ও তাঁদের কর্ম্মচারীদের ব্যবহার ও অত্যাচার। ভাল কেউ ছিলেন না, এ-কথা বলা যায় না। দারোগার অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে থানাতেই খুন করেছে, ফাঁসি গেছে। সেখানেই অনাহারে, রোগে, হিংস্র জীবের দংশনে, আক্রমণে প্রাণ হারিয়ে আর স্বগৃহে ফেরেনি। কোথায়ও গভর্ণমেণ্ট "রিগ্রেট" (regret) করেছে, দয়া করে, বিনা "রিগ্রেটে" জানিয়েছে আবার কখনও; সে তরফ থেকে খবর আসবার অনেক আগে অতি গোপনে শঙ্কাকুলচিত্তে স্থানীয় লোক হয়তো-বা বে-নামা চিঠিতে জানিয়েছে। হাড়-ক'খানাও খুঁজে পাওয়া যায়নি; পরে খবর পাওয়া গেছে—দয়াময় দারোগা "শাস্ত্রীয় মতে" তার শেষকৃত্য সম্পাদন করেছেন!

গভর্ণমেণ্টের আশা পূর্ণ হতে বেশ একটু সময় লেগেছিল। এ-সময়কার বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আন্দোলন শিকড় ছড়িয়েছিল কেবল গভীরে নয়, দিগ্‌দিগন্তেও।

মন্দের ভাল (১৯১৬)

যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ সমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯১৪-১৫ সালের বিরাট পরিকল্পনার প্রায় সবগুলিই ব্যর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু দলের কর্ম্মীদের মধ্যে যে প্রেরণা ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হয়েছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ এ-সময় দেখা গেছে। বড় রকমের কোনও কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি, তবে গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক ও ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে খুবই। ডাকাতি হয়েছে বহু এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও গুপ্তচর হত্যাও হয়েছে বেশ কয়েকটি।

বিপ্লবের আগুন জ্বলেছে। কখনও বেঁচেছে ভস্মস্তূপের মধ্যে, আবার কখনও শিখা ও বিস্ফোরণ দিয়ে অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে।

ঘটনা-প্রবাহ

ডিক্সন লেন ঃ চট্টগ্রামের ছেলে কলিকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে ৩০।১-নং ডিক্সন লেনে রিপন কলেজের অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেনের বাহিরের ঘরে আশ্রয় নিয়ে লেখা-পড়া করে ; গোপনে যে কি করে, সে খবর সকলেরই অবিদিত। ১৯১৬ জানুয়ারী ৫-ই হঠাৎ তার ঘরে প্রচণ্ড শব্দে এক বিস্ফোরণ ঘটে এবং যুবক নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে আহত অবস্থায় দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে হাজির এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার। অস্ত্র-আইনের ধারায় ফেব্রুয়ারী ২৮-এ মামলা রুজু হয়। অপরাধের গুরুত্ব বিধায় মামলা দায়রায় ঠেলা হয় মার্চ ২০-এ। যখন মামলা চলছে—নগেন অপরাধ কবুল করে এবং মে ৯-ই চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ লাভ করে।

মাদারিপুর ঃ মুস্তাফাপুর— মাঝরাত্রি পার হয়েছে, চারিদিকে গভীর শান্তি বিরাজ করছে, কিন্তু ডাকাতদের একটা দল ১৯১৬ জানুয়ারী ৯-ই মুস্তাফাপুর গ্রামে মহিম কুণ্ডুর বাড়ী হানা দেয়। দলের অধিকাংশই বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে ; কেবল দু'জন ভিতরে প্রবেশ করে। বাড়ীর লোকদের ভয় দেখিয়ে সাড়ে তিন হাজার টাকা নিয়ে ভেগে যায়।

ময়মনসিংহ ঃ সুলতানপুর— গুরুচরণ নাথের বাড়ী ১৯১৬ জানুয়ারী ১৫-ই প্রায় বিশজন যুবক মিলে যে ডাকাতি করে, সেটা কেবল নিন্দনীয় নয়, শোকাবহও বটে। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ৬৯ টাকা মাত্র। প্রৌঢ় রামচরণ, বয়স ৫৫, বুলেটের আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। ডাকাতদের সঙ্গে ছিল দুটো রিভলভার আর একটা বন্দুক।

সালকিয়া ঃ গোলাবাড়ী— সন্ধ্যা তখনও ঘনিয়ে আসেনি, কেবল মানুষ চিনতে কষ্ট হয়—এমন সময় হাওড়া সালকিয়ার কৃষ্ণমোহন মিত্র লেনে, ১৯১৬ জানুয়ারী ১৭-ই, চার-পাঁচজন যুবক হরিদাস পাইনের বাড়ী প্রবেশ করে ভিতর থেকে কপাট বন্ধ করে দেয়। বেচারা হরিদাস বাড়ীর মধ্যে একা। সুযোগ বুঝে আগন্তুকরা ছোরা ও পিস্তল বার করে মালিককে ভয়ে অভিভূত করে ফেলে। তখন মালিকের লোহার সিন্দুক থেকে দুটো ক্যাশ-বাক্স টেনে বার করে ; তার মধ্যে পায় কয়েকটা গিনি, ৫৮-খানা ১০-টাকার নোট আর সোনারূপার অলঙ্কারে ৭।৮ হাজার টাকার মাল।

সন্দেহভাজন লোক হিসাবে ফরিদপুরের মোহিনীমোহন ঘোষকে ১৯১৬ সেপ্টেম্বরে আটকবন্দী করে রাজসাহীতে রাখা হয়। সেখানে এক ডাকাতি হওয়ায়, মোহিনীকে অন্তরীণ অবস্থা থেকে জেলে টেনে আনা হয়। রাজসাহীর মামলা তখনও গুছিয়ে ওঠেনি।

পুরাতন ঘটনার সালকিয়ার ডাকাতিতে যে ক্যাশ-বাক্স দুটি ডাকতরা হাতে করে ধরেছিল, তার গায়ে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। তার ফটো তুলে, সযত্নে পুলিশ-অফিসে রক্ষিত হয়। এ-সময় আসামী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। ছাপ না দিলে, বিশেষ আইন-মতে দণ্ডভোগ করতে হ'ত। কেবল এই আপত্তি করায় বহু ছেলেকে জেল খাটতে হয়েছে।

অতএব মোহিনীর আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে। পুলিশ-অফিসের ছাপের সঙ্গে অবিকল মিল হয়ে যাওয়ায়, মোহিনীর নামে মামলা রুজু করা হ'ল ; রাজসাহীর ডাকাতির ব্যাপার ধামা-চাপা পড়ে গেল। ১৯১৮ মে ১১-ই দায়রায় মামলা ওঠে এবং জুন ২২-এ মোহিনীর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টের আপীল ১৯১৮ সেপ্টেম্বর ২৫-এ নাকচ হয়। একেই বলে ঃ "কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় !"

পাবনা ঃ কাদিমপাড়া— অভিযানটা মামুলী ধরনের বলা চলে। গুন্‌তিতে ১৪।১৫ জন ; পিস্তল, ছোরা প্রভৃতি হাতিয়ার-সমন্বিত হয়ে ১৯১৬ ফেব্রুয়ারী ২৭-এ পাশাপাশি অবস্থিত কেশবচন্দ্র সাহা ও নবদ্বীপচন্দ্র সাহার বাড়ী আক্রমণ করে। ঘটনাস্থল সারা থানার কাদিমপাড়া গ্রাম। কিছুই পাওয়া যায়নি।

হাওড়া ঃ দফারপুর— ১৯১৬ মার্চ ৩-রা, মধ্যরাত্রি। ১০।১২ জন যুবক ডোমজুড় থানার হীরালাল সাহার বাড়ীতে, মুখে মুখোস পরে আর মাথায় বালাক্লাভা-টুপি লাগিয়ে প্রবেশ করে। হীরালালকে আটকে রেখে, তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে সিন্দুকের চাবী আদায় করে। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ দু'হাজারও হবে না।

ত্রিপুরা ঃ গাণ্ডোরা— মুরাদনগর থানার এক গণ্ডগ্রাম। সবে সন্ধ্যার পরে,

১৯১৬ মার্চ ৬-ই, অক্ষয়কুমার দাসের বাড়ী ২৫।৩০ জন অকস্মাৎ হাজির হয়ে লোকদের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করে রাখে। তাদের সঙ্গে মশার-পিস্তল ছিল। এক-দল লোহার সিন্দুক ভাঙ্গার কাজে লেগে যায় ; হাতুড়ি প্রভৃতি সঙ্গেই ছিল। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ সাড়ে চৌদ্দ হাজার টাকা। এই দলে অক্ষয় দাসের জামাতা-বাবাজী ছিলেন বলে পাকা খবর।

এই দলের সঙ্গে যুক্ত অন্য একস্থানে টেলিগ্রাফের তার কাটার জন্য তিনি চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেছিলেন।

ত্রিপুরা ঃ নাথগড়— আবার ত্রিপুরা। এবার থানা নবীনগর। রাত্রি ১১-টায়, ১৯১৬ এপ্রিল ৩০-এ জগৎ চন্দ্রর বাড়ীতে জন-বিশেক যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চড়াও হয় ; তিনটা লোহার সিন্দুক ভাঙ্গে এবং সাড়ে সতেরো হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়।

কুমিল্লা— সাক্ষাৎ ডাকাতি নয়, তার প্রস্তুতি মাত্র। পুলিশ আগে থেকে সংবাদ পেয়ে সতর্ক থাকে। ১৯১৬ মে ২৯-এ, দু'জন লোক কুমিল্লা ডাকবাংলোতে এসে হাজির হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদের আগমনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করে। তখন ব্যাপার বুঝে একজন সরে পড়বার চেষ্টা করে। পিছু তাড়া করলে, রিভলভার থেকে গুলি চলতে থাকে এবং পুলিশ এগুতে ভরসা করে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি পুলিশ-কবলে পড়ে। যেখানে গ্রেপ্তার হয় ঠিক সেখানে একটা ছোট আকারেব টোটা-ভরা রিভলভার পাওয়া যায়। ডাকাতির প্রচেষ্টা প্রভৃতি অভিযোগে আসামী তারাপদ ভট্টাচার্য্যর নামে ১৯১৫ জুন ২৮-এ দায়রায় মামলা রুজু হয়। জুলাই ১৯-এ তার সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ফরিদপুর ঃ ধনকাটি— লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ বিচারে গোঁসাইর-হাট থানার ধনকাটি গ্রামের কৈলাসনাথ রায়ের বাড়ীর ডাকাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাত্রি দশটা নাগাদ, ১৯১৬ জুন ৯-ই, সাত-আটজন যুবক রিভলভার নিয়ে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, যেন বাইরে থেকে বাড়ীর ভেতর গিয়ে সাহায্য করা তো দূরের কথা, বাড়ীর ধারে-কাছে যেন কেউ ঘেঁষতে না পারে। বাকী ক'জন বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। জুন মাস, গরম তখনও কাটেনি, বাড়ীর লোকজন প্রায় সব জেগে ; বাড়ীর মধ্যে ঘরের সব দরজা তো বটেই, সদর দরজাও খোলা। চাবি আদায় করার অপেক্ষা না করেই, বাক্স-তোরঙ্গ-আলমারি সব ভেঙ্গে তোলপাড় করে ফেললে। লুণ্ঠনপর্ব্ব সেরে যখন ডাকাতরা চলে যায়, তখন দেখা গেল বাড়ীর দো-নলা গাদা-বন্দুকটা আর ৪৩,০০০ টাকা অদৃশ্য হয়েছে।

হাওড়া ঃ গোপীনাথ রায় লেন— সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—৫-নং গোপীনাথ রায় লেনের বাড়ীতে, ১৯১৬ জুন ২৬-এ, ছ'-সাতজন লোক বসে তাস খেলছে।

এমন সময় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জন-আষ্টেক যুবক দু’-দলে এসে উপস্থিত। প্রথম দল বৃষ্টির প্রবল ধারা থেকে রক্ষা পাবার নাম করে আগেই এসে বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। অপর দলটি এসে যোগ দিলে, তারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। বাড়ীর মালিক গৌরচন্দ্র তালুকদারকে ধরে ভয় দেখিয়ে চাবি কেড়ে নিয়ে, বাক্স-আলমারি-সিন্দুক প্রভৃতি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে। লাভ হ’ল হাজার-ছয়েক টাকা।

সন্তুষ্ট হতে পারেনি আগন্তুকরা। গৌরচন্দ্রকে ধরে পাশেই হারাণচন্দ্র পালের বাড়ীর দোতলায় টেনে তোলে এবং সেখান থেকেও হাজার-পাঁচেক টাকা আদায় করে নিয়ে সরে পড়ে।

এই ডাকাতিতে নূতন নজির সৃষ্টি হয়েছিল। শিরোদেশে ‘বন্দে মাতরম্’ ও ‘যুগান্তর’ দলের প্রতীক ছাপা কাগজে এক চিঠি পেয়েছিলেন গৌরচন্দ্র। তাতে বলা হয়েছিল যে, মালিকের কাছে যে ৯,৮৯১ টাকা ১ আনা ৫ পাই ঋণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে, সুবিধামত সে-টাকা যোগ্য মালিককে সুদ-সমেদ পরিশোধ করা হবে। পত্রের তারিখ ছিল—কলিকাতা, ১৪-ই আষাঢ়, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ ; লেখক—জে. বলবন্ত, সংযুক্ত স্বাধীন-ভারতের বঙ্গ-বিভাগের অর্থসচিব (Finance Secretary to the Bengal Branch of Independent Kingdom of United India)। আড়ম্বর নিতান্ত মন্দ নয় ; কাজে কিছুই হয়নি (*Sedition Committee Report*, p. 79-80)। বলা বাহুল্য, এ প্রতিশ্রুতি আরও নানা স্থানে দেওয়া হয়েছিল, তবে সবই ভিত্তিহীন।

হাওড়া ঃ ডোমপাড়া— কলিকাতা সহরের মধ্যে এক গর্ত্তে কয়েকটি পলাতক বাস করার বিপদ ছিল সমূহ। গর্ত্তটির মুখ আটকে ফেলতে পারলে, সব-ক’জন ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তা’ছাড়া আদালতে সাজা ও বিনা বিচারে সন্দেহভাজন সব কর্ম্মীকে বন্দী করে রাখবার ফলে লোকাভাব গুরুতর। সেই হিসাবে হাওড়া ডোমপাড়া লেনে এক অন্ধকার বস্তির মধ্যে এক আস্তানা গাড়া হয়। জন-তিনেক সেখানে থাকেন, আবার বাইরে থেকেও দু’-একজন কখনও কখনও এসে বাস করেন।

পুলিশের কাছে ডোমপাড়ার খবর এসে পৌঁছেচে এবং সত্যাসত্য নির্ণীত হয়ে গেছে। ১৯১৬ আগষ্ট ৪-ঠা কলিকাতার সশস্ত্র পুলিশ প্রায় মাঝরাত থেকেই, বাড়ী তো বটেই, আশপাশের পলায়নের পথ রোধ করে ঘিরে ফেলে। তা সত্ত্বেও পুলিশের অসতর্কতার মধ্যে দু’জন চম্পট দেয় ; পুলিশ ঠিক সন্ধান করতে পারেনি। তৃতীয় ব্যক্তি শ্রীযুগলকিশোর দত্ত, অনন্যোপায় হয়ে পুলিশের ভিতর দিয়েই পলায়নের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়েন। পুলিশ পিছু ধাওয়া করছে—পলায়মান আসামী যুগলের হাতে রিভলভার ও একটি মসার-পিস্তল ছিল। রিভলভারটি তিনি ছুড়ে ফেলে দেন। পুলিশ তাঁকে পিস্তল-সহ গ্রেপ্তার করে। নূতন আইনে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল বসলো আগষ্ট ২৪-এ, আর ২৮-এ তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ হ’ল।

ত্রিপুরা ঃ সহরপদুয়া— ত্রিপুরার চান্দিনা থানায় বসতি-বিরল স্থান। ১৯১৬ সেপ্টেম্বর ২-রা, রাত্রি ১০।১১-টার মধ্যে বেশ হৈচৈ পড়ে গেল—সাহাদের বাড়ী ডাকাত পড়েছে। প্রতিরোধ হয়েছিল সামান্যই। লুণ্ঠিত হ'ল নগদ ১,৭২০ টাকা এবং অলঙ্কার প্রভৃতিতে আরও ১,৬৫০ টাকা। একজনকে আসামী-সন্দেহে টানাটানি করে শেষপর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

ত্রিপুরা ঃ ললিতাসর

এ-যুগে ডাকাতি অনেক হয়েছে, কিন্তু নরবলির হিসাব নিলে, ললিতাসর একটা উচ্চস্থান অধিকার করে। সেপ্টেম্বরে শীতের আমেজ নেমেছে—সাধারণ লোকে গভীর নিদ্রামগ্ন, সময়টা মধ্যরাত্রি। দেবীদ্বার থানার ললিতাসর গ্রামে ১৯১৬ সেপ্টেম্বর ১১-ই রুহিতচন্দ্র পালের বাড়ীতে মাত্র জন-পাঁচ-ছয় যুবক লুঠপাটের উদ্দেশ্যে হাজির হ'ল। সদর দরজা বন্ধ ; ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতে কেউ খুলে দিল না ; দমাদ্দম্ বড়-হাতুড়ির ঘা খেয়ে দরজা ভেঙ্গে গেল। বাড়ীতে প্রবেশলাভ করে সহজেই ৫৩০ টাকার মত সংগ্রহ সম্ভব হ'ল। মন ওঠেনি ; তখন মালিককে ধরে তাঁর কপালের ওপর রিভলভার এবং গলার ওপর ছোরা রেখে, গোপন অর্থের সন্ধান দেবার জন্য সামান্য সময় দিয়ে, ব্যস্ততার সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলো। রুহিতের নির্দ্দেশিত স্থান খুঁড়ে ফেলে আর মাত্র শ'-পাঁচ-ছয় টাকা পাওয়া গেল।

এইবার দুর্ঘটনার শুরু। হট্টগোলে গ্রামের বহু লোক এসে জুটে গিয়েছিল। তারা ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করতে আরম্ভ করে এবং একে একে পাঁচজন রিভলভারের গুলির আঘাতে নিহত হয়। আরও পাঁচজন আহত হয়েছিল। পরিবর্ত্তে তারা একজন ডাকাতকে লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী করে এবং ঘটনাস্থলেই তার জীবনান্ত ঘটে।

লোকটি কে ? অনুসন্ধান আরম্ভ হ'ল। দেখা গেল তিনি রাজসাহীতে অন্তরীণে গতিবিধি-নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ছিলেন। ১৯১৬ জুলাই ১২-ই থেকে উধাও হন ; নাম—প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রবোধ সম্বন্ধে বিপ্লবীমহলের এক ভিন্ন মত আছে। যখন ডাকাতি সেরে দলবল ফিরে আসছে রেল-লাইন ধরে, তখন প্রবোধকে বিষাক্ত সাপে কামড়ায় এবং তাইতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতদেহ জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। পরে পুলিশ উদ্ধার করে সনাক্ত করে।

পল্লীবাসীদের তাড়া খেয়ে পলায়মান ডাকাতরা প্রায় সব টাকাই খালে ফেলে দিতে বাধ্য হয়। সমগ্র ডাকাতির তালিকায় ললিতাসর ডাকাতি সাক্ষাৎ বিভ্রাটের এক প্রতীক বলে মনে করা যেতে পারে।

ফরিদপুর ঃ ব্রাহ্মণকাণ্ডা— সেপ্টেম্বর মাসে ত্রিপুরার চাঁদপুর ও ফরিদপুরের

পালং থানায় পর পর দুটো বিফল চেষ্টার পর, ফরিদপুরেই কোতোয়ালি থানার ব্রাহ্মণকাণ্ডা গ্রামে রাত্রি ১-টার সময়, ১৯১৬ সেপ্টেম্বর ২৬-এ, গদাধর দত্তর বাড়ী ডাকাতি হয়। একে ডাকাতির প্রহসন বলা চলে। ভয় দেখাবার পরও টাকার সিন্দুকের পাল্লা খোলা পাওয়া গেল না ; স্বয়ং গদাধর হলেন বাদী। আর বিশেষ হাঙ্গামা না করে, গোটা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন টাকা পেয়ে ভগ্নমনোরথে বিদায় নিতে হয়েছিল। সান্ত্বনার মধ্যে ছিল—ধরপাকড় বা সাজা-শাস্তি কারও হয়নি।

ঢাকা ঃ রামদিয়ানালী

কর্ম্মী যুবকদের পক্ষে বিপদে পড়বার বড় ফাঁদ 'রামদিয়ানালী ডাকাতি'। সাতজন একসঙ্গে দীর্ঘ কারাবাসে চলে গেলেন একেবারে বিফলে। একেই ভারত-রক্ষা আইনে (Defence of India Act) শত শত কর্ম্মী আটকবন্দী হয়ে আছে, তার ওপর বুদ্ধির দোষে একসঙ্গে অনেকগুলি অপসারিত হলে, অসুবিধার মাত্রা খুবই বেশী।

১৯১৬ সেপ্টেম্বর ৩০-এ, রাত্রি ১১-টায় একটা ঘাসী নৌকা এসে ঢাকার বরাইল ঘাটে হাজির ; আরোহী আটজন। সেখানে নেমে রান্না করা হ'ল। আহারের পর একজনকে রেখে, বাকী ক'জন গ্রামের মধ্যে চলে গেল। নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ স্থানীয় দফাদার যথানিয়মে বাসায় নিদ্রিত না-থেকে, চৌকি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এত গভীর রাত্রে একখানা নৌকা দেখে তার ঔৎসুক্য হ'ল এবং নৌকার আরোহীকে নামধাম, আগমনের হেতু প্রভৃতি নানা প্রশ্ন জুড়ে দিল।

নবাগত লোকটি প্রথমে কিছুই বলতে চায়নি ; পরে বলে, তার নাম অতুলচন্দ্র ঘোষ। রাত্রি দু'টার সময় অপর একজন এসে 'অনিল' বলে ডাকার পর শুনলে যে, আশেপাশে পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে। শুনেই সে-লোকটি সেখান থেকে অন্তর্দ্ধান হ'ল।

এধারে ভোর চারটা নাগাদ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, ঘেওড় থানার রামদিয়ানালী গ্রামে ললিতচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ী একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। পুলিশ চারিদিকে খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। গ্রামবাসীরা সংবাদ দিল যে, ডাকাতরা বরাইল ঘাটের দিকে গিয়েছে। ভোর সাড়ে চারটার সময় একজন লোক নৌকায় প্রবেশ করতে যায় ; পরে শোনা গেল যে, তার নাম 'ললিতমোহন ঘোষ' বলেছে।

রাত্রের মধ্যেই ধরা পড়ে গেলেন নৌকার মধ্যে অবস্থানকারী অতুল (ওরফে অনিল)-চন্দ্র ঘোষ, ললিতমোহন ঘোষ, ভুবনমোহন দাস, অরবিন্দ বসু, নলিনীরঞ্জন গুপ্ত, প্রফুল্লরঞ্জন রাহা ও দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

তদন্তের মুখে জানা গেল—আক্রান্ত বাড়ীটির মালিক হচ্ছেন আসামী দেবেন্দ্র বিশ্বাসের খুল্লতাত। সঙ্গে সঙ্গে ভারত-রক্ষা আইনের বিধানে বিশেষ আদালত

(Standing Commission) গঠিত হ'ল। ডিসেম্বর ১৩-ই প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। লুণ্ঠিত ৫৬৫ টাকা পুলিশ কর্তৃক ধরা পড়ে।

একটি ব্যাপার এ-মামলায় প্রকটিত হ'ল। এসকল দুঃসাহসিক কাজে স্কুলের অপরিণতবয়স্ক ছেলেরা এসে জুটেছিল। কিসের প্রভাবে, সেটা আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়; ঘটনার বিবৃতিই হ'ল মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দলের সাত জনের মধ্যে পাঁচ জন ছিল ঈশান বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং এই শিক্ষায়তন 'অনুশীলন সমিতি'র নেতৃবর্গদ্বারা পরিচালিত হ'ত।

ময়মনসিংহ ঃ শহিলদেও— অনেক ঘটনার মধ্যে ময়মনসিংহের বরবেটা থানার শহিলদেও ডাকাতির খবর আসর খুব সরগরম করে তুলেছিল। হিসাবমত দুটো স্বতন্ত্র ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে। ১৯১৬ অক্টোবর ১৭-ই পঁচিশ-তিরিশ-জন যুবক এক স্ত্রীলোকের বাড়ী হানা দিয়ে তার সমস্ত গহনা সংগ্রহ করে নেয়। আর বড় দলটা যায় মহম্মদ মালিকের বাড়ী। এটা যে "ভদ্রলোক" ডাকাতদল, সেটা বোঝা গেল নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ইংরেজীতে চলেছিল বলে। আগন্তুকরা এতটা আশা করেনি। মালিকের বয়স ৭০ পার, কিন্তু অতি দুঃসাহসের সঙ্গে ডাকাতদের আক্রমণে বাধা দিতে এগিয়ে আসেন। এলেন গ্রামবাসীদের কয়েকজন। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার থেকে গুলি ছুটলো। মালিক নিজে নিহত হলেন; পাঁচজন আহত। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ আশী হাজার টাকা। এত টাকা একসঙ্গে লুঠ হবার কথা সেদিনে ক্বচিৎ শোনা গেছে।

ময়মনসিংহ ঃ পরাইল— বৎসরের অন্তিম আঘাত পড়লো ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানার এরফান আলি সরকারের বাড়ীতে, ১৯১৬ নভেম্বর ৭-ই। ডাকাতরা দলে বেশ ভারি ছিল, অনুমান হয়েছিল ২৫।৩০ জন। এসেই এলোপাথাড়ি (random) গুলি চালাতে লাগলো; সঙ্গে মসার-পিস্তল ছিল—কাছে ঘেঁষা দায়। আলি-সাহেবের পুত্র নিহত হলেন গুলির আঘাতে। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ তিন হাজার টাকা মাত্র।

কুমিল্লা ঃ ত্রিপুরার কান্দিরপাড় থানার অধিবাসী অবনীমোহন রায়চৌধুরী; কুমিল্লাতে বিচার হয় অস্ত্র-আইনে। দুটি পৃথক্ দিনে তাঁর কাছে আপত্তিকর অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে দুটো স্বতন্ত্র মামলা রুজু করা হয় এবং একটা মামলার নিষ্পত্তি হয়—১৯১৬ এপ্রিল ৬-ই, আর দ্বিতীয়টি হ'ল ঠিক একমাস বাদে—মে ৬-ই। প্রত্যেকটিতে দু'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অর্থাৎ মোট কয়েদ খাটতে হয়েছে চার বছর এক মাস।

মরণ-যজ্ঞ

সঞ্জীব রায় ঃ ভারতের কারাগার বহু দেশপ্রেমিককে কোল দিয়েছে। ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে বন্দী মেঝেয় পড়েছেন, ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে!

কখন ঘটেছে তা জানবার লোক কাছে থাকেনি, কি কারণে ঘটেছে তার আসল খবর কিছুটা জানেন জেলের ডাক্তার আর জন-দুই বড় কর্ম্মকর্ত্তা।

দেশসেবা-মাত্রই যখন অপরাধ তখন ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের সঙ্গীবচন্দ্র রায়ের জেলের বাইরে থাকা চলে না। গুপ্তচর খবর দিয়েছে সঙ্গীব একটু উগ্রমতের মানুষ। পুলিশ লেগে গেল তাঁকে ধরবার জন্যে, ১৯১৬ এপ্রিলের এক জরুরী হুকুম নিয়ে। পরোয়ানায় ছিল—ধরার সঙ্গে-সঙ্গেই এক সুদূর পল্লীতে অন্তরীণ করে আটকে রাখতে হবে। যাকে ধরা হবে, তার যে কিছু জবাবদিহি করবার সুযোগ আছে, তা নয়। বাড়ীতে হাজির হয়ে পুলিশ সঙ্গীবকে তখন পেলে না। কিন্তু পাওয়া গেল—১৯১৬ জুলাই ১৩-ই, কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরের সন্নিকটে। তখন তিনি সাইকেল চড়ে যাচ্ছিলেন ; সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল একটা রিভলভার আর কয়েকটা কার্ত্তুজ। থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার হ'ল, সঙ্গীবের লোহার শরীর তাতে ভাঙ্গল।

বিচারে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল। কিন্তু এতে নিষ্কৃতি পাবার তো কথা নয়। "বাঘে ছুঁয়েছে" যে! এক সাজা চলছে, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। সরকারী হুকুম ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাবার জন্য আবার মামলা শুরু করলো সরকার-বাহাদুর।

প্রথম মামলার সাজার জন্য আসামী আপীল করেছিলেন। কিন্তু ১৯১৬ সেপ্টেম্বরে গভর্ণমেণ্ট তরফে সংবাদ প্রচারিত হ'ল যে, সঙ্গীব রক্ত-আমাশয় রোগে মারা গেছেন। তাঁর রোগের খবর কেউ শোনেনি, সুতরাং সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেল। এর মধ্যে অনেক কারচুপি আছে। পিটিয়ে মেরে থাকলেও বলবার কিছু নেই। অন্ত্যেষ্টির জন্য আত্মীয়রা শব নেবার বহু চেষ্টা করে বিফল হলেন। সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়ে উঠলো।

প্রতিশোধ

এইবার "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" যে-পর্ব অনুষ্ঠিত হ'ল, তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখে দেওয়া যাক্। পুলিশ-সাহায্যে নতুন আইনে বেওয়ারিশ ধরপাকড় সত্ত্বেও যখন বৈপ্লবিক উপদ্রব রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন অজস্র অর্থব্যয়ে গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেকার অনুসৃত নীতি গুপ্তচর-নিয়োগ আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিপ্লবীরাও অনুপাতে তাদের কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে চলেছে, তারই নিদর্শন কিছু পাওয়া যাবে।

নোয়াখালি ঃ স্কুলের ছাত্র হিসাবে বয়স বেশী হয়েছে—২১ বছর, নোয়াখালি রাজকুমার জুবিলী স্কুলের শ্রীশচন্দ্র রায় ; সাকিম ঃ রায়গঞ্জ থানার কালপাড়া গ্রাম,—হঠাৎ যেন আর-একটা কি কাজ যোগাড় করে ফেললে—পুলিশের সঙ্গে

গোপন পরিচয়। হয়তো তারই ফলে সে জল-পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (S. I., River Police) পদের মনোনয়ন পেয়ে থাকবে। পাশ-টা করলেই নিয়োগপত্র পেয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ১৯১৬ জানুয়ারী ১০-ই, ভোর ছ'টার সময় অজ্ঞাত কোনও লোক তার বাড়ী এসে নাম ধরে ডাকে। সম্ভবতঃ বিশেষ জরুরী কাজে থানা থেকে এ-সময় তার ডাক আসতো।

শ্রীশ যে সেই লোকটির সঙ্গে বাড়ী থেকে চলে গেল, এপর্য্যন্ত খবরটা ঠিক। তারপরে বাড়ী থেকে মাইল-খানেক দূরে শ্রীশের রক্তাক্ত মৃতদেহ সদর রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় লোকরা প্রত্যুষে বন্দুক-ছোড়ার তিনটে শব্দ শোনে এবং বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ঘটনাস্থলে শ্রীশকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। দেহের তিন স্থান গুলিবিদ্ধ হয়েছে এবং নিহত লোকটির গায়ের কোট ও গরম চাদরের অংশের দগ্ধ অবস্থা থেকে মনে হয়, তার গা ছুঁয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ছোড়া হয়েছে।

কলিকাতা ঃ বছরের প্রথম পুলিশ-বলি হচ্ছেন মধুসূদন ভট্টাচার্য্য; খুব সুনাম সি.আই.ডি.-তে; দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁর ডাক পড়ে, বিভাগীয় বুদ্ধিতে তিনি ধুরন্ধর। সন্দেহভাজন বহু লোককে চেনেন বলে, সময়-সময় ঘাঁটি আগলাতে তাঁকে নিয়োগ করা হয়, যাতে সুষ্ঠুভাবে বিপ্লবীদের চলাফেরা, পরস্পরের মেলামেশা লক্ষ্য করে, নতুন শিকার 'মার্কা' বা দাগী করে রাখতে পারেন।

চলছে সব ঠিকই। "বিপদভঞ্জন"-এর নাম ধারণ করেও তিনি পড়লেন চরম বিপদে। মেডিক্যাল কলেজের মেন-গেটের আশপাশে বিপ্লবীদের মধ্যে মেলামেশার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। এরা কারা? কে কে আসে যায়, যদি মানুষ চিনে তাদের লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে কোনও ধারণা করা যায়, এসব তথ্য-নির্দ্ধারণের জন্য চতুর-চূড়ামণি মধুসূদনের ওপর ভার পড়ে। "খোদার ওপর খোদকারী"—বিপ্লবীরাও লক্ষ্য করলে তাদের ওপর 'নজর' রাখা হচ্ছে, সুতরাং ঐ আপদকে দূর করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রস্তুতিপর্ব্ব শুরু হয়ে গেল। বিশেষ 'দাগী' নয়, এমন লোক ওখানে মোতায়েন হ'ল। এ যেন দস্তুরমত 'সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি'। ক'দিন চলছে এইরকম, আর মধুসূদনের দিন ঘনিয়ে আসছে। ১৯১৬ জানুয়ারী ১৬-ই, ইন্সপেক্টর-সাহেব বেলা ১০-টা নাগাদ একখানা দক্ষিণগামী শ্যামবাজারের ট্রাম থেকে কলেজ ষ্ট্রীট আর কলুটোলা ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে নেমে, তাঁর নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণের জন্য আসছিলেন। মাত্র কয়েক গজ এসেছেন, এমন সময় দু'জন যুবক অপর ফুটপাথ অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজের দেয়ালের কাছ থেকে ছুটতে ছুটতে এসে মধুসূদনের গা-ঘেঁষে উপর্য্যুপরি তিনবার রিভলভার থেকে গুলি ছুটিয়ে দিয়েছিল। মোট তিন সেকেণ্ড-ও লাগেনি। বুলেট আর পরিত্যক্ত টোটার খোল থেকে বোঝা গেল যে, তারা মসার-পিস্তল ও ওয়েব্লি-রিভলভার ব্যবহার করেছে।

বাঁ-পাশ ফিরেই যুবকরা প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীটে প্রবেশ করে; পিছনে একদল

লোক ধাওয়া করে যায়, কিন্তু কাছে যেতে খুব একটা সাহস করছিল না,—মাঝে মাঝে গুলি ছুটছে। তখন আততায়ীরা অনতি-উচ্চ পাঁচিল টপ্‌কে একটা বাড়ীতে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একেবারে সন্নিকট মৃত্যুর সঙ্গে হাসপাতালও অবস্থিত। আহত ব্যক্তিকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে ফেলা হ'ল, তখন তিনি সকল চিকিৎসার বাহিরে। দুটো গুলি লেগেছে—একটা পিঠে, আর একটা কাঁধে। বাকীটা তাঁর বক্ষস্থল ভেদ করে চলে যায়। তাই থেকে স্থির হয়, দু'বার গুরুতর আঘাত পাবার পরও শক্তিমান পুরুষ আততায়ীদের দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। তাতেই তিনি শেষ ও মারাত্মক আঘাত লাভ করেন।

আততায়ীদের বিবরণ দিয়ে, গভর্ণমেণ্ট ধরে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। প্রথম লোকটির কালো রঙ, আঁটসাঁট গড়ন, মাঝারিরকম দীর্ঘ, ঘনকৃষ্ণ গুম্ফ, সাদা আলোয়ান ও মোটা গরম গেঞ্জি গায়ে ; আর দ্বিতীয়টি তার প্রায় বিপরীত—অর্থাৎ ফরসা রঙ, রোগা গড়ন, মাঝারি মাপ, গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান আর এক পাঞ্জাবি বা শার্ট। এত করেও কোনও তথ্য বা তত্ত্ব পাওয়া গেল না, সবই বিফল হ'ল।

ময়মনসিংহ ঃ প্রকাশ্য গুপ্তচর-বৃত্তির জন্য ময়মনসিংহের শশী চক্রবর্ত্তীর ওপর স্থানীয় "স্বদেশী" ছেলেদের একটা স্বভাবসিদ্ধ বিদ্বেষ ছিল ; বলা বাহুল্য, বিদ্রূপের পাত্র তো বটেই। বোধ হয় কিছু বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। হঠাৎ ১৯১৬ জানুয়ারী ১৯-এ, বাজিতপুর-শোভারামপুর সদর রাস্তার ওপর দীঘির পাড়ের কাছে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। দেহে শাণিত অস্ত্রের আঘাত-চিহ্ন বর্ত্তমান। তাতেও মনঃপূত হয়নি বলে, গোটা-দুই রিভলভারের গুলি দেহে প্রবিষ্ট করা ছিল।

মালদহ ঃ অত্যুৎসাহী কোনও কোনও শিক্ষক তাঁর কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছাড়া 'ছাত্র-কল্যাণে' অন্যান্য অপ্রিয় কাজও করেছেন। সবারই দুষ্টবুদ্ধি এবং সরকারী গুপ্ত-অর্থে লোভ যে ছিল তা নয়, অনেকসময় অপরিণতবুদ্ধি ছাত্ররা বাহাদুরীর লোভে রাজনৈতিক আবর্ত্তের মধ্যে না-পড়ে, সে-উদ্দেশ্যেও পুলিশ বা হাকিমকে সংবাদ দিয়ে থাকবেন।

মালদহ জিলা-স্কুল পরিচালনা করতেন নবীনচন্দ্র বসু। 'গরম' ছাত্ররা লক্ষ্য করে যে, তিনি যা করছেন, সেটা তাদের সহনশক্তির বাইরে। এ (অপ-) কার্য্যে অতীত ইতিহাসে তাঁর দুর্নাম ছিল। ১৯১০ সালে তিনি সরকারী স্কুলের প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। ঐ সময় তিনি 'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা'য় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন। ১৯১১ জুলাই ১৫-ই জামালপুর সহর তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত

প্রাচীরপত্রে ভরে গিয়েছিল। সে-অভ্যাস তাঁর যায়নি, মালদহ জেলা-স্কুলেও তিনি সেই খেলা খেলছিলেন। একদল ছাত্র তাঁর ওপর দারুণ বিরূপ হয়ে ওঠে।

বিকেল সাড়ে-ছয়-সাতটার মধ্যে বেড়িয়ে বাসায় ফিরছিলেন, ১৯১৬ জানুয়ারী ২৮-এ। সারকিট হাউস (Circuit House) ময়দানের কাছে যখন এসেছেন তখন সাত-আটজন যুবক কর্তৃক তীক্ষ্ণ ছোরা দ্বারা আক্রান্ত হন। দূর থেকে দু'জন কন্ষ্টেবল "বাপ্‌রে! বাপ্‌রে!" কাতরধ্বনি শুনতে পায়। ঘটনাস্থলেই নবীনচন্দ্রের প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে যায়।

কয়েকটা ছেলে ছুটছে দেখে নিকটবর্ত্তী লোকরা পিছু ধাওয়া করে এবং একজনকে ধরে ফেলে। স্পেশ্যাল জজ কর্তৃক ১৯১৬ জুলাই ১২-ই আসামী মহেন্দ্র-নাথ দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীল হয়েছিল; জানুয়ারী ২৮-এ মে সে-আপীল নাকচ হয়ে যায়।

বরাহনগর ঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে উপেন ঘোষ, ওরফে দেবব্রত ব্রহ্মচারীর বাস। বিপ্লবী কর্ম্মীদের সঙ্গে মেলামেশা খুব, কিন্তু তার পিছনে একটি গোপন উদ্দেশ্য ছিল—অর্থাৎ পুলিশকে গুপ্ত-সংবাদ সরবরাহ দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন। বেশীদিন খবরটা চাপা থাকেনি। হঠাৎ ১৯১৬ আগষ্ট ১০-ই থেকে তার কোনও পাত্তাই পাওয়া যায় না। পুলিশ তৎপর হয়ে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিলে। একদিন ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে এক ট্রেনের কামরায় বে-ওয়ারিশ এক তোরঙ্গ পড়ে থাকতে দেখা গেল। মালিকহীন সম্পত্তি পুলিশ-হেপাজতে জমা হ'ল। ঢাক্‌না খুলে যে-মৃতদেহ আবিষ্কৃত হ'ল, সেটা পরে উপেন ঘোষের বলেই সনাক্ত হয়েছিল। সন্ধান করে, ১৯১৭ নভেম্বর নাগাদ তিনজন আসামী খাড়া করে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে হাজির করা হ'ল, ১৯১৮ জানুয়ারী ৪-ঠা। কিন্তু ধোপে টিকলো না; এপ্রিল ১১-ই সবাই মুক্তিলাভ করে।

ময়মনসিংহ ঃ বিবরণ কিছু পাওয়া যায়নি। অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদ। ময়মনসিংহের নামকরা গুপ্ততথ্য-সরবরাহকারক বলাই লোধকে ১৯১৬ আগষ্টে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় মৃত পড়ে থাকতে দেখা যায়। এটা যে বিপ্লবীদের দ্বারা সংসাধিত, সেটা বুঝতে কারও কষ্ট হয়নি।

ঢাকা ঃ ঢাকা গুপ্ত-তথ্যানুসন্ধান-বিভাগের (সি.আই.ডি.) দুই কন্ষ্টেবল সুরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ও রোহিণীকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অতিরিক্ত তৎপরতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে দিলেন। দু'জন পলাতকের সন্ধানে তাঁরা ব্যস্ত। মুখোপাধ্যায়-দ্বয়ের ওপর স্বভাবতঃই বিপ্লবীদের বিষদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। তাঁদের সরিয়ে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্তও গৃহীত হ'ল। ১৯১৬ জুন ২৩-এ, প্রায় ৬-টার সময়—বেলা যখন ঢলে পড়ে-পড়ে, দু'জন যুবক হঠাৎ আবির্ভূত

হয় এবং ঢাকার বৈরাগীতলা গলির মুখে সুরেন্দ্র ও রোহিণীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। সুরেন্দ্র পাঁচটি ও রোহিণী সাতটি গুলি-বিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন।

বসন্ত চট্টোপাধ্যায়

জীবনের খেলা যখন শেষ হয়ে আসে, তখন মৃত্যু কোথা দিয়ে তার পথ খুঁজে নেয়, সে-কথা বলার সাধ্য কারও নেই। বসন্ত চট্টোপাধ্যায় গুপ্ত-পুলিশ-বিভাগের এক স্তম্ভস্বরূপ। ক্ষুরধার বুদ্ধি আর বুকে অদম্য সাহস। কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে কখনও দ্বিধা করতেন না। ইংরেজ-অধ্যুষিত গুপ্ত-পুলিশ-বিভাগকে কঠিন সমস্যায় বসন্তর শরণাপন্ন হতে হ'ত।

বসন্তর অসমসাহসিকতার মূলে ছিল তাঁর অদ্ভুত ভাগ্য। ঘোরতর বিপদ কোথা দিয়ে কেটে যেত তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ১৯১৪ জুলাই ১৯-এ, ঢাকা সহরে একদিন তাঁকে লক্ষ্য করে গোটাকয়েক বুলেট পাশ দিয়ে ছুটে গেছে। তাতে বসন্তর কোনও ক্ষতি হয়নি, কিন্তু মরেছিল তাঁর এক দেহরক্ষী।

আরও অদ্ভুত উপায়ে নিয়তি তাঁকে রক্ষা করেছেন। ঐ বছরই নভেম্বর ২৫-এ, ১০৪।৪-নং মুসলমানপাড়া লেনের বাসায় সন্ধ্যার সময় তিনজন বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের সঙ্গে গোপন পরামর্শে লিপ্ত ছিলেন ; সদর দরজায় চৌকিদার উপবিষ্ট। বাড়ীর ভিতর থেকে ডাক আসায় তিনি উঠে গেলেন। ফিরতে দেরী হতে পারে বলে, অন্য পুলিশ অফিসাররা রওনা দিলেন,—আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দে এক বোমা ফাটলো ঘরের দরজার সামনে। অনুমান হয়, অপরদের আঘাত করবার ইচ্ছা হয়তো ছিল না, তাই আগন্তুকরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফেলা হয়েছে ; মনে করা হয়ে থাকবে যে, বসন্ত ঘরের মধ্যেই আছেন। বোমার বিদারণ একেবারে নিষ্ফল হয়নি। দ্বাররক্ষী রামভজন গুরুতররূপে আহত হয়। পা-দু'খানি চূর্ণ হয়েছে, দেহের অন্যান্য স্থানেও গভীর ক্ষত হয়েছে। দু'দিনের মধ্যেই হতভাগ্যের মৃত্যু ঘটে হাসপাতালে।

শ'-তিনেক গজ তফাতে এক যুবককে রাস্তায় রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ; পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার ও যথারীতি মামলা। পুলিশের দুর্ভাগ্য, রাম-ভজনের মৃত্যুর কারণের সঙ্গে যুবকটির আঘাতের কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারা গেল না। ফলে সে মুক্তিলাভ করে।

কথায় বলে "বার বার তিনবার"। দু'বার বিফল হয়েও বসন্তকে হত্যার চেষ্টার বিরাম নেই। সুতরাং তৃতীয়বার। আর বসন্তর অদৃষ্টও তাঁকে রক্ষা করতে-করতে যেন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। ১৯১৬ জুন ৩০-এ হ'ল এক স্মরণীয় দিন। বিপ্লবীভাগ্য সুপ্রসন্ন, বসন্তর পক্ষে অশুভ। যথারীতি দিনের কাজ সেরে

বসন্ত অফিস থেকে নিজ বাসায় ফিরছেন সাইকেল চড়ে। এখনকার মত তখনকার দিনে মাঝারি অফিসাররা 'অফিস-কার' পেতেন না। বসন্তর সঙ্গে দেহরক্ষী বিলাসচন্দ্র ঘোষ সাইকেলের আরোহী। চৌরঙ্গী হয়ে বসন্ত ডানদিকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটের মধ্যে প্রবেশ করেছেন—যাবেন হরিশ মুখোপাধ্যায় রোডে। একপাশে (উত্তরে) কিছুটা ফাঁকা মাঠ, ছেলেরা সেখানে ফুটবল খেলছে। পদযাত্রী ও যানবাহনে রাস্তায় ভিড়ে-ভিড়।

মনে হ'ল যেন ভুঁই ফুঁড়ে পাঁচ-ছ'-জন যুবক আবির্ভূত হলেন। চক্ষের নিমেষে রিভলভার দিয়ে তাঁরা বসন্তকে আক্রমণ করলেন। দেহরক্ষী একজনের ঘাড় ধরে ফেলেছেন। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। যাঁরা বসন্তকে গুলি করছেন, তাঁদের আর সঙ্গীটির সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না। ধৃত ব্যক্তি নিজেই নীচু হয়ে বিলাসের পায়ে গোটা-দুই গুলি প্রবিষ্ট করাতে, বিলাস ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর দেহে আরও গোটা-দুই গুলি করায়, তিনি একেবারে মরণের মুখে এসে পড়লেন।

বসন্তর ওপর অবিশ্রাম আক্রমণ চলছে। চার (হয়তো পাঁচ) জন-ই পর পর ন'টা বুলেটের দ্বারা বসন্তকে প্রায় "ভীষ্মের শরসজ্জা" পর্য্যায়ে এনে হাজির করেছিলেন। যে বুলেট মাথার মধ্যে প্রবেশ করে, সেইটিই তাঁর সাক্ষাৎ মৃত্যুর কারণ বলে উল্লেখ করা হয়।

কার্য্যসিদ্ধির পর নিশ্চিন্তমনে আততায়ীরা এলগিন রোড (লালা লাজপত রায় সরণী) ধরে পূর্বদিকে চলবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন, তখন আর একজন কন্‌ষ্টেবল তাঁদের বাধা দিতে এগিয়ে আসে। প্রত্যেকের হাতে রিভলভার এবং তাঁদের মারমুখী অবস্থা দেখে সে সরে দাঁড়ায়। আততায়ীরা পিপুলপটি (এলগিন) লেন ধরে অদৃশ্য হয়ে যান।

'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকা বড় ক্ষোভে-লজ্জায় ক'টা খাঁটী কথা সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেছিল—জুলাই ১-লা :

বাঙ্গলার বিপ্লবীরা এপর্য্যন্ত যত দুঃসাহসিক কাজ করেছে, বর্ত্তমান ঘটনা তাদের সকলকে ছাপিয়ে গেছে ("The most audacious crime which the Bengal anarchists have yet perpetrated ....")। আর বলেছিল যে, এটি বিপ্লবীদের পক্ষে একটি বিশেষ জয় এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তদপেক্ষা গ্লানির পরিচয় ("It is a special triumph for the anarchists and a special source of humiliation for the Government")।

'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় ভাষাই ঘটনার গুরুত্ব সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে না। সব দিক বিচার করে ১৯১৮ সালের 'সিডিশন কমিটীর রিপোর্ট' লিখেছে (পৃঃ ১৮১) :
পুলিশকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলাটা ছিল বিপ্লবীদের বিশেষ লক্ষ্য এবং এই ঘটনা

থেকেই তারা প্রায় উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম হয়েছিল ("By this crime the revolutionaries were brought within sight of the realisation of one of their preliminary objects, namely, the demoralisation of the police")।

এত ঘটনার মধ্যে বসন্তর মৃত্যু গভর্ণমেণ্টকে একেবারে বিচলিত করে ফেলেছিল। এর আগে, অনেক পুলিশ মরেছে, কিন্তু বসন্তর ওপর গভর্ণমেণ্টের যে আস্থা ও নির্ভরতা ছিল সেটা যখন জানা যায়—তখন তাঁর মৃত্যুর পর বিশেষ-আইন-প্রয়োগে আর বিলম্ব করা যায় না। Report বলছেঃ "The necessity of extraordinary measures could now no longer be denied."

আর্দ্দালী বিলাসচন্দ্র আগষ্ট ১৬-ই শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

'মর্ম্মন্তুদ'

সন্দেহমাত্র পুলিশ যখন গ্রেপ্তার ও আটক রাখবার শক্তি পেয়েছে তখন সেটা ব্যাপক প্রয়োগ করতে কৃপণতা করেনি। আর, আটক রেখে জীবন অতিষ্ঠ করে তোলবার উপায়ের অভাব ছিল না, তার ফলে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শেষ উপায় আত্মহত্যা করে 'বন্দী' উদ্ধার পেয়েছে।

রংপুরে বাড়ী, নাম শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভরপুর যৌবন, বয়স মাত্র ১৮। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁর নাম। বিশেষ কোনও ঘটনার সংবাদ নেই, অথচ ১৯১৬ আগষ্ট ২৪-এ, ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে তাঁকে বাড়ী থেকে বহুদূরে এক অস্বাস্থ্যকর গ্রামে অন্তরীণ করে পাঠানো হ'ল। বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে তাঁর পিতৃদেব ডিসেম্বর ১৯-এ থেকে স্বগৃহে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা করিয়ে নেন।

পিতামাতার স্নেহ আছে বটে, কিন্তু যৌবনের বিপুল ও বহুমুখী শক্তি ঐ ছোট একটি গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা থাকতে চাইছিল না। কারও সঙ্গে মেলামেশার হুকুম নেই; কলিকাতার কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র,—স্থানীয় কলেজে ভর্ত্তি হতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন। পুলিশের আনাগোনা, থানায় হাজিরা প্রভৃতিতে যেন আরও কড়াকড়ি পড়ে গেল।

বর্ত্তমানে উপার্জ্জন নেই, ভবিষ্যতে উপার্জ্জন করার শিক্ষায় প্রচণ্ড বাধা বর্ত্তমান। শচীনের মনের ওপর এর প্রভাব পড়তে লাগলো। আনন্দ অন্তর্হিত, হাসি-ঠাট্টা নিঃশেষ—সদা ম্রিয়মাণ। দেহের ওপর মনের অশান্তির অভিশাপ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বাবা-মা'কে মুখে এক কথাঃ "আমি তোমাদের গলগ্রহ হয়ে আর কতকাল থাকবো? আমার জন্যে বাড়ীর সকলে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে বিব্রত। এ অবস্থা কিন্তু আর বেশীদিন চলবে না।" তাঁকে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়ে শান্ত করার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। কিন্তু তাতে কোনও ফল যে হচ্ছিল, তার প্রমাণের যথেষ্ট অভাব।

শচীন প্রায়ই এরকম কথা বলেন, বিশেষ করে ১৯১৭ সেপ্টেম্বর ১৮-ই রাত্রে নিজ ঘরে শুতে যাবার আগে কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে গেলেন জননীর কাছে।

ভোরে ঘুম থেকে ওঠা ছিল শচীনের অভ্যাস। পরের দিন সাতটার পরও দরজা বন্ধ। ডাকে সাড়া না-পেয়ে, দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখা গেল শচীনের অচৈতন্য দেহ মাটীতে পড়ে আছে ; পাশে একটা বাটিতে সামান্য দুধ আর খানিকটা আফিম। বহু চেষ্টাতেও মৃত্যুপথযাত্রীকে আর ফিরিয়ে আনা গেল না ; সেপ্টেম্বর ১৯-এ বেলা দ্বিপ্রহরে শচীন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শচীন তিনখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন—যথাক্রমে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, সি.আই.ডি.-ইন্সপেক্টর আর নিজ দাদাকে। দারোগাকে লেখেন ঃ "এখন যেখানে চললাম, আপনার অত্যাচার সেখানে পৌঁছুতে পারবে না।"

চুকে গেল সব ; অমূল্য এক জীবনদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হয়ে গেল। মহাপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের কাছে খবরটা পৌঁছুলে, তিনি অত্যন্ত ক্ষোভে মনের ব্যথা প্রকাশ করেন। প্রতি চিন্তাকুল পিতামাতা, অতি-নিকট-আত্মীয়ের উদ্বেগ-অমঙ্গলের আশঙ্কাকে তিনি অননুকরণীয় সংবেদনশীল ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন ; 'প্রবাসী' (১৩২৪ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১২৪) থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। রাজনৈতিক কারণে বন্দীদের সম্বন্ধে তিনি কত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, এই প্রবন্ধ থেকে সেটা অনুমান করা যাবে। প্রবন্ধের শিরোনামা "ছোট ও বড়"।

জগতের সকল জাতি সামনে এগিয়ে চলেছে, তাতে বিরাম নেই বিচ্ছেদ নেই। কবি বলছেন ঃ

"মহৎ লক্ষ্যের প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়া দুঃখ স্বীকার করাই সেই বাড়িয়া চলিবার গতি। সকল বড় জাতির ইতিহাসেই এই গতির দুর্নিবার আবেগ ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপল বন্ধুর পথে গর্জ্জিয়া, ফেনাইয়া, বাধা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ইতিহাসের সেই মহৎ দৃশ্য আমাদের মত পোলিটিক্যাল পঙ্গুদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া রাখা অসম্ভব। এইজন্য যে-সব যুবকের প্রকৃতিতে প্রাণের স্বাভাবিক উত্তেজনা আছে, মহতের উপদেশ ও ইতিহাসের শিক্ষা হইতে প্রেরণা লাভ করা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা তাদের কাছে যে মৃত্যুর চেয়ে দারুণতর, সে-কথা আত্মহত্যাকালে শচীন্দ্র দাশগুপ্তের মর্ম্মান্তিক বেদনার পত্রখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে।

* * *

"আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সঙ্কটময় দুর্গমপথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকরা সাড়া দিতে দেরী করিল না ; তারা মহৎ ত্যাগের

উচ্চ শিখরে নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির সম্বল মাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্ত বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই, ছোট ইংরেজ ইহাদের শুভসঙ্কল্প ঠিকমত বুঝিবে কিম্বা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে এ-দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই। অন্য সৌভাগ্যবান দেশে, যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত হইয়া দিকে দিকে চলিয়া গিয়াছে, যেখানে শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছার ক্ষেত্রে এই দুয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেইখানে এইরকম দৃঢ়সঙ্কল্প, আত্মবিসর্জ্জনশীল, বিষয়বুদ্ধিহীন, কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড় সম্পদ। আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অন্তিম চিঠি পড়িলে বুঝা যায়, এই ছেলেকে যে ইংরেজ সাজা দিয়াছে, সেই ইংরেজের দেশে যদি এ জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিতে এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত। আদিম কালের বা এখনকার কালের যে-কোন রাজা বা রাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া দলন করিয়া দেশকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অসাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাই সহজ কিন্তু ইহা ভদ্র নহে, এবং শুনিয়াছি ইহা ঠিক ইংলিশ নহে।”

বিনা বিচারে মাত্র সন্দেহক্রমে পুলিশের হেপাজতে প্রাণবন্ত যুবকদের অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পঙ্গু করে রাখার ওপর এই তীব্র কশাঘাত সে-সময় কতক লোকের মনে বিশেষ চাঞ্চল্য ঘটিয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ নিজ দুরভিসন্ধিতে অটল ছিল। শচীনের মত আরও কত ছেলে অকালে জীবনত্যাগে বাধ্য হয়েছে, তার সব হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়। তবে অনেক যে ঘটেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যুদ্ধান্ত-কাল (১৯১৭)

যুদ্ধ-পরিচালনার নামে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যে-সকল বে-আইনী আইনের আশ্রয় নেয় এবং একলক্ষ্য হয়ে বিপ্লব-আন্দোলন বন্ধ করতে যে-সকল উপায় অবলম্বন করে, তার ফল বুঝতে বিশেষ বিলম্ব হয়নি। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে যতটা সম্ভব সন্ত্রাস-সৃষ্টি ও কর্ম্মক্ষেত্র হতে সাহসী যুবক অপসৃত করার একটি নীতি পালিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে ভারত-রক্ষা আইন প্রভৃতি জুড়ে দিয়ে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার ফলে সহস্র সহস্র নেতা ও কর্ম্মিবৃন্দ একেবারে অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হলেন। ক্রমে স্বাভাবিকভাবেই বৈপ্লবিক ঘটনার তালিকা সংক্ষেপ হতে থাকে। মাত্র সাতটি ডাকাতি ও একটি হত্যা হয়েছিল ১৯১৭ সালে। হত্যাটিও নিজেদের লোককে; ধরা পড়লে বিপদ হতে পারে বলে খুন করা হয়েছিল।

ঘটনা-প্রবাহ

কলিকাতা ঃ কাঁটাপুকুর— কলিকাতার বুকের ওপর কয়েকটা ডাকাতি হয়ে গেছে; কাঁটাপুকুর ডাকাতি তাদের অন্যতম। চিৎপুরের দোকান "হরনাথ শশীভূষণ কেদারনাথ বিশ্বাস" নামে পরিচিত। বড় কারবার, সব পাওনা টাকা সঙ্গে-সঙ্গেই আদায় হওয়া সম্ভব নয়, কিছু 'বিলেত' অর্থাৎ বাকী থেকে যায়, সরকার দিয়ে আদায় করতে হয়। ১৯১৭ জানুয়ারী ২৩-এ, সুরেন ঘোষ আর হরিপদ টাকা সংগ্রহ করে ফিরছে—এমন সময় রামকান্ত বসু লেন ও কাঁটাপুকুর লেনের সংযোগস্থলে কয়েকটি যুবক তাদের আক্রমণ করে দু'হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়ে।

ঢাকা ঃ পাইকারচর— ঢাকার নরসিংদি থানার পাইকারচর গ্রাম। সাধারণ গৃহস্থ হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাস সেই গ্রামে। রাত্রি সাড়ে বারোটার পর, ১৯১৭ ফেব্রুয়ারী ২৭-এ, জন-ছয়-সাত যুবক উপস্থিত হয়ে মালিককে দরজা খুলে দিতে বলে। সে-কথার কোনও সাড়া না পেয়ে তারা দরজা ভেঙ্গে ফেলে; গোটা-দুই বন্দুকের আওয়াজ করে বাড়ীর লোকদের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করে। মোট ১,২০০ টাকার মত সংগ্রহ করে ফিরে যেতে হয়।

রাজসাহী ঃ জামনগর— ডাকাতদের বড় লাভ হয়—১৯১৭ এপ্রিল ১৫-ই অনুষ্ঠিত এক ডাকাতিতে। ঘটনাস্থল রাজসাহী জেলার বাগাটিপাড়া থানায়। রাত্রি ১১-টার পর প্রায় কুড়িজন যুবক ধনী-গৃহস্থ রামরাঘব ও গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাড়ীতে হানা দেয়। কিছু বাধা পেতে হয়েছিল, কিন্তু কোনও পক্ষেই কেউ হতাহত হয়নি।

বেশ খানিকক্ষণ লুঠপাটের পর, সাড়ে ছাব্বিশ হাজার টাকা ও একটা দো-নলা গাদা-বন্দুক আর ১৭০-টা কার্ত্তুজ নিয়ে সরে পড়ে।

কলিকাতা ঃ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট— সারা বাংলায় হিংসাত্মক কাজের অসুবিধা বেড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব অন্যতম। কলিকাতায়ও তার ফল বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল। এখানকার শেষ রাজনৈতিক ডাকাতি এবং সারা বৎসরের মধ্যে একটিই সংঘটিত হয়—বড়বাজারের ৩২-নং আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটের সোনা-রূপার অলঙ্কার প্রভৃতির দোকানে।

বেচা-কেনা শেষ হয়ে গেছে রাত্রি ৮৷৷০-৯-টার মধ্যে। দোকানের মালিকের দুই ভাই মগনলাল ও ত্রিকমজীলাল এবং এক সরকার হিসাবপত্র মেটাতে ব্যস্ত। এমন সময় তিনজন এসে মুক্তার হার দেখতে চাইলে। দেখা চলেছে—হঠাৎ আর একজন প্রবেশ করে মুহূর্ত্তের মধ্যে গুলি চালাতে থাকে। মগনলাল ও তাঁর ভাই মারাত্মকভাবে আহত হন। দোকানের অন্য কর্ম্মচারীরাও কম-বেশী জখম হয়। লুঠের পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। দোকানে ফেলে যেতে হয়েছিল তার চেয়ে বেশী টাকা ; তাড়াতাড়িতে উঠিয়ে নিতে পারেনি।

এই ডাকাতির ব্যাপারে আর-একটা খুন হয়। রাত্রি ৯-টা নাগাদ একটা ট্যাক্সি ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড ধরে বাগবাজার সেণ্ট্রাল হাইড্রলিক প্রেসের নিকট থামে। তখন একজন নেমে গাড়ীতে ষ্টার্ট (start) দিতে যায়। যখন ফিরে এসে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছে, সেই সময় তাকে তিন-চারটে গুলি মেরে হত্যা করা হয়। মনে হয়, ডাকাতির পর নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাধে, যার ফলে এই মারাত্মক কাণ্ড ঘটে। লোকটির নাম সুরেন্দ্রনাথ কুশারী ; বাড়ী—খুলনা ; রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের ছাত্র।

রাজসাহী ঃ রাখালব্রুজ— ডাকাতি করতে গিয়ে নিষ্ঠুরতা যে আচরিত হয়েছে, সে-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। বেশীর ভাগ গৃহস্থই ভয়ে টাকা ফেলে দিয়ে রক্ষা পেয়েছে, কোথাও-বা কিছুটা প্যাঁচ কষতে হয়েছে ; আর চরম নৃশংসতার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নয়। রাজসাহীর গোবিন্দগঞ্জ থানার রাখালব্রুজ গ্রাম,—চোটায় (চড়া সুদে) টাকা খাটিয়ে যান সরিয়াতুল্লা সরকার। ১৯১৭ জুন ২৫-এ, রাত্রি সাড়ে ন'টায় জন-দশ-পনেরো লোক হানা দেয়। সপুত্র সরিয়াতুল্লা সাধ্যমত বাধা দিতে চেষ্টা করেন। বন্দুকের গুলির কাছে হার মানতে হয়, কিন্তু টাকার সন্ধান তাঁর মুখ থেকে আদায় করা কঠিন হ'ল। তখন চললো গুরুতর নির্য্যাতন। চোখের সামনেই পুত্র জহরতুল্লা গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করলো। কেবল এই একটা বাড়ী নয়, আশপাশের আরও দু'-তিনটি সমৃদ্ধ লোকের বাড়ী লুঠ করে ২৯,৪০০ টাকা ও প্রায় পৌনে ছ'হাজার টাকার অলঙ্কার নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

ঢাকা ঃ আবদুল্লাপুর— এই সময় উপর্য্যুপরি ক'টা হামলায় প্রচুর টাকার আগম হয়েছিল, অথচ বড় মামলায় পড়তে হয়নি। বিপ্লবীদের ছাতে কিছু টাকা জমা পড়ে থাকবে। ঢাকার আবদুল্লাপুর গ্রাম (থানা টঙ্গীবাড়ী)—১৯১৭ অক্টোবর ২৭-এ যাত্রা চলছে, উপস্থিত লোক হাজার-বারোশ' হবে ; রাত্রিও দেড়টা। ঈশ্বর মণ্ডলের বাড়ী যাত্রাস্থল থেকে খুব বেশী দূরে নয়। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে জন-ছয়-সাত যুবক গিয়ে হাজির। যাত্রার সোরগোলে চেঁচামেচি কারও কানে পৌঁছায়নি,—খুব বেশী বাধা পেতে হয়নি। প্রায় ২৫ হাজার টাকা, তার মধ্যে নগদ ৮ হাজার টাকা ডাকাতদের থলি ভর্ত্তি হয়ে চলে যায়।

ত্রিপুরা ঃ মাঝিয়ারা— এবারে ত্রিপুরা ; থানা রসুলাবাদ। সেখানে বাস করতেন সমৃদ্ধ তিন ভাই—রামজী, রাইচরণ ও রামগতি রায়। ১৯১৭ নভেম্বর ৩-রা, জন-বিশেক যুবক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাত্রি আটটার সময় সব-ক'টা বাড়ীতেই হানা দেয়। প্রথম চোটে হল্লা শুনে রামজী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এক ডাকাতের হাত ধরে ফেলেন। নিস্তার নেই, অপর একজন তাঁর পায়ে গুলি করতে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এই ঘটনার পরে আর বাধা পেতে হয়নি। রাইচরণের বাড়ী প্রবেশ করে ছ'জন, রামগতির বাড়ীতেও প্রায় সেইরকম।

একটা দো-নলা গাদা-বন্দুক আর নগদ ও অলঙ্কারে ৩০ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। ডাকাতির এই শেষ, কাজেই যাবার সময় বেশ মোটা টাকা লুঠ করে সাময়িকভাবে ডাকাতির পরিসমাপ্তি ঘটে।

দুকড়িবালা

সকলরকম মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নামকরা বিপ্লবীর নিজ হেপাজতে রেখে দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর বিপদ। অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন দুটি 'পেনাল কোড' (দণ্ডবিধি আইন)-এর ঊর্দ্ধে অবস্থিত। যাঁরা পুলিশের সন্দেহভাজন তাঁদের পিছনে গুপ্তচর আছে এবং আরও আছে প্রকাশ্যে পুলিশ কর্ত্তৃক মাঝে মাঝে বাড়ীর খানাতল্লাসীর সম্ভাবনা। লোক খুঁজে বার করতে হয়েছে, যাঁরা স্বেচ্ছায় অথবা অনুরোধ বা প্রভাবের বশবর্ত্তী হয়ে অস্ত্রাদি গোপন রেখে দিয়েছেন,—লোক "মাল" রাখতে রাজী হলেই যে সেখানে রাখা যেত, তা নয় ; নিতান্ত নির্ভরযোগ্য না হলে, বহু কষ্টে ও অর্থব্যয়ে এবং চুরি প্রভৃতি বিপদের মধ্যে যা সংগৃহীত হয়েছে—অস্ত্রাদি খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনার আগে সে-বিষয় বিবেচনা করতে হয়েছে।

অস্ত্রাদি গোপনে রাখবার খুব বেশী লোক পাওয়া না গেলেও, যা ছিল, তার সংখ্যা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। এর এক বিশেষ উদাহরণ আছে। বর্দ্ধমানের সিয়ারসোল বিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটক আর বীরভূম

নলহাটীর (ঝাওপাড়া) দুকড়িবালা দেবীর নাম আজ এই অস্ত্ররক্ষা-সম্পর্কে কারও কারও মনে পড়ে। হঠাৎ ১৯১৭ জানুয়ারী ৮-ই, বীরভূমে (নলহাটী) দুকড়িবালার বাড়ী এবং সিয়ারসোলে নিবারণের বাড়ী খানাতল্লাসী হয়েছিল। প্রথম জায়গায় দুটো ট্রাঙ্কের মধ্যে পাঁচটা ('রডা') রিভলভার, ১,১৩১-টি টোটা (কার্ট্রিজ), একটা রিভলভারের চামড়ার খাপ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। বলা বাহুল্য, নিবারণ (দুকড়িবালার বোনের ছেলে) ও দুকড়িবালার নামে অস্ত্র-আইনে ফেব্রুয়ারী মাসে মামলা রুজু হয়। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে—মহিলার নিকট স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিশ নানারূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছিল। কিন্তু একটা বাক্যও দুকড়িবালার নিকট আদায় করা যায়নি। মার্চ ১২-ই নিবারণচন্দ্রের পাঁচ বছর ও চিরস্মরণীয়া দুকড়িবালার দু'বছর কারাদণ্ডের আদেশ হয়; দুকড়িবালার কারাদণ্ডের প্রথম বছর সশ্রম আর দ্বিতীয় বছর বিনাশ্রম।

কলিকাতা ঃ মলঙ্গা লেন— মলঙ্গা লেনের ৩১-নং বাড়ী ভোর পাঁচটার সময় জোর খানাতল্লাসী করে পুলিশ রামপদ সরকারকে খোঁজ করে। কোনও মাল বা মালিক কিছুই না পেয়ে পুলিশ ফিরে যায়। সেইদিন বিকাল সাড়ে ছ'টায় রামপদ হাওড়ায় গ্রেপ্তার হন। পুলিশের কুখ্যাত, নৃশংস ও অতি কুৎসিত নির্য্যাতনকারীর হাতে পড়ে রামপদ বলে যে, বাড়ী নিয়ে গেলে সে সব দেখিয়ে দেবে। পুলিশ-পাহারায় এসে, তিনি মাটী খুঁড়ে বিশটা-কার্তুজ-ভরা এক বাক্স বার করে দেন। প্রাথমিক তদন্তের পর মামলা হাইকোর্টের দায়রায় যায় এবং ১৯১৭ জুলাই ১৭-ই আসামীর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ঢাকা ঃ আগ্নেয়াস্ত্র-সংগ্রহ-চেষ্টা কিছুদিন পর্য্যন্ত চলেছে, যদিও ডাকাতি, হামলা, খুন প্রভৃতি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ঢাকায় গিরিজাশঙ্কর চৌধুরীকে তল্লাসী করে পুলিশ রিভলভার পায়, ১৯১৭ মার্চ ২০-এ। জুন মাসে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে তাঁর অস্ত্র-আইনে বিচার আরম্ভ হয়। পরে ভারত-রক্ষা আইন (Defence of India Act)-এর কবলে নিয়ে খাড়া করা হয়। ১৯১৮ আগষ্ট মাসে তাঁর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল।

পাবনা ঃ পাবনার ছেলে অবিনাশচন্দ্র ভৌমিক ১৯১৭ জুলাই মাসে ঢাকাতে গ্রেপ্তার হলেন। অপরাধ বা অন্য তথ্য কিছুই সন্ধান করতে পারা যায়নি। কেবল নথিপত্রে বলে ঃ তাঁর ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

শ্রীহট্ট ঃ হত্যা করার চেষ্টা (দঃ বিঃ আঃ ৩০৭ ধারা) ও অপহৃত মাল হেপাজতে রাখা (দঃ বিঃ আঃ ৪১২ ধারা)-র অপরাধে সিলেটের (মাচুল্লি থানা) প্রফুল্লরঞ্জন রায়কে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৭ নভেম্বর ৩০-এ, প্রথম দফায় তাঁর আট বছর ও দ্বিতীয় দফায় চার বছরের সশ্রম

কারাদণ্ড হয়েছিল। সাজার গুরুত্ব বোঝা যায়, যখন জানা গেল—প্রথম মেয়াদের অন্তে শেষ মেয়াদ চার বছরের সাজা আরম্ভ হবে ; অর্থাৎ দেশসেবায় প্রফুল্লরঞ্জনের একসঙ্গে বারো বছরের জেল ভোগ করতে হয়।

ঢাকা ঃ সতীশচন্দ্র সিংহ নিরীহ গো-বেচারার মত ঢাকা রেল-ষ্টেশনে ঘোরাফেরা করছেন, ট্রেনখানা এসে পড়লে সরে পড়তে পারেন। সময়টা হচ্ছে—১৯১৭ জুলাই মাস। তাঁর আসল সাকিম হ'ল ত্রিপুরা, মুকুণ্ডি গ্রাম। বিচারালয়ে হাজির হলে, পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাসের হুকুম হয়েছিল। অপরাধ হ'ল—দণ্ডবিধি আইনের ৪১৭ ধারা (অপরের চুরি বা ডাকাতিতে সাহায্য, অপহৃত দ্রব্যাদি গ্রহণ ও রক্ষা করা ইত্যাদি) ও ১২০-বি (ষড়যন্ত্র)।

বীরভূম ঃ নিবারণচন্দ্র ঘোষ 'বীরভূম ষড়যন্ত্র' সম্পর্কে ধরা পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত এ-মামলা বেশীদূর গড়ায়নি ; কিন্তু নিবারণের কাছে ১৯১৭ সালে রিভলভার পাওয়াতে, তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

মরণ-যজ্ঞ

হরিচরণ দাস ঃ অস্বাস্থ্যকর এবং নানারকম অসুবিধাপূর্ণ দূর-দূর গ্রামের মধ্যে বিনা বিচারে অন্তরীণ রেখে অকালে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া বা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করার উদাহরণ অনেকগুলি পাওয়া যাবে ; তার মুখবন্ধ হিসাবে হরিচরণ দাসের কথা উল্লেখ করা যাক্।

ডায়মণ্ড হারবার থানার সাহালামপুরে হরিচরণ দাসের বাড়ী ; বিবাহিত যুবক, গ্রামের মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা অতিশয় জনপ্রিয়। রাজনীতি কতটা করতেন সেটা তাঁর যতটা জানা ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল পুলিশের। তিনি নাকি ভবানীপুর বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে জড়িত। এই অপরাধের অনেকখানিই ছিল গুপ্তচরের রিপোর্ট। ১৯১৭ জুন ৯-ই এক সরকারী আদেশে তাঁকে রাজসাহী জেলার পুটিয়া থানার অন্তর্গত বারাইপাড়া গ্রামে অন্তরীণে প্রেরণ করা হয়। যারা এরকম বাসের যন্ত্রণার কথা জানে না, তারা মনে করে সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট মাসিক টাকা দিয়ে আরামে আনন্দে থাকবার ব্যবস্থা করেছে।

যাই হোক্, হরিচরণের কপালে এ-সুখ লেখা ছিল না। হরিচরণের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না। চিকিৎসার টাকা তো দূরের কথা, গিয়ে পর্য্যন্ত তাঁর দিনের খোরাক যোগাড়ের টাকা পর্য্যন্ত যায়নি। খাওয়া হয় না ; হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতাপুরুষ স্থানীয় দারোগাকে জানিয়ে কোনও ফল হ'ল না। একজন মুসলমান কন্‌ষ্টেবল দয়াপরবশ হয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন ; তাঁর সর্ত্ত ছিল—দারোগাবাবু খরচটা মিটিয়ে দেবেন। বলা বাহুল্য, সে-সাহায্য প্রত্যাখ্যাত হয়।

দারুণ জ্বর ও আমাশয় দেখা দিল। জুলাইয়ের গোড়ায় হরিচরণ 'পুটিয়া 'সদরে' যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, অবশ্য দারোগাবাবুর অনুমত্যনুসারে। দারুণ জ্বর ও নানারকম রোগযন্ত্রণা নিয়ে তিনি ফিরে আসেন ৯-ই। দারোগার চেলারা এসে খোঁজখবর নিয়ে গেল, রোগের নয়, হরিচরণ রক্তমাংসের দেহে যথাস্থানে ফিরেছেন কিনা। বিভ্রান্ত রোগী দারোগাবাবুর কাছে সমস্ত দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করলেন। ফলে ১৭-ই ও ১৮-ই পুলিশ ঘন ঘন এসে খবর নিতে লাগলো ; প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা হ'ল না। বাধ্য হয়ে হরিচরণ গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করলেন। তফাৎ হ'ল—স্থান,—জেলের ফাঁসিকাষ্ঠ নয়, তবে ফাঁসি-ই বটে।

সদাশয় গভর্ণমেণ্ট সান্ত্বনাবাক্য পাঠালেন হরিচরণের পিতাকে। নবপরিণীতা স্ত্রীর জন্য দু'-একটি বেদনার বাক্যও তাতে যে ছিল না, তা নয় ; আর ছিল—ওটা নিছক আত্মহত্যা, তাতে কোনও অনাচারের সন্দেহ ছিল না ("there was no suspicion of foul play")—এটা যেন "আমি তো কলা খাইনি"-র মত শোনাচ্ছে।

রেবতীচরণ নাগ : রহস্যময় মৃত্যুর সঙ্গে রেবতীচরণ নাগের নাম জড়িত হয়ে আছে। তাঁর ত্রিপুরায় বাড়ী ; বিহারে রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। ১৯১৬ ডিসেম্বর থেকে নিরুদ্দেশ। তাঁর 'তত্ত্ব' আবিষ্কারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 'সিডিশন (রোলট) কমিটী'র রিপোর্ট প্রকাশিত হলে, পাওয়া গেল, রেবতীর অসচ্চরিত্রতার জন্য তাঁর সঙ্গীরা খুন করেছে। পরে তাঁর দলের লোকেরা বলেছেন— 'সামান্য ত্রুটি'র ('minor lapse') জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়। কবে বা কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি।

বিরতি-পর্য্যায়ে (১৯১৭-১৯১৮)

বিপ্লবাত্মক ঘটনা খুব মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিল—ইংরেজ যুদ্ধে লিপ্ত থাকার জন্যে। যুদ্ধ মিটে আসছে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না। বিনা বিচারে আটক রাখা ছাড়া, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হাকিমের হাতে জেল ও ফাঁসি সমানে চলছে। কত আসামীর যথাসর্ব্বস্ব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পরিবার-পরিজন পথের ভিখারী হয়ে পড়েছে। সশ্রম দণ্ডাদেশ আছে কোনও ফৌজদারী ঘটনা (বিপ্লবাত্মক) নিয়ে। তার সঙ্গে আছে জেল বা অন্তরীণ আইন-ভঙ্গের অপরাধ। শৃঙ্খলা-রক্ষার নামে জেলের মধ্যে ও বাইরে তুচ্ছ অভিযোগে গড়ে উঠেছে অমানুষিক অত্যাচার।

বৈপ্লবিক বড় ঘটনা প্রায় শেষ। ক্বচিৎ দু'-একটা পুলিশ-গুপ্তচর নিহত হয়েছে, পূর্ব্ব-পরিকল্পনার জের টেনে। অপরপক্ষে সরকারী অমনোযোগিতা, ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা, বিশেষতঃ রোগে বা বিপজ্জনক অসুবিধা-সৃষ্টিতে জীবনধারণ অসহ্য করে তোলা, যার ফলে আত্মহত্যার সাহায্যে বন্দী মুক্তিলাভ করেছে।

মোটের ওপর, "স্বদেশী যুগ"-এর শেষদিক থেকে বৈপ্লবিক ঘটনা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই চলেছে—কখনও বেশী, কখনও কম। এইবার স্বল্পকালের জন্য হলেও, একটা ছেদ এসে পড়লো।

গৌহাটী সংগ্রাম

সন্দেহভাজন লোকদের ধরবার জন্য পুলিশ আটঘাট সব বেঁধে, গুপ্তস্থান সব তন্ন তন্ন করে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। সারা বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলার সন্নিকটস্থ প্রদেশ বাদ পড়ছে না। বন্দী বা অন্তরীণাবদ্ধ বিপ্লবী ছাড়া, মুষ্টিমেয় জনকয়েক বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদের তল্লাসীতে ব্যস্ত। একসঙ্গে কয়েকটা দিন একস্থানে শান্তিতে বাস করা তাদের কপালে নেই।

আসামের জঙ্গলাকীর্ণ স্থান নির্ব্বাচন করে কাছাকাছি দুটো আস্তানায় উঠলেন জন-দশ-বারো। গৌহাটী তখন পলাতক বিপ্লবীদের বাসস্থান হয়ে উঠলো। বাসা-দুটোর একটা আটগাঁ-য়, আর একটা ফাঁসিবাজারে। খুঁজে খুঁজে পুলিশ গোপন গুহা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়। ১৯১৮ জানুয়ারী ৭-ই রাত্রিশেষে ৩-৩০ মিনিটে আটগাঁয়ের বাসা ঘেরাও হয়ে পড়লে, দু'পক্ষে গুলি-বিনিময় আরম্ভ হয়ে যায়। ভাগ্য ও পুরুষকার মিলিতভাবে বিপ্লবীদের সহায়তায় অবতীর্ণ। পুলিশের অত তোড়-জোড়ের মধ্যে পাহাড়ের গা বেয়ে বিপ্লবীরা পালাতে সক্ষম হ'ল। ফাঁসিবাজার

আশ্রয় থেকে নলিনী বাগচীর দল বেরিয়ে পড়েন। নলিনী নিজে কলিকাতা হয়ে ঢাকার কলতাবাজারে পৌঁছান।

সেদিনকার হাঙ্গামা কতকটা চুকলো। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বুঝে নিলে, শত্রু নিঃশেষ হয়নি। পাতি-পাতি করে আসামের সহরতলী জঙ্গল খোঁজা চলছে। এদিকে পলাতকরা চাটগাঁ থেকে বেরিয়ে নবগ্রহ-পাহাড়ে আশ্রয় নেন। পুলিশ সন্ধান করে সেখানে উপস্থিত ১৯১৮ জানুয়ারী ৯-ই রাত্রে। বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও হয়ে পড়েছে, পলায়নের কোনও উপায় নেই। আর, বিনা-যুদ্ধে শান্তশিষ্ট লোকের ন্যায় ধরা দেওয়ার মত মনের দুর্ব্বলতা কারও নেই। বেশ খানিকক্ষণ গুলি-বিনিময় হবার পর অবরুদ্ধদের পক্ষ থেকে গুলিবর্ষণের ব্যবধান বেড়ে যেতে লাগলো। তখন পুলিশ অনুমান করে যে, তাঁদের টোটা নিঃশেষ হয়ে আসছে। পুলিশ পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলো।

সে-অবস্থায় বাড়ীর আশ্রয় পরিত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টাই তখন একমাত্র পথ। পুলিশ পিছু নিয়েছে এবং গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। পলাতকদের একজন আহত হয়ে আর বেশী দূর যেতে পারলেন না, গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন সেই রাত্রেই। একজন পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে কামাখ্যা-পাহাড়ের নিকট পর্য্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। তারপর ভোরের আলোর সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রেপ্তার। এক পুকুরের পাড়ে ঘন ঝোপের ওপর পুলিশের নজর পড়ে। বাকী ক'জন সেখানে লুকিয়ে রয়েছেন। সকলকে ঘিরে ফেলে ধরবার চেষ্টা হয়। একজন কন্‌ষ্টেবল খুব কাছে গিয়ে পড়ায়, তার মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে একজন সজোরে আঘাত করেন। যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত আর কারও পক্ষে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরে পুলিশ অন্যান্য আস্তানা থেকে নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাপ্রসন্ন দে-কে গ্রেপ্তার করে।

এপ্রিল মাসে নলিনীকান্ত ঘোষ প্রমুখ একসঙ্গে পাঁচজনের গৌহাটী স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে বিচার আরম্ভ হয়। নলিনী কলিকাতার 'ডালাণ্ডা হাউস' (Dullanda House)—কঠিন বন্দীশালা থেকে প্রবোধ বিশ্বাসের সঙ্গে পালিয়ে যান (২৩.১২.১৬)। এখন গৌহাটীর মামলা। অস্ত্র-আইন-ভঙ্গ ও হত্যা-প্রচেষ্টার অভিযোগে ১৯১৮ এপ্রিল ২২-এ নলিনীর (ওরফে নিখিলনাথ রায়, নিখিল চক্রবর্ত্তী, 'মাষ্টার') সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ওরফে 'বটাদা') ও তারাপ্রসন্ন দে (ওরফে টিপু সুলতান, টি. পি. পি., মনু)—প্রত্যেকের পাঁচ বছর এবং প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (ওরফে 'ফিলজফার') ও মণীন্দ্রনাথ রায়—প্রত্যেকের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

'কাশী ষড়যন্ত্র মামলা'য় নরেন্দ্রর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ ছিল।

ফাঁসিবাজার আশ্রয়-কেন্দ্রে নলিনীকান্ত বাগচী, তারাপ্রসন্ন দে ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন। এখানে সকলে মিলে ধরা পড়ে যান।

কলতাবাজার (ঢাকা)

নলিনী বাগচী আসাম ছেড়ে কলিকাতা হয়ে ঢাকার কলতাবাজারে হাজির। সেখানে তারিণী মজুমদার ও হরিচৈতন্য দে থাকতেন। মাস-পাঁচেক কোনওরকমে কেটেছে, হাতের মুঠোর মধ্যে প্রাণ নিয়ে চলাফেরা। ১৯১৮ জুন ১৫-ই পুলিশ এসে বাসা ঘিরে ফেলে। পলায়নের কোনও পথ নেই; সব দোরই বন্ধ। ধরা দেওয়ার চেয়ে একটা সংগ্রাম করে ভাগ্যপরীক্ষার পথই শ্রেয় বলে মনে হ'ল। দু'পক্ষেই গুলি ছুটলো। গোড়াতেই তো বিপ্লবীদের একটা গুলি পতিরাম সিং কন্‌ষ্টেবলের দেহ বিদ্ধ করলো; সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধরাশায়ী। পরেরটা আঘাত করলো স্বয়ং দারোগা-সাহেবকে; আঘাতটা এমন গুরুতর কিছু নয়। পুলিশ দলে খুব ভারি। কাজেই এ-দুটো আঘাত উপেক্ষা করেও তারা সমানে আক্রমণ চালিয়ে গেল।

এইবার বিপ্লবীদের মধ্যে তারিণী মজুমদার পুলিশের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। নলিনী এর পরের এক গুলিতে অনুরূপভাবে আহত হলেন। মিটফোর্ড হাসপাতালে সকলকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তারিণী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। নলিনী তার পরের দিন পর্য্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত বীরের অন্তরের কথা নিয়তি মেনে নিলেন; বাঞ্ছিত পরমগতি লাভ করলেন নলিনী। যে কয়ঘণ্টা বেঁচে ছিলেন, পুলিশ শান্তি দেয়নি,—প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে মেরেছে। নলিনীর এক উত্তর: "আমায় শান্তিতে মরতে দাও।"

সঙ্গী হরিচৈতন্যও আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। নিরাময় হতে যেটুকু সময় লেগেছিল, তার পরই স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হ'ল। তড়িঘড়ি বিচার। ১৯১৮ আগষ্ট ২৪-এ তাঁর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

গৌহাটী আর কলতাবাজার সংঘর্ষ ভয়লেশলীন দুর্দ্দান্ত কয়েকটি বিপ্লবীকে সংগ্রাম-ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করে দেয়।

পাবনায় হানা: পুলিশ খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। উপর্য্যুপরি দুটো ঘটনায় সফল হয়ে, বাকী কয়েকজনের জন্যে জোর তল্লাসী লাগিয়েছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এবার ঘটনাস্থল হচ্ছে পাবনার তৌলিজানা গ্রাম, আটঘরিয়া থানা এলাকায় (ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী: 'জেলে ত্রিশ বছর', পৃঃ ২০০)। পলাতক বিপ্লবীরা একটা গোপন আস্তানায় বাস করছেন। পুলিশ হানা দিতে বোঝা গেল, দু'জন এক গুহায় আছেন। ভোর-রাত্রে এসে দস্যুর মত দুর্গ-আক্রমণের রূপ গ্রহণ করলো। গুলি-বিনিময় হচ্ছে। গোবিন্দ কর প্রথমেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মরণোন্মুখ অবস্থায় ধরা

পড়লেন। সঙ্গে নিকুঞ্জবিহারী পাল এখনকার মত পালাতে সক্ষম হলেন। কিন্তু তাঁর "স্বাধীনতা"-ভোগ বেশীদিন কপালে ছিল না। পরের দিনই গ্রেপ্তার হলেন।

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল গঠন হয়েই বিচার। অভিযোগ সবই গুরুতর। হত্যা-প্রচেষ্টা, অস্ত্র-আইন-ভঙ্গ প্রভৃতি। ১৯১৮ আগষ্ট ১২-ই গোবিন্দর সাত বছর দ্বীপান্তর ঘটে। নিকুঞ্জর সাজা হয় অস্ত্র-আইনে সাত বছর আর হত্যা-প্রচেষ্টায় (দণ্ডবিধি ৩০৭ ধারা) তারও পরে সাত বছর—মোট চৌদ্দ বছরের দ্বীপান্তর আদেশ দয়।

এ সাজা-ভোগ শেষ হলে, গোবিন্দ 'কাকোরী ট্রেন লুঠ'-এর মামলার আসামী ছিলেন। ১৯২৭ এপ্রিল ৬-ই তাঁর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

বে-পরোয়া : দুই সহকর্ম্মী একই বিপদসঙ্কুল পথের যাত্রী। একজন ত্রিপুরার লগ্নেশ্বরের মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, আর দ্বিতীয়টি ত্রিপুরার বরকান্তার অতুলচন্দ্র মজুমদার। ১৯১৮ মে ২৭-এ ঢাকা সহরে গ্রেপ্তার হলেন দু'জনেই। অপরাধ—'ডাকাতির প্রস্তুতি'—দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৯ ধারা ("make any preparation for committing dacoity")। এই ধারাটা পুলিশের খুবই কাজে লেগেছে। যখন আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, তখন একে কাজে লাগানো হয়েছে। ১৯১৮ আগষ্ট ১৯-এ দু'জনের প্রত্যেকের আট বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এ ছাড়া, দু'জনেরই ভারত-রক্ষা আইনে (Defence of India Rules) স্বতন্ত্র দু'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

পুলিশ দেখেছে—দণ্ডবিধি ৩৯৯ ধারা খুব তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে। দু'-দফা হয়ে যাবার পর, ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে সুধীরচন্দ্র মজুমদারকে ডাকাতির প্রস্তুতি প্রভৃতি অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া, সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধাদান। ভারত-রক্ষা আইন (D. I. Rules)-সম্পর্কিত অভিযোগ ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯১৮ আগষ্ট ১৯-এ দণ্ডাদেশ প্রকাশিত হ'ল। প্রথম দু'-দফার যথাক্রমে পাঁচ ও দু'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড; সুখের মধ্যে, সমকালীন-ভোগ (concurrent); কিন্তু ভারত-রক্ষা আইনের অতিরিক্ত এক বছর পূর্ব্বদণ্ডকাল উত্তীর্ণ হলে শুরু হবার ব্যবস্থা। অর্থাৎ মোট ছ'বছর।

হৃদয়বত্তা

বিপ্লবী-কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সন্দেহভাজন লোকদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবার ব্যবস্থা বেড়েই চলেছে। বগুড়ায় গোপন-পুলিশ-বিভাগ থেকে চারিদিকে সংবাদ-সংগ্রহের চেষ্টা চলেছে। এমন সময়, ১৯১৮ মে ৮-ই সাব-ইন্সপেক্টর হরিদাস মৈত্র এক 'দুর্নাম'-সম্বলিত বাড়ীর ওপর চড়াও হলেন সকালের

দিকে। কন্‌ষ্টেবলরা সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে, হরিদাস গেলেন পিছনের দরজা আটকাতে। আততায়ী সেই দিক দিয়ে পালাবার সময় হরিদাসের বুকে এক বুলেট বসিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। হরিদাসের প্রাণহীন দেহ সেখানে লুটিয়ে পড়ে।

কন্‌ষ্টেবলরা এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সামনে থেকে ঘুরে এসে, সব অবস্থা বুঝে পলায়মান আততায়ীর পিছনে একজন ধাওয়া করে যায়, কিন্তু তাকে ধরা আর সম্ভব হয়নি।

অবান্তর হলেও, এখানে হরিদাসের পত্নী সম্বন্ধে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শোকার্ত্তা রমণী শ্রাদ্ধাদি সেরে শিশুসন্তানদের নিয়ে বগুড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন,—ঘটনার পর থেকেই পুলিশ-সুপার বার্ট (Burt) ও তাঁর স্ত্রী মৈত্র-পরিবারের তত্ত্বাবধান করছিলেন। ওঁরা এসেছেন ষ্টেশনে হরিদাস-পরিবারকে বিদায় দিতে। সান্ত্বনা দেবার জন্য যখন সাহেব হরিদাস-পত্নীকে বললেন যে, তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন যাতে আততায়ী ধরা পড়ে এবং সমুচিত সাজা পায়।

সাশ্রুনয়না মহিলা উত্তর দিলেন—"আসামী ধরা পড়লে তো তার ফাঁসী হবার সম্ভাবনা।" নিজের বৈধব্য-বেশ দেখিয়ে বললেন—"হয়তো আমার মতনই আর-এক জনের সর্ব্বনাশ হবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আসামী যেন ধরা না পড়ে; আর কাকেও যেন আমার দুর্দ্দশা ভোগ করতে না হয়।"—বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ষ্টেশনে বহু পুলিশ-কর্ম্মচারী উপস্থিত। সকলেরই চোখে জল। সাহেব-মেম তো একেবারে অভিভূত। মহিলা বললেন—"আপনারা যা করেছেন, তার জন্য আমার নিজের ও শিশু-পুত্রকন্যার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার যা হবার হয়েছে। এটা বিধির বিধান। ছেলেটা-মেয়েটা যাতে মানুষ হয়, তার জন্য যা হয় করবেন—এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে সেটাই হবে সান্ত্বনা।"

ট্রেন আসা আর ছাড়ার মধ্যে তিনি আর-একটি কথাও বলেননি।

কর্ত্তব্যের দায়ঃ রোজগারের অর্থের মর্য্যাদা-রক্ষা ছাড়া, কর্ত্তব্যের খাতিরে অনেক সাধারণ পুলিশ-কর্ম্মচারী কর্ত্তব্য-পালনে যে বিপদ বরণ করে নিয়েছেন, এ পরিচয় একেবারে বিরল নয়। ১৯১৮ মে ৯-ই এক যুবককে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ রেল-ষ্টেশনে একটা ছোট পুঁটুলি নিয়ে ট্রেন থেকে নামতে দেখা গেল। সেখানে প্রহরারত গোয়েন্দা-পুলিশের কর্ম্মচারী প্রসন্নকুমার নন্দী সেটা লক্ষ্য করেন। নিকটে এসে তিনি পুঁটুলিটা পরীক্ষা করতে চাইলেন; বিনা ওজর-আপত্তিতে পুঁটুলি হাতে পেলেন প্রসন্ন নন্দী। তিনি খুশি হয়েই নিজ কাজে রত, একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন আগন্তুক সম্পর্কে—এমন সময় হঠাৎ রিভলভার ছুটলো, প্রসন্ন মারাত্মকভাবে আহত; আর আততায়ী প্ল্যাটফর্ম থেকে সরে পড়লেন ইত্যবসরে।

পুঁটুলির মধ্যে কিছু কার্ত্তুজ আর বৈপ্লবিক-কার্য্যসূচী-সম্বলিত কাগজপত্র। ক'দিন বাদে প্রসন্ন হাসপাতালে মারা যান।

মরণ-যজ্ঞ

"মারি অরি পারি যে কৌশলে" হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের নীতি। জীবন্ত বা মৃত মানুষ চাই। প্রয়োজন হয়—জীবন্ত ধরে, তার মৃতদেহটা কারাগৃহের বাইরে (অধিকাংশ সময় জেলের বাইরে নয়) বার করে ফেলা।

সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের কর্ম্মী। 'কাশী ষড়যন্ত্র মামলা'য় বহু চেষ্টাতেও তাঁকে ফাঁসাতে পারা গেল না। তবুও চেষ্টা ছাড়া যায় না। ১৯১৮ ফেব্রুয়ারী ২১-এ তাঁকে গ্রেপ্তার করে বাড়ী তল্লাসী হ'ল। সেখানে দুটো রিভলভার আর শ'-তিনেক কার্ত্তুজ পাওয়া গেল। বিচারে অস্ত্র-আইনে তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাস আর দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়।

নিষ্কৃতি নেই। ১৯১৮ ফেব্রুয়ারী ৯-ই, এক গুপ্তচর নিহত হয় অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে। সেখানে কার্ত্তুজের যে খোল পাওয়া যায়, তার সঙ্গে সুশীলের হেপাজতে প্রাপ্ত কার্ত্তুজের 'মার্কা'র মিল রয়েছে। সুতরাং হত্যার দায়ে আবার নয়া মামলা। ১৯১৮ আগষ্ট ১১-ই তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। আর, অক্টোবর মাসে আসামীকে ফাঁসিতে লট্‌কে বাঙ্গলা আর ইউ.পি.-র পুলিশ নিশ্চিন্ত হয়।

মণীন্দ্রনাথ শেঠ ঃ অপরাধের প্রমাণ নেই, বিচারে মামলা টেঁকবে বলে বিশ্বাস নেই, কেবল সন্দেহের ওপর নির্ভর করে যার স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে—সকল সভ্য দেশের এই শ্রেণীর বন্দীদের ওপর একটা গুরু দায়িত্ব থাকে। ইংরেজ-পরিচালিত ভারত-শাসনযন্ত্র এর একটা প্রকাণ্ড ব্যতিক্রম।

মণীন্দ্রনাথ শেঠ এই আচরণের এক মর্ম্মান্তিক উদাহরণ। এম্.এ. পরীক্ষায় গণিতে স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-বিজ্ঞানের পরীক্ষক। কপালের ফের! ১৯১৬-তে দৌলতপুর কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন,—শনি-দেবতা তাঁর ওপর ভর করলেন। ১৯১৭ মে মাসে রংপুর কলেজ চালু হলে, তিনি সেখানে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে দৌলতপুরের সংস্রব ছাড়লেন।

রংপুর এসে কাজে যোগ দেবেন এমন সময় কলেজের সেক্রেটারী—ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব বাধা দিলেন, কারণ ইতিমধ্যে পুলিশ এসে কিছু গোপন রিপোর্ট তাঁকে জানিয়ে গেছে। নিরুপায় হয়ে মণীন্দ্র ১৯১৭ জুলাই মাসে গভর্ণমেণ্টের পোলিটিক্যাল সেক্রেটারীর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে সাক্ষাৎ করেন। উদ্দেশ্য ছিল—তাঁর ভ্রাতা, বন্দী শচীনের কথা বলবেন আর তাঁর নিজের "করুণ" অবস্থার বিষয় জানিয়ে একটা বিলি-ব্যবস্থা করে নেবেন।

সাক্ষাৎ হ'ল। রাজকর্ম্মচারী যেন তৈরী হয়েই বসেছিলেন; মণীন্দ্র যখন বলেন যে, তাঁর কি-ভাবে চলবে, পরিবারবর্গের ভরণপোষণেরই বা কি হবে? তদুত্তরে অতি শান্ত-ধীর মোলায়েমভাবে সাহেব বললেন—"ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে যে নদী, তার

পাড়ে দাঁড়িয়ে, কোথায় তলিয়ে যেতে হবে সে-কথা কে বলতে পারে ? ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যে, তুমি এখনও মুক্ত আছ।"

গড়া-পেটা সবই তখন হয়ে গেছে। এ কেবল "করুণ-চিত্ত" সাহেব আগে একটু জানিয়ে দিলেন। মণীন্দ্রের অবস্থা অতি সঙ্গীন। গভর্ণমেণ্ট যখন বাদী তখন কাছে কোথাও কাজ জুটবে না। পিতৃমাতৃহীন ১০ ও ১২ বছরের দুই ভাই বাড়ীতে। তাদের দেখাশোনা করবার লোক নেই। কেবল "দাদা" নয়, মণীন্দ্র তাদের "জনক-জননী"। শচীন বাড়ীতে আটক-বন্দী থাকলেও কতকটা সুরাহা। "কিন্তু··· ?"

মাসখানেকের মধ্যে, অর্থাৎ আগষ্ট ২৮-এ, মণীন্দ্র প্রেসিডেন্সী জেলে নিক্ষিপ্ত হলেন বিচারাধীন সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে। উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র মধ্যবিত্ত-ঘরের যুবকের পক্ষে সাধারণ চোর-ছ্যাঁচড়, খুনী, মাতাল, চরিত্রহীন নানারকম লোকের সঙ্গে বাস করতে বাধ্য হওয়ার কথা কল্পনায় ধরতে হয়। মণীন্দ্র একেবারে অকূল সমুদ্রে পড়লেন। তার ওপর বাড়ীতে আছে অভিভাবকহীন দুই নাবালক সহোদর। মণীন্দ্র সকল অবস্থা ভেবে একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

বেশীদিন এ-অবস্থা চললো না। একমাস কাটবার আগেই, সেপ্টেম্বর ১১-ই জেলের অধ্যক্ষ গভর্ণমেণ্টকে লিখে জানালেন—মণীন্দ্রের মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

আগষ্ট ২৬-এ, পাগলের অন্তরীণের আদেশ বেরিয়ে গেল। কিন্তু সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট জানালেন যে, গুরুতর উন্মাদের অবস্থা, বাইরে যে-কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। তারপরই গভর্ণমেণ্ট প্রচার করলে, এ অবস্থার জন্য মণীন্দ্র নিজেই সম্পূর্ণ দায়ী। দেখা যাচ্ছে তাঁর যক্ষ্মাও হয়েছে। এর চেয়ে হৃদয়হীনতার পরিচয় কোনও সভ্যজগতের ইতিহাসে আছে কিনা সন্দেহ। হিটলার-শাসনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

নভেম্বর ৪-ঠা, জেলের বাইরে যে-কোনও স্থানে বন্দী করে রাখার আদেশ বেরুলো। উন্মত্ততা আর যক্ষ্মার মিলিত সংযোগ। আত্মীয়দের প্রায় সকলেরই আর্থিক অসঙ্গতি, তা ছাড়া রোগী মরণোন্মুখ,—সঙ্গে সরকারী সন্দেহ,—কেউ ঘাড় পেতে নিতে সম্মত হয় না। গভর্ণমেণ্ট এ-অবস্থা খুব ভালরকমই জানে। এ একটা প্রকাণ্ড মারাত্মক রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নভেম্বর ৪-ঠা, প্রায় জোর করে এক অনিচ্ছুক আত্মীয়ের ঘাড়ে রোগীকে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। তার পরদিনই রোগীকে মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করতে হয়। যথাবিহিত পুলিশ-প্রহরা বসে গেল। যদি রোগী উঠে গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ওল্টাবার কাজে লেগে যায় ! গভর্ণমেণ্টের সকল দুশ্চিন্তা নিরসন করে মণীন্দ্রনাথ শেঠ ১৯১৮ জানুয়ারী ১৬-ই চিরনিদ্রায় ডুবলেন। কোথায় অসহায় দুই ভাই ?—কোথায় শচীন্দ্র ?

সব চিন্তা ডুবে গেল একজনের সঙ্গে। হয়তো হাসপাতালে দাবীদারহীন লাশের সঙ্গে মণীন্দ্রের "সৎকার" হয়ে থাকবে।

এইভাবে ইংরেজ সরকার এক বিরাট শত্রু জয় করেছে! তবে এ-নমুনার অভাব নেই। সঙ্গেই আরও কিছু ঘটনা বলা হচ্ছে।

রসিক সরকার ঃ বেকার দল কার্য্যাভাবে উপজীবিকা-অর্জ্জনে অপারগ হয়ে বিপ্লবী-সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে বলে গভর্ণমেণ্ট তরফে এক ধূয়া তোলা ছিল। মণীন্দ্র শেঠের কথা বলা হয়েছে, এখন হচ্ছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের আর-এক কৃতবিদ্য, বাঙ্গলার সন্তানের কথা। ময়মনসিংহের রসিক সরকার সন্দেহের বশে ধরা পড়েন। আর বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। তবে এটা ঠিক, নিতান্ত রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু না ঘটলে এবং পত্রিকার সংবাদদাতা নিতান্ত সতর্ক না হলে, রসিকের কথা কেউ জানতেও পারতো না।

বিস্তারিত সংবাদ চুম্বকে দাঁড়াচ্ছে—১৯১৮ জুন ১৭-ই এক যুবক নিজ বস্ত্রে কেরোসিন ঢেলে, তাতে আগুন লাগান এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল রাজসাহী জেল। গভর্ণমেণ্ট থেকে নামটা চেপে যাওয়া হ'ল। ঘটনার কোনও বিবরণ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করলো না। ১৯১৮ জুলাই ৪-ঠা, বঙ্গীয়-আইন-পরিষদে প্রশ্নের চাপে পড়ে নামটা প্রকাশ করা হয়।

জীবনের সামনে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র, ধন, মান, যশ সবই পড়ে আছে যাঁদের, তাঁরা এভাবে কেন আত্মহত্যা করেন, এ প্রশ্ন আজও মনে ওঠে। আত্মীয়-বন্ধু সেই অবস্থার কল্পনাই করেছে, যাতে পড়ে রসিকের মত যুবক আত্মবিলয় করে।

সত্যেন সরকার ঃ সিনেমার ফিল্মের মত লাগবে। একটির পর একটি চলেছে অনন্তের যাত্রাপথে। স্বেচ্ছায় চলেছে এ-কথা বললে, গভর্ণমেণ্ট খুশি হতে পারতো। কিন্তু আসল ঘটনা ঃ এসব নিষ্ঠুর হত্যা ছাড়া কিছুই নয়।

বিশ বৎসর পূর্ণ হয়নি; গৃহস্থঘরের সন্তান লেখাপড়া ও খেলাধূলা নিয়ে আছে। কিন্তু পুলিশ আবিষ্কার করলে বিপ্লবী-সংস্রব। সুতরাং কু-সঙ্গ হতে রক্ষা করবার জন্য পরম দয়ালু বঙ্গ-শাসনকর্ত্তা সত্যেন সরকারকে বিনা বিচারে যশোরের অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর চৌগাছায় অন্তরীণ করে রেখে দিল। এমনিতেই 'প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত', তার ওপর ১৯১৮ মে মাসে ক্ষ্যাপা কুকুর কামড়ে দিল। সকল দিক বিবেচনা করে জলাতঙ্কের চিকিৎসার জন্য তাঁকে শিলং পাঠানো হয়েছিন। তা না করলে, সত্যেনের জীবনের দুর্ভোগ খানিকটা কম হ'ত।

চিকিৎসা যা হ'ল, তার খবর ভগবান হয়তো জানতে পারেন। সত্যেন স্বস্থানে ফিরে এলেন ১৯১৮ জুন ৯-ই। হয়তো এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ায় চিকিৎসকদের অভিমত ছিল না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের তাগিদ। চিকিৎসা যে পূর্ণ হয়নি, তার প্রমাণ—অক্টোবর ১-লা রোগের সমস্ত লক্ষণ উৎকটভাবে পুনরাবির্ভূত হ'ল। কেউ কাছে ঘেঁষতে

চায় না। যাঁরা বিপদ উপেক্ষা করে আসবেন, সে-আত্মীয়রা দূরে, অতিদূরে। বিনা চিকিৎসা ও বিনা শুশ্রূষায় সত্যেনের জীবনদীপ অকালে চিরতরে নির্ব্বাপিত হয়ে গেল। "সু-সংবাদ" যথাসময়ে আত্মীয়দের পৌঁছে দিতে ভুল হয়নি।

কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য ঃ সরকারী জেলে একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে ; বস্তুতঃ, সেটা নামে। দূর-পল্লীতে জলা-জঙ্গলের ধারে যাদের বছরের পর বছর বাস করতে হয়েছে, তারা কোনও চিকিৎসার সুযোগ পায়নি। কারণ ডাক্তার সাধারণতঃ অনেক দূরে,—খবর দেয় কে,—খরচার দায়ী হতে কেউ চাইত না। কারণ গভর্ণমেণ্ট হবে দেনেওয়ালা।

সন্দেহক্রমে কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্যকে ধরে মেদিনীপুরের এগরা গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে "পাশ"-করা ডাক্তার-বদ্যি নেই, দুই হাতুড়ে সর্ব্বজ্ঞ। বাঁচা-মরা সবই তাঁদের হাতে। কুমুদ বারে বারে অসুস্থ হয়ে, গভর্ণমেণ্টকে জানাতে লাগলেন। গভর্ণমেণ্টের ভাবটা যেন ঃ "কে কার কড়ি ধারে ?" ১৯১৮ ডিসেম্বরে অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠলো। দারোগাবাবু মফঃস্বলে "ট্যুরে" গেছেন। হেড্-কন্‌ষ্টেবল সদরে জানিয়ে দিলেন। স্থানীয় দুই "ডাক্তারবাবু" মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীবের চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ; তাঁদের তত্ত্বাবধানে কুমুদবন্ধু ১৯১৮ ডিসেম্বর ১৫-ই দেহত্যাগ করেন। নিকটে আত্মীয়ের তো কথাই নেই ; পরিচিত বন্ধুও কেউ নেই। থানা থেকে সংবাদটা গভর্ণমেণ্টকে জানালে, একজন "বিপ্লবী"র মৃত্যু ঘটিয়েছে বলে কোনও প্রশস্তিপত্র এসে থাকবে।

সারদা চক্রবর্ত্তী ঃ বৃদ্ধ সারদাকান্ত চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্ব আবাস ছিল রংপুরের নলডাঙ্গায়। সচ্ছল অবস্থার লোক ; প্রায় সংসার-ত্যাগ করে যখন কাশীবাস আরম্ভ করেছেন, তখন বয়স ষাটের ওপর। চেনাশোনা ছেলেরা নিজেদের কাজে কাশী গেলে, সারদার আতিথ্য গ্রহণ করতো। স্থায়ী বাসিন্দারা দুঃসময়ে সাহায্য পেত, তাদের ছেলেপুলের পড়ার কাজে অভাব হলে তাঁর শরণাপন্ন হ'ত।

অবস্থাটা পুলিশ খুব ভাল-চোখে দেখলে না। ১৯১৭ সেপ্টেম্বর ২৩-এ তাঁকে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হয়, কারণ তার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁর সাহায্যপুষ্ট এক যুবককে গ্রেপ্তার করা পুলিশের প্রয়োজন হয়েছিল।

সারদাকে কলিকাতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ সেরে, যশোরের আলফাডাঙ্গায় অন্তরীণ করে পাঠানো হয়। স্থানটি নাম-করা ম্যালেরিয়ার ডিপো ; রোগে পড়তে বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। গ্রামটি এত অস্বাস্থ্যকর যে, তিনি কাকেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসতে বলতে পারতেন না। তাঁর চিকিৎসা ও জীবনধারণের ব্যয় সরকারী সাহায্যে পূর্ণ হ'ত না। বাড়ী থেকে নিয়মিত টাকা আনতে হ'ত।

ক্রমে তাঁর চিঠিপত্র অনিয়মিত হয়ে উঠলো। শেষ পত্রখানি অপরের সাহায্যে লেখা। তাঁর স্বাস্থ্যের দুরবস্থার কথা তাতে বিশদভাবে লেখা আছে। আত্মীয়-স্বজন ব্যস্ত হয়ে সরকারের কাছে চিঠিপত্র দিয়ে হয়রান হ'ল ; উত্তর নেই। ক্রমে টেলিগ্রাম

গেল। তাতেও সাড়া-শব্দ নেই। ১৯১৮ ডিসেম্বর ৪-ঠা, ছাপ-মারা এক চিঠি এল— অন্তরীণাবদ্ধ ভদ্রলোক নভেম্বর ৩০-এ ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন।

মাখনলাল ঘোষ ঃ এ করুণ কাহিনীর যেন শেষ নেই। যুদ্ধ জয় করে ইংরেজ এত আনন্দে মত্ত যে, তাদের বিনা-বিচারে বন্দীদের প্রতি কর্ত্তব্য আছে এ-কথা যেন সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। কত বড় দায়িত্ব!—হয়তো নির্দোষ লোককে বাইরের সাহায্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে কড়া পাহারায় আটক রেখে দিয়েছে। এঁদের প্রতি দায়িত্ব দ্বিগুণ মনে করা সভ্য সরকারের কাজ।

বরানগর-আলমবাজারের স্থানীয় স্কুলের মাত্র ১৫ বছর বয়সের ছাত্র। ১৯১৫ মার্চে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। অভিযোগ—ডাকাতি। সুবিধা হ'ল না; বিচারে মুক্তি। আর সেটাই যেন মৃত্যুর ফাঁদ পাতা হ'ল। ভারত-রক্ষা আইনে তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে আটকে রেখে অন্তরীণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'ল জলপাইগুড়ির কালচিনি থানা এলাকায়। সেখানে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায়, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আনা হয়; কিন্তু সেরে ওঠবার আগেই যেতে হ'ল হুগলী জেলে। সেটাও সরকারের মনঃপূত হ'ল না। সেখান থেকে হাজারিবাগ জেল। ক'মাস বাদেই বাঁকুড়া জেলার তালডাঙ্গরা গ্রামে অন্তরীণ করে পাঠানো হ'ল। প্রকৃতপক্ষে মাখন তখনও বেশ অসুস্থ।

তালডাঙ্গবার জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর; সেখানে প্রকৃতির নিয়মে যেন সুস্থ থাকার বিধান নেই। রুগ্ন মাখন শয্যাশায়ী হলেন। পুলিশকে বারে বারে জানিয়ে কোনও ফল হ'ল না। তখন অন্তরীণ-আইন ভঙ্গ করে জেলে যাওয়া স্থির করে মাখন একদিন সদরে উপস্থিত হলেন। আইন-ভঙ্গের বিচার কিছু হ'ল না। ধরে তাঁকে তালডাঙ্গরায় পাঠানো হ'ল। স্বাস্থ্যের অবস্থা হীনতর হচ্ছে। তার কোনও প্রতিকার নেই। অনন্যোপায় হয়ে মাখন অন্নত্যাগ করে বসলেন। একটু লাভ হ'ল। বাঁকুড়া হাসপাতালে মাখনের আশ্রয় জুটলো।

সুস্থ হবার আগেই অণ্ডালে অন্তরীণের হুকুম হয়। কপাল পোড়া! সেখানে কলেরার আক্রমণ। দয়াময় সরকার মাখনের মাকে কাছে থাকার অনুমতি দিয়েছিল। শরীর সারেনি,—বর্দ্ধমানের পুলিশ-সুপারের সঙ্গে সাক্ষাতের এক হুকুমনামা এসে হাজির। তারপর সব চুপচাপ। বারে বারে লিখেও বাপ-মা কোনও খবরই পান না। বহু পরে জনরবে সংবাদ পাওয়া গেল—মাখনকে চট্টগ্রামের মহেশখালি থানায় আবদ্ধ রাখা হয়েছে।

দুর্ব্বল শরীর, নানা রকমের জলবায়ু, বাসের পরিবেশ অনবরত পরিবর্ত্তন করছে,—মাখন আর কোনও রকমেই সেরে উঠতে পারছেন না; মনে করেছেন— গভর্ণমেণ্ট যদি বিষ-প্রয়োগে জীবনান্ত ঘটায়, সেটাও পরম কৃপার কাজ হবে। ১৯১৯ ডিসেম্বর ১৯-এ মাখন তাঁর মাকে লিখেছিলেন—"পরে তোমায় সব জানাচ্ছি।"

১৯২০ জানুয়ারী ৭-ই গভর্ণমেণ্ট জানাল যে, ২৯-এ মাখন আত্মহত্যা করেছেন—"Government learn with much regret ....".

তিন বৎসরে চৌদ্দ জায়গায় টানাহেঁচড়া করা হয়েছে ১৫ থেকে ১৮ বছরের একটা ছেলেকে! "আছড়ে মারা"র এর চেয়ে ভাল উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

নারকীয় অত্যাচার ঃ দেশপ্রেমের অপরাধে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কি অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, তার কিছুটা প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কি ঘৃণ্য আচরণ অবলম্বিত হয়েছে, তার একটি উদাহরণ দিয়ে এ-বেদনাদায়ক অধ্যায়ের শেষ করতে হয়।

বন্দী হচ্ছেন যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভারতের বিপ্লব সম্বন্ধে যাঁরা কিছু খবর রাখেন, তাঁদের কাছে নামটা একেবারে অপরিচিত হবে না। নির্য্যাতন-ভোগের পর তিনি নিজ তিক্ত অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ভেবেছিল যে, এই-রকম ঘৃণ্য জঘন্য আচরণের সংবাদ প্রচারিত হলে, নিতান্ত দুঃসাহসী ছেলে ছাড়া কেউ এ-পথে আসতে রাজী হবে না।

যোগেশচন্দ্র গ্রেপ্তার হন ১৯১৬ অক্টোবরে, যখন পাইকারী হিসাবে ধরপাকড় চলছে। ১৯১৮ জুলাই ১৩-ই 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ,—যোগেশচন্দ্রের ভাষায় ঃ

"One man took hold of my hands, another head, and the officer in European costume pressed my nostrils and the *mehtar* put a commodeful of urine mixed with stool and poured it all over my face. Then they kept me in a cell and did not allow me to have a wash."

অনুবাদ বা টীকা নিষ্প্রয়োজন। কত লোককে যে বর্ণনার অযোগ্য অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে, সে-কাহিনী বিবৃত করলে—মানুষ কত নীচ হতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যেত।

অকস্মাৎ (১৯১৮-১৯১৯)

সন্দেহমাত্রেই যখন শান্ত-অশান্ত সবরকম রাজনৈতিক কর্ম্মী ধরে জেলে বন্ধ করে রাখা সফল হ'ল, তখন হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ প্রায় নিঃশেষ পর্য্যায়ে উপনীত। অস্ত্র-সংগ্রহের চেষ্টায় যখন দু'-একজন করে দণ্ডিত হচ্ছিল, তারও অবসান ঘটলো। সাধারণ-জ্ঞানে মনে হয়েছিল এ-সময় ভারতে ইংরেজ-শাসনের দমননীতিতে কিছুটা শিথিলতা আসবে।

এর সঙ্গে ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের জয়ের ক্ষীণ আশা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। ১৯১৭ এপ্রিল ৬-ই আমেরিকা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমেরিকার সৈন্যসামন্ত, বিরাট শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্র, যান ও বিবিধ সরঞ্জাম এসে যুক্ত হওয়া আর ইংরেজের সফলতা প্রায় সমার্থক। রণক্ষেত্রে জার্ম্মান সৈন্যের পশ্চাদপসরণ ঘটতে থাকে এবং দারুণ বিপর্যয় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। জার্ম্মানীর সহায়ক রাষ্ট্রগুলির পরাজয়ের পর একে একে ইংরেজ শক্তিবর্গের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে রণক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল।

ভারতে ইংরেজ-শাসন একটু দম নেবার সুযোগ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচছে। সন্দেহবশে বিনা-বিচারে আবদ্ধ সহস্র সহস্র যুবককে আর কতকাল রেখে দেওয়া যেতে পারে—সে-প্রশ্ন এখন প্রবলভাবে আলোচিত হতে লাগলো। এর মধ্যে আবার এক নতুন দমনযন্ত্রের খেলা শুরু হ'ল। অন্তরীণে আবদ্ধ ছিল শত শত যুবক। এখন আবার 'নতুন অন্তরীণ-আইন-ভঙ্গ', অর্থাৎ সরকারের অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে কথা বলা, থানায় হাজিরা দিতে বিলম্ব করা বা ভুলে যাওয়া, লাইব্রেরি ও স্কুলের সঙ্গে সংযোগ-প্রচেষ্টা, নির্দ্দিষ্ট-সীমানা-লঙ্ঘন, সময়ের আগে বা পরে বাসগৃহে অনুপস্থিতি প্রভৃতি অপরাধ তো ছিলই ; আরও ছিল—উর্ব্বরমস্তিষ্ক দারোগা বা তার চেলাদের উদ্ভাবনী শক্তিতে আবিষ্কৃত অপরাধের বিচার-প্রহসন। পটাপট্ (কারও কপালে দীর্ঘকাল) কারাদণ্ড চলতে লাগলো। এসব অপরাধী "মার্কা-মারা", সুতরাং জেল-আইন, অর্থাৎ শৃঙ্খলা-রক্ষা প্রভৃতি এঁদের ওপর কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। আবার সে-সকল আইনের ব্যত্যয়-হেতু, আবার কারাদণ্ড হয়েছে। এ প্রায় chain reaction—একটির সঙ্গে আর-একটি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত।

আক্রমণাত্মক ঘটনা বন্ধ। কিন্তু এ শান্তি-আবহাওয়ার সুযোগ গভর্ণমেণ্ট নিতে পারেনি। একটা অজুহাত অবশ্য তার ভাণ্ডারে জমে উঠেছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে ১৯০৫—১৯০৭ সালে উগ্রপন্থীদের প্রভাব ফুটে উঠেছিল। তারপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব চালিয়েছে মডারেটরা। গণ্ডগোল বাধলো ১৯১৭ সালে। কংগ্রেস-ত্যাগী দলের

নবজাগৃতি নিয়ে। এদিকে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারও আসন্ন। তখনও জেলের মধ্যে বিপ্লবী ছাড়াও, গরম-দলের কোনও কোনও নেতা আবদ্ধ। এঁদের মধ্যে ছিলেন আনি বেসাণ্ট। কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য উগ্রপন্থীদের মনোনীত সভাপতি হলেন তিনি। নরম-দল এ-নির্ব্বাচনের প্রতিরোধ করতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করে; কিন্তু সফল হতে পারেনি। এই নতুন ফাটল বিস্তৃতিলাভ করেছে এবং কংগ্রেস-রাজনীতি থেকে নরম-দল বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট এ-লক্ষণটা অতি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলো।

১৯০৬ সাল থেকে এ-সময় পর্য্যন্ত জাতীয় দলের লক্ষ্য "স্বরাজ" বরাবরই চলিত অর্থে গৃহীত হয়ে আসছে—"ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন"। এইবার তাতে নতুন অর্থ সংযোজনের চেষ্টা হচ্ছে। লক্ষণ আগে থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে—যখন ১৯১৬ এপ্রিল ২'৮-এ তিলক-মহারাজের এবং সেপ্টেম্বর ১-লা তারিখে বেসাণ্টের 'হোমরুল লীগ' স্থাপিত হয়েছিল। প্রচলিত রাজনীতি থেকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দুটি প্রতিষ্ঠান। উদ্যোক্তা দু'জনের নাম থেকেই কার্য্যক্রমের আভাষ পাওয়া যায়।

সিডিশন কমিটী

প্রগতির পথে আন্দোলন দ্রুত এগিয়ে গেলেও, আকস্মিকভাবে যা ঘটলো তাতে ভারতের রাজনীতির ধারায় বিরাট পরিবর্ত্তন এসে গেল। এতটার জন্যে ইংরেজও যে খুব প্রস্তুত ছিল, তা মনে হয় না।

যুদ্ধ-শেষে আটক-আইনের মেয়াদ ছ'মাসের মধ্যে ফুরিয়ে আসছে। গুরুতর অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে দণ্ডিত আসামীদের অনেকের মুক্তিলাভের সময় সমুপস্থিত। এর সঙ্গে এলো নতুন আতঙ্ক। যুদ্ধান্তে বহুসংখ্যক পাঞ্জাবী সৈন্য কর্ম্মচ্যুত হয়ে দেশে ফিরবেন। তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন কাজ হবেনা বলে গভর্ণমেণ্টের ধারণা। এসব সৈন্যের কাছে শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র থেকে যাবার সম্ভাবনা; যুদ্ধে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখিয়ে তাঁরা প্রচুর যশ ও মর্য্যাদা নিয়ে ফিরবেন। গদর-দলের কথা গভর্ণমেণ্ট ভুলতে পারেনি। অন্তরে চাপা আতঙ্ক বাসা বেঁধে আছে। সুতরাং সবের মূলে যেতে হলে, আগে থেকে "আইন" প্রস্তুত করে রাখতে হয়।

এর ওপর একটা গুপ্ত অভিসন্ধি যে না-ছিল তা নয়। মণ্ট্‌ফোর্ড-শাসন-সংস্কারে উজির ও তল্পিবাহক এবং আইন-সভার খবরদারি করার সুযোগ বর্ত্তমান। ভারত-সচিব মনে করলেন—এই সময় "লাড্ডু"র সঙ্গে বিদ্রোহ-নিবারক কোনও আইন চাপিয়ে দিতে পারলে জনপ্রতিনিধিদের একটা প্রকাণ্ড অংশ নতুন আইন সম্বন্ধে খুব বড় একটা বিতণ্ডা তুলবে না। গভর্ণমেণ্ট যে একেবারে ভুল করেছিল, সে-কথা ঠিক নয়।

অগ্রপশ্চাৎ সব বিবেচনা করে ১৯১৭ ডিসেম্বর ১০-ই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এক ইস্তাহার জারি করা হয়। সংক্ষেপে বলা হয়, ভারত-সচিবের সম্মতিক্রমে এক কমিটী গঠিত হবে। তার কাজ হবে—ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের রীতি ও প্রসার সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং তার ওপর একটা রিপোর্ট প্রদান ; আর এ-সকল ষড়যন্ত্র নিরোধ করবার (বর্ত্তমান আইনে) অসুবিধা আছে এবং যাতে গভর্ণমেণ্ট সেইসকল কার্য্যকলাপ সফলভাবে উচ্ছেদ করতে পারে, সে-সম্বন্ধে আইনের সঙ্কেত-দান। মূল ইংরেজী ঃ

"(i) To investigate and report on the nature and extent of the criminal conspiracies connected with the revolutionary movement of India ;

(ii) To examine and consider the difficulties that have arisen in dealing with such conspiracies and to advise as to the legislation, if any, necessary to enable Government to deal effectively with them."

কমিটীর চেয়ারম্যান হলেন খাস ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী-করা এক বিচারপতি —এস্. এ. টি. রোলট (S. A. T. Rowlatt) এবং আর দু'জন শ্বেতাঙ্গ ও দু'জন ভারতবাসী হলেন কমিটীর সভ্য। সারা ভারতময় পুলিশী নথিপত্র ঘেঁটে রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল চার মাসের মধ্যেই—১৯১৮ এপ্রিল ১৫-ই।

কমিটীর মতে, বোম্বাইয়ে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে ব্রাহ্মণরা, তন্মধ্যে 'চিৎপাবন' প্রধান। বিহার, ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজে বিধিবদ্ধভাবে কিছু হয়নি ; কচিৎ দু'-একটা ঘটনার পরিচয় মিলেছে। পাঞ্জাবের নিজস্ব যা ছিল, তার ওপর গদর-দল এসে পড়ায় বিপ্লব শক্তিলাভ করেছে। বর্ম্মায় গদর-দলেরই এক শাখা উৎপাত সৃষ্টি করেছে। হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঘটেছে বাঙ্গলায়। সেখানে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষিত ও ভদ্র যুবকদের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তা প্রবেশ করে। অজস্র ক্ষেত্রে লুঠতরাজ হয়েছে ; গুপ্তচর ও পুলিশ-কর্ম্মচারী নিহত হয়েছে অনেকগুলি। সকলের উদ্দেশ্যই এক—যে-কোনও উপায়ে ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিলোপ-সাধন। অবস্থা ভীষণতর হতে পারতো। বরং বলা যায়, অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে, আর সেটা বাঁচিয়েছে সাধারণ লোকের রাজানুগত্যবোধ।

সকল দিক বিবেচনা করে এবং ভারতে যাতে ইংরেজ রাজত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে সে-দিকে লক্ষ্য রেখে 'রোলট এ্যাণ্ড কোং' যা সুপারিশ করে বসলেন, তাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কবর হয়ে গেল। কেবল পুলিশ আর তার গুপ্তচররা যা বলবে, তার ওপর নাগরিকদের ভাগ্য নির্ভর করবে। তাদের কৃপা হলে জেলের বাইরে থাকা, আর না-হয় বিচারের একটা প্রহসন দেখিয়ে যথেচ্ছা জেল ও জরিমানা হতে পারবে : বিচার-ব্যবস্থা সহজ ও সরল করবার উপায় করে দেওয়া হ'ল। আদালতে হাজির করতে পারলেই হয় ; বিকল্পক্ষেত্রে তারও প্রয়োজন থাকবে না।

বিক্ষোভ

'রোলট বিল' উপলক্ষ করে ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া একেবারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। এইখানেই নতুন নেতৃত্ব এসে পড়লো এবং সেটি বজায় ছিল প্রায় স্বাধীনতা-লাভ পর্য্যন্ত। চারদিক থেকে বিল-এর বিরোধিতা হতে লাগলো ঃ সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা ও বিবৃতিতে দেশ মুখর হয়ে উঠলো। বঙ্গ-বিভাগ-রদ আন্দোলন প্রধানতঃ বাঙ্গলাতেই নিবদ্ধ ছিল। আজ প্রায় সকল প্রদেশের প্রতিবাদ একযোগে ফুটে উঠলো। বিশ্বযুদ্ধজয়ে সাহায্য করার পুরস্কার পাওয়া যাবে বলে একদল রাজ (বা ইংরেজ)-ভক্ত লোক বড় আশান্বিত হয়েছিল ; আজ সেখানে ছাই-চাপা পড়লো। এই 'ভক্ত' দলেরই এক অংশ প্রতিবাদে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করেছিল।

গান্ধীজী কেবল মৌখিক (বা লিখিত) আপত্তি জানিয়ে নিরস্ত থাকতে পারেননি। সেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ বলা চলে। ১৯১৯ মার্চ ১-লা তারিখে তিনি জানালেন—ভারতের প্রতিবাদকে রূপ দিতে হবে। প্রথম দফায় জনসাধারণের কর্ম্মবিরতি দিয়ে সেই প্রতিবাদ আত্মপ্রকাশ করবে। প্রথম বিলটি [Criminal Law (Emergency Powers) Bill] ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় আইন-সভায় (Imperial Legislative Council) উপস্থাপিত করা হয়েছে। সমস্ত জনমতকে দলিত করে উপস্থাপিত বিলটি মার্চ ১৮-ই বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয়ে গেল ; মার্চ ২১-এ বড়লাটের অনুমোদন লাভ করে 'The Anarchical and Revolutionary Crimes Act (XI) of 1919' নামে পরিচিত হয়। দ্বিতীয়টি স্থায়ী আইনের সংশোধন (Criminal Law Amendment Act) অর্থাৎ অতিরিক্ত কঠোর করা হয়।

বিধান-সভায় বিল উপস্থাপিত হলে—"stirred up a tremendous and unprecedented agitation"—বিরাট ও অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারপর যখন বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হ'ল, তখন বিক্ষোভ একেবারে ফেটে পড়লো। মহাত্মাজী ২৪-এ মার্চ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য অনশন পালন করলেন এবং 'মার্চ ৩০-এ' সারা ভারতের শোক-জ্ঞাপক ও অপমানিতের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য দিন ধার্য্য করলেন। এ তারিখ পরিবর্ত্তন করে এপ্রিল ৬-ই নির্দ্ধারিত হয়। যথাসময়ে সর্ব্বত্র খবরটা পৌঁছায়নি, কাজেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়ে গেল।

দিল্লী অসন্তোষের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এপ্রিল ১-লা দোকানপাট বন্ধ উপলক্ষে একটা গুরুতর-রকম দাঙ্গা ঘটে। সেখানকার সংবাদ পেয়ে মহাত্মাজী এপ্রিল ৯-ই বোম্বাই হতে দিল্লী রওনা হলেন। পরদিন, ১০-ই কোশিকালান ষ্টেশনে এক আদেশ ধরিয়ে দেওয়া হয়—তাঁর দিল্লী-প্রবেশ চলবে না। পরেই তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে মথুরায় নিয়ে যাওয়া হয়। উপরন্তু দিল্লী ও পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তারা তাঁদের রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ করে আদেশ দেন। মহাত্মাজী সে-আদেশ অমান্য করতে গেলে, তাঁকে বোম্বাইতে আটক করা হয়।

ঘটনা দ্রুততর তালে চলতে আরম্ভ করে। এপ্রিল ১০-ই নাগাদ পাঞ্জাবের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐদিনের জন্য দিল্লীতে হরতাল পালিত হচ্ছে, আর লাহোরে ও অমৃতসরে প্রচণ্ড দাঙ্গা বেধে উঠলো। সশস্ত্র পুলিশ বেরিয়ে পড়ে; দাঙ্গা রুখতে গিয়ে বহু লোককে হত্যা ও জখম করে ফেলে। সাধারণ লোকের লাঞ্ছনা, ক্লেশ ও জীবনের আতঙ্কের পরিসীমা ছিল না। বেশ কয়েকটা বাড়ীঘর পুড়েছিল; জন-চারেক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ নিহত হন, জনতার হাতে এক মহিলা বিশেষ-ভাবে লাঞ্ছিতা হন।

এর ওপর এসে গেল ১৯১৯ এপ্রিল ১৩-ই—যখন অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা-বাগে সহস্র সহস্র নিরস্ত্র জনতার ওপর বেপরোয়া গুলি চালানো হয়েছিল। অন্ততঃ শ'-পাঁচেক লোক ঘটনাস্থলেই মারা যায়; হাজার-দেড়েক লোক আহত হয়, তার মধ্যে গুরুতর আঘাতের সংখ্যা খুব বেশী। মুমূর্ষু লোক সভার মাঠে পড়ে রইলো, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোনও ব্যবস্থা করা হ'ল না।

এতে শেষ নেই। উপদ্রবের মাত্রা চরমে উঠেছিল। অমৃতসর, লাহোর, গুজরানওয়ালা জেলার ওপর সামরিক আইন (Martial Law) প্রযুক্ত হ'ল। লোককে উলঙ্গ করে প্রকাশ্যস্থানে বেত্রাঘাত সাধারণ শাস্তির পর্য্যায়ে স্থানলাভ করেছিল। গভর্ণমেণ্ট পরে অস্বীকার করলেও, খুব গুজব চলেছিল যে, জন-পাঁচেক লোক এই অত্যাচারের ফলে মারা পড়েছে। গভর্ণমেণ্ট কবুল করে যে, বত্রিশ জনকে এপ্রিল ১৫-ই থেকে মে ১৫-ই পর্য্যন্ত গড়ে এগারো-ঘা হিসাবে বেত মারা হয়েছে।

'উঠ্-বোস্', মাটীতে বুক পেতে (সরীসৃপ-ধরনের) চলা, 'হামাগুড়ি', সাহেব ও মিলিটারী দেখলেই সেলাম প্রভৃতি ব্যবস্থা প্রদত্ত-শাস্তির বিভিন্ন রূপ। হামলাকারীদের ভিড় লক্ষ্য করে বিমানপোত থেকে বোমা-ফেলা, স্কুলের কিশোর ছাত্রদের ধরে যাতায়াতে ষোলো মাইল হাঁটিয়ে হাজিরা এবং ব্রিটিশ পতাকাকে অভিবাদনে বাধ্য করা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবের রৌদ্রে অনাচ্ছাদিত লরির ওপর চাপিয়ে সহর-প্রদক্ষিণ, বড় রাস্তার মোড়ে খাঁচার ভিতর বন্যজন্তুর মত আবদ্ধ রেখে ভয়-সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একটা ধারা হয়ে উঠেছিল। নাগরিকদের ওপর সামরিক শাসনের বিধি-ব্যবস্থা-সম্বলিত প্রাচীরপত্রের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দেওয়া হ'ল। একটি বিবাহের মিছিলকে ধরে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়েছে; অপরাপর যুবকদের তো কথাই নেই।

নব নব সাজা-শাস্তির আর অন্ত ছিল না। দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে সারে সারে লোক টেনে নিয়ে যাওয়া, জবরদস্তি মোটর-দখল-করা অবাধে চলেছে। সামান্য প্রতিবাদ সহ্য করা হয়নি, উপরন্তু নানা অত্যাচার সংসাধিত হয়েছে। অত্যন্ত আধুনিক যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দেওয়া হয়েছে, যাতে নাগরিক সাধারণ ইংরেজের বিরাট শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। এসবের ওপরে হ'ল—

এলাকা নির্ব্বাচন করে আলো-জল বন্ধ করা। 'মার্শাল ল'র বিচার ঝট্পট্ সারা হয়েছে ; শাস্তির বহর সকল নির্ম্মমতাকে ছাড়িয়ে কয়েকজনের ফাঁসিতে পর্য্যবসিত হয়েছে।

দেশে শান্তি ফিরলে, ইংরেজ-শাসিত ভারতের পক্ষে ক্ষয়-ক্ষতির জন্য খেসারত-দাবীর প্রশ্ন উঠতে পারে মনে করে ভারত-সরকার অভাবনীয় এক পন্থা আবিষ্কার করে। পাঞ্জাব হাঙ্গামা সম্বন্ধে সবিস্তার অনুসন্ধানের জন্য হাণ্টার-এর সভাপতিত্বে এক কমিশন নিযুক্ত হয়। সে-কমিটীর রিপোর্ট বেরুবার আগেই গভর্ণমেণ্ট এক খেসারত-নিবারণী আইন (Punjab Indemnity Bill) সেপ্টেম্বর ২৫-এ পাকা করিয়ে নেয়। সুতরাং যত অপমান, নির্য্যাতন, সম্পত্তি-নাশ, অঙ্গ বা প্রাণহানি সবই নীরবে অসহায়ভাবে হজম করবার জন্য ব্যবস্থা হ'ল।

আগের দিন হলে হয়তো এতটা হ'ত না। কিন্তু দেশ আজ এক নব নেতৃত্বের প্রভাবে এসে পড়েছে। গান্ধীজী বললেন—যতদিন রোলট আইন বলবৎ থাকবে, ততদিন কারাগৃহের বাইরে থাকাও বেদনাদায়ক ("it was galling to remain free while the Rowlatt legislation disfigured the Statute Book")। আন্দোলনের ধারা আরও এক ধাপ গড়ালো। মে ২৭-এ রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সরকারী শ্রেষ্ঠ সম্মান বর্জ্জন করায় দেশের মধ্যে যেন তড়িৎ-প্রবাহ ছুটে গেল।

সুশীল ও সুবোধ বালকদের তুষ্টি বিধান করে 'মণ্ট্‌ফোর্ড রিফর্ম্মস্' ১৯১৯ ডিসেম্বর ২৩-এ চালু করা হয়েছিল। সম্রাট ঘোষণা করলেন—নতুন যুগে এক সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার প্রধান অমাত্যবর্গ ও ভারতীয়েরা এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন ("Let the new era begin with a common determination among My people and My officers to work together for a common purpose")। কংগ্রেসের মতিগতি সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করে নিয়ে নরমপন্থীরা 'ইণ্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশন' (Indian Liberal Federation) গঠন করে বেরিয়ে পড়লেন। "দিল্লীর লাড্ডু"র আকর্ষণ তাঁদের কাছে খুব বড় হয়ে উঠলো।

সম্রাটের দাক্ষিণ্যে ডিসেম্বর ২৩-এ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি আরম্ভ হয়েছিল।

কংগ্রেসের অভিমত

নতুন শাসন-সংস্কারের খসড়া ১৯১৮ এপ্রিল ২২-এ প্রকাশিত হবার পর, আগষ্ট মাসে হাসান ইমামের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন বসে। সেখানে 'রিফর্ম্ম'কে প্রয়োজনের তুলনায় অ-পর্য্যাপ্ত, অসন্তোষজনক বা অতৃপ্তিকর ও নিরাশাব্যঞ্জক ("inadequate, unsatisfactory and disappointing") বলে প্রকাশ করা হয়।

ডিসেম্বর মাসে মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। এখানে নতুন 'রিফর্ম্ম' নিয়ে তিলক ও গান্ধীজীর দুর্দ্দান্ত মতভেদ প্রকাশ পায়। মনে হয়েছিল যে, বামপন্থী কংগ্রেস বোধ হয় দু'ভাগ হয়ে যাবে। তিলক ছিলেন সরাসরি বর্জ্জনের বিপক্ষে। রক্ষা করেন মদনমোহন মালবীয়। ভারতের দাবীর তুলনায় 'রিফর্ম্ম' সন্তোষ-উৎপাদনে অসমর্থ এবং সম্পূর্ণ নৈরাশ্যব্যঞ্জক ('inadequate' শব্দটি বর্জ্জন করা হয়),—সকল দিক বিবেচনা করে আগের সুর বেশ খানিকটা নরম করা হয়েছিল। এখানে বলা হয়—যুদ্ধান্তে শান্তি-বৈঠকে প্রধান-শক্তি-জোটে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, যাতে উন্নত সকল দেশে আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি গৃহীত হয়েছে, সেটা ভরতবর্ষে সদ্য-সদ্যই প্রয়োগ করতে হবে ("This Congress claims the recognition of India .... as one of the progressive nations to which the principle of self-determination should be applied")—এইরকম একটা আভাষ পেলে, কংগ্রেস 'রিফর্ম্ম'-এর দরজার মধ্যে প্রবেশ করতে যে অনিচ্ছুক এ-কথা স্পষ্ট করে আর বলা হ'ল না।

সকলের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করে চিরাচরিত পথে ইতিহাসকে চলতে দেখা যায় না। তার খেয়ালের অর্থই হ'ল—ভাগ্যনিয়ন্তার নির্দ্দেশ। সবিস্তারে আলোচনা করতে গিয়ে 'রিফর্ম্ম'-এ নানা গলদ চোখে পড়তে লাগলো। 'পাঞ্জাব হাঙ্গামা' সম্বন্ধে কংগ্রেস-নির্ব্বাচিত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল—১৯২০ মার্চ ২৬-এ; ওদিকে 'হাণ্টার কমিটী'র সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল—১৯২০ মে ২৬-এ,—দানব ডায়ার যৎসামান্য তিরস্কৃত হ'ল মাত্র। আর, খিলাফতের মীমাংসায় খোদ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়ে পড়ায়, সব বানচাল হ'ল এবং ভারত সঙ্ঘর্ষের পথে এগিয়ে গেল। নতুন অভিযান!

পট-পরিবর্ত্তন (১৯২০—১৯২২)

১৯২০ সাল পর্য্যন্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু যখন রাজনৈতিক আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের মনে যখন ইংরেজ-বিদ্বেষ দানা বাঁধতে আরম্ভ করছে, তখন থেকে চিন্তাশীল বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ কেউ কংগ্রেসের মধ্যে স্থান-গ্রহণের কথা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, অসহযোগের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে থেকে বিপ্লবী-দলে নতুন কর্ম্মী সংগ্রহের সুযোগ হতে পারে, এ কথা বড় করে দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে বিপ্লবী বন্দী মুক্তি পেতে থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার বিশেষ চেষ্টা চলতে থাকে।

গান্ধীজী অবতীর্ণ হলেন ; অন্যান্য নেতারা সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলেন। অরবিন্দ লিখলেন ঃ

"When Tilak passed away and Gandhi came into the field, I saw distinctly that it was Gandhi's hour and not mine. What Gandhi has come to do, he will do ; and nobody will be able to stand in his way. He has complete faith in what he realises, and even if he fails, he has his own contribution to make to the national cause which will turn the country's destiny."

নূতন পথ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এসে ধীরে ধীরে আন্দোলন-পরিচালনার সকল দায়িত্ব নিজে ঘাড়ে করে নিলেন। একটা বিরাট অজ্ঞ অশিক্ষিত জাতির মন উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। সামান্য অঙ্গুলি-হেলনে তিনি সমস্ত জাতটাকে অহিংস সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবার সঙ্কেত দিলেন।

পাঞ্জাবের ঘটনা-পরম্পরা ছাড়া আরও নানা উপদ্রব একটির পর একটি এসে জুটতে লাগলো—যখন আর পিছু ফিরে দেখবার ফুরসত রইল না। এসে গেল খিলাফত-বিপর্য্যয়। যুদ্ধজয়ের পর তুরস্কের জন্যে কঠোর সাজা-শাস্তির পথ গ্রহণ করেছিল জেতারা। তখন ভারতের মুসলমান ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো এবং গান্ধীজী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফতকে যোগ করেছিলেন বলে নূতন আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব তাঁর ওপর এসে পড়েছিল। তিনি তাঁর অসহযোগ-মন্ত্র কংগ্রেসকে দেবার আগে, মুস্লিম লীগ কাউন্সিলে ১৯২০ জানুয়ারীতে ব্যক্ত করেন ;

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে গভীরভাবে অংশগ্রহণের জন্য মুসলমানদের উদ্‌বুদ্ধ করতে লাগলেন এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার নির্দ্দেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের তাণ্ডব নিয়ে বেসরকারী ও সরকারী কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল দু'মাস ব্যবধানে, যথাক্রমে মার্চ ও মে মাসে, সে-কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারেই দুই কমিটীর দৃষ্টিভঙ্গীর 'আসমান-জমিন ফারাক্'। বলা বাহুল্য, বে-সরকারী রিপোর্টের ওপর জনসাধারণ বেশী আস্থা স্থাপন করেছিল। সারা ভারতে এক দারুণ ক্ষোভ মানুষের মনে জমে উঠেছিল ঃ "প্রলয় ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন"।

১৯২০ সেপ্টেম্বর ৪-ঠা থেকে কলিকাতায় লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয এবং বহু খ্যাতিমান, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও সংখ্যাধিক্য (২,৭২৮-এর মধ্যে ১,৮৫৫) ভোটে অসহযোগ কার্য্যক্রম গৃহীত হয়। কার্য্যতালিকায় অন্যান্য বহুর মধ্যে কাউন্সিল (বিধান-সভা), আদালত ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জ্জন নীতি গৃহীত হয়েছিল। নাগপুর কংগ্রেসের (১৯২০) সাধারণ অধিবেশনেও পূর্ব্বনীতি গৃহীত হয়। উপরন্তু এবার স্বরাজলাভের পদ্ধতি হিসাবে নীতিসম্মত ও শান্ত উপায় ("attainment of *Swaraj* by all legitimate and peaceful means") নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। ভারতের বহু লক্ষ্মীকৃপাপুষ্ট আইনজীবী নিজ পেশা বর্জ্জন করে সম্পূর্ণভাবে আন্দোলনে যোগ দেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২১ জানুয়ারী ২১-এ আইন-ব্যবসা-বর্জ্জন ঘোষণা করেন। (সুভাষচন্দ্র মে মাসে সিভিল-সার্ভিস চাকুরিতে ইস্তফা দেন।)

অসহযোগের মধ্যে আইন-সভা-বর্জ্জন নীতি শীঘ্রই বিতণ্ডার সূত্রপাত করে। তা ছাড়া, বাঙ্গলার বিপ্লবী-দল গান্ধীজীর ১৯২০ অক্টোবর ১৬-ই তারিখে ঘোষিত "একবছরে স্বরাজ"-প্রলোভনে আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। গুরুতর নির্য্যাতনের প্রতিবাদে কেবল নিরুপদ্রব অসহযোগ নীতি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে তাঁরা সম্মত ছিলেন না। অবশ্য সারা ভারতে এরূপ অবিশ্বাসীর সংখ্যা হয়তো বিশ্বাসী অপেক্ষা সংখ্যায় খুব বেশীই ছিল। বাঙ্গলার উগ্রপন্থীদের মনোভাব বেশ ফুটে উঠেছে ক'টি কথায় ঃ "They could hear the promise in his tune but were reluctant to leave the familiar political haunts of the people. They followed Gandhi, but with many a backward glance at what they were leaving to their political and social rivals." (J. H. Broomfield : *Elite Conflict in a Plural Society, 20th Century Bengal,* p 170). তাঁরা ভাবতে লাগলেন, যে-রণক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে আসছেন—সেখানে মডারেট (নরমপন্থী) অবাধে বিচরণ করবেন ; ভারত সরকার মহা আনন্দে জগতে ভারতবাসীর সমর্থন প্রকাশ করবে।

চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলার বিপ্লবীদের মতিগতির খবর রাখতেন। তাঁদের ত্যাগ ও

কর্ম্মশক্তির ওপর তাঁর বিরাট আস্থা ছিল। না-থাকবার কারণও নেই। যখন সর্ব্বপ্রথম বিপ্লবী-দল বাঙ্গলায় গড়ে ওঠে তখন থেকেই তিনি সে-দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অরবিন্দ ও বারীন্দ্র ক্রমে যে-পথ নিলেন, তার থেকে খানিকটা দূরে সরে থেকে তিনি বিপ্লবীদের সম্পর্কে এক সম্ভ্রম ও মমতাপূর্ণ মনোভাব বরাবরই পোষণ করে গেছেন। তাঁদের সহযোগিতায় তিনি কংগ্রেসকে অধিকতর শক্তিশালী করতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে এর একটা বড় কারণ ছিল। শ্রদ্ধেয় ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "It was his (Gandhi's) idea to declaie the Congress as the free republic Government of India"—কংগ্রেসকেই তিনি ভারতের গণতন্ত্রী সরকার বলে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন এই মত সমর্থন করতেন এবং এই ধারার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৯২১ সেপ্টেম্বরে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রভাবশালী এক বিপ্লবী-দলের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিলেন। দুই মহান্ দেশনায়কের প্রভাব উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে, দেশবন্ধু মনে ব্যথা পান, এটা তাঁরা চাইলেন না। তাঁরা অসহযোগ-আন্দোলনে যথাসম্ভব সহযোগিতা করবার আশ্বাস দিলেন। বিপ্লবীদেরই অপর এক অংশ এ-পথ নিতে অস্বীকার করলেন। যদিও তাঁরা কোনও বৈপ্লবিক ঘটনা দ্বারা গান্ধীজীর আন্দোলনকে বিব্রত করেননি, অন্ততঃ সাময়িকভাবে। সুভাষচন্দ্র (*Indian Struggle*, p. 89) এ-বিষয়ে বলছেন: "Many of them did not approve of the doctrine of non-retaliation which they apprehended would demoralise the people and weaken the power of resistance."

বাঙ্গলার বিপ্লবী-দলের সাহায্য চিত্তরঞ্জনের একান্ত প্রয়োজন ছিল। আহম্মদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্ব করবার কথা। কিন্তু তিনি তখন জেলে; তাঁর বক্তৃতা হাকিম আজমল খাঁ পাঠ করেন। এই কংগ্রেস-ই হজরত মোহানির "সংযুক্ত ভারত-রাষ্ট্র" (United States of India) প্রস্তাব গান্ধীজীর বিরোধিতায় বর্জ্জন করে। দেশবন্ধু জেলে বসে বিচার করলেন যে, কংগ্রেস কাউন্সিল বর্জ্জন করলেও, নির্ব্বাচনের জন্য লোকের অভাব হয়নি। মডারেট ও ইংরেজের "খয়ের খাঁর" দল বিধানসভার জলুষ বৃদ্ধি করে বসে আছে আর ইংরেজের পক্ষে প্রচারের সুবিধা হচ্ছে যে, স্বনির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে ভারত শাসিত হচ্ছে। তিনি বিধানসভা দখল করে ভিতর থেকে সংঘর্ষের প্রস্তাব দিলেন; জেলখানার সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মন স্থির করে ফেললেন এবং গান্ধীজীর মতের বিরোধিতা করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

নভেম্বরে (১৯২২ সাল) কলিকাতায় অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর (A.I.C.C.) অধিবেশন হয়। সেখানে বুঝতে কষ্ট রইল না যে, গান্ধীজীর নীতির বিরুদ্ধে দেশে একটা প্রবল মত গড়ে উঠেছে। ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেস; চিত্তরঞ্জন সভাপতি। সেখানে তাঁর মত গৃহীত না হওয়ায়, তিনি পদত্যাগ করলেন।

মতিলাল নেহরু প্রমুখ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠিত হ'ল এবং ১৯২৩ মার্চ মাসে এলাহাবাদে তাঁদের প্রথম অধিবেশন হয়। প্রকাশ্য কংগ্রেসের মধ্যেই তাঁদের মত গৃহীত হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। এখন পর্য্যন্ত এঁদের লক্ষ্য হিসাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই (Dominion Status) রেখে দিলেন। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি বেশ বোঝা গেল যে, স্বরাজ্য-পার্টিকে আর উপেক্ষা করা চলবে না। তখন সেপ্টেম্বর ১৫-ই দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। মৌলানা আজাদ সভাপতির আসন থেকে 'পার্টি'কে স্বাগত জানালেন। গান্ধীজীর ভক্তরা বিপদাশঙ্কায় একটা মিটমাটের অনুকূলে মত দেন। পরের কংগ্রেস (১৯২৬ ; কাঁকিনাড়া, মাদ্রাজ) মহম্মদ আলির সভাপতিত্বে স্থির হয় যে—কংগ্রেসের একটা অংশ গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত থাকবে, আর অপর অংশ বিধান-সভার ভিতর থেকে শাসনযন্ত্রের গলদ প্রকাশ করে যাবে।

দেশের মধ্যে এ-সময় আরও নানারকম আন্দোলন চলতে থাকে। তার অনেকগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। আসাম থেকে একজোটে কুলীদের চা-বাগান ত্যাগ, আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্ম্মঘট, মেদিনীপুরে কর-বন্ধ আন্দোলন, মোপলা-বিদ্রোহ, আকালী-অভ্যুত্থান, সর্ব্বোপরি যুবরাজের অভ্যর্থনা-মিছিল বর্জ্জন। শেষটি এত নিপুণ ও নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে, বড়লাট লর্ড রেডিং (Lord Reading) মালব্যজীকে ধরে প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে বলেন। সর্ত্ত ছিল—অসহযোগ আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ হলে, ঐ সম্পর্কে ধৃত বন্দীদের সদ্য-মুক্তি, দমনমূলক সমস্ত সরকারী আদেশ নাকচ, যথাসম্ভব শীঘ্র গোলটেবিল বৈঠক বসিয়ে ইঙ্গ-ভারত সমস্যার আলোচনা প্রভৃতি। দেশবন্ধু এ-প্রস্তাব সমর্থন করে গান্ধীজীর কাছে পাঠালে, তিনি বিকল্প যে কঠিন সর্ত্ত দিলেন—সেটা গভর্ণমেণ্টের মনঃপূত না হওয়ায়, মালবীয় দৌত্য বিফল হয়ে গেল। চিত্তরঞ্জন-প্রমুখ একদল নেতা বলেছিলেন, মহাত্মাজী জিদের বশে একটা প্রকাণ্ড ভুল করলেন।

মোপলা-বিদ্রোহ

অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে মোপলা-বিদ্রোহের যৎসামান্য পরিচয় থাকা ভাল বলে মনে হয়। এটি শুরু হয় স্থানীয় হিন্দু-বিদ্বেষকে মূল করে। অত্যাচার যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তখন গভর্ণমেণ্টের তরফে প্রতিবিধানের চেষ্টা হয় এবং সমস্ত আক্রোশ গভর্ণমেণ্টের ওপর গিয়ে পড়ে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না এবং এইখানেই পরের ঘটনা চৌরিচৌরার সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য।

মোপলা-অভ্যুত্থান আরম্ভ হয় ১৯২১ আগষ্ট ২০-এ এবং সমস্ত মালাবার উপকূলে ছড়িয়ে পড়ে। বে-সরকারী হিসাবে ধরা হয় যে, শেষ পর্য্যন্ত অন্ততপক্ষে দশ হাজার বিদ্রোহী মোপলা নিহত হয়েছিল। বাইরে এ-খবর খুব ছড়াতে পারেনি।

কিন্তু একটা নিদারুণ মর্ম্মান্তিক ঘটনা ইংরেজ-শাসনের খুব বড় কলঙ্কচিহ্ন হয়ে থেকে গেছে। তিরুর থেকে কইম্বাটুরে পাঠানো হচ্ছে একশত মোপলা-বিদ্রোহী বন্দী ১৭১১-নং একখানা বন্ধ মালগাড়ীর মধ্যে ভর্ত্তি করে। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার পর মালগাড়ী পোদানুর পৌঁছুলে, তত্ত্বাবধায়ক রক্ষী একজন দেখতে পায়, ৫৬ জন বন্দী বাতাসের অভাবে গাড়ীর মধ্যে মারা গেছে, আর বাকীরা সব জীবন্মৃত। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর মধ্যে আরও ছ'জন মারা যায়। কাহিনী-বর্ণিত অন্ধকূপের হত্যাকেও এ-ঘটনা ম্লান করে ছেড়েছে।

চৌরিচৌরা

গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিটমাটের সকল সম্ভাবনা দূর হলে, অসহযোগ-আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগলো। কিন্তু বিধি বাম ; এক প্রকাণ্ড দুর্ঘটনায় সব বানচাল হয়ে গেল। চৌরিচৌরা উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার একটা চৌকি। ১৯২২ ফেব্রুয়ারী ৪-ঠা সেখানে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক-দলের সঙ্ঘর্ষ হয়। এতে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে থানায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে, একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও কয়জন (সম্ভবতঃ ২১ জন) কন্‌ষ্টেবলকে পুড়িয়ে মারে।

ঘটনা যে অতি গুরুতর সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহাত্মাজী মনে ভীষণ আঘাত পেলেন। এ অপকর্ম্মের সমস্ত দায়িত্ব তিনি মাথা পেতে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বারদৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা আহূত হ'ল। সেখানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্যে অসহযোগ কর্ম্মতালিকা থেকে সকলপ্রকার বে-আইনী বা যাতে আইনভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, সে-সব ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়। গঠনমূলক কার্য্যতালিকায় যা রইল—অর্থাৎ চরকা, তাঁত, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য-স্থাপন, মাদক-বর্জ্জন ইত্যাদি,—তাতে গভর্ণমেণ্টের শিরঃপীড়ার সমস্ত কারণ অপসারিত হয়ে গিয়েছিল।

চৌরিচৌরার ঘটনা নিতান্ত আকস্মিক ; এতদূর যে গড়াবে—স্বপ্নেও কেউ তা ভাবেনি। একে পূর্ব্বপরিকল্পনামত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংগ্রামের কোনও অংশ বলে গ্রহণ করা চলে না, কারণ সমস্ত আন্দোলন থেকে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। তবুও মূল ঘটনাস্রোত থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। অনেকগুলি প্রাণ নিয়ে এর পরিসমাপ্তি এবং ভারতের সংগ্রামের সমস্ত উদ্যোগ এই ঘটনা উপলক্ষ করে স্থগিত হয়ে যায়। সুষ্ঠুভাবে আন্দোলন চললে, কি দাঁড়াতে পারতো সে-কথা ভেবে লাভ নেই।

চৌরিচৌরা অধ্যায়ের আরম্ভ এবং শেষ—দুটিই বিশেষ করুণ। অতগুলি কর্ত্তব্যরত সরকারী কর্ম্মচারীর বেঘোরে মৃত্যু গভর্ণমেণ্ট উপেক্ষা করেনি ; বিচার-ব্যবস্থা প্রতিহিংসা-পর্য্যায়ে গিয়ে উঠেছিল। ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গেল এবং সেটা

যে নিতান্ত শান্তভাবে হয়েছে এরকম মনে করবার কোনও কারণ নেই। কিশোর, বালক, অপস্মারগ্রস্ত রোগী ধরে আনা হয়েছে। মোট আসামী-সংখ্যা দাঁড়িয়ে গেল ২২৮ জন। যখন যূপকাষ্ঠে বলি দেবার মত বিচার-ব্যবস্থা পূর্ণ হতে চলেছে—১৯২৩ জানুয়ারী ৯-ই, তখন দেখা গেল বিচারের প্রতীক্ষাকালে হাজতে (হয়তো পুলিশের মার খেয়ে) মরেছে ছ'জন, আর একজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। তাকে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট মামলার হাত থেকে রক্ষা করে মুক্তি দিল। বে-আইনী মিছিলে যোগ দেওরার জন্য ভিন্ন মামলায় দু'জনের দু'বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। বাকী যা রইল, তার মধ্যে ৪৭ জনকে মুক্তি এবং ১৭২ জনকে হত্যা, ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের অনেকগুলি ধারায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

আপীল হ'ল। এলাহাবাদ হাইকোর্টে ১৯২৩ এপ্রিল ১৫-ই আসামীদের পক্ষে সওয়াল শেষ হয়। রায় প্রদত্ত হয়েছিল—এপ্রিল ৩০-এ। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ সমর্থিত হ'ল ১৯ জনের ওপর; ১১০ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ব্যবস্থা রইল। বিচারপতিরা তার মধ্যে শাস্তির মাত্রা হ্রাস করে—১৯ জনের আট বছর, ৫ জনের পাঁচ বছর ও ২০ জনের তিন বছর করে দ্বীপান্তরের জন্য গভর্ণমেণ্টকে সুপারিশ জানান। ৩ জনের ছ'বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩৮ জনের মুক্তি ঘটে।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ১৯ জন: (১) আবদুল্লা, ওরফে সুখী বা সুখাই, (২) ভগবান, (৩) বিশ্রাম, (৪) দুধাই, (৫) কালীচরণ, (৬) লাল মহম্মদ, (৭) লাল্টু, (৮) মহাদেও, (৯) মেঘু, ওরফে মহম্মদ, (১০) নজর আলি, (১১) রঘুবীর, (১২) রামলগন, (১৩) রামরূপ, (১৪) রুদালি, (১৫) সহদেও, (১৬) সম্পত—১, (১৭) শ্যামসুন্দর, (১৮) সীতারাম ও (১৯) সম্পত—২।

১৯২৩ মে ৪-ঠা, গভর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের সুপারিশ সর্ব্বতোভাবে মেনে নেয়। লণ্ডন থেকে মে ১৮-ই বার্ত্তা আসে যে, এর পর কারও দণ্ড যেন হ্রাস করা না হয়। মৃত্যুদণ্ড-হ্রাসের জন্য ১৯ জনের প্রার্থনা—জুন ২৬-এ, বড়লাট বাতিল করেন। অতঃপর যথারীতি ফাঁসি শেষ হয়।

দীর্ঘমেয়াদী সাজার সঙ্গে এতগুলি লোক প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। সুতরাং চৌরিচৌরার ঘটনা একেবারে উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভ্রান্ত-পথে গেলেও, জাতীয় আন্দোলনের এক অংশ বলে মনে করলে, খুব ভুল হবে না।

পুনরাবির্ভাব (১৯২৩—১৯২৬)

১৯২৩

সশস্ত্র-বিপ্লব-আন্দোলন একেবারে তিরোহিত হয়নি ; একটা বড় অংশ একে আঁকড়ে ধরে বসেছিল। এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়—চট্টগ্রামে সদ্যমুক্ত বিপ্লবী বন্দীরা যখন ১৯২৩ এপ্রিলে এক গোপন বৈঠকে স্থির করলেন—উদ্যম ও আয়োজন সম্পূর্ণ বজায় রাখতে হবে।

ঘটনা-প্রবাহ

চট্টগ্রাম ঃ পরৈকোড়া— ফলস্বরূপ, ১৯২৩ এপ্রিল ২৩-এ পরৈকোড়ায় (চট্টগ্রাম) সরসী মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল। জন-ত্রিশ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সিন্দুক-বাক্স ভেঙে টাকা ও অলঙ্কার লুঠ করে নিয়ে যায়। সরসী ও তাঁর ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকেন। প্রচণ্ড গুজব চলতে থাকে যে, লুণ্ঠিত টাকার পরিমাণ খুবই ভারি ; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেটা এক হাজারের অধিক দাঁড়ায়নি (অনন্ত সিংহ ঃ 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম', পৃঃ ৬৭)।

পাহাড়তলী— বৎসরের শেষের দিকে, ডিসেম্বর ১৪-ই চট্টগ্রামেই দ্বিতীয় ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল। আসাম-বেঙ্গল রেলের কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ টাকা ঘোড়ার গাড়ী করে রেলের হেড-অফিস থেকে পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে পাঠানো হ'ত। ঐ দিন বেলা দশটা নাগাদ যখন গাড়ী এসে পাহাড়তলী পৌঁছালো, তখন লুণ্ঠনকারীরা রিভলভার দেখিয়ে গাড়ী থামায এবং কোচম্যান ও তহবিলরক্ষীদের নামিয়ে দিয়ে, টাকা-সমেত গাড়ী নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

সুলকবাহার ঃ সেখান থেকে সুলকবাহারে বিপ্লবীদের গোপন আড্ডায় টাকা এলো নির্ব্বিবাদে। কয়েকদিনের মধ্যে পুলিশ সংবাদ পাওয়াতে, বিপ্লবীরা ১৯২৩ ডিসেম্বর ২৪-এ সে-স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে বেরিয়ে পড়েন ; মাঝে মাঝে পুলিশের সঙ্গে গুলি-বিনিময় করে চলতে হয় এবং নাগারখানা পাহাড়ে দস্তুরমত এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। পরে দু'জন পলাতক এখানে ধরা পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট জন-তিনেককে আসামী করে এক মামলা করে ; কিন্তু কাকেও শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি।

অন্যান্য নতুন দল গজিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। নিরুপদ্রব পথ তাদের শান্ত রাখতে পারেনি। নতুন নামও ক্রমে জানা যেতে লাগলো। পুলিশ বলে এদের ঃ 'New Violence Party' ; আবার কেউ বললে ঃ 'Red Bengal Party'।

পর পর কয়েকটি ডাকাতিতে এরা লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলাফল বিচার করে তখনই মনে হয়েছে একেবারে "কাঁচা হাত", যেন একটা কিছু করা চাই নিজেদের অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য।

হাওড়া ঃ কোনা— প্রথম ঘটনা হ'ল—হাওড়া জেলার কোনা গ্রামে, ১৯২৩ মে ১৬-ই, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সন্ধ্যার বেশ একটু পরে। লুণ্ঠনকারীরা কলিকাতা থেকে ট্যাক্সিতে রওনা দেয়। পথের মধ্যে ড্রাইভারকে দড়ি দিয়ে বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে স্বর বন্ধ করে রাখে।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে টাকার সন্ধানে হামলা শুরু করতে—প্রসন্ন ও তাঁর এক ভাইপো একজন ডাকাতকে ধরে ফেলেন। কালবিলম্ব না করে, আক্রান্ত ব্যক্তি রিভলভার-সাহায্যে দু'জনকেই মারাত্মকভাবে আহত করেন। পরে ঐ দু'জনই মারা যান। সোরগোল উঠে পড়েছে, সুতরাং আর সময় নষ্ট না-করে, ট্যাক্সিতে উঠে ফিরে পালাবার ব্যবস্থা নিতে হয়। পথে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে একটা কাঠের পুলের কাছে ফেলে দিয়ে, আততায়ীর দল গোপন আড্ডায় এসে পৌঁছে যায়। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে পরে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

ডাকাতরা পুলিশের হাত এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। প্রসন্ন তাঁর অন্তিম জবানবন্দীতে প্রতিবেশী এক শত্রুকে জড়িয়ে দেন। পুলিশ তাদের নিয়ে টানাটানি করে। যথারীতি সাজা-শাস্তির ব্যবস্থাও হয়। পরে ঘটনা সম্বন্ধে গোপন তদন্তের ফলে, গভর্ণমেণ্ট সত্য ঘটনা জানতে পারে এবং নিরপরাধীদের মুক্তি দেয়। নারায়ণগড় ট্রেন-হামলার ব্যাপারে এই কাণ্ড ঘটেছিল।

কলিকাতা ঃ উল্টাডিঙ্গি— উল্টাডিঙ্গির ছোট এক পোষ্ট-অফিস ; খুব কাজের দিনেও বেশী টাকার কারবার হয় না। সে-দিনটা ছিল 'এম্পায়ার ডে'—ছুটির দিন, ১৯২৩ মে ২৪-এ। চারজন যুবক সাইকেল চেপে এসে হাজির। যতদূর সম্ভব মুখ ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করবার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। ডাকঘরের বাইরে বারান্দায় এক উকিল ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন। সুতরাং খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে হ'ল। কিন্তু এভাবে খুব বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করা চলে না। অতএব দু'জন পোষ্ট-অফিসের কামরায় ঢুকে পড়ে ; একজন রাস্তায় আর একজন বারান্দায় উপবিষ্ট উকিল ভদ্রলোককে রিভলভার দেখিয়ে নিরস্ত্র করে রাখে।

ভিতর থেকে টাকা নিয়ে দু'জন যখন বেরিয়ে আসছে, তৃতীয় ডাকাত সে-দিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েছে—আর সেই সুযোগে উকিল ভদ্রলোক সরে পড়ে নিকটস্থ ট্রাফিক-পুলিশকে খবর দেন। পুলিশদের ছুটে আসতে দেখে, ডাকাতরা সাইকেল চেপে পালাতে চেষ্টা করে। ইট-পাটকেল ছুড়ে ডাকাতদের মারবার চেষ্টা হয়। ঠেলাগাড়ীর এক চালক গাড়ীখানা দিয়ে রাস্তা বন্ধ করতে

চেষ্টা করে। রিভলভার হতে গুলি চালিয়ে ডাকাতরা সরে পড়ে। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ৪১৫ টাকা কয়েক আনা মাত্র। মামলা করবার মত প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি।

গোয়াবাগান ঃ আরও একটা ডাকাতি হ'ল কলিকাতার গোয়াবাগানে। একে ডাকাতির প্রহসন বললেও চলে। দরিদ্র ভূষণমণি দাসীর বাস ২-নং গোয়ালপাড়া লেনে। ১৯২৩ জুলাই ১৯-এ রাত্রে ঐ বাড়ী চড়াও হয়ে প্রৌঢ়া ভূষণমণিকে বেঁধে ফেলে এবং রিভলভার দেখিয়ে অন্য এক মহিলার গা থেকে কিছু গহনাপত্র নিয়ে ডাকাতরা চলে যায়।

গড়পাড় ঃ কলিকাতার গড়পাড় লেনের ডাকাতি যতটা করুণ, তার চেয়ে হাস্যোদ্দীপক অনেক বেশী। ১৯২৩ জুলাই ৩০-এ, ১১-নং গড়পাড় লেনের বাড়ী থেকে এক দ্বারোয়ান প্রভুর গাড়ীতে একটা মোট তুলে দিচ্ছিল। প্রহরায় নিযুক্ত ডাকাতরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মোটটা ছিনিয়ে নিতে গেলে, দ্বারোয়ান বাধা দিতে চেষ্টা করে। তখন একজন তাকে গুলি মেরে সেইখানেই তার মৃত্যু ঘটায়। আসলে পোঁটলার মধ্যে ছিল—টাকা নয়, ঝোড়াখানেক আম।

শাঁখারিটোলা ঃ গুরুতর কাণ্ড ঘটলো—কলিকাতার শাঁখারিটোলা ব্রাঞ্চ পোষ্ট-অফিস লুঠ করতে গিয়ে। ১৯২৩ আগষ্ট ৩-রা, বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ তিনজন যুবক হামলা করে। ঘরে ঢুকেই একজন টাকার থলি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ব্রাঞ্চ পোষ্ট-অফিস, সুতরাং টাকা-পয়সা বিশেষ কিছুই ছিল না। পোষ্ট-মাষ্টার অমৃতলাল রায় বাধা দিতে গেলে গুলিবিদ্ধ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

পোষ্ট-অফিসের অপর এক কর্ম্মী আততায়ীকে ধরতে চেষ্টা করে বিফল হন এবং আক্রমণকারী পালিয়ে যান। যখন রাস্তায় উঠে ছুটতে আরম্ভ করেছেন তখন স্থানীয় কয়েকজন এক ডাকাতের পিছু ধাওয়া করে। বেশ খানিকটা ছোটবার পর হাঁপিয়ে পড়ে ঐ লোকটি একটা বাড়ীর রকে বসে পড়েন। তখন পশ্চাদ্ধাবনকারীরা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে। পরে নাম জানা গেল বরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

হাইকোর্ট দায়রায় ১৯২৩ আগষ্ট ১৭-ই বিচার আরম্ভ হয় এবং আসামীর ফাঁসির হুকুম হয়। সেপ্টেম্বর ২৬, জজ-মণ্ডলীর (Full Bench) কাছে আপীলের শুনানি হয় এবং পূর্ব্বের রায় বহাল থাকে। প্রিভি কাউন্সিল ১৯২৪ জুলাই ৩১-এ আপীল নাকচ করে। তখন লাটকে ধরাধরি করে আগষ্ট ২৬-এ আসামীর ফাঁসি রদ হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিণত হয়।

আলিপুর মামলা ঃ শাঁখারিটোলার ঘটনার পর সন্দেহভাজন লোকদের আটকাবার জন্যে পুলিশ খুব বড় করে জাল পাতে। জন-নয়েককে আসামী করে 'আলিপুর বোমার মামলা' ফাঁদা হ'ল। এর মধ্যে একজনকে ফেরারী বলে হুলিয়া দিতে হয়। সব-ক'টা ঘটনা মিলিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়—১৯২৩ সেপ্টেম্বর ১৯-এ। দায়রা সোপর্দ্দ হ'ল ডিসেম্বর ১৭-ই। একজন রাজসাক্ষী দাঁড়ায় আর একজন অপরাধ কবুল করে। এত তোড়জোড় ফেঁসে গেল যখন দায়রা-জজ ১৯২৪ এপ্রিল ১৭-ই সকলকে বেকসুর খালাস দেন। সঙ্গে সঙ্গে চারজনকে ১৮১৮ সালের ৩-নং রেগুলেশনে বন্দী করা হয়। আর সেপ্টেম্বর ২৫-এ, ঢালাও ধরপাকড় হয়। এতেও হ'ল না; ১৯২৪ অক্টোবর ২৫-এ, বাছাই করে কেবল কলিকাতাতেই ৫৬ জনকে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়েছিল। মফস্বল-সমেত সংখ্যা শতাধিকে দাঁড়ায়। সাধারণের মত ঃ 'স্বরাজ্য পার্টি'র আক্রমণে বেইজ্জত হয়ে দেশবন্ধুর বাছাই কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করা হ'ল।

পরিচয়ে ভুল
১৯২৪

নিরুপদ্রব শান্ত আন্দোলনের প্রভাব ক্ষুন্ন হয়ে আসবার পর বিপ্লবী হিংসাত্মক ঘটনা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বছরের শেষদিকে আটক-আইনে ধরা পড়েছেন। কিন্তু এ-সময় যুবকদের চাঞ্চল্য বয়স্কদের ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলে না। সুতরাং কয়েকজন যুবক এক দুঃসাহসিক কাজে নেমে পড়েছিলেন। প্রচণ্ড বাধা ছিল, আর ছিল পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, এবং ক্রমেই তা গুরুতর আকার ধারণ করছিল।

একটা ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূল বিপ্লবের ধারার সঙ্গে কতটা যোগ ছিল তা নিয়ে বিতণ্ডায় লাভ নেই, তবে ঘটনাটি যে অত্যন্ত গুরুতর সে-বিষয়েও সন্দেহ নেই। হোমরা-চোমরা পুলিশ-কর্ত্তা চার্লস্ টেগার্ট গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিপ্লব-দমন-প্রচেষ্টায় একাই একশ' বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁকে কার্য্যক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলা—বিপ্লবীদের একটা বড় লক্ষ্য। ঘটনা-পরম্পরা সে-ধারণা বহুল পরিমাণে প্রমাণ করে দিচ্ছে। তাঁকে নিপাত করতে পারলে, গভর্ণমেণ্টের একটা স্তম্ভ ধ্বসে যায়—এই হচ্ছে যুবক-বিপ্লবীদের বড় যুক্তি এবং কর্ম্মে প্রেরণা।

কলিকাতা ঃ চৌরঙ্গী— এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য যিনি এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁর নাম গোপীমোহন সাহা; বাড়ী ঃ হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে। মতলব স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হ'ল তাঁর প্রথম কাজ। সম্ভবতঃ গোপীমোহন টেগার্ট-এর ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে, গোড়া হতেই ডে (Ernest Day)-কে টেগার্ট বলে স্থির করে নিয়েছিলেন। ঘটনার দিন, অর্থাৎ ১৯২৪

জানুয়ারী ১২-ই, অভ্যাসমত পার্ক ষ্ট্রীট দিয়ে এসে চৌরঙ্গী (জওহরলাল নেহরু) রোডের কোণে দাঁড়িয়ে সাহেব এক দোকানের শো-কেস (show-case)-এর মধ্যে সজ্জিত পণ্যসম্ভার দেখছিলেন। এমন সময় গোপীমোহন এসে তাঁর পিঠ লক্ষ্য করে রিভলভার ছোড়েন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে, ডে ফিরে দাঁড়ান এবং সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা গুলি তাঁর বক্ষস্থল ভেদ করলে, তিনি ফুটপাথের ওপর পড়ে যান। নিঃসন্দেহ হবার জন্য আততায়ী ভূপতিত দেহে আরও কয়েকটা গুলি করার পর, পালাতে চেষ্টা করেন। পার্ক ষ্ট্রীট ধরে চলবার সময় একটা ট্যাক্সি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। গাড়ীটা লক্ষ্য করে গোপীমোহন একটা গুলি ছোড়েন ; কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। পিছনে লোক ধাওয়া করে আসছে এবং ক্রমে তাদের সংখ্যাও বাড়ছে। বেশ খানিকটা গিয়ে একটা মোটরগাড়ী দেখে, তাতে ওঠবার সময় ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে হুকুম দেন। অসম্মত হওয়ায়, তার প্রতি একটা গুলি ছোড়া হয়। কিন্তু তার কোমরবন্ধের ধাতব অংশে বুলেট লাগায়, তার দেহে কোনও আঘাত লাগেনি। একটা ঠিকা-ঘোড়ার-গাড়ী পেয়ে, তার পা-দানিতে পা রেখেই গাড়ী হাঁকাবার জন্যে বলতে যাচ্ছেন—এমন সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী একজন এসে তাঁকে ধরে ফেলেন ; ধরা পড়ার সময় একটা বড়গোছের পিস্তল, একটা রিভলভার ও আন্দাজ চল্লিশটা তাজা কার্ত্তুজ তাঁর সঙ্গে ছিল।

বলা বাহুল্য, রাস্তায় ধরা পড়ার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গোপীমোহনের ওপর নির্য্যাতনের সীমা ছিল না। তাঁর বাম উরুতে তিনটি আঘাত, ডান হাতের কনুইয়ের কাছে বুলেট ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া, দক্ষিণ চক্ষুর পাশে বুলেট-জাত তিনটি ক্ষত এবং পৃষ্ঠের বামদিকে একটি বুলেট-প্রবেশের ক্ষতচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। যখন আদালতে হাজির করা হয়েছে তখনও সব-কয়টি ক্ষত বর্ত্তমান। মানসিক শক্তিতে গোপীমোহন এসকল আঘাত হতে যন্ত্রণার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করেননি। পরিহাসমিশ্রিত অথচ দৃঢ় উক্তি সে-পরিচয় বহন করেছে।

প্রমাণের অভাব ছিল না, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বিচার। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তাঁকে হাজির করা হয়েছিল—১৯২৪ জানুয়ারী ১৪-ই। তখন আসামী বলেন—"সরকারী উকিল বলেছেন ঃ আমাকে লালবাজারের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত এবং আমি অপর একজন লোকের সঙ্গে বৌবাজারের কোনও এক বাড়ীতে প্রবেশ করছি, তাও দেখা গেছে। এটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি সর্ব্বদাই একা ঘুরতাম। কেউ কখনও আমার সঙ্গে থাকেনি। টেগার্ট-সাহেবকে হত্যা করবো, এই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। তাঁকে আমি খুব ভালরকমই চিনি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক নিরীহ সাহেবকে হত্যা করেছি। নিহত সাহেব সম্পূর্ণরূপে টেগার্ট-এর মত দেখতে। ভাগ্যগুণে টেগার্ট বেঁচে গেছেন। আর আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার দেশের শত্রু টেগার্ট আমার হাতে মরলেন না। যদি একজনও দেশপ্রেমিক

লোক বাঙ্গলায় থাকেন, তিনি আমার অসমাপ্ত কাজ সুসম্পন্ন করবেন। আমি যে ভুল করেছি, তিনি তা করবেন না এবং বেশী দক্ষতার সঙ্গে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করবেন।”

আদালতে কি হচ্ছে, সেদিকে গোপীর ভ্রূক্ষেপ নেই—যেন অপর কার কি হচ্ছে! দেখা যাচ্ছে—মাথায় মোটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, রোগা চেহারা, বালকোচিত মুখাবয়ব, পাণ্ডুর রং, স্মিতহাস্য যেন বিচার-প্রহসনকে বিদ্রূপ করছে। যখন তিনি বলছিলেন—“সকল সময় আমি টেগার্টকেই মারতে চেয়েছি”—তখন তিনি টেগার্ট-এর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ টিপে হাসছিলেন।

মামলার তদন্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে চলছে। জানুয়ারী ১৭-ই আসামী বলছেন সরকারী উকিলকে—“সেরে নিন্-না তাড়াতাড়ি।” আবার পরদিনেরই উক্তি: “এত সাক্ষী-সাবুদের দরকার কি? মামলা অযথা লম্বা করে লাভ হচ্ছে কার?”

পুলিশ-কোর্টের পর্ব্ব শেষ হ'ল। জানুয়ারী ২১-এ আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ বা অভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন—খুন ও খুনের চেষ্টা প্রমাণিত হয়ে গেছে। নথি পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য হাকিম প্রশ্ন করলেন—“কিছু বলবার আছে?” তার উত্তরে পেলেন: “বলার কি কিছু প্রয়োজন আছে? আর তার ফলই বা কি? যাক্‌গে, যা বলবার সেসনেই বলা যাবে।” অভিযোগের গুরুত্ব শুনে বললেন—“বহুৎ আচ্ছা! আরও গোটাকয়েক ধারা যোগ করে দিলে তো ভাল হ'ত।”

মামলা গেল হাইকোর্ট সেসনে। শুনানি আরম্ভ হ'ল ফেব্রুয়ারী ১৩-ই। সে-দিনটা কেটে গেল প্রাথমিক তোড়জোড় গুছিয়ে তুলতে। আসামী যে কোর্টে আছেন সে-সাড়াশব্দ কিছুই নেই। তার পরদিন মনে হ'ল আসামী তাঁর সামনে রঙ্গমঞ্চে কি হচ্ছে তার খানিকটা বোঝবার চেষ্টা করছেন। কোর্টে যখন মামলার কাজ খানিকটা শেষ হয়ে আসছে তখন আসামী বলছেন: “আজ আমার বড় শুভ-দিন। মা আমাকে ডাকছেন—আমি যেন তাঁর বক্ষে চিরতরে আশ্রয় নিতে পারি। আমি সেইজন্য যেতে চাই। গতবৎসরের প্রথমদিকে আমি পত্রিকায় পড়ি যে, টেগার্ট নামে একজন লোক পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের তথ্য সংগ্রহ করে এখানে ফিরে আসছেন—আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য। তিনি যে-সকল বাধা সৃষ্টি করতে পারেন সে-সম্বন্ধে আমি গভীর চিন্তা করতে থাকি। যখনই এ-বিষয়ে ভেবেছি তখনই আমার মাথা গরম হয়ে উঠেছে। আমি ভাল করে খেতে পারিনি, শান্ত হয়ে দিনে-রাতে ঘুমুতে পারিনি। সারারাত্রি ছাদের ওপর পাইচারি করে বেড়িয়েছি।

“এমন সময় আমি মায়ের আহ্বান শুনতে পেলাম: 'তার পিছু নাও'। তখন থেকে আমি সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহে লেগে গেলাম। শুনলাম 'স্বদেশী যুগে' ঐ ভদ্রলোক কলিকাতা পুলিশের ডেপুটী কমিশনার ছিলেন।

"তারপর ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি গভীর চিন্তা করতে লাগলাম। মনের যখন এ-অবস্থা, তখন মা বললেন ঃ 'ওকে জগৎ থেকে দূর কর'। নিরীহ যে-সাহেবকে আমি খুন করেছি, তাঁর জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। সাহেবমাত্রেই আমার শত্রু নয়।"

মামলার মাঝেই আবার একদিন বললেন (১৫-ই)—"টেগার্ট নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারেন। কিন্তু সে-ধারণা নিতান্ত ভুল। আমি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে পারিনি। অপরে সফল হবে নিশ্চয়ই।"

মামলা প্রলম্বিত হবার কোনও কারণ ছিল না। আসামীর প্রতি উক্তিতেই অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারী ১৬-ই রায় প্রদত্ত হবার আগেই আসামী বলছেন ঃ

"আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু ভারতের প্রতি গৃহে স্বাধীনতার বীজ রোপণ করবে। যতদিন ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগ ও চাঁদপুরের মত অত্যাচার চলবে, এ অবস্থার বিরাম হবে না। শীগ্‌গির এমন দিন আসবে, যখন গভর্ণমেণ্ট এর ফল হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারবে।"

জজের রায় বেরুলো ১৯২৪ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই ঃ আসামীর প্রাণদণ্ড। গোপীমোহন নির্ব্বিকার। যেন তাঁর কানে কোনও কথাই প্রবেশ করছে না।

ফাঁসির দিন ঘনিয়ে এল। দণ্ডাদেশের পর তাঁর পাঁচ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে। আহার-নিদ্রার ব্যাঘাত কিছুই নেই।

ফাঁসির দিন—১৯২৪ মার্চ ১-লা—প্রেসিডেন্সী জেলে আসামী দৃঢ়পদে ফাঁসি-মঞ্চের ধাপ ক'টা পার হয়ে ওপরে উঠে দাঁড়ালেন। কালবিলম্ব হয়নি। দেহ ফাঁসির দড়িতে লটকে রইল।

মাতার নিকট লিখিত শেষ পত্রে মিনতি জানান ঃ তিনি যেন সর্ব্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করেন—ভারতের প্রতি মাতা যেন লেখকের মায়ের মত সন্তান প্রসব করেন এবং প্রতি সংসার যেন তাঁর মাতার মত মাতা লাভ করে ধন্য হয়।

এ-সময় গান্ধীপন্থীদের প্রতাপ কতকটা বর্ত্তমান। ১৯২৪ জুন ২-রা, সিরাজগঞ্জে বাঙ্গলার প্রাদেশিক সম্মেলনে এক প্রস্তাবে গোপীমোহনের সাহস ও ত্যাগের তারিফ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আচরিত কার্য্যের নিন্দা করা হয়। এতে যে কেবল গভর্ণমেণ্ট রুষ্ট হয়েছিল তা নয়, শান্ত নিরুপদ্রব আন্দোলনের সমর্থকরা এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন। সারা ভারতে সন্ত্রাসের নীতি সম্বন্ধে প্রকাশ্য বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে।

এ-সময় টেগার্ট-কে মারবার আরও একটা বিফল চেষ্টা হয়েছে। গুরুতর ফল কোনও পক্ষেরই হয়নি। ১৯২৪ এপ্রিল ২৩-এ, সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ

ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়ে ইংরেজ ব্রুস্ (Bruce) চলেছেন। দেখতে প্রায় টেগার্ট-এরই মত। উভয়ের গাড়ীতেও খুব মিল। বন্দুকের একটা গুলি সাহেবের গা ঘেঁষে চলে গেল; দেহ স্পর্শ করেনি। এ-সম্পর্কে পরে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু মামলা পর্য্যন্ত আর গড়ায়নি।

ঘটনা-প্রবাহ

কলিকাতা ঃ মির্জ্জাপুর— সময়টা বিপ্লবীদের দিক থেকে বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠেছে; পরস্পরে মারাত্মক রেষারেষি চলছে। প্রাণহানিকর ঘটনা এসে দেখা দিচ্ছে।

সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে কতটা যোগাযোগ ছিল, তার কোনও হিসাব পাওয়া যায়নি; উগ্রমতাবলম্বী এক ভদ্রলোক ২৫-নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে 'স্বদেশী এজেন্সী' নামে এক কাপড়-বিক্রীর দোকান খুলেছিলেন। ১৯২৪ আগষ্ট ২২-এ, রাস্তার ওপর থেকে অজ্ঞাত একজন সন্ধ্যার পর দোকানের মধ্যে একটা বোমা ছুড়ে ফেলে দেয়। দোকানের মালিক রক্ষা পেলেও, প্রভাসচন্দ্র বণিক্য নামে এক যুবক গুরুতররূপে আহত হন এবং রাত্রি ৯-টা নাগাদ মেডিক্যাল কলেজে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই খুনের ব্যাপারে পুলিশ শান্তি চক্রবর্ত্তী বলে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাস্থল থেকে একটা ট্যাক্সি করে তিনি পালাচ্ছিলেন। পুলিশ সন্দেহক্রমে পাকড়াও করে। ট্যাক্সি তল্লাসী করে একটা ছ'ঘরা রিভলভার উদ্ধার করা হয়। হাইকোর্ট সেসনে ১৯২৪ আগষ্ট তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বর ২৯-এ তিনি ভাগ্যক্রমে বেকসুর খালাস পান।

অন্তরঙ্গ-মহল জানতো—গ্রেপ্তারের আগে শান্তি এক সহকর্ম্মীর কাছে গোপনে কিছু অস্ত্র গচ্ছিত রেখেছিলেন; বারে বারে তাগিদ দিয়েও উদ্ধার করতে পারেননি। মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি আবার তাগিদ দেন। একদিন গচ্ছিত-রিভলভার-ধারী বন্ধু শান্তিকে একা দেখা করতে বলে।

বন্ধুবান্ধব ও হিতৈষী কয়েকজন মানা করেছিলেন, কিন্তু অস্ত্রগুলি খোয়া যাওয়ায় শান্তি খুব অস্বস্তি ভোগ করতে থাকেন। বন্ধুমহলেও অবিশ্বাসের গুঞ্জন কানে এসে তাঁকে মর্ম্মপীড়া দিয়েছে।

রাত্রি বেশ একটু এগিয়ে গেলে, শান্তি এক বন্ধুকে গমনের উদ্দেশ্য জানান। বন্ধু বহু নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। ১৯২৪ অক্টোবর ৩-রা, দমদম-বেলঘরিয়া রেল-লাইনের ধারে বহু-ক্ষত-সমন্বিত ছিন্নভিন্ন অবস্থায় শান্তির মৃতদেহ পাওয়া গেল। পূর্ব্বরাত্রে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

শান্তি চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকা সন্দেহে অম্বিকা খাঁ ও আর-একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৪ অক্টোবর ২১-এ, কলিকাতা পুলিশ-কোর্টে মামলা

ওঠে। প্রমাণাভাবে অম্বিকাকে ছেড়ে দিয়ে, বেঙ্গল অর্ডিনান্সে আটক রাখা হয়। বছরখানেক প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ থাকবার পর তাঁকে সদাই বিমর্ষ দেখা যেত। জেলের বাইরে তাঁর কার্য্যকলাপের সংবাদ জেলের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ায় তিনি একটু অসুবিধার মধ্যে পড়েন। যত দিন যায়, ততই তাঁকে সঙ্গীদের থেকে দূরে সরে যেতে লক্ষ্য করা গেল এবং কথাবার্ত্তাও ক্রমশঃ বন্ধ হবার উপক্রম। শেষ পর্য্যন্ত কাপড়ে আগুন লাগিয়ে, জেলের মধ্যেই ১৯২৬ এপ্রিল ৩-রা আত্মহত্যা করে সকল যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

মাণিকতলা: চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কর্ম্মী যশোদারঞ্জন পালকে সেখানের এক ডাকাতি সম্পর্কে খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি। শেষে ১৯২৪ মার্চ ৮-ই তাঁকে ও অবনীকান্ত, ওরফে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে ১০-সি, ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীটে (মাণিকতলা) পাওয়া গেল। ঘরখানা তল্লাসী করে বোমা ও বোমা-তৈরীর নানা উপকরণ আবিষ্কৃত হ'ল। মার্চ ৩১-এ আলিপুর জেলের মধ্যেই দু'জনের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হয়—বিস্ফোরক রাখা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে। দায়রায় মামলা সোপর্দ্দ হ'ল—১৯২৪ এপ্রিল ২৪-এ, আর শুনানি আরম্ভ হ'ল—মে ১৯-এ। রায়ে যশোদার দশ বছর ও অবনীর (উপেন্দ্রর) সাত বছর দ্বীপান্তর আদেশ হয়—জুন ২০-এ। হাইকোর্টের আপীলে ১৯২৫ মার্চ ৪-ঠা যশোদার দশ-বছরটা সাত-বছরে হ্রাস করা হয়।

যশোদা জেলের মধ্যে বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯২৬ এপ্রিলে তিনি প্রচুর রক্তবমন করতে থাকেন এবং দেহের ওজন অত্যন্ত হ্রাস পায়। যে-স্বাস্থ্য নিয়ে যশোদা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নন্-কমিশান্‌ড্ অফিসার (N.C.O.) হয়েছিলেন, আজ সেটা ছায়ায় পর্য্যবসিত হয়েছে। এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিতে হয়। কিন্তু সেই যে শয্যাগ্রহণ করেছিলেন, সেটাই তাঁর অন্তিমকাল পর্য্যন্ত আশ্রয় ছিল।

ফরিদপুর: প্রমোদকুমার নাগের বাড়ী—দোহার গ্রাম, ঢাকার মালিকান্দা থানায়। ১৯২৪ মার্চ ২৩-এ গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে ক্যাম্পবেল (নীলরতন সরকার) হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সে-সময় কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করা হয় যে, ফরিদপুরে মার্চ ২১-এ বাজী তৈরী করার সময় বারুদে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে এবং প্রমোদ অর্দ্ধদগ্ধ হয়। সন্দেহ হয়েছিল যে, বিবৃতি হয়তো সত্যি নয়। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে। ইতিমধ্যে প্রমোদ রোগমুক্ত হচ্ছেন।

সেরে ওঠায় সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা রুজু হয়। ডিসেম্বর ২৩-এ তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ন'বছরের জন্য দ্বীপান্তর আদেশ হয়। হাইকোর্টের আপীলে, ১৯২৫ জুন ২৪-এ, মেয়াদ হ্রাস করে ছ'বছরে পরিণত করা হয়।

নোয়াপাড়া ডাকাতি ঃ এ-সময়ের চট্টগ্রামের সফল তৃতীয় ডাকাতি ঘটেছিল—১৯২৪ সেপ্টেম্বর ৫-ই, নোয়াপাড়া গ্রামে।

ছোটখাটো লুণ্ঠনের আরও একটি সংবাদ আছে।

কোনও ক্ষেত্রেই টাকার পরিমাণ বেশী নয়, সুতরাং বড় হৈচৈ হয়নি, তবে বিপ্লবী কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধির পরিচয় দেয়।

বোলশেভিক-এজেণ্ট মামলা

বাঙ্গলার বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে কোনওরকমেই যুক্ত নয়, কিন্তু চারজনকে বোলশেভিক সন্দেহে গভর্ণমেণ্ট এই সময় যে মামলা করে, তাতে বোঝা যায়, কমিউনিষ্ট ভাবধারা দেশে এসেছে এবং গভর্ণমেণ্ট মনে করছে তাতে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন। আসামী মোট চারজন, তার মধ্যে একজন পলাতক। কানপুর দায়রায় মামলা হয়—১৯২৪ এপ্রিল ১-লা; মে ২০-এ প্রত্যেকের চার বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। নভেম্বর ১০-ই এলাহাবাদ হাইকোর্ট আসামীদের আপীল নামঞ্জুর করে।

পলাতক আসামী পরে ধরা পড়েন এবং দণ্ডিত হন।

প্রতিশোধ

চট্টগ্রাম ঃ এক সাব-ইন্সপেক্টর প্রফুল্লকুমার রায় কয়েকটি বৈপ্লবিক ঘটনার তদন্তে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। সুতরাং এ পথের কণ্টককে সরাবার জন্যে ১৯২৪ মে ২৫-এ প্রফুল্ল যখন পল্টন-মাঠের আশেপাশে শিকারের খোঁজে বেড়াচ্ছেন তখন পিছন থেকে এসে এক অজ্ঞাত যুবক গুলি মেরে পালিয়ে যান। সাংঘাতিকভাবে আহত প্রফুল্লকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় সুচিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ায়, শব চট্টগ্রামে ফিরিয়ে আনা হয়।

নতুন মহড়া

১৯২৫

সরকার এবার খুব বড়রকম হাঙ্গামা আসবার আগেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। পুলিশের অভিজ্ঞতা যে, বিচারে বা বিনা-বিচারে বাছাই লোক আটক করা ছাড়া সন্ত্রাস-দমনের সম্ভাবনা কম। কিছুদিন ধরপাকড় স্থগিত থাকলেই দলগুলির সাহস বেড়ে যায়; "পাকা লোক" দ্বারা পরিচালিত হলে, বিপ্লবীদের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের অসুবিধা হয় এবং বুদ্ধি খাটিয়ে তারা পুলিশের ভিতরের ব্যবস্থাও জেনে নিতে সক্ষম হয়। মোট কথা, পুলিশের অসুবিধা অনেক বেড়ে যায়।

অসহযোগ-আন্দোলনে বহু যুবক এসে পড়ায়, কর্ম্মী সংগ্রহ করার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হ'ল। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে বাছাই ছেলে দলে ভর্ত্তি করা

অপেক্ষাকৃত সহজ। তা'ছাড়া প্রকাশ্য আন্দোলন দমন করতে সময়-সময় যে-সকল উপায় অবলম্বন করতে হয়, সেগুলিতে সাধারণ লোকের বিশেষ আপত্তি দেখা যায় এবং যাঁরা নিজ সুখ-সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়ে, এমনকি প্রাণ-বিনিময়ে অত্যাচারী গভর্ণমেণ্টকে "শিক্ষা" দিতে যান, তাঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীর সমর্থনের ক্ষেত্র প্রসারলাভ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব ও পরের বিপ্লবী-সংঘটন সম্বন্ধে আলোচনা করলে, প্রতীয়মান হয় যে, ভারত-রক্ষা আইন প্রয়োগে ব্যাপক ধরপাকড় বিপ্লবী কার্য্যকলাপ প্রায় বন্ধ করে এনেছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে "দম" নিতে যে সময় গেছে, গভর্ণমেণ্ট তাতে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল। কিন্তু ১৯২৪ সাল নাগাদ দু'বছরে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। সরকারী রিপোর্ট বলে—"the situation became serious". সেই কথা ভেবে, ১৯২৪ সালে একসঙ্গে বহু সন্দেহভাজন যুবককে আটক করা হয়। ঠিক এক বছর পরে গ্রেপ্তারী অভিযানের ব্যাপক পুনরাবৃত্তি ঘটে।

বাঙ্গলার বাইরেও বিপ্লবী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে আরম্ভ করে, বিশেষ করে অসহযোগ-আন্দোলনের বিফলতার ওপর। উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা। নিরুপদ্রব আন্দোলনকে গভর্ণমেণ্ট সহজে বন্ধ করে দিতে পারে, নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ নেই ; পুলিশ-কর্ত্তাদের প্রাণের আশঙ্কাও নেই বললেই চলে। বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে গেলে, হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ স্বতঃই এসে পড়ে। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। উত্তর-ভারত, বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশে একটা সংগঠন ধীরে ধীরে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

কাকোরী ষড়যন্ত্র

বিপ্লবী উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সংগঠন ও কার্য্যকলাপের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বাঙ্গালী ও প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশের যুবকরা মিলে দলটি গঠন করেছিলেন। শিক্ষা, সাহস, নিষ্ঠা ও স্থির লক্ষ্য আছে, নেই উদ্দেশ্য-পালনের অর্থসঙ্গতি। তখন অর্থাগমের জন্য ডাকাতির পথ অবলম্বন করা একমাত্র উপায় বলে পরিগণিত হ'ল।

এসেছিলেন অনেকে, তন্মধ্যে রামপ্রসাদ বিশ্‌মিল ও রৌশন সিংকে সংগঠনের জন্য প্রধান স্থান দিতে হয়। রামপ্রসাদের বাড়ীতে ষড়যন্ত্রকারীরা বসে শলাপরামর্শ করেন—১৯২৪ সালের প্রথমদিকটায়। তার আগে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা ডাকাতি হয়ে গেছে। পরের ঘটনার জন্য সকলে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ১৯২৫ আগষ্ট ৯-ই, লক্ষ্ণৌ জংশন থেকে চৌদ্দ মাইল তফাতে, রাত্রি সাড়ে আটটায় কাকোরী থেকে ট্রেন ছাড়বার সময় চারজন লোক গার্ডের গাড়ীতে উঠে পড়েন এবং বলেন যে, কাকোরীতে তাঁদের মালপত্র পড়ে আছে, তাঁরা আনতে যাবেন, সেইজন্যে গাড়ী

ওখানেই থামাতে হবে। গার্ড অসম্মত হয়ে ট্রেন চালিয়ে যান। কাকোরী আর আলমনগরের মাঝামাঝি দু'জন নবাগত যাত্রী গার্ডকে রিভলভার দেখিয়ে বিহ্বল করেন এবং শিকল টেনে ট্রেন থামিয়ে ফেলেন। তখন আরও জন-পাঁচেক লোক গার্ডের গাড়ীতে এসে ওঠেন, দু'জন যান ড্রাইভারের কাছে এবং উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হুকুম দেন। তখন তিন-চারজন টাকা-ভর্ত্তি একটি লোহার সিন্দুক নামিয়ে নিয়ে যান। কয়েকজন যাত্রী ব্যাপার জানবার জন্যে. ট্রেন থেকে নেমে আক্রমণকারীদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। এক গুর্খা তাঁর বন্দুক ওঁচাতে, লুণ্ঠনকারীদের একজনের গুলির আঘাতে নিহত হলেন। যখন এই তাণ্ডব চলেছে তখন দেরাদুন এক্সপ্রেস এসে পড়ায়, লুণ্ঠনকারীরা স্থানত্যাগ করে সরে পড়েন। সিন্দুকটা রেল-লাইন থেকে বেশীদূর নিয়ে যাওয়া হয়নি। সেখানে সেটাকে ভেঙ্গে, সমস্ত টাকা সরিয়ে নিয়ে, খালি সিন্দুকটা ফেলে রাখা হয়েছিল।

ডাকাত ধরবার জন্য পুলিশ ১৯২৫ সেপ্টেম্বর ২৫-এ পর্য্যন্ত সন্দেহের বশে প্রচুর ধরপাকড় করেছিল। প্রায় পাঁচশ জনকে গ্রেপ্তার করে ১৯২৬ জানুয়ারী ৪-ঠা স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে ; তার মধ্যে তেইশ জনকে এপ্রিল ১৬-ই দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়। তখন আরও তিনজন আসামী পলাতক ছিলেন। মে ১-লা থেকে লক্ষ্ণৌতে নিয়মিত মামলা চলতে থাকে। আসামীদের মধে৷ অনশন নিয়ে শুনানি মাঝে মাঝে বন্ধ গেছে, সুতরাং রায় প্রকাশিত হয় অনেক বিলম্বে, অর্থাৎ ১৯২৭ এপ্রিল ৬-ই। এতে তিনজনের ফাঁসি, একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, একজনের চৌদ্দ বছর, পাঁচজনের দশ বছর, দু'জনের সাত বছর, আর ছ'জনের পাঁচ বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মাত্র দু'জন মুক্তি পান। রাজসাক্ষী দু'জনের তো কথাই নেই।

পরে ১৯২৭ জুন ২৪-এ তিনজন বাদে, চৌদ্দজন হাইকোর্টে আপীল করেন। অপরপক্ষে গভর্ণমেণ্ট ছ'জনের দণ্ডবৃদ্ধির আপীল করেছিল জুলাই ২-রা। জুলাই ১৮-ই শুনানি আরম্ভ হয় এবং ১৯২৭ আগষ্ট ২২-এ রায় প্রদত্ত হয়। তাতে সকল অভিযুক্তের সাজা সমর্থিত হয়। গভর্ণমেণ্ট-আপীল মেনে নিয়ে, কারও কারও সাজার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। আসামীদের আপীলে বিশেষ ক্ষেত্রে দণ্ড কিঞ্চিৎ হ্রাস করা হয়েছে।

পলাতক আসামী দু'জন হচ্ছেন আস্‌ফাকুল্লা ও শচীন বক্সী। শচীন ছিলেন ভাগলপুরে, বিনয়কুমার ঘোষ ছদ্মনামে। সেখানে ১৯২৬ জানুয়ারীতে গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯২৪ ডিসেম্বর ২৫-এ অনুষ্ঠিত 'বামরাউলি ডাকাতি'তে সংশ্লিষ্ট বলে অভিযোগ করা হয় ; আর, মামলা মার্চ ৯-ই দায়রায় যায়। আস্‌ফাকুল্লা ১৯২৬ সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে গ্রেপ্তার হন। ডিসেম্বর ১৪-ই তাঁর মামলা দায়রায় প্রেরিত

হয়। অভিযোগ একই, অতএব মামলা একসঙ্গে চলে। ১৯২৭ জুলাই ১৩-ই আস্‌ফাকুল্লার মৃত্যু আর শচীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হয়।

তৃতীয় পলাতক আসামীকে জীবন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩১ ফেব্রুয়ারী ২৭-এ, পলাতক চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে এলাহাবাদের এ্যালফ্রেড পার্কে নিহত হন।

ছকে ফেললে, মামলার ফল নিম্নরূপ দাঁড়ায়। সব বিষয়টি স্পষ্ট করবার জন্যে কয়েকটি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়েছে ; যথা—

(১) সঃ কাঃ—সশ্রম কারাদণ্ড, (২) যাঃ দ্বীঃ—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, (৩) গঃ আঃ—গভর্ণমেণ্ট আপীল, (৪) আঃ নাঃ—আপীল হয়নি।

	দায়রা (রায়)		হাইকোর্ট (রায়)
	৬.৪.১৯২৭		২৫.৮.১৯২৭
রামপ্রসাদ বিস্‌মিল (সাহজানপুর)	মৃত্যু	আপীল	বহাল
রৌশন সিং (সাহজানপুর)	মৃত্যু	আঃ	বহাল
রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (বারাণসী)	মৃত্যু	আঃ	বহাল
মন্মথনাথ গুপ্ত (বারাণসী)	১৪ বঃ সঃ	আঃ ; গঃ আঃ	বহাল
রাজকুমার সিংহ (কানপুর)	১০ বঃ সঃ	আঃ ; গঃ আঃ	বহাল
গোবিন্দচরণ কর (ঢাকা)	১০ বঃ সঃ	আঃ	যাঃ দ্বীঃ
রামকিষণ ক্ষত্রী (চন্দা, মধ্যপ্রদেশ)	১০ বঃ সঃ	আঃ	বহাল
যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা)	১০ বঃ সঃ	আঃ ; গঃ অঃ	যাঃ দ্বীঃ
শচীন্দ্রনাথ সান্যাল (বারাণসী)	যাঃ দ্বীঃ	আঃ নাঃ	বহাল
বিষ্ণুচরণ দুর্বালিস্ (মীরাট)	৭ বঃ সঃ	আঃ ; গঃ আঃ	১০ বঃ সঃ
সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কানপুর)	৭ বঃ সঃ	আঃ ; গঃ আঃ	১০ বঃ সঃ
মুকুন্দিলাল (এটাওয়া)	১০ বঃ সঃ	আঃ ; গঃ আঃ	যাঃ দ্বীঃ
প্রেমকিষণ খান্না (সাহজানপুর)	৫ বঃ সঃ	আঃ	বহাল
রামদুলারি তেওয়ারী (কানপুর)	৫ বঃ সঃ	আঃ	বহাল
প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায় (জব্বলপুর)	৫ বঃ সঃ	আঃ	৪ বঃ সঃ
ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (এলাহাবাদ)	৫ বঃ সঃ	আঃ নাঃ	বহাল
বনোয়ারী লাল (রায়বেরিলী)	৫ বঃ সঃ	আঃ নাঃ	৪ বঃ সঃ
রামনাথ পাণ্ডে	৫ বঃ সঃ	আঃ	৩ বঃ সঃ

১৯২৭ জুলাই ১৩-ই

শচীন্দ্রনাথ বক্সী (বারাণসী)	যাঃ দ্বীঃ	আঃ নাঃ	বহাল
আস্‌ফাকুল্লা (সাহারানপুর)	মৃত্যু	আঃ	বহাল

১৯২৭ ডিসেম্বর ১৭-ই গোণ্ডা জেলে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর, ১৯-এ ফয়জাবাদ জেলে আস্‌ফাকুল্লা ও গোণ্ডা জেলে রামপ্রসাদ বিস্‌মিলের, এবং ২১-এ নাইনী জেলে রোশন সিংহের ফাঁসি হয়।

দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজার

দক্ষিণেশ্বর

অসহযোগ-আন্দোলন শেষ পর্য্যায়ে উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে বারুদ, বোমা ও গোলাগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল, সে-কথা বলা হয়েছে ; আসন্ন হিংসাত্মক ঘটনার জন্য বড় একদল যুবক আগ্নেয়াস্ত্র-সংগ্রহ ও বিস্ফোরক প্রস্তুত করতে লেগে যান। তাঁরা কেবল কলিকাতায় বোমা-প্রস্তুত-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন না, উত্তর-ভারতের নানা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বোমা ও বোমা-তৈরীর উপকরণ সংগ্রহ করে নয়, বোমা-তৈরীর জ্ঞানও রপ্তানি করেছিলেন। এমন-কি, উত্তরপ্রদেশের এক দায়িত্বসম্পন্ন কর্ম্মী এর মধ্যে ছিলেন এবং এতৎসংক্রান্ত যে-মামলা হয়, তাতেও জড়িয়ে পড়েন।

দুটি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল এঁদের দ্বারা। একটি—কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর বাচস্পতিপাড়ায় জীর্ণ এক দোতলা বাড়ীতে, আর দ্বিতীয়টি—কলিকাতার বুকের ওপর ৪-নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। গুপ্তচর ঘুরছে চারপাশে এবং সন্দেহভাজন যুবকদের গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছে পুলিশ। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার তদ্বির করবার সময়, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র থেকে পুলিশ বুঝতে পারে—কলিকাতায় কোনও কেন্দ্রের সঙ্গে আসামীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। সেইসূত্রে কলিকাতায় গুপ্তচরদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

কতকগুলি যুবককে সন্দেহ করতে পুলিশের খুব বেশী সময় লাগেনি। নিয়মিত চৌকি দেওয়ার ব্যাপারে ঘোরাফেরা করতে—দক্ষিণেশ্বর-ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া যায়। সন্দেহ যখন বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, তখন ১৯২৫ নভেম্বর ১০-ই বাচস্পতিপাড়ার বাড়ীতে পুলিশ অতি প্রত্যুষে সদলবলে গিয়ে হাজির হয় এবং এক-দঙ্গল ছেলে গ্রেপ্তার করে ফেলে। তল্লাসীর সময় বহু বোমা-তৈরীর উপকরণ, বন্দুক, রিভলভার, কয়েক বোতল সালফিউরিক ও নাইট্রিক এ্যাসিড, বন্দুক ও রিভলভারের গুলি (ছর্‌রা), কাঁচের নল, ব্যাটারি প্রভৃতি আবিষ্কার করে। পুলিশ-মহল থেকে এটিকে বোমা-বিস্ফোরক-তৈরীর কারখানা বলা হয়েছে। প্রত্যুত, পূর্বে বর্ণিত রাজাবাজার কারখানার সমতুল্য বললেও চলে।

এখান থেকেই সন্ধান মিলে গেল,—শোভাবাজার কেন্দ্রে হানা দেওয়া হয়। যখন দক্ষিণেশ্বরে তল্লাসী চলছে তখন পাশের বাড়ীতে এক বিপ্লবী শুয়ে ছিলেন। তিনি গিয়ে শোভাবাজার কেন্দ্রে সংবাদ পৌঁছে দিলে, চট্টগ্রামের সূর্য্য সেন সময়মত

পালাতে সক্ষম হন। কিন্তু মালপত্র সরানো বা অন্য কিছু করার সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়নি। বিকাল ৪-টার সময় পুলিশ এসে পৌঁছে যায়। সেখানে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে ; ঘর তল্লাসী করার ফলে—রিভলভার, দু'মাপের কার্ত্তুজ ও বিপ্লব-সংক্রান্ত বহু কাগজপত্র হস্তগত হয়। এই কাগজের মধ্যে বোমা-তৈরীর ফর্ম্মুলা এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নানা স্তর ও কার্য্যক্ষেত্রে বিধি-বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

আসামী সব ধরা পড়েছে ; বাকী কাজ—মামলা করে এদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। বেশী দেরী না করে দুটো স্বতন্ত্র মামলা আরম্ভ করে দেওয়া হ'ল। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম, অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন ভঙ্গ এবং ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সব মিলিয়ে মামলা। দক্ষিণেশ্বর-আসামীদের মামলা স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের কাছে আরম্ভ হয়—১৯২৫ নভেম্বর ২৮-এ ; ১৯২৬ জানুয়ারী ৯-ই রায় প্রকাশিত হয়।

(১) হরিনারায়ণ চন্দ্র, (২) অনন্তহরি মিত্র ও (৩) রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী—প্রত্যেকের দশ বছর দ্বীপান্তর ; (৪) বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) নিখিলবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬) ধ্রুবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও (৭) রাখালচন্দ্র দে—প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ; (৮) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও (৯) শিবরাম চট্টোপাধ্যায়—প্রত্যেকের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

আসামীরা হাইকোর্টে আপীল করেন—১৯২৬ ফেব্রুয়ারী ২০-এ। শুনানি আরম্ভ হয় ডিসেম্বর ৮-ই এবং রায় প্রদত্ত হয় ১৯২৭ জানুয়ারী ৫-ই। তাতে সকল আসামীর দণ্ড বহাল থাকে ; কেবল রাজেন্দ্র লাহিড়ীর দণ্ড দশ থেকে পাঁচ বছরে পরিণত হয়। রাজেন্দ্র লাহিড়ী কাকোরী মামলার পলাতক আসামী। যথাস্থানে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

শোভাবাজার

শোভাবাজারে অস্ত্র-আবিষ্কার সম্পর্কে ধৃত আসামীদের স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে বিচার আরম্ভ হয়—১৯২৬ জানুয়ারী ২-রা। বিচারে বিলম্ব হবার কথা নয়। রায় প্রদত্ত হ'ল—জানুয়ারী ১৫-ই। প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্তকুমার চক্রবর্ত্তী প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এপ্রিল ১৬-ই হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হয়েছিল। তার শুনানি আরম্ভ হয়—আগষ্ট ১৩-ই এবং রায় প্রদত্ত হয়—১৯২৭ জানুয়ারী ৫-ই। তাতে দুই আসামীর পূর্ব্বদণ্ড সমর্থিত হয়েছিল।

"ঘুঘু দেখেছ……"

এ অধ্যায়ের এখানে পরিসমাপ্তি হয়নি ; শ্রাদ্ধ গড়িয়েছিল অনেক দূর পর্য্যন্ত। সাজার পর, দুই মামলার আসামীদের আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রেখে দেওয়া হয়

বম্ব্-ইয়ার্ডে (Bomb Yard)। আটক অবস্থাতেই তাঁদের দু'-তিনজন লক্ষ্য করলেন—সি.আই.ডি.-আই.বি.-র স্পেশ্যাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতি সন্ধ্যায় অন্য ওয়ার্ডে আবদ্ধ ডেটিনিউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ক্রমে প্রচার হয়ে গেল যে, তিনি নানাপ্রকার প্রলোভন, ছলছুতা, আশ্বাসবাণী দিয়ে রাজবন্দীদের মন ভাঙ্গিয়ে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। ১৯২৬ মে ২৮-এ, ভূপেন যথারীতি ৫-৩০ মিঃ নাগাদ জেলের মধ্যে নিজ কাজ উদ্ধার করবার জন্যে এসেছিলেন। যাওয়া-আসার পথটা দক্ষিণেশ্বর-কয়েদীদের কারাগৃহের সামনে দিয়ে পড়েছে।

ভূপেনের প্রত্যাবর্ত্তন তাঁরা ওপরের দোতলার বারান্দা থেকে লক্ষ্য করলেন। যখন তাঁদের ইয়ার্ডের ঠিক সামনে আসার সময় হয়েছে এবং তাঁদের ইয়ার্ডের দরজা সবে বন্ধ হতে যাচ্ছে, সেই সময় একজন ছুটে এসে চাবিধারী ওয়ার্ডারকে বললেন—দরজাটা সামান্য খুলে দিতে, কারণ ওপর থেকে যে কাপড়খানা পড়ে গেছে, সেখানা কুড়িয়ে আনতে হবে। যখন দরজা সবেমাত্র খোলা হয়েছে, ভূপেন তখন সেটা মাত্র পার হয়ে, পা-দুই-তিন এগিয়েছেন—যুবকটি উচ্চকণ্ঠে বললেন—"মশাই! শুনছেন?" —শব্দটা শুনে ভূপেন মুখ ফিরে দাঁড়াতে, যুবক জামার গলার কলার ধরে ভূপেনের নাকের ওপর বিরাশী-সিক্কা ওজনের এক ঘুষি লাগিয়ে দিলেন; ভূপেন চোখে অন্ধকার দেখলেন। ওয়ার্ডার বিপদ-সঙ্কেত-বাঁশী না বাজিয়ে, ভূপেনের সাহায্যে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আর-এক আসামী খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, একটা লোহার ডাণ্ডা—সাধারণ মাপের সাবলের আধখানা (আন্দাজ বিশ ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি ব্যাস) নিয়ে, ভয় দেখাতে সে পালিয়ে যায়, আর সেই ডাণ্ডা দিয়ে ভূপেনের মাথার বাঁ-দিকে সজোরে প্রথমে এক-ঘা কষিয়ে আরও ঘা-দুই দিয়ে নিরস্ত হন। ভূপেনের মাথার বাঁ-দিকটা ও চোয়ালের হাড় চূর্ণ হয়ে যায়, বাঁ-দিকের সম্পূর্ণ চোখটা কোটর থেকে বেরিয়ে পড়ে মৃত্যু ঘটে সঙ্গে-সঙ্গেই। পাগলা-ঘণ্টি বেজে উঠলো। আততায়ীরা তখন শান্তশিষ্ট বালকের মত যে-যার সেল বা কক্ষে প্রবেশ করে লক্ষ্মীছেলের মত গল্প জুড়ে দিয়েছেন; দেখলে, কেউ মনে করতে পারবেনা যে, মাইল-টাক্-এর মধ্যে কোনও বড় ঘটনা কিছু হয়েছে।

চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। দারুণ শব্দে পাগলা-ঘণ্টি গুরুতর বিপদের বার্ত্তা ছড়াচ্ছে। লাঠি ও বন্দুক নিয়ে হুড়মুড় করে সশস্ত্র পুলিশ বম্ব্-ইয়ার্ডের দিকে ছুটে চলেছে। উদ্দেশ্যটা যে কি, সেটা বুঝতে কারও বাকী নেই। কারারক্ষক (Jailor) তো ছিলেনই, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টও এসে গেলেন। পুলিশ যখন আততায়ীদের হাড় ভাঙ্গবার জন্যে ছুটে চলেছে তখন জেল-রক্ষক বাধা দিলেন। কয়েদীরা তাঁর এক্তিয়ারে রয়েছেন, কাজেই আইনমত ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করবেন; মারপিট চলবে না—কারণ কয়েদীদের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় মঙ্গলামঙ্গলের জন্য সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বা জেল-রক্ষক দায়ী। কল্পনাতীত তাণ্ডবের হাত থেকে কয়েদীরা রক্ষা পেয়ে গেলেন।

আসামী তো কেউ পালায়নি। ওয়ার্ডারের হাত থেকে বেটন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তাই দিয়ে ভূপেনকে মারা হয়েছে ; রক্ত-মাখা অবস্থায় সেটা পাওয়া গেল। কিন্তু আঘাতের গুরুত্ব থেকে বোঝা যাচ্ছে, ওটা কাঠের লাঠির কাজ নয়। চোয়ালের হাড় ও মাথার খুলি ভেঙ্গেছে, কিন্তু মাথার খুলির অন্যস্থানে লোহার শিক ফোটার একটা চিহ্ন রয়েছে। সেই অদৃশ্য প্রহরণের জন্যে মহা খোঁজাখুঁজি পড়ে গেল। কোথাও পাওয়া আর যায় না। কয়েদীদের মাটীতে কুস্তি লড়বার জায়গাটা দু'বার বিফল খোঁড়া হয়েছে। তৃতীয়বারে দেখা গেল—একেবারে কিনার ঘেঁষে খুব ভিতরে বাঁ-দিকে পোঁতা রয়েছে একটা 'ক্রো-বার' (crow-bar)। মূলতঃ সেটা তাঁবু-খাটানোর একটা খোঁটা (peg)। লোহার হাতুড়ি দিয়ে মাটীতে পোঁতবার সময় ঘা খেয়ে-খেয়ে মাথাটা ছেত্‌রে (ছত্রাকার হয়ে) গেছে, আর ছড়ানো পেরেকের মত ডাণ্ডা থেকে বেরিয়ে সেগুলি তাতেই সংলগ্ন হয়ে রয়েছে। তারই গোটা-দুই মাথার খুলিতে গর্ত করে দিয়েছে। ক্ষিপ্রকারিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সকলকে অবাক্‌ করে দিয়েছিল। কোন্‌ ফাঁকে গিয়ে ডাণ্ডাটা যে কুস্তির চৌকায় পোঁতা হয়েছিল, তা আসামীদের একজনই জানেন।

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে মামলা আরম্ভ হ'লঃ দণ্ডবিধি আইনের হত্যা, ষড়যন্ত্র ও আরও কয়েকটা অভিযোগ। ঘটনাটা হয়—মে ২৮-এ ; বিচার আরম্ভ হ'ল—জুন ১৫-ই, আর রায় প্রদত্ত হয়—১৯২৬ জুন ২১-এ। আসামীদের হাল দাঁড়ালোঃ

ফাঁসিঃ (১) প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী, (২) বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও (৩) অনন্তহরি মিত্র ;

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরঃ (৪) হরিনারায়ণ চন্দ্র, (৫) নিখিলবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬) সুধাংশুশেখর চৌধুরী, (৭) ধ্রুবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (৮) অনন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, (৯) রাখালচন্দ্র দে, (১০) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

হাইকোর্টে আপীল হ'ল—১৯২৬ জুলাই ২৬-এ। রায় প্রদত্ত হয়—আগষ্ট ৯-ই। প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্রর মৃত্যুদণ্ড বহাল রইল। প্রমোদকে নিয়ে হাইকোর্ট একমত হতে না পারায়, তৃতীয় জজের কাছে যায়। তৃতীয় জজ মৃত্যু-দণ্ডই বজায় রাখলেন—আগষ্ট ২৩-এ।

ধ্রুবেশ, অনন্ত ও রাখাল এই তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বহাল রইল ; বাকী চারজন মুক্তি পান।

প্রমোদ ও অনন্তহরির ফাঁসি হয় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে—১৯২৬ সেপ্টেম্বর ২৮-এ। জেলের মধ্যে শত্রু-নিপাত-যজ্ঞে এঁরা দু'জন কানাইলাল ও সত্যেনের স্বনামধন্য অনুচর।

ঘটনা-প্রবাহ

জাল-নোট ঃ কেবল ডাকাতি করেও টাকার সঙ্কুলান হচ্ছে না ; তা ছাড়া, সে-কাজে বিপদের সম্ভাবনা বিস্তর। অর্থাগমের অপর একটি উপায় হিসাবে জাল-নোট-তৈরীর চেষ্টা হয়েছিল একাধিকবার। দু'জনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ১৯২৫ মার্চ ২০-এ, প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত ও সঙ্গী শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জাল নোট ভাঙ্গিয়ে, প্রাপ্ত টাকা বিপ্লবের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় বলে পুলিশ প্রমাণ করে। নোট-জাল-করা তো এমনিতেই অপরাধ। জুলাই ২৮-এ, উভয় আসামীর পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯২৬

১৯২৬-১৯২৭ সালে যে-কয়টি ঘটনা লক্ষ্য করা যায়, তাতেও সেরকম গুরুতর পরিস্থিতি বলে ধরা যায় না।

ঘটনা-প্রবাহ

হাওড়া ঃ ডোমজুড় গ্রামের শ্যামাপদ রায়ের বাড়ী, ১৯২৬ জুলাই ১৬-ই, পুলিশ কর্ত্তৃক তল্লাসী হয়। বোমা, বোমা-তৈরীর উপকরণ ও পদ্ধতি-সম্বলিত নির্দ্দেশ, একটা '৪৫০ নলের ওয়েবলী বিভলভার, কার্ত্তুজ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

সরাসরি বিচারের জন্য স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হ'ল। ১৯২৬ আগষ্ট ১২-ই, বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গে শ্যামাপদর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

কলিকাতা ঃ সুকিয়া ষ্ট্রীট— খুনখারাপি প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। ডোমজুড়ের ঘটনার মত পুলিশ তল্লাসী চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯২৭ জানুয়ারী ৬-ই, সুকিয়া (কৈলাস বসু) ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে তল্লাসী করে পুলিশ তাজা কার্ত্তুজ, রিভলভার ও বোমার খোল আবিষ্কার করে। সেইসূত্রে রবীন্দ্রমোহন কর গুপ্ত ও কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (ওরফে কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস দে, হারাণ, কিনু) দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ও অস্ত্র আইনের ধারা-মতে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে ১৯২৭ জানুয়ারী ১৭-ই মামলা আরম্ভ হয়। ১৯-এ প্রদত্ত রায়ে প্রত্যেকের সাত বছর দ্বীপান্তর আদেশ হয়।

১৯২৭ এপ্রিল ২০-এ হাইকোর্ট তাঁদের আপীল অগ্রাহ্য করে।

হাওড়া ঃ সালকিয়া— মালীপাঁচঘরা থানা ; ১২১-নং বাবুডাঙ্গা রোডের বাড়ী। সন্ধান পেয়ে, পুলিশ ১৯২৭ আগষ্ট ২৭-এ সেখানে উপস্থিত হয় এবং জোর তল্লাসী চালায়। বোমার খোল, রিভলভারের কার্ত্তুজ, বিস্ফোরক-তৈরীর টাইপ-করা ফর্ম্মুলা, বোমা-প্রস্তুতের উপযোগী তূলা (gun cotton) প্রভৃতি পাওয়া গেল গৌরচন্দ্র দাসের বাড়ী থেকে। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে সতীশচন্দ্র সরকারকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

সেপ্টেম্বর ১৫-ই স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে বিচার আরম্ভ হয়। সেপ্টেম্বর ১৯-এ প্রদত্ত রায়ে দুই আসামীর প্রতি বিস্ফোরক-আইনে সাত, অস্ত্র-আইনে তিন ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে সাত বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯২৮ এপ্রিল ২৩-এ প্রদত্ত রায়ে হাইকোর্ট সব দণ্ড বহাল রাখে।

হুগলী ঃ গোঘাট— ১৯২৭ মে ৫-ই একটা বাড়ীতে বলপূর্ব্বক টাকা-লুঠের চেষ্টা হয়। এ-সম্পর্কে দিবাকর পাত্র ও মেদিনীপুরের স্বদেশরঞ্জন দাসকে গ্রেপ্তার করে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে আসামী খাড়া করা হয়। লুণ্ঠন ও ষড়যন্ত্র অপরাধে স্বদেশরঞ্জনের পাঁচ ও পাঁচ বছর, আর দিবাকর অপরাধ কবুল করায় তিন ও দুই বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ লাভ করেন।

ঢাকা ঃ শ্বেতখামার ষ্টেশনের বুকিং-ক্লার্ক ১৯২৭ মে ২৫-এ একটা ঝুড়ির মধ্যে কয়েকটা বোমা দেখতে পান। এ-সম্পর্কে পুলিশ বীরেন্দ্র নন্দী, অতুলচন্দ্র নন্দী ও আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। এ ছাড়া, আরও তিন-চারজনকে ধরা হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চারজনকে আসামী করে ১৯২৭ সেপ্টেম্বর ৩০-এ শুনানি আরম্ভ হয়। রায় প্রদত্ত হয়—১৯২৮ মার্চ ৯-ই। বীরেন আর অতুল প্রত্যেকের তিন ও আর দু'জন প্রত্যেকের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

হুগলী ঃ আরামবাগ— এখানে ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি এক ডাকাতি হয়েছিল ; বিবরণ পাওয়া যায়নি। আসামী হলেন স্বদেশভূষণ দাস ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯২৭ সেপ্টেম্বর ২৮-এ স্বদেশের পাঁচ ও যতীন্দ্রের ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। সচ্চরিত্রতার মুচলেকা দেওয়ায়, স্বদেশকে ১৯৩০ ফেব্রুয়ারী ১৮-ই সর্ত্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হয়।

দেওঘর ষড়যন্ত্র

১৯২৭-১৯২৮ সাল বাঙ্গলার বিপ্লবীরা অন্য প্রদেশের যুবকদের নিয়ে যে দল পাকিয়েছিলেন, 'দেওঘর ষড়যন্ত্র' তার এক প্রমাণ।

কাজে কিছু প্রকাশ পাবার আগেই পুলিশের কাছে ষড়যন্ত্রের খবর এসে পৌঁছায় এবং পুলিশ অতিরিক্ত মাত্রায় সতর্ক হয়ে ওঠে। বাঙ্গলা, বিহার ও উত্তর-প্রদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং এই বিস্তৃত অঞ্চলের সন্দেহভাজন লোকদের ওপর পুলিশের খরদৃষ্টি পড়ে ১৯২৭ সালের গোড়া থেকেই।

দেওঘর সহরের একটা বাড়ীতে ১৯২৭ অক্টোবর ২০-এ পুলিশ হাজির হয় এবং কিছু অস্ত্র, বোমা-তৈরীর মালমশলা ও সরঞ্জাম আবিষ্কার করে ; সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় আরম্ভ হয় এবং সংখ্যা প্রায় চল্লিশে দাঁড়ায়।

প্রথমে তিনজনের বিরুদ্ধে ১৯২৭ নভেম্বর ১৪-ই মামলা আরম্ভ হ'ল। পরে

এঁদেরই আবার মূল দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করা হয়। সে-মামলায় মোট একুশ জনকে, ১৯২৮ জানুয়ারী ৩-রা, দুমকা দায়রা-জজের এজলাসে হাজির করা হয়। খুন, ডাকাতি ও অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের অভিযোগ। এপ্রিল ১০-ই প্রথম দুই অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। ১৯২৮ জুলাই ১-লা রায় প্রদত্ত হলে, দেখা গেল, রাজসাক্ষী (approver) দু'জন-সহ দশজন মুক্তিলাভ করেছে। দণ্ডিতরা হচ্ছেন:

(১) শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (২) উপেন্দ্রচন্দ্র ধর—প্রত্যেকের সাত বছর;

(৩) সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, (৪) বীরেন্দ্র (ধীরেন্দ্র)-নাথ ভট্টাচার্য্য—প্রত্যেকের পাঁচ ও তিন বছর সমকালীন ভোগ;

(৫) সুখেন্দুবিকাশ দত্ত, (৬) বিজনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (৭) প্রসাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (৮) সুশীলকুমার সেন—প্রত্যেকের পাঁচ বছর;

(৯) অতুলকৃষ্ণ দত্ত, (১০) লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, (১১) বিশ্বমোহন সান্যাল—প্রত্যেকের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

১৯২৯ জানুয়ারী ২৫-এ, হাইকোর্ট এঁদের সবার দণ্ডই বহাল রাখে। কেবল একজন মুক্তি পান।

'দ্বিতীয় দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা' কাছাড় হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল; ফলাফল জানা যায়নি।

মরণ-যজ্ঞ

শিবশঙ্কর ব্রহ্মচারী: ফরিদপুর বোমার মামলার মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী, পাবনার শিবশঙ্কর ব্রহ্মচারী বেঙ্গল অর্ডিনান্সে ১৯২৪ সালে গ্রেপ্তার হন। কিছুকালের জন্য তাঁকে বর্ম্মার জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বাঙ্গলার জেলে ফিরে আসার পর, জেলের মধ্যে বসন্তরোগে ১৯২৭ আগষ্ট মাসে তাঁর লোকান্তর ঘটে।

সন্ধিক্ষণ (১৯২৭—১৯২৯)

পাইকারী হিসাবে ধরপাকড়ের পর, জেলের বাইরে অবস্থিত অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কর্ম্মীদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার বিশেষ চেষ্টা হয় ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর কিছু গড়ে উঠতে পারেনি।

নিজেদের দলের কাজ কতকটা ব্যাহত হওয়ায়, বিপ্লবী-দল কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সুভাষচন্দ্র বসুকে যথাক্রমে অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টি সমর্থন জানাতে থাকে। একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, যতীন্দ্রমোহন অনুশীলন বিপ্লবী-সংস্থার সঙ্গে কখনই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন না। গোপনীয় ব্যাপারে তাঁর কোনও স্থানই ছিল না, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তিনি অনুশীলন দলের নেতা বলে পরিচিত। সুভাষচন্দ্র যুগান্তর পার্টির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন, ভিতরের অনেক খবরাখবর তাঁর গোচরে আসতো, কিন্তু দলের নেতৃত্ব তিনি কখনও লাভ করেননি, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর অন্তরঙ্গ কয়েকজন সহকর্ম্মী নিয়ে কাজকর্ম্ম চালিয়ে যেতেন। প্রকাশ্য কংগ্রেসে দু'পক্ষের বিরোধে যতীন্দ্রমোহন প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই যে মতামত পোষণ করতেন, বা যে-পথে নিজে চলতে চাইতেন, 'অনুশীলন' সে-কাজে তাঁকে সমর্থন জানাতো। গুরুতর বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে যুগান্তর পার্টির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে অগ্রসর হতে হয়েছে অধিকাংশ সময়।

কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯২৮ সাল) সামরিক কায়দায় যে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত হয়, সেটা সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা-মত সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেটা শক্তিশালী হয়েছিল যুগান্তর ও সহায়ক পার্টির সর্ব্বস্তরের নেতা ও কর্ম্মিবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতায়।

এখন থেকে সামরিক-পোশাক-পরিচ্ছদাবৃত 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর্' (Bengal Volunteer Corps) বিপ্লবী-সংস্থার মধ্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। পুলিশের মতে, ঢাকার 'শ্রীসঙ্ঘ' ও 'চট্টগ্রাম যুগান্তর পার্টি' নবগঠিত "কোর্"-এর স্বেচ্ছাসেবক বা সভ্য দিয়ে বিশেষ পুষ্টিলাভ করে। রে (R. E. A. Ray, D.I.G., I.B.) ১৯৩৪ জুন ২৮-এ লিখেছেন ঃ "Sri Sangha was formed from the Dacca and Midnapore sections of the Bengal Volunteers—the group which shared with the Chittagong Jugantar Party the distinction of being the most dangerous party in Bengal."

অনুশীলন পার্টির এক অংশ ১৯২৯ সালে খুব বড় এবং ব্যাপক আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হতে চাইছিল, কিন্তু এতে যে সঙ্গতি ও প্রস্তুতির প্রয়োজন, সেটা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার বলে একটা দল তড়িঘড়ি চমকপ্রদ কিছু করবার জন্যে মেতে ওঠে : "In 1929, *Anushilan* was for an all-India rebellion. Some of the members thought that this involved far too long a period of inactivity and were impatient for action of a spectacular kind."

এ-সময় যুগান্তর পার্টির নেতারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধারণ সভ্যদের কাছে অপ্রকাশিত রেখে দেন। কর্ম্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করে নতুন করে আক্রমণাত্মক কাজের কথা চিন্তা করা চলতে থাকে। সেটার ফলাফল পরবৎসরে প্রকট হয়ে ওঠে।

সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছাড়া, এ-সময় যুবক, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। তার মধ্যে গুজরাটের বরদলৈ তালুকের কৃষকদের মধ্যে ভূমি-রাজস্ব বন্ধ করার সিদ্ধান্ত-গ্রহণ একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা (১৯২৮ সাল)। পূর্ব্বাপর কিছু বিচার না-করেই গভর্ণমেণ্ট ঢালাও শতকরা ২০ ভাগ ট্যাক্স বৃদ্ধি করে। কৃষকরা সরাসরি এই বর্দ্ধিত হারকে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হয়। ট্যাক্স-আদায়ের সরকারী জুলুম উপেক্ষা করে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিবশেষে সাহসের সঙ্গে "যুদ্ধ" চালিয়ে যেতে থাকে। বেশ কয়েক মাস ধরে এই সংঘর্ষ চলবার পর, শেষ পর্য্যন্ত কিষাণরাই জয়লাভ করে।

এই ঘটনা অতিসাধারণ মানুষের মনে বল সঞ্চার করেছে এবং কেবল পরবর্ত্তী আইন-অমান্য-আন্দোলন নয়, একটা বিরাট "বিপ্লবী" মন গড়ে তোলার সহায়তা করেছে।

অসহযোগ-আন্দোলনের উত্তেজনা এবং সরকারী প্রতিরোধ-নীতি বিপ্লবী-কার্য্যকলাপকে অনেকটা স্তিমিত করে ফেলেছে ; তবে সেটা যে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি, তার প্রমাণের অভাব নেই। বিপ্লবী-গণ্ডীর বাইরে হলেও, যুব-জাগরণ এ-সময়ের একটা প্রকাণ্ড শুভ লক্ষণ। বড় উন্মাদনা থাকলে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সরকারী অনাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে বা প্রতিকারের পথে যুবশক্তির মধ্যে থেকে কর্ম্মী ছিটকে বেরিয়ে আসে।

গান্ধীজীর প্রকাশ্য আন্দোলন অনেক ভবিষ্যৎ-কর্ম্মীর মন তৈরী করে দিয়েছে। অবশ্য যাঁরা শান্তপথের পথিক, তাঁদের মধ্যে থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথের দারুণ নির্য্যাতন ভোগ করতে কতজন প্রস্তুত হয়েছিলেন সেটা বড় কথা নয়, তবে ইংরেজ-বিদ্বেষ যে বহুর মন দখল করেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই পটভূমিকায় শক্তিশালী যুবকদল গড়ে উঠেছে এবং তার ফল দু'বছরের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়েছে।

ভারতে পরবর্ত্তী শাসন-সংস্কারের জন্য কমিশন গঠিত হবার কথা বড়লাট ঘোষণা করেন—১৯২৭ নভেম্বরে। সার জন সাইমন এই কমিশনের প্রধান বলে

প্রকাশ করা হয়। কংগ্রেস তো বিরূপ ছিলই, নরমপন্থীরাও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। ইংরেজের প্রতি বিতৃষ্ণায় যে শিথিলতা প্রকাশ পাচ্ছিল, সেটা এবার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো। কংগ্রেসের ভিতর কমবয়সীর দল একটা তোলপাড় সৃষ্টি করে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে প্রধানতঃ তাদেরই চাপে পড়ে স্বাধীনতা-প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'সাইমন চমূ' ১৯২৮ ফেব্রুয়ারী ৩-রা বোম্বাই পৌঁছুলে, সর্ব্বত্র হরতাল পালিত হয় এবং এই দল যেখানেই গেছে সঙ্গে সঙ্গে হরতাল ও বিক্ষোভ ফুটে উঠেছে। অপরদিকে কংগ্রেসের তরফে (মতিলাল) নেহরু কমিটী ভারতের সংবিধান কি হবে, তার খসড়া কংগ্রেসে দাখিল করে—আগষ্ট ১০-ই, পরে ১৪-ই সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়।

এ-বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল কলিকাতায়। আবার ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা নিয়ে তোলপাড় হ'ল, যেন সাম্বৎসরিক ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু বিশেষ দর্শনীয় ও ভবিষ্যৎ কাণ্ডের সূচক হিসাবে দাঁড়াল সামরিক-পোশাক-সজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক-দল ও তাদের সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। এই থেকে সহর, সহরের উপকণ্ঠ ও দূর গ্রামের যুবকরা সামরিক পোশাক পরতো, সামরিক নীতি-শৃঙ্খলা পালন করতো, নায়কগণ সামরিক নামে অভিহিত হতেন ও সামরিক মর্য্যাদায় সম্মানিত হতেন। এই সাজপোশাক, কায়দাকানুন, কুচকাওয়াজ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছিল, ১৯৩০ এপ্রিল, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের সংস্রবে। বিপ্লবী সংগ্রামের দিক থেকে এর প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়।

কংগ্রেস এক-পা পিছিয়ে গেল যখন পূর্ব্ববৎসরের স্বাধীনতার দাবী থেকে সরে এসে স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট হ'ল। কিন্তু দেশের চারিদিক থেকে বিশেষ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। কংগ্রেসের মধ্যেই প্রকাণ্ড এক দল নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা-লাভের উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল। সাইমন কমিশন আসার পর আন্দোলনে ইন্ধন যোগ হয়েছে। আপত্তির অপরাপর কারণের সঙ্গে কমিশন 'বিলকুল' শ্বেতকায় সভ্য নিয়ে গঠিত হওয়ায় আপত্তি প্রবলতর হয় কৃষ্ণকায়দের পক্ষ থেকে। একজনও কমিশনে স্থান না পাওয়ায়, প্রায় সব নরম-গরম রাজনীতিক দল ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

এদিকে ১৯২৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে (লাহোরে) বলা হ'ল যে, ইংরেজ এক বছরের মধ্যে দাবী না মেটালে, সংগ্রাম শুরু হবে। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কুম্ভকর্ণদের নিদ্রাভঙ্গের জন্য ১৯২৯ এপ্রিলে কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্ব্লী-কক্ষে ঠাণ্ডা-মস্তিষ্ক রাজনীতিকদের চমক ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বোমা বিদীর্ণ হ'ল।

যুবচিত্ত তো বিক্ষুব্ধ হয়েই ছিল। ব্যষ্টি ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজে নামার জন্যে তারা এগিয়ে আসে। সঙ্গে জুটে গেল ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন। রাজনীতিক্ষেত্রে

ছাত্রদের অংশগ্রহণ সেই স্বদেশী যুগ থেকে কমবেশী চলে আসছে। এখন সঙ্ঘবদ্ধতা ও সংখ্যাধিক্য আপনাদের স্থান সংগ্রহ করে নিতে সমর্থ হয়।

শ্রমিক-অশান্তি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। যাঁরা কেবল কংগ্রেস নিয়ে মেতে থাকতেন, তাঁদেরও টনক নড়ে উঠেছিল। বড় বড় কারখানায় ধর্ম্মঘট একটা বড় লক্ষণ এবং তার সংখ্যা গণনা করলে অঙ্কটা বেশ বড় হয়েই ওঠে। তবে এদের পিছনে কমিউনিষ্ট প্রভাব খুব বেশী মাত্রায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই নূতন দলের আবির্ভাবে গভর্ণমেণ্ট নিজেকে খুব বিব্রত বোধ করতে থাকে।

একটা নতুন কার্য্যধারা সম্বন্ধে কোনও কোনও নেতা চিন্তা করতে থাকেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বিদেশী সরকারের সমপর্য্যায়ে (parallel Government) নিজেদের শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার এক প্রস্তাব এনেছিলেন ("a resolution was moved .... to the effect that the Congress should aim at setting up a parallel Government in the country and to that end should take in hand a task of organising the workers, peasants and youth". [Subhas Chandra Bose, *Indian Struggle* (1948), p. 244]. আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে উঠছে ঃ এখন থেকে জাতির পদক্ষেপ-ধ্বনির দ্রুততাল শোনা যাচ্ছে। ১৯২১ সালে অসহযোগ-আন্দোলন দেশের সুষুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে, কিন্তু সেটা মূলতঃ "অসহযোগ"। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গড়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা আন্দোলনকে নূতন শক্তি যোজনা করতে থাকে।

ঘটনা-প্রবাহ

মনমদ ঃ বাঙ্গলার বাইরে বাঙ্গালী ছেলেরা বোমা-পিস্তল নিয়ে দস্তুরমত মরণ-যজ্ঞে নেমেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, এক মারাত্মক বিস্ফোরণ ও জীবনহানির ভিতর দিয়ে। অন্যান্য দিনের মতই এলাহাবাদ এক্সপ্রেস ভূসাওয়াল থেকে মনমদ চলেছে অতি দ্রুতগতিতে, ১৯২৮ অক্টোবর ৭-ই। হিসাওয়াড়ের কাছাকাছি ট্রেন যখন চলেছে তখন প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটলো এবং তিনখানা গাড়ী দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে তিনজন যাত্রী গাড়ী থেকে ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়ে। তার মধ্যে দু'জন প্রাণহীন। তৃতীয় ব্যক্তি মনমদ পৌঁছুবার আগেই মারা যায়, আর ন'জন গুরুতররূপে আহত হয়।

পুলিশ-তদন্তের ফলে কাশীর দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের নাম হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আর মনোমোহন গুপ্ত। মনমদের কাছে ঘটনা হওয়ায়, সেখানে দায়রা আদালতে তাঁদের মামলা চলে। ১৯২৯ জুন ৪-ঠা রায় প্রকাশিত হলে, দেখা গেল, হরেন্দ্র ও মনোমোহনের ষড়যন্ত্র অপরাধে সাত বছর, বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গে দু'বছর এবং রেল-আইন (বিনা অনুমতিতে যাত্রী-কামরায় দুরন্ত বিপজ্জনক বস্তু বহন)-ভঙ্গের অভিযোগে একবছর সমকালীনভোগ দণ্ডবিধান হয়।

হরেন্দ্রর এক বন্ধু মার্কণ্ডেয় নিহতদের মধ্যে ছিলেন।

অনুমান করা হয়, মার্কণ্ডেয় ও তাঁর দুই বন্ধু মিলে, নিজেদের তৈরী ডিনামাইট আর বোমা নিয়ে বোম্বাইতে সাইমন-কমিশনের দলের ওপর ফেলবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন,—পথে এই দুর্ব্বিপাক।

কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্ব্লী-ভবনে বোমা

'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টি' দেশের রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেছিল। বক্তৃতা ও পত্র-পত্রিকায় তীব্র আলোচনা চলছিল এবং কোথাও-বা বোমাও ফাটছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে নিতান্ত বিব্রত বোধ করছে এমন লক্ষণ কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। এইরকম সময়ে, ১৯২৯ এপ্রিল ৮-ই, এক অঘটন ঘটে গেল রাজধানীর এ্যাসেম্ব্লী-কক্ষে।

কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্ব্লীতে অধিবেশন চলছে। দুটো বিল—'ট্রেড্স্ ডিসপিউট্স্' (Trades Disputes) আর 'পাবলিক সেফ্টি' (Public Safety) নিয়ে আলোচনা চলছে, স্পীকার বিঠলভাই জে. প্যাটেলের মতামত দরকার যে, বিল দুটির আলোচনা স্থগিত রাখা হবে কিনা। দ্বিতীয় বিল সম্বন্ধে স্পীকার ১৯২৯ এপ্রিল ২-রা বলেছিলেন যে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা চলবে। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য তাতে খুবই নারাজ।

ঘটনার দিন, অর্থাৎ এপ্রিল ৮-ই, প্রথম বিল সম্বন্ধে নির্দ্দেশ (ruling) দেবার পর স্পীকার যখন সবেমাত্র বলেছেন যে "পাবলিক সেফ্টি বিল সম্বন্ধে···" —বাক্য শেষ হবার পূর্ব্বেই দর্শকের গ্যালারী থেকে এ্যাসেম্ব্লী-কক্ষতলে দুটো বোমা পড়ে বিরাট শব্দে বিদীর্ণ হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দুটো রিভলভার ছোড়ার আওয়াজ হ'ল আর কিছু ইস্তাহার উড়ে মেঝেয় পড়তে লাগলো। দেখা গেল উভয় কার্য্যই গ্যালারিতে দণ্ডায়মান দুই যুবক কর্ত্তৃক সংসাধিত হয়েছে।

বোমা-দুটি পড়েছে খালি জায়গায়, যাতে কারও আঘাত না লাগে অথচ সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, পরিপূর্ণভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সভ্যরা যে-যার আসন ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করায় এক হট্টগোলের সৃষ্টি হয়ে গেল। এ্যাসেম্ব্লী-পুলিশ ওপরে উঠে যুবক দু'জনকে গ্রেপ্তার করতে গেলে, একজন চীৎকার করে বলে উঠলেন—"আমার কর্ত্তব্য আমি সম্পাদন করেছি", বলে নিজের বসবার চেয়ারের ওপর রিভলভারটা ফেলে দিলেন। গ্রেপ্তারের সময় কেউ সামান্য বাধাও দিলেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির করলে, আসামী সর্দ্দার ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত বলেন যে, তাঁদের অভিযোগ ব্যক্তিগত কারও বিরুদ্ধে নয়, যার বিরুদ্ধে—

সেটা হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠান। এ্যাসেম্ব্লী দেশ-বিদেশকে ধোঁকা লাগাচ্ছে; উপকার করার ক্ষমতা নেই, উপরন্তু যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করছে। সভ্যজগৎকে বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে যে, সেটা জনপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। আরও বহু যুক্তির দ্বারা তাঁরা কৃতকার্য্যের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

প্রাথমিক তদন্তের পর, ১৯২৯ মে ৮-ই, ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী দু'জনকে দায়রা সোপর্দ্দ করলেন। বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গ ও হত্যা-প্রচেষ্টা হচ্ছে প্রধান অভিযোগ। ১৯২৯ জুন ১০-ই দায়রা জজ দু'জনেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। হাইকোর্ট ১৯৩০ জানুয়ারী ১৩-ই আসামীদের আপীল বাতিল করে।

এখানেই আসামীদের মামলা শেষ হ'ল না। লাহোরের সহকারী পুলিশ-সুপার সণ্ডার্স ১৯২৮ ডিসেম্বর ১৭-ই বিপ্লবী-দল কর্ত্তৃক নিহত হন। দিল্লী ও আশপাশে নানা ঘটনা চলতে থাকে। সবরকম মিলিয়ে 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হয়—১৯২৯ জুলাই ৭-ই।

আসামীদের প্রতি নানারূপ বীভৎস অত্যাচারের ফলে, সকলেই অনশন করেন এবং তাঁদের কোর্টে হাজির করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন আসামীদের অনুপস্থিতিতেই মামলা চলার জন্য অর্ডিনান্স পাশ হয়। ১৯৩০ অক্টোবর ৭-ই, রায়-প্রদানের সময়, একজনও আসামী কোর্টে হাজির হননি। ঐ রায়ের ফলে—ভগৎ সিং, শিবরাম রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির হুকুম হয়। আর, (১) কিশোরী লাল, (২) মহাবীর সিং, (৩) শিব বর্ম্মা, (৪) গয়াপ্রসাদ, (৫) জয়দেব, (৬) কমল-নাথ তেওয়ারী ও (৭) বিজয়কুমার সিংহর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

ফাঁসির দণ্ড পালিত হয়—১৯৩১ মার্চ ২৩-এ।

এখন, চিরস্মরণীয় আমরণ অনশন-কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক অনশন

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়—১৯৩০ জুলাই ১০-ই। তার আগে থেকেই রাজনৈতিক আসামী হিসাবে অপর সাধারণ কয়েদী হতে উন্নত শ্রেণীর পথ্য (special diet) দাবী করা হয়েছে। ভদ্রতাসম্মত সভ্য-ব্যবস্থাও চাই, সে-কথাও বলা হ'ল। দাবী আরও বেড়েছে—এসকল লোক দণ্ডিত হলে তাদের পড়ার ব্যবস্থা, আর পাকা ঝুনো, গুরু অপরাধে বারম্বার দণ্ডিত (hardened criminal) কয়েদী হতে ভিন্ন আচরণ—এই ছিল প্রধান দাবী। দাবী পূর্ণ করা দূরের কথা, এ অপরাধে তাঁদের ওপর প্রচণ্ড নির্য্যাতন চলতে থাকে। প্রতিবাদে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত কয়েদীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অনশন আরম্ভ করেন, যাতে শরীর অপটু হয়ে পড়ে এবং কঠোর কায়িক-শ্রমে অক্ষমতা এসে পড়ে। এই অনশনকারীদের মধ্যে ছিলেন কলিকাতার যতীন্দ্রনাথ দাস।

দশ দিন অপেক্ষা করে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ কয়েদীদের মৃত্যু রোধ করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। ধারণা ছিল—ক্ষুধার তাড়নায় ঐ দশ দিনের মধ্যেই ওঁরা অনশন ভঙ্গ করতে বাধ্য হবেন। গভর্ণমেণ্টের আদেশে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিটি কয়েদীর স্বতন্ত্র কক্ষে (cell) পাঁচজন হিসাবে পালোয়ান দণ্ডিত-কয়েদী ও একজন করে ডাক্তার-সাহায্যে নাক বা মুখের মধ্যে নল প্রবিষ্ট করে তরল পথ্য ঢেলে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেল। কয়েদীরা দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে রেখে দিলেন। সুতরাং নাকের মধ্যে নল-প্রবেশের চেষ্টা একমাত্র উপায়। একজন ক্ষীণকায় দুর্ব্বল লোককে পাঁচজন ষণ্ডা, দণ্ডিত কয়েদী চেপে ধরে রাখতো, ডাক্তার নল-সাহায্যে পথ্য ঢালতেন। ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু খাদ্য পেটের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে, বমন-সাহায্যে সেটা উঠিয়ে দিতে লাগলেন "চিকিৎসিত" ব্যক্তিরা।

সকলের মধ্যে যতীনের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো। জুলাই ২-রা, ২৫,০০০ টাকার হিসাবে দুটো জামিনে তাঁকে জেলের বাইরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কোনও কারণ না জানিয়ে, তার পরদিনই সে-আদেশ বাতিল করা হয়। জুলাই ২৪-এ যতীন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এসে পৌঁছুলেন। সেই নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায় পথ্য-গ্রহণে বাধা দিতে যাওয়ায়, দু'বার তাঁর নাড়ী ছেড়ে যায়। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে দিন কাটছে। অবস্থা হীন হতে হীনতর হয়েই চলেছে। আগষ্ট ২৩-এ সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটলো। ২৬-এ দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যাওয়ায়, জগতের আলো তাঁর কাছ নির্ব্বাপিত হয়ে গেল। মৃত্যুপথযাত্রীর নিকট তার কোনও প্রয়োজনও তখন নেই। সেপ্টেম্বর ১-লা, কোমর থেকে বাঁ-দিকের সমস্ত অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল। ৬-ই পর্য্যন্ত দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা। সজ্ঞানে সকল যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। এ যেন অদৃশ্যে বসে সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের যন্ত্রণা-সহনশক্তির পরিধি পরীক্ষা করছিলেন! পরের দিন থেকে জ্বরের তীব্রতা দারুণ বেড়ে উঠলো।

সেপ্টেম্বর ১০-ই অনশনের ষাট দিন পূর্ণ হ'ল। মস্তিষ্কে রক্তশূন্যতা-হেতু কঙ্কালসার যতীনের জীবন বা মৃত্যুর পরিচয় পাওয়া কঠিন হয়ে উঠলো। ১২-ই রক্তবমনের সঙ্গে সঙ্গে হাত ও পায়ের তালু থেকে দৈহিক তাপ বিদায়গ্রহণ করেছিল। ১৯২৯ সেপ্টেম্বর ১১-ই, বেলা ১-টা ৫ মিনিটে যতীন আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু বরণ করলেন। অকল্পনীয় যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে তিনি যে সহনশক্তি ও মানসিক দৃঢ়তার প্রমাণ রেখে গেলেন, তার তুলনা জগতে বিরল। আন্দামানে রামরক্ষা, আয়ার্ল্যাণ্ডে মাক্‌সুইনী (McSwiney) আর বর্ম্মার ভিক্ষু উইজায়া (Wizaya) যতীনের অগ্রগামী বলে জানা যায়।

শত-সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের মধ্য দিয়ে যিনি চলেছেন, করাল মৃত্যু যাঁকে তিলে তিলে গ্রাস করছে, যাঁর ইহজগতের নিজ অস্তিত্বের জ্ঞান বিলুপ্তির শেষপ্রান্তে, তিনি

বলছেন—"আমি হিন্দু নই, আমি বাঙ্গালী নই,—আমি ভারতবাসী ; সেই-ই আমার একমাত্র পরিচয়।" সাধনার ধন ভারতমাতার শৃঙ্খল-মোচনের জন্যে সগৌরবে আত্মপ্রসাদে মগ্ন হয়ে সেই দেশমাতৃকার বুকেই যতীন চিরনির্ব্বাণ লাভ করলেন।

নাটোর বাস্-ডাকাতি ঃ আক্রমণাত্মক ঘটনার মধ্যে নাটোর বাস্-ডাকাতির পরিচয় থাকা দরকার। এ-কালের এইটাই প্রথম। উত্তরবঙ্গে রাজসাহী থেকে বাস্ চলেছে নাটোরে। মাইল উনিশ যাবার পর যখন ডাক (মেল)-বাহী বাস্ পুটিয়া এসে পৌঁছেচে, ১৯২৯ সেপ্টেম্বর ১১-ই, সে-সময় বাস্-এর মধ্যে একটা সোরগোল উঠলো যে, একটা ঘড়ি পড়ে গেছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে, ড্রাইভার গাড়ী থামালেন। নাটোর পৌঁছুতে তখনও মাইল আট-নয় বাকী। জন-ছয়েক সশস্ত্র লোক চীৎকার করে উঠলো—"হাত উঠাও" (hands up) ; ভয়গ্রস্ত যাত্রীদের কাছ থেকে মূল্যবান যা পাওয়া গেল, তাই নিয়ে লুণ্ঠনকারীরা উধাও হ'ল।

কিছু লোক ধরপাকড় করবার পর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে মামলা উঠলো। আসামী তিনজন। ডাকাতি, ডাকাতির প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র হচ্ছে অভিযোগ। রায় প্রকাশিত হ'ল—১৯৩০ ফেব্রুয়ারী ২৪-এ। তাতে দু'জনের ছ'বছর হিসাবে, আর একজনের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে আপীলে ১৯৩০ আগষ্ট ১৮-ই ধরণীকান্ত বিশ্বাস ও সুশীলকুমার দাশগুপ্তর ছ'বছর সশ্রম দণ্ড সমর্থিত হয় ; তৃতীয় আসামী মুক্তিলাভ করেন।

লাহোর বোমা ঃ বিপ্লবীদের ব্যবহারের জন্যে বাঙ্গলা থেকে উত্তর-ভারতে কেবল বোমা সরবরাহ করেই কাজ শেষ হয়নি, সেখানে রীতিমত বোমা তৈরী করেছে বাঙ্গলার ছেলেরা। লাহোরের রামগলিতে এক ধরমশালায় বোমা ফাটে। স্থানীয় পুলিশ হুগলী ভাঙ্গামোড়ার এবং হাওড়া ধরণীধর মল্লিক লেনের অধিবাসী—যথাক্রমে কালীপদ ভট্টাচার্য্য ও পি. কে. রায়কে ১৯২৯ নভেম্বর ২৪-এ গ্রেপ্তার করে। বিচার-নিষ্পত্তি লাহোরেই শেষ। ১৯৩০ জানুয়ারী ১৬-ই উভয় আসামীরই ছ'বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

প্রতিশোধ

বরিশাল ঃ তখনও যৌবনে ভাল করে পদার্পণ ঘটেনি—মাত্র চৌদ্দবছরের এক ছেলের মাথায় "খুন" চেপেছে,—তিনি "দেশের কাজ" করতে নেমেছেন। রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন এতটা গরম হয়ে উঠেছে।

বরিশালে স্থানে স্থানে রাজনৈতিক সভা চলছে। এরই একটা অনুষ্ঠিত হয়—১৯২৯ মার্চ ২০-এ, স্থানীয় টাউন হল্-এ। পুলিশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দারোগা (S.I.) যতীশচন্দ্র রায়। সভা চললো ৬-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত। ভাঙ্গবার পর লোক

ইতস্ততঃ চলে যেতে লাগলো। এই সময়ে সভাস্থল থেকে একটু দূরে এক পুকুর-পাড়ে দু'জন লোককে আলাদা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সে-দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবার মত লক্ষণ কিছুই ছিল না। যতীশ যখন কর্ত্তব্য সেরে সাইকেলে চড়তে যাচ্ছেন তখন রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যুতের বেগে এসে দারোগার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন। আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায়, ঘটনাস্থলেই যতীশের প্রাণহীন দেহ মাটীতে লুটিয়ে পড়ে।

রমেশচন্দ্র প্রায় 'হাতে-নাতে' ধরা পড়লেন। সেসনে বিচার; মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হ'ল—১৯২৯ এপ্রিল ২২-এ। আপীল হয়েছিল হাইকোর্টে। আততায়ীর পরমায়ু ছিল। জুলাই ২৬-এ হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেয়।

কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট

কংগ্রেস এবং কতকটা বিপ্লবীদের চাপে পড়ে সমসাময়িককালে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তথা পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন-সংস্কারের কথা আলোচিত হতে থাকে। ১৯২৯ অক্টোবর ৩১-এ ভারতের বড়লাট ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে এক 'গোল টেবিল বৈঠক' (Round Table Conference) হবে। এই ঘোষণাতেই পাওয়া যায়, ব্রিটিশ সরকার ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নিচ্ছে। এটা সম্ভব হচ্ছিল—ইংল্যাণ্ডে ১৯২৯ অক্টোবর ১৬-ই 'শ্রমিক দল' (Labour Party) মন্ত্রিসভা গঠন করার ফলে। অনেকেই মনে করেছিল রক্ষণশীল দলের প্রভাবে যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার কতকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হবে।

এদিকে লাহোর কংগ্রেসে ১৯২৯ ডিসেম্বর ৩১-এ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভারতের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয় এবং কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করেন। ইংরেজ সরকার "ভাঙে তো মচকায় না" নীতি অবলম্বন করে চলেছে। তারা মনে করছে কংগ্রেস স্বায়ত্তশাসন টোপটা গিলবে আর ইংরেজ সামান্য কড় ছেড়ে দিয়ে ভারতরূপী মাছকে বেশ খানিকটা খেলিয়ে নাজেহাল করে ছাড়বে।

১৯৩০ জানুয়ারী ২৬-এ সমগ্র ভারতে 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের নির্দ্দেশ বেরিয়েছিল জানুয়ারী ২-রা। দূর পল্লী পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠান মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়েছিল। গভর্ণমেণ্ট প্রায় নীরবে ঘটনাটা লক্ষ্য করে নিশ্চেষ্ট বসে ছিল। ও-পক্ষ থেকে আর কোনও সাড়া না-পেয়ে, মহাত্মাজী লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা মনস্থ করলেন এবং মার্চ ১২-ই যাত্রা শুরু করে এপ্রিল ৬-ই গন্তব্যস্থলে পৌঁছুলেন। তখন আর গভর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট রইল না। মুদ্রাযন্ত্র ও পত্র-পত্রিকার ওপর বাধা-নিষেধ অর্ডিনান্স পাশ হ'ল—জুলাই ২৪-এ। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-আক্রমণ আর সোলাপুরে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে জনতার সঙ্ঘর্ষ ঘটে গেল।

গভর্ণমেণ্ট যে কতকটা বিব্রত বোধ করেনি তা নয়। সাইমন-কমিশনের রিপোর্টের অপেক্ষায় বসে ছিল। জুন ৭-ই কমিশনের রিপোর্ট প্রচারিত হ'ল। এতে 'গোল টেবিল'-এর আলোচনার ক্ষেত্র প্রসার করা হয়। কংগ্রেস এতেও অংশগ্রহণের কোনও উৎসাহ প্রকাশ করেনি। ১৯৩০ নভেম্বর ১২-ই লণ্ডনে 'গোল টেবিল আলোচনা-সভা' বসলো এবং ১৯৩১ জানুয়ারী ১৯-এ পর্য্যন্ত চললো।

বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায়, এ বৎসর প্রকাশ্য কংগ্রেস-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। 'গোল টেবিল বৈঠক' শেষ হওয়ায়, জানুয়ারী ২৬-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যদের মুক্তি দেওয়া হয়, যাতে সকলে মিলে সলাপরামর্শ করে পরবর্তী "বৈঠক" সম্পর্কে গ্রহণীয় পন্থা স্থির করতে পারেন।

ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনার পর্য্যালোচনায় ফিরে আসা যাক্। মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্বাধীনতা-লাভই ভারতের লক্ষ্য বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এখন বিস্তারিত কর্ম্মপন্থা গ্রহণের ব্যবস্থা হতে লাগলো। ব্যাপকভাবে নিরুপদ্রব আইন-অমান্য-আন্দোলনকে (কেবল অসহযোগ নয়) উপায় বা পথ বলে প্রচার করা হ'ল। এর পিছনে সংগ্রামী বিপ্লবীদের কথা মহাত্মাজীর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বললেন—"Civil Disobedience alone can save the country from impending law-lessness and secret crime since there is a party of violence in the country which will not listen to speeches, resolutions and conferences but believes in direct action." (Subhas Chandra Bose, *Indian Struggle*, p. 247). সুতরাং 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের জন্য ১৯৩০ জানুয়ারী ২৬-এ নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ল। কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে সারা ভারতে সাড়ম্বরে উৎসব পালিত হয়েছিল।

মহাত্মাজী জানুয়ারী ৩০-এ তাঁর স্বাধীনতা-মন্ত্রের সার (Essence of Independence) প্রচার করলেন—যেটা গৃহীত হলে, তিনি ইংরেজের সঙ্গে একটা রফা করতে পারেন। তাঁর সর্ত্তের মধ্যে ছিল ঃ "Discharge of all political prisoners save those condemned for murder, or the attempt thereat by the ordinary judicial tribunal."—অর্থাৎ সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, কিন্তু তাদের নয়, যারা খুন করেছে বা করার চেষ্টা করেছে এবং সেই অপরাধে বিচারে দণ্ডিত হয়েছে।

ভারত সরকার মহাত্মার কথায় কর্ণপাত করেনি। সত্যাগ্রহীদের ওপর বীভৎস অত্যাচার হয়েছে। সোলাপুরে একটা বড়রকম হাঙ্গামা ঘটে। সেখানে একদল লোক পুলিশের নৃশংসতায় আন্দোলনের মূলমন্ত্র "নিরুপদ্রব" ও ক্রোধ-হিংসা-বর্জ্জিত কংগ্রেসের কথা ভুলে গিয়ে, হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল্। ১৯৩০ মে ৮-ই সমস্ত সোলাপুর সহরে আগুন জ্বলে ওঠে ; সাধারণ আন্দোলনকারী ও পুলিশের

বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। সামরিক আইন (Martial Law) চালু করা হয়েছিল এবং সেই আইনের কবলে তিনজনের ফাঁসি হয়।

যে রূপ নিয়ে নিরুপদ্রব আইন-অমান্য-আন্দোলন আবির্ভূত হ'ল—একদল বিপ্লবী তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা চাইছে 'নিরামিষ' আন্দোলন নয়। যা করা চাই তাতে প্রাণ দিতেও হবে, নিতেও হবে। তাদের বিশেষ সুবিধা হ'ল, গান্ধীজীর আশ্বাসমত একবছরে স্বরাজ এল না। সুতরাং বাঙ্গলার 'দাওয়াই' প্রয়োগের জন্য দল এগিয়ে এল। যার ফলে, জগতের ইতিহাসে বিপ্লবী সংঘটনের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন' এবং অপরাপর বহু দুঃসাহসিক কাজে যুবকের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

প্রলয়-তাণ্ডব (১৯৩০)

ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসে ১৯৩০—১৯৩২ সাল একটি বিশেষ স্মরণীয় কাল।

ওদিকে গণ-আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সরকারী আইন অমান্য করার প্রবণতা ব্যাপক হয়ে পড়ে। বিপ্লবী-দলও কোমর বেঁধে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ; তার সমর্থনও আসছে নানা দিক থেকে। রিপোর্ট (R. E. A. Ray) বলছে ঃ "In 1930 when the terrorist campaign started, the terrorist leaders had a larger and most enthusiastic support throughout Bengal than they had ever had before."—বিপ্লবী-দল যে সমর্থন পেতে লাগলো, এর আগে তারা এরকম আর কখনও পায়নি।

দলবদ্ধভাবে কাজেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালে যুগান্তর পার্টির তিনটি শাখা—চট্টগ্রাম, শ্রীসঙ্ঘের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এবং যুগান্তরের বরিশাল, ময়মনসিংহ, মুন্সীগঞ্জ, উত্তর বাঙ্গলা এবং ২৪-পরগনার শাখা একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কলিকাতাতে বসেই দলীয় নেতাদের আলোচনা এই অঘটন সম্ভব করেছিল।

ঘটনা-পরম্পরার বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিপ্লবীদের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র এবং বিভিন্ন কার্য্যকলাপের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে।

বীরভূমি চট্টগ্রাম

গান্ধীজীর কথা বিফল প্রতিপন্ন করে একবৎসরে স্বরাজ আসেনি। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র, বিশেষ করে চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ; তাঁদের মত ঃ "কিবা ফল কাল ব্যাজে ?" ১৯২২ সালে কর্ম্মপন্থা-নির্দ্ধারণের জন্যে এক বৈঠক বসেছিল, কথা হ'ল 'তৈরী হতে হবে'। প্রারম্ভিক কাজের জন্য চাই টাকা। গোটা-দুই-তিন ডাকাতিতে কিছু পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেটা কিছুই নয়। কর্ম্মীরা ধরা পড়লে, মামলা-মোকদ্দমা চালাতে কষ্টার্জ্জিত অর্থ ক্ষয় হয়ে যায়, অতএব স্থির হ'ল নিজেদের মধ্যে থেকে টাকা তুলতে হবে। যে-যার সামান্য উপার্জ্জন ছাড়া, বাড়ী থেকে সংগৃহীত অর্থ এনে জমা-করা শুরু করে দিল। বাড়ীর অভিভাবকদের "সাপে ছুঁচো-গেলা" অবস্থা। সব বুঝতে পারছেন, সদুপদেশ-দানে ফল কিছুই হচ্ছে না ; পুলিশে খবর দিতে গেলে "হিতে বিপরীত" অবস্থা দাঁড়াবে।

যাই হোক, বড়রকমের একটা কিছু করবার জন্য সবাই প্রস্তুত হতে লাগলেন

১৯২৪-২৫ সাল থেকে বিনা বিচারে বন্দী-থাকাকালে, এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৯২৮ সাল নাগাদ জেল থেকে বেরিয়ে সবাই কাজে নেমে পড়লেন। এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কর্ম্মীর কথা এখানে বলে রাখা যাক্। নেতৃস্থানীয় বন্দীদের মধ্যে ছিলেন নোয়াপাড়ার অনুরূপচন্দ্র সেন। তিনি ১৯২৬ ডিসেম্বর ১৯-এ চব্বিশ-পরগনার বোড়াল গ্রামে ধরা পড়েন। পরে তাঁকে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি গ্রামে অন্তরীণ করা হয়। অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাঁকে বাঙ্গলার বাইরে কাশীতে পুলিশ-তত্ত্বাবধানে বাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। সেখানে ১৯২৮ এপ্রিল ৩-রা তাঁর জীবনান্ত ঘটে।

প্রস্তুতিপর্ব্বের শীর্ষে ছিলেন নেতা সূর্য্য সেন, ওরফে 'মাষ্টার-দা'। তিনি স্থির করেন—জেলা কংগ্রেস কমিটীকে হাতে রাখতে হবে। প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব হয়—১৯২৯ সেপ্টেম্বর ২১-এ। ভোটে জয়লাভ হয়েছিল একটি অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে। বিপক্ষদল মারাত্মক গোপন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসে এবং 'মাষ্টার-দা'র সমর্থক যুবক সুখেন্দুবিকাশ দত্তকে গুরুতরভাবে আঘাত করে। মেরুদণ্ড ভীষণভাবে জখম হয়ে যায়। স্থানীয় চিকিৎসার পর তাঁকে কলিকাতা আনা হয়। কিন্তু ১৯২৯ অক্টোবর ২৭-এ তিনি সকল যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেন।

চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস অফিস দখল হ'ল, আর ভিতরে ভিতরে এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রস্তুতি চলতে লাগলো। স্বাস্থ্যচর্চ্চা, প্রদর্শনীতে শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয়, দস্তুরমত সামরিক পোশাক পরে চলাফেরা, লাঠি-ছোরা খেলা, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি আছে। হালচাল দেখে বাইরে থেকে অতিরিক্ত পুলিশ আমদানী করা হ'ল—১৯২৯ নভেম্বর ও ১৯৩০ মার্চ মাসে।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দখলে থাকায়, বাইরের লবণ-সত্যাগ্রহ-সম্পর্কিত ইস্তাহার প্রভৃতি বিলি করার বিশেষ সুবিধা হ'ল। ১৯৩০ মার্চ ২১-এ কংগ্রেস-পক্ষ থেকে বলা হ'ল যে, কর্ম্মীরা শীগ্‌গিরই লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবে—দেশবাসী যেন সর্ব্বরকমে তাঁদের সহায়তা করে।

প্রকাশ্য কংগ্রেস আন্দোলনের আড়ালে বৈপ্লবিক সংগঠনের আয়োজন সমাপ্ত হয়েছিল। পূর্ব্ব-পরিকল্পনা-মত ১৯৩০ এপ্রিল ১৮-ই রাত্রি ১০-৩০ মিনিটের সময় চট্টগ্রাম সহরের গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অস্ত্রাগার আক্রান্ত হ'ল। জন-ছয়-সাত নেতৃবর্গ ছাড়া, ষাট-বাষট্টি-জন অপরিণতবয়স্ক স্কুল ও কলেজের ছাত্র নিয়ে 'ভারতীয় গণতান্ত্রিক বাহিনী' (Indian Republican Army) গঠিত। যুদ্ধ-সরঞ্জামের মধ্যে ১৪টি পিস্তল, ডজনখানেক পুরাতন আমলের দো-নলা গাদা বন্দুক (D.B.B.L.) এবং মাত্র কয়েকটা বোমা। একখানা নতুন মোটরগাড়ি আগে থেকে কেনা ছিল।

ঘটনার পূর্ব্বেই আক্রমণকালে যাতায়াত ও যোগাযোগ রাখবার সুবিধের জন্যে মালিক নাজির আহম্মদকে হত্যা করে একখানা ট্যাক্সি দখল করে নেওয়া হয়েছিল।

অস্ত্রাগার-আক্রমণ

সহরের প্রান্তে অবস্থিত পুলিশ-লাইনের অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হচ্ছে, এমন সময় এক রক্ষী বাধা দিতে এসে নিহত হ'ল। অপরাপর রক্ষীরা পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিল। যতদূর সম্ভব বিনা বাধায় প্রচুর অস্ত্র লুণ্ঠিত হ'ল।

অতিরিক্ত সামরিক বাহিনীর অস্ত্রাগার ও প্রধান ছাউনী (Auxiliary Force Head Quarters) আক্রান্ত হলে, সেখানকার রক্ষী বাধা দিতে এসে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালো ও সঙ্গে মরলেন সেনানায়ক ফ্যারেল (Major Farrell)। অস্ত্রাগারের বজ্র-সদৃশ দৃঢ় কপাটের হুড়কোর সঙ্গে নতুন গাড়ীর পিছনদিকে নিবদ্ধ মোটা দড়ির অংশ বেঁধে দিয়ে গাড়ীখানা প্রচণ্ড শক্তিতে চালিয়ে দিলে, দরজা ফাঁক হয়ে গেল। মহোল্লাসে বীরের দল শক্তি-সামর্থ্য-মত বন্দুক ও অপরাপর অস্ত্রাদি সংগ্রহ করে বেরিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে পুলিশ-লাইন-আক্রমণকারীরা এসে মূল দলে যোগ দেবার পর বিজয়ের আনন্দে সবাই ভরপুর। পাহাড়তলী রাস্তা দিয়ে যখন একটা দল চলেছে, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ী সে-পথে তখন যাবার সময় আক্রান্ত হয়। তিনি কোনও রকমে রক্ষা পেলেও, সঙ্গের আর্দ্দালীর প্রাণনাশ ঘটে।

চট্টগ্রাম সহর থেকে ভুমভুমা পঞ্চাশ মাইল দূরে। সেখানে জারারগঞ্জের সন্নিকটে রেল-লাইন উঠিয়ে ফেলা হয় এবং একখানা মালগাড়ী লাইনের ওপর পড়ে যায়। পরের গাড়ী-চলাচল সম্পূর্ণ রুদ্ধ হ'ল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস তছনছ। বাইরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের ওপর আক্রমণ নিষ্প্রয়োজন, কারণ সেটা লোকশূন্য।

চার ঘণ্টা অবাধ লুণ্ঠন চলার পর 'জল-কল'-এর (water-works) দিক থেকে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যন্ত্রচালিত কামান (machine gun) থেকে গোলাবৃষ্টি দিয়ে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের গুলি দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দেওয়া চলেছিল।

১৯৩০ এপ্রিল ১৮-ই গণতান্ত্রিক বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা, অধিনায়ক সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে, অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে—চট্টগ্রামের বিজয়গৌরব সারা বাঙ্গলায় ছড়িয়ে দেওয়া। সেই আদর্শে অন্যান্য অঞ্চল উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠবে।

মাঝে মাঝে দু'পক্ষে অস্ত্র-বিনিময় চলছে। ইত্যবসরে 'ডাব্‌ল্ মুরিংস জেটি' (Double Moorings Jetty) অস্ত্রাগার থেকে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সাহায্য এসে পড়লে বিপ্লবীদের সাময়িক অসুবিধা বৃদ্ধি পায়।

দুর্ঘটনা

পুলিশ-লাইন-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর, তার মধ্যে পেট্রল ছিটিয়ে অগ্নিসংযোগের সময় হিমাংশুবিমল সেনের পোশাকে আগুন লেগে যায়। ভীষণ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে নিয়ে দু'জন প্রধান ও দু'জন সৈনিক স্থানান্তরে রেখে দেবার জন্যে একটা মোটরে করে সে-স্থান পরিত্যাগ করেন।

হিমাংশুকে চন্দনপুরায় এক বাড়ীতে রেখে দেওয়া হয়। এপ্রিল ১৯-এ সেখানে পুলিশ উপস্থিত হয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং কোতোয়ালিতে নিয়ে যায়। পরে চট্টগ্রাম বড় (General) হাসপাতাল এবং সেখান থেকে জেল-হাসপাতালে নিয়ে গেলে, এপ্রিল ২৮-এ অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যে তাঁর দেহান্তর ঘটে।

সূত্র ছিন্ন করে একটু সরে আসা যাক। অস্ত্রাগার-আক্রমণের পর থেকে গভর্ণমেণ্ট সময়-সময় বাইরে থেকে সৈন্য এনে দল পুষ্ট করেছে আর বিপ্লবীদের পক্ষে একে একে সংখ্যা হ্রাস হয়েছে।

দু'দিনের মধ্যে সশস্ত্র গুর্খা-পুলিশ এসে সহর ও সহরতলীতে ছড়িয়ে পড়লো আর নিকটবর্ত্তী অঞ্চল থেকে সামরিক পুলিশ আমদানী হ'ল। 'সুরমা ভ্যালি লাইট হর্স' (Surma Valley Light Horse) আর 'ঈষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফ্‌ল্‌স্' (Eastern Frontier Rifles) পল্টন এসে পড়ায়, কেবলমাত্র গুর্খা-সৈন্য-সংখ্যা ১,৫০০-তে দাঁড়ায়।

এইবার আত্মরক্ষার পালা। বিপ্লবীরা এপ্রিল ১৯-এ সুলকবাহার এবং পরদিন ফতেহাবাদ পাহাড়ে এসে উপনীত হলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি এসেছে। অতি কষ্টে এবং দারুণ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে গ্রামপ্রান্ত থেকে যৎসামান্য ভোজ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে।

জালালাবাদ

নানাবিধ বিঘ্ন ঠেলে, জালালাবাদ পাহাড় পর্যান্ত চট্টগ্রাম থেকে মাত্র তিন মাইল তফাতে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। গুপ্তচর মারফত খবর পেয়ে, কামান গোলাগুলি সৈন্যসামন্ত সদলবলে সেখানে এসে হাজির। বিকাল ৫-টায় উভয়পক্ষের প্রকাশ্য সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল। বিপ্লবীরা পাহাড়ের মাথায়; হাতে রাইফ্‌ল্‌। গভর্ণমেণ্ট-পক্ষ দূরপাল্লার বন্দুক ছাড়া, শক্তিশালী লুইস কামান (Lewis gun) নিয়ে পাহাড়ের নিচ থেকে গোলা ছুড়তে লাগলো। বিপ্লবীদের বিক্রমের কাছে পরাজিত হয়ে রাত্রির জন্যে গভর্ণমেণ্ট-পক্ষ সরে পড়ে। তাদের কতজন হতাহত হয়েছিল, সে-সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি।

জালালাবাদ পাহাড়ের ওপর কয়েকজন বীরের মৃত্যু ঘটে। প্রথম বলি

হরিগোপাল বল (টেগ্‌রা); পরে ত্রিগুণা সেন, নির্ম্মল ঘোষাল, বিধু ভট্টাচার্য্য, নরেশ রায়, শশাঙ্ক দত্ত, যতীন দাশগুপ্ত, পুলিনবিকাশ ঘোষ, মধুসূদন দত্ত ও প্রভাস বল।

যখন ভোরে তোড়জোড় করে পল্টন ও পুলিশ আবার এসে গেল, তখন পর্য্যন্ত মতিলাল কানুনগোর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়নি; পুলিশের জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজ নাম বলে, "হরি-বোল" উচ্চারণ করে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জালালাবাদ পাহাড়ের ওপর মৃতদেহ স্তূপীকৃত করে একসঙ্গে সৎকার করা হয়।

অবশিষ্ট বিপ্লবী-দল নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে তখনকার মত গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা পান। গোপন আস্তানা থেকে তাঁরা নানারকম ধ্বংসাত্মক কার্য্য করেছেন এবং 'মাস্টার-দা'র গ্রেপ্তার পর্য্যন্ত সমানে পৃথক্‌ভাবে গভর্ণমেণ্টকে সন্ত্রস্ত ও বিব্রত করেছিলেন।

পুলিশ ধাওয়া করে চলেছে। পলায়মান বিপ্লবীদের প্রায় সকলেই 'গা-ঢাকা' দিতে সমর্থ হলেও, একটা মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল অর্দ্ধেন্দু দস্তিদারকে নিয়ে। অস্ত্রাগার-আক্রমণকারী দলের মধ্যে ছিলেন অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার। এ কাজে লিপ্ত হবার কয়েকদিন আগে আস্কর-দীঘির পাড়ে এক আস্তানায় বোমা তৈরী করবার সময় বিস্ফোরণে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। ক্ষত সম্পূর্ণ সারেনি। তা সত্ত্বেও "দুর্গ"-জয়ের সম্মান হতে তিনি নিজেকে সংযত করতে পারেননি।

জালালাবাদ যুদ্ধে তিনি ডানহাতে ও তলপেটে গুলিবিদ্ধ হন। ভোরে জ্ঞান হলে বুঝতে পারেন আঘাত অত্যন্ত গুরুতর, উঠে চলে যাবার সম্ভাবনা নেই। প্রত্যূষে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে, এপ্রিল ২৩-এ বেলা ১-৪০ মিনিটে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। এ-ক'দিন ধরে জেরা আর ভয়-প্রদর্শনে তাঁকে মৃত্যুযন্ত্রণার শতগুণ যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে। পরদিন ২৪-এ, রাত্রি ১-৫৭ মিনিটে মৃত্যুর দাক্ষিণ্যে তিনি সকল যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতিলাভ করেন।

সদরঘাট

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-আক্রমণে অমরেন্দ্রনাথ নন্দীর একটা বিশিষ্ট অংশ ছিল। তিনি সেখান থেকে সরে পড়ে গ্রাজুয়েট হাই স্কুল (Graduate High School)-এর খালি বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গুপ্তচর-সাহায্যে খবর পৌঁছুলে, ১৯৩০ এপ্রিল ২৪-এ পুলিশ এসে তাঁকে তাড়া করে। সদরঘাট রোড দিয়ে ছুটে চলতে চলতে আলকরণ লেনের কাছে এসে এক ছোট পুল-এর (culvert) তলায় ঢুকে পড়েন। সে-অবস্থায়ও তিনি পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকেন। যখন দেখলেন উদ্ধারের আর কোনও আশা নেই, তখন রিভলভার ঘুরিয়ে নিজের দেহে গুলি মেরে আত্মহত্যা করেন।

কালারপোল

চাকা ঘুরছে—ইংরেজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। মাঝে মাঝে বিপ্লবী ও পুলিশে সংঘর্ষ হচ্ছে। যখন চারিদিকে দলে দলে পুলিশ ঘুরছে, তখন গভর্ণমেণ্ট-কৃপাপুষ্ট গ্রামবাসী কেউ কেউ পুলিশকে সংবাদ জুটিয়েছে। ১৯৩০ মে ৬-ই বিকালের দিকে ছ'জন যুবককে রাস্তার ওপর সন্দেহজনকভাবে অতি সাবধানে চলতে দেখা যায়। এঁরা বেরিয়েছিলেন গুপ্ত আস্তানা থেকে একখানা সাম্পান নিয়ে নদী পার হয়ে ইয়োরোপীয়ান ক্লাবকে আক্রমণ করতে। জীবন যাঁদের হাতের মুঠোয়—দুর্জ্জয় তেজ, কল্পনাতীত সাহস নিয়ে তাঁরা বেড়াচ্ছেন। কর্ণফুলি নদীতে ছ'জনের সন্তর্পণে সাম্পান চড়ে যাবার সংবাদ পুলিশকে পৌঁছে দেওয়া হলে, তারা পলাতকদের সাম্পানখানা সামান্য ব্যবধান রেখে অনুসরণ করতে থাকে। মাঝনদী থেকে তারা অগ্রগামী সাম্পান-আরোহীদের দেখতে পায় যে, নদী-পাড়ে নেমে তাঁরা কালারপোলের দিকে যাচ্ছেন।

সামান্য পরেই পুলিশ গিয়ে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে। প্রায় ধরা পড়ার মুখে একজন রিভলভার ছুড়লে, দু'জন অনুসরণকারী মারা পড়ে। কনষ্টেবল প্রসন্ন বড়ুয়া খুব কাছে এসে পড়ায়, তিনিও গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হন। পরে ৯-ই তাঁর দেহান্ত ঘটে।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পড়ে এবং ফণীন্দ্র নন্দী ও সুবোধ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। বাকী চারজন—স্বদেশ রায়, রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেন এক বাঁশঝাড়ের পিছনে আশ্রয় নেন। গভীর রাত্রি; বাঁশঝাড় ঘিরে গ্রামবাসী আর পুলিশ সারারাত চৌকি দিয়েছিল। জায়গাটার নাম সমীরপুর।

ভোর হতে-না-হতেই সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে যখন পুলিশের গুলির আর প্রত্যুত্তর আসে না, তখন দেখা গেল বাঁশঝাড়ের মধ্যে তিন বীর প্রাণত্যাগ করেছেন, আর স্বদেশ রায় জীবন্মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। পরের দিন মৃত্যু এসে ভবিষ্যতের সকল জ্বালা থেকে তাঁকে মুক্তি দিল।

প্রত্যেকের দেহে পুলিশের গুলি ছাড়া, আত্মঘাতী আঘাত দেখা গেছে। পুলিশের হাতে ধরা-পড়ার চেয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ শ্রেয় বলে তাঁদের মনে হয়েছে এবং তদনুসারে কাজ করেছেন।

সুবোধ ও ফণীকে মূল মামলায় আসামী করা হয়।

মামলা আরম্ভ

অস্ত্রাগার-আক্রমণ ও আনুষঙ্গিক অপরাধের জন্যে আসামীদের সন্ধানে চট্টগ্রাম-সমেত সমগ্র বাঙ্গলা, এমনকি বাঙ্গলার বাইরেও পুলিশ-বাহিনী উঠে-পড়ে লেগে গেল

এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক-ধরা চলতে লাগলো। বাছাই করে ছেড়ে দিতে বা আটকবন্দী করে বেশ কতকজনকে রেখে দেবার পর ত্রিশজনকে আসামী করে প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলা খাড়া করে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে পেশ করা হয়।

অভিযোগ খুঁজে বার করতে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের অনেকগুলি ধারা এবং নানা নতুন আইন ভঙ্গের অপরাধ উল্লেখ করা হয়।

মামলা চট্টগ্রামেই আরম্ভ হ'ল—১৯৩০ জুলাই ২৪-এ। খুব খানিকটা এগিয়ে যাওয়া অর্থাৎ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চলেছে, এমন সময় নতুন ঘটনার সমাবেশ হ'ল।

চন্দননগর

পলাতক আসামী ধরবার জন্য অন্যান্য স্থানের মতো, হয়তো তার চেয়েও বেশী দৃষ্টি রাখা হয়েছিল কলিকাতা সহরকে কেন্দ্র করে আশপাশের সমস্ত অঞ্চল ঘিরে। হিমাংশুকে যাঁরা দগ্ধ অবস্থায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদেরই চারজন নানা আপদ-বিপদের মধ্যে কলিকাতায় এসে পড়লেন। সহানুভূতিসম্পন্ন কয়েকটি গৃহস্থ-পরিবারের মধ্যে বাস করার পর, চন্দননগর গোঁদলপাড়ায় এক বাড়ীতে আশ্রয় ঠিক করা হয়। সশস্ত্র ও সন্ত্রস্তভাবে দিন কাটছে কোনও রকমে।

পুলিশ সন্ধান পেয়ে, সেপ্টেম্বর ১-লা মাঝরাত্রে কলিকাতা থেকে রওনা হয়ে গোন্দলপাড়ার বাড়ীটা ঘিরে ফেলেছিল। বাড়ীটার দোতলার চিলে-কোঠায় বসে সশস্ত্র একজন বাইরের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। পুলিশের আবির্ভাব তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ভোরের আলোর সঙ্গে দু'পক্ষের গুলি-বিনিময় চলতে থাকে। একজন ফেরারী পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে পালাবার সময় বুলেট-বিদ্ধ হয়ে বাড়ীর পুষ্করিণীতে পড়ে যান। বুলেট-আঘাতই যথেষ্ট ছিল, তার ওপর প্রায় মৃত অবস্থায় জলে ডুবে জীবন (মাখন) ঘোষালের প্রাণহানি হয়।

পুলিশের কবল থেকে পালাবার কোনও পথ ছিল না। পুলিশ বাড়ীর আশপাশ থেকে কতকজনকে গ্রেপ্তার করে জীবিত-মৃত সকলকে নিয়ে কলিকাতায় ফিরে আসে। তা ছাড়া ফেরারী শ্রীঅনন্ত সিংহ ভিন্নস্থানে থাকায়, তখনকার মতো রক্ষা পান। কিন্তু তিনি ইলিসিয়াম রো (লর্ড সিংহ রোড) আই.বি.-র বড়কর্ত্তার অফিসে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন।

মামলার যবনিকা

এখন চট্টগ্রাম মামলায় ফিরে আসা যাক্। নতুন চার আসামী যোগ করে মামলা "কেঁচে-গণ্ডুষ" (*de novo*) পর্য্যায়ে শুরু হ'ল—সেপ্টেম্বর ১১-ই থেকে।

সব বাদসাদ দিয়ে আসামী-সংখ্যা সেই ত্রিশজন। একদিকে মামলা চলছে, —বাইরে পলাতক বীরের দল নানা কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন। রায় প্রদত্ত হ'ল—

১৯৩২ মার্চ ১-লা। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ঘটে দ্বাদশজনের। একজনের তিন বছর সশ্রম আর একজনের তিন বছরের চরিত্র-সংশোধনী (borstal) জেল ঘটে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত ঃ

(১) অনন্ত সিংহ, (২) লালমোহন সেন, (৩) সুবোধ রায়, (৪) রণধীর দাশগুপ্ত, (৫) সুবোধ চৌধুরী, (৬) ফণীন্দ্র নন্দী, (৭) সহায়রাম দাস, (৮) গণেশ ঘোষ, (৯) লোকনাথ বল, (১০) সুখেন্দু দস্তিদার, (১১) ফকির সেন ও (১২) আনন্দ গুপ্ত।

অনিলবন্ধু দাসের 'বোর্‌ষ্টাল' তিন বছর এবং অপর একজনের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়; বাকী ক'জনের মুক্তি হয়।

এই মামলার আসামী অনিল রক্ষিত ও অর্দ্ধেন্দু গুহর স্বতন্ত্র 'ডাইনামাইট মামলা'য় কারাদণ্ড হয়।

ফেনী

অস্ত্রাগার-আক্রমণের পর ছত্রভঙ্গ হয়ে বিপ্লবীরা চলেছেন। ১৯৩০ এপ্রিল ২৩-এ অনন্ত সিংহ আর তাঁর চারজন সঙ্গী পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তারের সম্মুখীন হন। আত্মরক্ষার্থে অনন্ত রিভলভার ছুড়তে আরম্ভ করলে, পুলিশ বে-সামাল হয়ে পড়ে এবং আততায়ীরা পালাতে সক্ষম হন। ঠিক এইভাবে ১৯৩০ মে ৭-ই চট্টগ্রাম শিকলবাহা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় পুলিশ তাড়া করলে, পলাতক বিপ্লবীরা রিভলভার ছুটিয়ে পালাতে সক্ষম হন।

চাঁদপুর

অস্ত্রাগার-আক্রমণের আর পুলিশের অকল্পনীয় তৎপরতার মধ্যেই গোপনচারী বিপ্লবীরা নিজেদের লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছেন না। সুযোগ পেলেই, অনেকক্ষেত্রে নিজেরা সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়ে, সমানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন।

চট্টগ্রামে গোপনে বিপ্লবীদের নিকট খবর পৌঁছায় যে, পুলিশ-প্রধান (Inspector General of Police) চট্টগ্রামে আসছেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আর কালীপদ চক্রবর্ত্তী গোপন আস্তানায় বসে ঠিক করলেন যে, তাঁকে আক্রমণ করতে হবে।

চট্টগ্রাম থেকে বেরিয়ে পুলিশ-কর্ত্তা লাক্‌সাম চাঁদপুর হয়ে ঢাকা যাবার জন্যে রওনা হবেন। রাত্রি দু'টার সময় ট্রেন লাক্‌সাম পৌঁছুলে, গভর্ণমেণ্ট-রেল-পুলিশের ইন্সপেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায় সেই ট্রেনে উঠলেন—চাঁদপুরে নেমে ইন্সপেক্টর-জেনারেলকে অভ্যর্থনা জানাবেন।

সাহেবের কামরার ঠিক সামনের কামরায় তিনি উঠলেন। ১৯৩০ ডিসেম্বর ১-লা ভোর ৪-টায় ট্রেন চাঁদপুর পৌঁছুলে, তারিণী ট্রেন থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে দুটি যুবক তৃতীয় শ্রেণীর কামরার দিক থেকে এসেই রিভলভার থেকে কয়েকটা গুলি মারেন তারিণীকে লক্ষ্য করে। আহত তারিণী পড়ে যান।

শব্দ শুনে পুলিশসাহেব জানালাটা খুলেই অবস্থাটা বুঝতে পারেন এবং যুবক দু'জনকে লক্ষ্য করে ব্যর্থ রিভলভার ছোড়েন। তাঁর দেহরক্ষী সাহেবের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। ফল সমানই হ'ল। রামকৃষ্ণ ও কালীপদ তখনকার মত পুলিশ-কবল থেকে রক্ষা পেলেন।

চারিদিকে খবর ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বড় বড় রাস্তায় পুলিশ-টহল শুরু হয়ে গেল। আততায়ীরা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছেন। এইভাবে চাঁদপুর থেকে বাইশ মাইল তফাতে মেহেরকালী রেল-ষ্টেশনের কাছে পুলিশ সন্দেহক্রমে তাঁদের গ্রেপ্তার করে এবং ঘটনাস্থলেই দেহ-তল্লাসীতে দু'জনেরই কাছে একটি করে রিভলভার, কয়েকটা কার্ত্তুজ আর রামকৃষ্ণের কাছে শক্তিশালী একটি বোমা আবিষ্কার করে।

তারপর কল্পনায় যা ধরা যায় না, সেরকম অত্যাচার সবই হ'ল, আর ১৯৩১ জানুয়ারী ৩-রা স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের কাছে তাঁদের বিচার আরম্ভ হ'ল। রায় প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ১৪-এ—রামকৃষ্ণের ফাঁসি আর কালীপদর দ্বীপান্তর। রামকৃষ্ণর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা—সুতরাং রায়টি হাইকোর্টের সমর্থনের জন্য 'ফাইল' গেল ১৯৩১ মার্চ ১৭-ই। যথারীতি হাইকোর্ট মার্চ ২৭-এ দুই দণ্ডই সমর্থন করে।

রামকৃষ্ণর ফাঁসি হয়—১৯৩১ আগষ্ট ৪-ঠা, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

টেগার্ট-হত্যা প্রচেষ্টা

দিনদুপুরে ডালহাউসি স্কোয়ার (বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ)-এর মত জনবহুল স্থানে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার-এর হত্যা-প্রচেষ্টা সে-যুগের এক বড় চাঞ্চল্যকর ও প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা।

কিড্ ষ্ট্রীট কোয়ার্টার থেকে প্রতি দুপুরে টেগার্ট লালবাজার পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে যেতেন। ১৯৩০ আগষ্ট ২৫-এ, বেলা ১১-টায় অন্যান্য দিনের মতোই যাচ্ছেন স্কোয়ারের পূর্বদিকে ট্রাম-লাইন (অধুনা-লুপ্ত) ঘেঁষে। স্কোয়ারের পূব-দক্ষিণ কোণ থেকে বিশ-বাইশ গজ যাবার পরই চলন্ত মোটরের বামপাশে প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটলো; সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর দক্ষিণ দিকে আর-একটা। গাড়ী থেমে গেল। ভয়ত্রস্ত লোক এ-দিক ও-দিক ছুটে পালাতে আরম্ভ করেছে, আর সেইসঙ্গে দেখা গেল এক যুবক খানিকটা দক্ষিণে এসে, স্কোয়ারের কোণ পার হয়ে পশ্চিম দিকে চলেছেন। তিনি ডালহাউসি ইন্‌ষ্টিটিউট (বর্ত্তমান 'টেলিফোন ভবন') পর্য্যন্ত এসে, রেলিং-এর

গায়ে ওভারকোট রেখেই সংজ্ঞাহীন হয়ে ফুটপাথে লুটিয়ে পড়লেন। দেহের নানা স্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে কোনও কষ্ট হ'ল না। তদবস্থায় তাঁকে লালবাজার পুলিশ-অফিসে নিয়ে যাওয়া হ'ল; তখন তাঁর প্রাণবায়ু স্তব্ধ হয়ে গেছে। পরে সন্ধানে প্রকাশ পায়, মৃতের নাম অনুজাচরণ সেনগুপ্ত; খুলনা সেনহাটীর লোক। সঙ্গে ছিল দুটো বোমা আর একটা ·৪৫০ নলের রিভলভার।

সঙ্গী দীনেশচন্দ্র মজুমদার পথচারী পলায়নপরদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস (ডালহাউসি স্কোয়ারের দক্ষিণে, রাস্তার অপর পারে অবস্থিত)-এর সামনে এসে এক ট্যাক্সিতে চড়ে বসেন। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছে এক কন্‌ষ্টেবল। একজন ট্যাক্সির মধ্যে ধরতে গেলে, তাঁকে রিভলভার উঁচিয়ে নিরস্ত করা হয়। তখন নেমে পড়ে ছুটতে থাকেন। গভর্ণমেণ্ট প্লেস রাস্তাটায় ঢুকে পড়লে, দু'জন কন্‌ষ্টেবল তাঁকে গ্রেপ্তার করে হেয়ার ষ্ট্রীট থানায় নিয়ে যায়। দীনেশের সঙ্গে ছিল একটি ·৩২০ নলের কার্ত্তুজ-ভরা রিভলভার, কয়েকটা ব্যবহৃত (বুলেট-হীন) কার্ত্তুজ, একটা বোমা, সিগারেট-বাক্স ও কয়েকটা টাকা। দীনেশ ইউনিভার্সিটী ল'-কলেজের ছাত্র; চব্বিশ-পরগনার বসিরহাট তাঁর দেশ।

পরীক্ষায় অনুজার শরীরে আট জায়গায় গভীর ক্ষত দেখা যায় এবং প্রত্যেকটির মধ্যে বোমার টুকরো পাওয়া গিয়েছিল।

দীনেশের বিচার আরম্ভ হয়—১৯৩০ সেপ্টেম্বর ১১-ই। টেগার্ট-হত্যা প্রচেষ্টা, বিস্ফোরক ও অস্ত্র আইন ভঙ্গ প্রভৃতি অভিযোগ। সে-সম্বন্ধে প্রমাণের কোনও অভাব হয়নি। সেপ্টেম্বর ১৮-ই তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়।

একটি বিষয় উল্লেখ করা চলে। টেগার্ট-সাহেব প্রাণে মরলেন না বটে, কিন্তু যাঁকে সাহস ও কূটবুদ্ধির প্রতীক বলে জানা ছিল, নানারকম গুরুতর বিপদকে উপেক্ষা করা যাঁর প্রধান পরিচয়, এই ঘটনায় ভয় তাঁর সকল গুণের স্থান অধিকার করে বসে। তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হতে বিদায়গ্রহণ করেন।

দীনেশ-পর্ব্ব এইখানেই শেষ নয়। তাঁকে মেদিনীপুর জেলে পাঠানো হয়—অক্টোবর ১৭-ই; সেখান থেকে ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ৭।৮-ই মধ্যরাত্রে আর-চারজন দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দীর সঙ্গে পালাতে সক্ষম হন। সেখান থেকে বেরিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেননি বা বাঙ্গলা ছেড়ে অন্যত্র যাননি। ১৯৩৩ মার্চ ৯-ই চন্দননগর ও ১৯৩৩ মে ২২-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের গুপ্ত আড্ডার সংগ্রামের সঙ্গে তাঁকে পাওয়া যায়।

অনুজা-দীনেশ-পর্ব্ব চুকছে, কিন্তু এর পিছনে কারা আছে, সেই রহস্য-আবিষ্কারে গভর্ণমেণ্ট একেবারে সারা বাঙ্গলা, বিশেষ করে কলিকাতা, তোলপাড় করে ফেললে। সন্দেহমাত্রই এলোপাথাড়ি যুবক-ধরা চলেছিল। ঘটনা হচ্ছে—১৯৩০ আগষ্ট ২৫-এ। স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে বিচার আরম্ভ হ'ল নভেম্বর ১-লা। ক'দিন

বাদেই ২৭-এ রায় প্রকাশিত হ'ল। তাতে দু'জনের বিশ বছর হিসাবে, দু'জনের পনেরো বছর হিসাবে, তিনজনের বারো বছর হিসাবে, আর একজনের দশ বছর দ্বীপান্তর আদেশ হয়। দু'জন মুক্তিলাভ করেন ; আর তিন রাজসাক্ষীর তো কথাই নেই।

হাইকোর্টে আপীল দায়ের হ'ল ১৯৩১ ফেব্রুয়ারী ১৮-ই। রায় প্রদত্ত হয়—জুলাই ২৭-এ। ফল দাঁড়াচ্ছে ঃ

	স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল	হাইকোর্ট
	২৭.১১.৩০	২৭.৭.৩১
নারায়ণচন্দ্র রায়	২০ বঃ দ্বীঃ	১৫ বঃ দ্বীঃ
ভূপালচন্দ্র বসু	২০ ,,	১৫ ,,
সুরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৫ ,,	১২ ,,
রোহিণীকান্ত অধিকারী (ওরফে বিমলচন্দ্র রায়)	১০ ,,	৫ বঃ সঃ কাঃ

একজনের বারো বছর দ্বীপান্তর দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডে পরিণত হয়। আর, তিনজন প্রত্যেকের পনেরো বছর দ্বীপান্তর ও দু'জন প্রত্যেকের বারো বছর দ্বীপান্তর আদেশ নাকচ হয়ে যায়। এঁরা সকলেই বিচারে মুক্তিলাভ করেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেককেই সঙ্গে সঙ্গে আটক-বন্দী করে রাখা হয়।

আক্রান্ত ব্যক্তির গুরুত্ব অনুপাতে ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিদের যে অমানুষিক পুলিশী অত্যাচার হয়েছে, সেটা কল্পনাতীত বলা চলে। ঐ নির্য্যাতনের ফলে কারও কারও স্বল্পকালের মধ্যে জীবনান্ত ঘটেছে। কয়েকজন সারা-জীবনের জন্য স্বাস্থ্য হারিয়েছেন ; অকালবার্দ্ধক্য প্রায় সকলকেই এসে ভর করেছিল।

দাসপুর (মেদিনীপুর)

ভারতের অপরাপর অসংখ্য সহর ও পল্লীগ্রামে যেমন চলছিল, (মেদিনীপুর) দাসপুরেও সেইরকম আইন-অমান্য-আন্দোলনের সমর্থনে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বড়-দারোগা ভোলানাথ ঘোষ, আর সহকারী অনিরুদ্ধ সামন্ত আন্দোলন-দমনে একটু বেশী পরিমাণ 'শক্তি' প্রয়োগ করছিলেন ; ১৯৩০ মে ১৩-ই উড়ো-চিঠিতে সাবধান হবার সতর্কবাণী পেয়েছিলেন।

চেচুয়াহাটে পিকেটিং আরম্ভ হয় ১৯৩০ জুন ২-রা। পরদিন ভোলানাথ কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে চার-জনকে গ্রেপ্তার করেন। একজনের সঙ্গে কিছু বচসা হতে, ভোলানাথ তাঁকে বেত-পেটা করেন। গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে বেশ। যখন কন্‌ষ্টেবলরা বে-পরোয়া লাঠি

চালাতে থাকে, তখন উপস্থিত জনতা আর নিরুপদ্রব থাকেনি। একটা দল ভোলানাথকে টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করে, যার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। অনিরুদ্ধকে নিয়ে গিয়ে তারা যে কি করলে, জানা যায় না ; তবে তাঁর যে আর পাত্তা পাওয়া যায়নি, সেটা খুব ঠিক।

অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত সতেরোজনের বিরুদ্ধে হত্যা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারপিট প্রভৃতি অভিযোগে নালিশ করা হ'ল। বেশ বড়-রকমের মামলা। সেসনে বারোজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর পাঁচজনের দু'বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়—১৯৩০ সেপ্টেম্বর ২৫-এ। দু'জন মুক্তি পান ; তাঁরা অন্য মামলায় সাজা ভোগ করছিলেন। এই ঘটনা-সংশ্লিষ্ট অন্য এক মামলায় কানন পূজারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছিল।

দু'জন বাদে সকল আসামী হাইকোর্টে আপীল করেন। তার রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩১ জুন ১৫-ই। তাতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত—(১) মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (২) ভূতনাথ মান্না, (৩) শীতল ভট্টাচার্য্য, (৪) কানন পূজারী, (৫) কালাচাঁদ ঘাঁটি, (৬) সুরেন্দ্র বাগ, (৭) যোগেন্দ্র হাজরা, (৮) বিনোদ বেরা—প্রত্যেকের দণ্ড হ্রাস পেয়ে, সাত বছর সশ্রম কারদণ্ডে পরিণত হয়। তিনজনের দণ্ড দু'বছর করা হয়, আর চারজন মুক্তিলাভ করেন।

মিটফোর্ড হাসপাতাল (ঢাকা)

এ-সময়টায় চারিদিকে বিরাট যে-ক'টা ঘটনার পরিচয় রয়ে গেছে, তার মধ্যে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে দুই প্রধান পুলিশ-কর্ত্তাদের ওপর সার্থক হামলাকে অন্যতম বলে মনে করা হয়।

সরকারী গুপ্তচর তো ছিলই, প্রতিপক্ষ বিপ্লবীরাও এ-কাজে বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। ঢাকায় খবর পৌঁছায়, ১৯৩০ আগষ্ট ২৯-এ, বাঙ্গলার আই.বি.-পুলিশ-প্রধান (I.G. of Police, I.B.) লোম্যান ঢাকা আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন বন্ধু তৎপর হয়ে উঠলেন। জল-পুলিশ (River Police)-এর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অপস্মার-রোগে আক্রান্ত হয়ে মিটফোর্ড (Mitford) হাসপাতালে ছিলেন ; তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন লোম্যান আর সঙ্গে ঢাকার পুলিশ-সুপার হড্‌সন।

রোগী দেখে বেরিয়ে এসে, সকাল ৯-১৫ মিনিটে দু'জনে হাসপাতালের ঢালাও উঠানে দাঁড়িয়ে আলাপ করছেন, এমন সময় পিছনে বিশ-পঁচিশ হাত দূর থেকে সুদর্শন এক যুবক রিভলভার থেকে পাঁচটা গুলি ছুড়লেন। অব্যর্থ সন্ধান ; একটা গুলিও বিফলে যায়নি। সব-ক'টাই লোম্যান ও হড্‌সন-কে বিদ্ধ করেছে, যথাক্রমে তিনটে আর দুটো।

আততায়ী ছুট মেরেছেন। এক কণ্ট্রাক্টর পলায়নকারী একজনের একটা হাত ধরে ফেললে, এক ঝট্‌কায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বীর যুবক ছুটেছেন। মাঠের শেষের দিকে দু'জন তাঁর সঙ্গ নিলেন এবং সকলে মেডিক্যাল কলেজের হোষ্টেলের ভিতর দিয়ে অন্তর্দ্ধান হলেন।

আহত দুই পুলিশ-কর্ত্তার অস্ত্রোপচার হ'ল। লোম্যান মারা গেলেন—আগষ্ট ৩১-এ; আর, হড্‌সন সেরে উঠলেন।

কাউকেও ধরতে পারা গেল না; তখনকার মত তো নয়ই, পরেও না। সমস্ত আক্রোশ পড়লো হোষ্টেলের ছাত্র-অধিবাসীদের ওপর; যার ফলে অন্ততঃ ৫১ জনকে গুরুতর আঘাতের জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হয়েছিল।

সিম্পসন-হত্যা

'ঢাকা ঘটনা'র কোলাহল তখনও থামেনি, এবার হামলা পড়লো গভর্ণমেণ্টের খোদ কর্ম্মকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং (Writers Building)-এর ওপর—১৯৩০ ডিসেম্বর ৮-ই।

বেলা ১২-৩০ মিনিট নাগাদ তিনটি যুবক সাহেবী পোশাকে সজ্জিত হয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এর পশ্চিম কোণের বড় ফটক দিয়ে দোতলায় উঠে যান। তাঁদের পোশাক দেখে কেউ বাধা দেয়নি। দোতলায় পৌঁছেই তাঁরা কারা-বিভাগের প্রধান (Inspector General of Prisons) সিম্পসন (N. G. Simpson)-সাহেবের ঘরের দরজায় দণ্ডায়মান বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সাহেব কামরায় আছেন কিনা। বেয়ারা পরিচয় ও প্রয়োজনজ্ঞাপক কাগজ দিয়ে, সেটাকে ভরে দেবার জন্য বললে। আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে বেয়ারাকে একপাশে ঠেলে ফেলে তিনজনেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সিম্পসন তখন মনোযোগ দিয়ে ফাইল দেখছেন; পাশে এক বাঙ্গালী সহকারী দাঁড়িয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটলো। সিম্পসন আহত হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়লেন; সহকারী টেবিলের তলায় আশ্রয় নিলেন। যুবক তিনটি—বিনয় বসু, সুধীর (বাদল) গুপ্ত আর দীনেশ (নসু) গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে বড় বড় জাঁদরেলদের ঘরের সামনে এসে বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা করেন—ঘরে সাহেব আছেন কিনা।

এ-সময় পুলিশ-প্রধান (Inspector General of Police) ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আততায়ীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। পরে তাঁর সহকারী (Assistant I.G.) তাঁর নিজের রিভলভার চালালেন। কিন্তু দু'জনেরই চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল; গুলি কাকেও স্পর্শ করলে না। বিচার-বিভাগীয় (Judicial) সেক্রেটারী বাইরে আসতে, তাঁর উরুতে বুলেট-বিদ্ধ অবস্থায় কোনওরকমে নিজ কামরার মধ্যে ঢুকে পড়েন।

সমস্ত বারান্দা পার হয়ে বিনয়, বাদল ও দীনেশ পূর্ব্বদিকের শেষপ্রান্তের ঘরটায় পৌঁছুলেন। সেটা পাস-পোর্ট (Passport) অফিস। আগন্তুকদের রণচণ্ডীমূর্ত্তি দেখে বড়কর্ত্তা ও অন্যান্য উপস্থিত লোকরা পালালেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী উঁকি দিতে যাচ্ছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে বুলেট ছুটলো বটে, কিন্তু তাতে কেউ আহত হয়নি।

ঘটনাস্থল থেকে লালবাজার কেন্দ্রীয় থানায় খবর চলে গেছে—দু'মিনিটের রাস্তাও নয়। তাড়াহুড়ো করে হোমরা-চোমরা থেকে খুদে-খাদা পুলিশ-চমু সোরগোল করে এসে পড়ছে। এদিকে ঘরের মধ্যে থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে, অতি সন্তর্পণে এক কন্‌ষ্টেবল ঘরে প্রবেশ করলেন; দেখলেন—দু'জন মেঝেয় পড়ে আছেন, তৃতীয় যুবক একটা চেয়ারে বসে সামনের টেবিলের ওপর মাথা রেখে অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন। নিকটে খানিকটা সাদা গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে, আর আছে দুটো রিভলভার আর কয়েকটা কার্ত্তুজ।

ভূপতিত দু'জনের মধ্যে একজনের কপালের ডাইনে-বাঁয়ে বুলেট-আঘাতের চিহ্ন; কাছে ছ'ঘরা একটা পিস্তল পড়ে আছে। একেবারে সংজ্ঞাহীন অবস্থা নয়। জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, তাঁর নাম বিনয় বসু। দ্বিতীয় ব্যক্তির বাঁ-ঘাড়ের বাঁ-দিকে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন। ছ'ঘরা এক রিভলভার আর কয়েকটা ব্যবহৃত কার্ত্তুজ তাঁর দুটো পায়ের মাঝখানে পড়ে রয়েছে।

বিনয়ের পকেটে এক বুল-ডগ্ (bull-dog) প্যাটার্ণের রিভলভার ছিল। মেঝের ওপর সুধীরের পকেটে কয়েকটা তে-রঙ্গা জাতীয় পতাকা দেখা গিয়েছিল।

মৃত সুধীরকে শবব্যবচ্ছেদাগারে নিয়ে যাওয়া হ'ল; আর বিনয় ও দীনেশকে মেডিক্যাল কলেজে। পরদিনই দু'জনকেই জেল-হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হ'ল; ১৫-ই পর্য্যন্ত সেখানে বাসের হুকুম। ১০-ই বিনয় সামান্য জ্ঞানলাভ করার সঙ্গে মাথার ব্যাণ্ডেজ আলগা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কতকটা সফলও হলেন, আর ক্ষতর ভিতর থেকে মস্তিষ্কের কিছুটা গড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। ডিসেম্বর ১৩-ই তাঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়ে গেল। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি বলে যান—তিনিই লোম্যানের হত্যাকারী। দস্তুরমত পুলিশ-চৌকিদারির মধ্যে তাঁর অন্ত্যেষ্টি নিমতলা শ্মশানে সম্পন্ন হয়েছিল।

অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার ফলে দীনেশ রোগমুক্ত হন। এইবার বিচারের পালা। ১৯৩১ জানুয়ারী ২০-এ তাঁর বিচার শুরু হয়ে, ফেব্রুয়ারী ২-রা রায় প্রকাশিত হয়। হাইকোর্ট তাঁর আপীল নাকচ করে—১৯৩১ মার্চ ২৭-এ। পরে জুলাই ৭-ই প্রত্যূষ ৩-৪৫ মিনিটে দীনেশ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

দীনেশ মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে অধিকতর গৌরবের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এই পুনর্জন্মলাভ বিফল হয়নি। মৃত্যুকে কি করে উপেক্ষা করতে হয়—কানাইলাল দত্তর মতো দীনেশ জগৎকে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর দেহের ওজন বেড়েছিল; মনের সজীবতা শেষ পর্য্যন্ত সমান বর্ত্তমান ছিল। মাত্র ঊনিশ বছরের যুবক কর্ত্তৃক আত্মীয়দের কাছে লিখিত চিঠি কেবল তাঁর অন্তরের পরিচয় দিচ্ছে না, প্রকৃত বিপ্লবীর জীবনদর্শনকে লেখার ফাঁদে রূপ দিয়ে গেছেন। দীর্ঘ হলেও, সব-কয়টি পত্রের নকল 'বসুধারা' পত্রিকার ১৩৬৭, আশ্বিন-সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনামা ছিলঃ "মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে"।

* * *

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পাবার পর, সে যাহা ভাবিল তাহা সাধারণ মানুষের কাছে বিস্ময় উৎপাদন করে। দীনেশ তাহার দাদা ডাঃ পৃথ্বীশচন্দ্র গুপ্তকে (৯.২.৩১) যাহা লিখিল, তাহা কেবল দীনেশের মতো বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব। তাহার একটা রোমাঞ্চকর আনন্দের অভিজ্ঞতা হইয়াছে—মৃত্যুটাও অভিনব ধরনের হইবে; "জীবনে একটা thrilling experience লাভ করা গেল, সন্দেহ নাই। মৃত্যুটাও একটা novelty হবে। ··· আমার শরীর ও মন দুই-ই ভাল।" না হইবার কথা নহে—কারণ সে এ দুই বস্তুর চিন্তার উপরে উঠিয়াছে, সবই সে দেশমাতৃকা ও দেবাদিদেব শিবকে অর্পণ করিয়াছে। দেহমনের বালাই আর তাহাকে বিরক্ত-বিব্রত করিতেছে না।

কি-ভাবে মৃত্যু জয় করিতে হয় তাহার ব্যবস্থাপত্র (prescription) তাহার ভাষায় দিলে, তাহার প্রকৃত পরিচয়লাভের সুযোগ হইবে। মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ তাহার মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া ও আত্মীয়দের মন অশান্ত করিয়াছে; তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে (২৯.৩.৩১) দীনেশ তাহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে যাহা বলিল—তাহা বেদান্ত, উপনিষদ্ ও গীতার সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"কিসে তোমাদের মনে শান্তি আসিতে পারে তুমি তাহার উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি কি আর তা বলিতে পারি ছাই। তবে আমার মনে হয় মরণকে আমরা বড় ভয় করি তাই মরণের কাছে আমরা পরাজিত হই। এই ভয় যদি জয় করিতে পারি তবে মরণ আমাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইবে। মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া নির্ভয়ে প্রশান্তচিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। আর আমরা হিন্দু, মরণকে আমাদের ভয় করিলে ধর্ম্মের প্রথম সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমরা জানি মরণ আমাদের হয় না; হয় এই নশ্বর দেহের। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। সেই আত্মাই আমি। আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সে-উপলব্ধি হয় তখনই সে বলিতে পারে "আমিই সেই"। ··· গীতা বলিয়াছেন—শস্ত্রসকল আমাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে

ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী।

"তুমি বলিবে—'এসব কথা তো আমিও জানি, কিন্তু মন তো শান্তি মানিতে চায় না।' মন শান্ত করিবার একমাত্র উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ। ইহা ভিন্ন শান্তি পাইবার আর কোন উপায় নাই। আমরা যতই জপ-তপ করি, ফোঁটা-তিলক কাটি না কেন, কিন্তু তাঁকে আমরা ভালবাসিতে পারি কই! তাঁকে যে ভালবাসিতে পারে, মরণ তো তার কাছে একটি ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তাঁকে তেমন করিয়া ভালবাসিয়াছিল বাঙলার নিমাই, প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট—আর আমাদেরই দেশে যেসব ছেলেরা হাসিমুখে মরণকে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিল তারা।"

মানুষ যে ভগবানের হাতের খেলার পুতুল, তাহার নিজস্ব সত্তা কিছু নাই, "ফুরাইলে বেলা—ফেলিয়ে সে খেলা, চলে যায় পুনঃ আপন আলয়ে"—এই কথাটি অতি সহজ, সুন্দর ভাবে যেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর বলার ভঙ্গীতে দীনেশ বলিতেছে (১৮.৬.৩১):

"তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আমি পুতুল নাচাইতাম। পুতুল আসিয়া গান গাহিত: 'কেন ডাকাইছ আমারে মোহন ঢুলী'। যে পুতুলের পার্ট শেষ হইয়া যাইত তাহাকে আর ষ্টেজে আসিতে হইত না। ভগবানও আমাদের নিয়া পুতুলনাচ নাচাইতেছেন। আমরা এক এক জন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পার্ট করিতে আসিয়াছি। পার্ট করা শেষ হইলে, প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে। তিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে আমাদের সরাইয়া লইয়া যাইবেন, ইহাতে আফশোষ করিবার আছে কি ?"

আত্মা অবিনাশী, সুতরাং এ মৃত্যু তো মৃত্যু নয়। সকল ধর্ম্ম এই এক কথা ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করিতেছে। দীনেশ ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী; জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মানুষের এই খেলা চলিতেছে।

আরও পরিষ্কার করে দীনেশ মৃত্যু ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বলিতেছে:

"পৃথিবীর যে-কোনো ধর্ম্মমতকে জানিতে হইলেই আত্মার অবিনশ্বরতা স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা হিন্দু; হিন্দুধর্ম্মে এ-সম্বন্ধে কি বলিয়াছে কিছু কিছু জানি। মুসলমানধর্ম্মও বলে—মানুষ যখন মরে তখন খোদার ফেরেস্তা তাহার রু কবজ করিতে আসেন। মানুষের আত্মাকে ডাকিয়া বলেন—'আয় রু, নিকাল এই কালেফ্‌সে, চল্‌ খোদাকা জিনুৎ মে'—অর্থাৎ, তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল্‌। তাহা হইলে বোঝা গেল মানুষ মরিলেই তাহার সব শেষ হইয়া যায় না, মুসলমান-ধর্ম্মের এ বিশ্বাস আছে। খৃষ্টানধর্ম্ম বলে—"Very quickly there will be an end of thee here; consider what will become of thee in the next

world.'—অর্থাৎ, দিন তো তোমার ফুরিয়ে এল, পরকালের কথা চিন্তা কর। বোঝা গেল খৃষ্টানধর্ম্মও বিশ্বাস করে—মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না। এ তিন ধর্ম্মের কোনোটা স্বীকার করিতে হইলেই আমাকে মানিয়া লইতে হইবে আমার মৃত্যু নাই। আমি অমর। আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারও নাই।"

দীনেশ মনে করিত প্রার্থনা কখনও বিফল হয় না; যাহা পাওয়া যায় বা যায় না, তাহা আমাদের মনের মত হয়না বলিয়া আমরা অবিশ্বাসী হইয়া উঠি। মাকে (৩০.৬.৩১) লিখিত পত্র হইতে তাহার জীবন-দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে অতি স্পস্টভাষায়ঃ

"তুমি হয়তো ভাবিতেছ ভগবানের কাছে এত কাতর প্রার্থনা করিলাম তবুও তিনি শুনিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই পাষাণ, কাহারও বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদ তাঁহার কানে পৌঁছায় না। ভগবান কি আমি জানি না, তাঁহার স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও এ-কথাটা বুঝি—তাঁহার সৃষ্টিতে কোনো অবিচার হইতে পারে না। তাঁর বিচার-ঘরের দ্বার চিরকাল খোলা, নিত্যই তাঁর বিচার চলিতেছে। তাঁর বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তুষ্টচিত্তে মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কী দিয়া যে তিনি কী করিতে চান তাহা আমরা বুঝিব কেমন করিয়া?

"মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোটছেলের মিথ্যা জুজুবুড়ীর ভয়। যে মরণকে একদিন সকলকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দু'দিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য? যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল—মৃত্যু মিত্ররূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে।"

আপাতদৃষ্টিতে পূজায় সাক্ষাৎ ফল হয় নাই, কিন্তু আরাধ্য দেবতার নাম-গ্রহণে যথেষ্ট সুফল আছে। বৌদিকে বুঝাইল (১.৫.৩১): "শিবপূজায় ফল হইবে না, এ কথা তুমি লিখিয়াছ কেন? শিব যে আমার উপাস্য দেবতা, তাঁর কাছে আমি নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেন আমায় মুক্তি দেন—এই দেহপিঞ্জর হতে তিনি আমাকে তাঁর কোলে টানিয়া লন। ভগবানের আমি চির দাস। তিনি আমাকে অসীম দয়া করিয়াছেন, সংসারপথে আমায় ফেলেন নাই।"

ইহার পরও দীনেশ (২৫.৬.৩১) শিব-সম্বন্ধে তার আরও নির্ভরতার কথা প্রকাশ করিয়াছেঃ "তিনি আমার অন্তরে আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে বুঝিতে শিক্ষা দিন—জীবন কিছু নয়, মৃত্যু কিছু নয়। তিনিই সব, জগতের সব-কিছুই তিনি। প্রত্যেক মানুষের শেষ লক্ষ্যস্থানও তিনিই।"

পত্র ইংরেজীতে লেখা। তার নিজের ভাষায় ঃ

"Let Shiva take His place in my heart and teach me that life is nothing and death is nothing. He is all. He is everything. He is the goal of every man to reach."

মৃত্যুভয়ের পরই মানুষ দুঃখচিন্তায় বিব্রত। চিরদিন সুখে যায় না, তাহা জানিলেও, দুঃখ বা দুঃখ-আগমনের সম্ভাবনায় মানুষ বিচলিত হইয়া পড়ে। দুঃখ যে নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের কারণ নয়, তাহা দীনেশ বৌদিদিকে (২৮.৫.৩১) বুঝাইতেছে ঃ

"পৃথিবীতে সুখের চেয়ে দুঃখের মূল্য বেশী। দুঃখের ভিতর দিয়া মানুষ যেমন মানুষকে চিনিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নয়। দুঃখই মানুষকে যাচাই করিবার কষ্টিপাথর। সুখের ভিতরে পেতলকে সোনা বলিয়া মনে হয়, কাচকে কাঞ্চন বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু তাদের স্বরূপ প্রকাশ পায় তখন—যখন আসে দুঃখ-দুর্দ্দৈব। ঝুটা যা, তা দূর হইয়া যায় ; যেটুকু থাকে তা দুঃখের আগুনে পুড়িয়া নিখাদ নির্ম্মল হইয়া থাকে।

* * *

.. "দুঃখ মহান্, দুঃখ সুন্দর। দুঃখের স্পর্শে যে আসে তারও সব কলুষ সর্ব্ব গলদ ধুইয়া যায়। দুঃখ স্পর্শমণি—লোহাকে সোনা করে। তাই বলি—দুঃখ পাইয়াছ বলিয়া দুঃখ করিও না।"

দীনেশ যেন মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিতেছে, তাহার সহিত সম্পূর্ণ মিতালি হইয়াছে। ইহাকে সে দেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ মনে করিতেছে। ভগবানের দান কেবল ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যরূপে দেখা দেয় না, বিপদ ও মৃত্যু তাহারই ভিন্ন রূপ।

তাহার ছোড়দাকে লিখিয়াছে (৮.৪.৩১) ঃ

"Death may not be adventure to me but I take it as the blessing of God. Hindu philosophy says that God's blessing does not always come as worldly happiness, but it also manifests itself in the form of danger and death."

মরণের পর যেন কেউ শোকাশ্রুপাত না করে, তাহাতে সে অত্যন্ত ব্যথাই পাইবে। ফুল, সূর্য্যের আলো, সঙ্গীতের সুর সব যেন তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। সে তাহার মধ্যে চিরনিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয়গ্রহণ করিবে। সঙ্গীতের শেষ রেশটুকুর মতো সে মিলাইয়া যাইতে চায়। জীবনের যত আনন্দ, পৃথিবীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্মৃতি তাহার যাত্রার পথে—নিদ্রালসচিত্তে ঘুমপাড়ানী ছড়ার মত কাজ করিবে—

"Memories of life and laughter,
Memories of earthly glee,
As I go to the hereafter
All my lullaby shall be." (৮.৪.৩১ তারিখে লিখিত)

দীনেশ বলিতেছে (১.৫.৩১) ঃ

"আমি অমৃতের সন্তান। তিনি আমার পরম ও চরম লক্ষ্য। তিনি সত্য। চিরপ্রেমে আমি তাঁহার সহিত মিশিয়া থাকিতে চাই।"

"I am the son of God. He is my supreme and ultimate aim. He is the truth and I want to be one with Him in everlasting love."

জীবন আনন্দময়, কিন্তু কখনও কখনও মৃত্যু তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক। চিরনিদ্রা জীবনের যত জ্বালা-যন্ত্রণায় শান্তির প্রলেপ দান করে। মৃত্যু এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিবে ; উহা তাহার পরম মিত্র। মুক্তি, অনন্ত জীবন এই মৃত্যুর মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। দীনেশের নিজের ভাষায় (২২.৬.৩১) ঃ

"I am not grieved in the least to die. I do agree that life is sweet but sometimes death is sweeter.

"I want to sleep, deep sleep, sleep that soothes the heart from the endless miseries and misfortunes of the world. Death is my friend, my greatest benefactor. Death will release me from this bondage ; death will make me free. My liberty is in death, my life eternal is in death."

মনে বহু জোর থাকিলে, মৃত্যুকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া মানুষ তাহার সহিত হাস্যকৌতুক করিতে পারে, বন্ধুর মতো খোসগল্পে মজিয়া মৃত্যুর দিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে পারে। যেখানে বিমর্ষতা, বিহ্বলতা ও আক্ষেপ মনকে আলোড়িত করে, সেখানে আনন্দের স্থান নাই। যে ইহাতে অভিভূত হয় না, সে বাস্তবিকই সাধারণ মানুষ হইতে অনেক ঊর্দ্ধে স্থানলাভ করিয়াছে। তাহাকে পত্রে সে-কথা বলিলে, সরস উত্তরে জানাইল (৮.৬.৩১) ঃ

"লিখিয়াছ, আমি নাকি তোমাদের অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছি। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমার পা-দুটা মাটীতেই আছে, উপরে উঠিয়া যায় নাই। কাজেই বুঝিতে পারিলাম তোমাদের সঙ্গে এক জমিতেই আছি—উপরে নাই।"

ফাঁসির রায় বাহির হইবার পর দীনেশের দেহের ওজন বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ মন না হইলে, ইহা কি সম্ভব ? এখানে কানাইলাল দত্ত, গোপীমোহন সাহার নাম মনে আসে। ইহাদের ওজন-বৃদ্ধির পরিমাণ আরও কয়েকটি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবীর অপেক্ষা কিছু বেশী, প্রায় অস্বাভাবিকের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া, জেল-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দীনেশ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে জানাইল (১৯.৩.৩১) ঃ "তুমি তো ডাক্তার, তুমি কি বিশ্বাস করবে এ-ক'দিনে আমার ১২ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে। জেলের ডাক্তারকে যখন বললাম—ওজনের যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেছে, তখন তিনি বললেন—'না, ওটা ঠিকই আছে'—Jail doctor assured

me that the balance was quite all right." বৌদির সহিত আরও মিষ্টভাষণ হইয়াছে (১৭.৫.৩১) ঃ "আমার এখানে বসিয়া বসিয়া খাইয়া দেহবৃদ্ধি হইতেছে— দেহ অর্থে পেট। আগে ছিল পেটের চেয়ে বুক বড়,—এখন হয়েছে বুকের চেয়ে পেট বড়। বাঙ্গালীর বুদ্ধি না কি মাথায় না থাকিয়া থাকে পেটে। আমার বুদ্ধি বাড়িতেছে না কি ?"

মৃত্যুর চিন্তা অতিক্রম করিয়া যাহা ফুটিয়াছে, তাহা মায়ের কথা ঃ "মরতে তো ডরি না, ভাবি মায়ের কথা"। এইখানেই তো মানুষ দীনেশ। যে দেশমাতৃকার প্রেমে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সে আপন মায়ের কথা—জগতে কল্যাণদায়িনী, সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপিণী মায়ের কথা না ভাবিয়া পারে না। সাধারণভাবে বলা যায়, মায়ের স্নেহ হইতে যে-জন বঞ্চিত, জগতে তাহার মত দুর্ভাগা আর নাই। অপরপক্ষে, যাঁহারা জীবনে মহান্ আদর্শ পালন করিয়াছেন, জ্ঞানে বিজ্ঞানে দর্শনে, জীবনের মহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও গরিমা লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা মায়ের শিক্ষা, শাসন, স্নেহ ও সতর্কতার প্রভাবে নিজেরা ধন্য হইয়াছেন, জগৎকে ধন্য করিয়াছেন।

সশস্ত্র প্রকাশ্য যুদ্ধ-পরিচালনায় যতীন্দ্রনাথ (মুখোপাধ্যায়) ভারতের অগ্রদূত। তাঁহার কাহিনী নানা স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। দীনেশের মাতৃভক্তির পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, যতীন্দ্রনাথ মাকে কত শ্রদ্ধা করিতেন, শরৎশশীর সন্তান বলিয়া কত গর্ব্ব অনুভব করিতেন তাহা, অজ্ঞাতবাসকালে মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে [১৩২২ জ্যৈষ্ঠ ৩-রা (?)] লেখা পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় ঃ

"হা-হুতাশ তো সকলেই করিয়া থাকে, আপনি-আমিও যদি তাহাই করি, তবে আমরা আমাদের স্বর্গীয়া মাতৃদেবী শরৎশশীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম কেন ? আমরা তো সাধারণের ন্যায় দুর্ব্বলহৃদয়, অবিশ্বাসী সামান্য মায়ের সন্তান নই।"

নানা দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যেও দীনেশের মায়ের কথা স্মরণে আসিয়াছে। সে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল (১৮.২.৩১) ঃ "অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, কোনও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আমার নাই" ; সেই পত্রেই বলিতেছে—"তবে মাকে দেখিবে"। এক মুহূর্ত্তও ঐ-চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করে নাই। মরণে তাহার কোনও ভয় নাই—"but I am extremely sorry for my mother" (8. 4. 31). মায়ের জন্য তাহার দুঃখের অবধি নাই। তাহার বড়ই দুশ্চিন্তা, বড় ভয় যে, তাহার শবের উপর মায়ের তপ্ত অশ্রু পড়িবে (*ibid*) :

"To die for me, no terror holds
Yet one fear presses on my mind,
Much I fear that over my corpse
The scalding tears of my mother shall flow."

মায়ের কথা যখনই মনে পড়ে, তাহার হরিষে বিষাদ হইয়াছে ; অপার আনন্দ, মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসিতেছে—এক পত্রে (১৫.৬.৩১) লিখিল—

"মুক্তির দিন আসিয়াছে। আনন্দের কথা। কিন্তু তবুও দুঃখ হয় মায়ের চোখের জল, বুক-ভরা ক্রন্দন দেখিয়া। আসা-যাওয়া জগতের নিয়ম, কিন্তু মাকে এ-কথা বোঝানো দায় !"

তাহার জীবনের শেষ পত্রখানি মায়ের উদ্দেশে লিখিয়াছে। স্নেহের "নসু" ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতেছে—(৬.৭.৩১) বেলা ৫৷৷০-টায় লিখিল—

"মা তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। কিন্তু পরলোকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।

"তোমার কিছুই কোনোদিন করিতে পারি নাই। সে না-করা যে আমাকে কতখানি দুঃখ দিতেছে তাহা কেহ বুঝিবে না, বুঝাইতে চাইও না।

"আমার যত দোষ যত অপরাধ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে।

"আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

তোমারই নসু"

কিশোর অবস্থা হইতেই দীনেশ বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বলতার কারণ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে ; ভিন্নপথে জীবনকে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছে। বাঙ্গালীর দুর্দ্দশায় যে-বেদনা সে অনুভব করিয়াছে—একদিন (১৭.৫.৩১) ক্ষোভবশে তাহা প্রকাশ করিল। "চাকৃরি আর টুকটুকে বৌ" এই কথা শৈশব হইতে শুনিতে শুনিতে এই লোভনীয় বস্তু-কয়টি বাঙ্গালী ছেলের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে। লম্বা বুলিতে আনন্দ পায় ; কাজের সময় স্ত্রীর অঞ্চলগ্রস্ত হইয়া আত্মরক্ষা করে। চারিদিকে রোগ, ধ্বংস আর মৃত্যু যখন বাঙ্গালীকে ঘিরিয়া আছে, তখনও সে বিবাহের চিন্তায় মশগুল থাকে। ধিক্ ! ডুবিয়া মরিবার জন্য গঙ্গায় কি জল নাই ?

তাহার নিজের ভাষায় ঃ

"Marriage and clerkship have entered into the bone and marrow of our nation. From their very infancy Bengalees hear from their mothers and grandmothers about pretty wives and clerkship. .... They pour forth high-sounding words and at the time of work hide themselves under the *sarees* of their wives."

মেছুয়াবাজার (কলাবাগান)

উপদ্রব যেমন চলছে, গভর্ণমেণ্টও প্রতিবিধানের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। পুলিশ-গুপ্তচর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ; সন্দেহজনক কোনও ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খ

পরীক্ষা না করে ছাড়া হ'ত না। মেছুয়াবাজার অঞ্চলে একদল যুবকের গতিবিধি গুপ্তচরের সন্দেহ সৃষ্টি করে, এবং অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করবার পর উচ্চমহলে সংবাদটা পৌঁছে দেয়।

ফলে, ১৯২৯ ডিসেম্বর ১৯-এ, পাঁচী ধোঁপানী লেনের এক এঁদো-বাড়ীতে খানাতল্লাসী হয়। ফল নিতান্ত মন্দ হয়নি। বোমা, বোমা-তৈরীর সরঞ্জাম ও মাল-মশলা আবিষ্কৃত হ'ল। তখন আরও জায়গায় জায়গায় তল্লাসী হয় এবং ধরপাকড় চলতে থাকে। ধৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা চল্লিশ ছাড়িয়ে গেল। ছাঁটাই-বাছাই করে সাতাশজনের বিরুদ্ধে ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্র, বিস্ফোরক-আইন-লঙ্ঘন প্রভৃতি অভিযোগে আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে মামলা হয়। ফেব্রুয়ারী ১৪-ই থেকে সাক্ষীসাবুদ-হাজিরা চলতে থাকে। আসামীদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। মামলা আরম্ভ হলে, প্রমাণাভাবে একজনকে মুক্তি দেওয়া হয়; আর, একজন রাজসাক্ষী হয়ে রক্ষা পায়।

মোট ২৪-টি আসামী রয়ে গেলেন শেষ পর্য্যন্ত। ১৯৩০ জুন ১৪-ই ট্রাইবিউন্যালের রায় প্রকাশিত হয়। তাতে আটজনকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করা হয়। একজনের ১০ বছর দ্বীপান্তর, আটজনের প্রত্যেকের ৭ বছর সশ্রম, সাতজনের ৫ বছর সশ্রম, দু'জনের ৪ বছর সশ্রম ও একজনের ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

হাইকোর্টে আপীলের শুনানি আরম্ভ হয়—এপ্রিল ২০-এ থেকে; রায় প্রদত্ত হয় ১৯৩১ এপ্রিল ২২-এ তারিখে, অর্থাৎ পুরো একটি বছর চলে। এখানে ন'জন মুক্তিলাভ করেন। দুই বিচারালয়ে শেষ পর্য্যন্ত যাঁদের দণ্ড বহাল থাকে, তাঁদের বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

	ট্রাইবিউন্যাল	হাইকোর্ট
	১৪.৬.৩০	২২.৪.৩১
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত	১০ বঃ দ্বীঃ	৭ বঃ দ্বীঃ
সতীশচন্দ্র পাকড়াশী	৭ বঃ সঃ	বহাল
শচীন্দ্রনাথ কর গুপ্ত	,,	,,
মুকুলরঞ্জন সেনগুপ্ত	,,	,,
রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস	৫ বঃ সঃ	,,
সুধাংশুলাল দাশগুপ্ত	,,	,,
নিশাকান্ত রায়চৌধুরী	,,	,,

কলাবাগান ষড়যন্ত্র মামলায় শচীন কর গুপ্ত সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করলেন। তাঁকে মেদিনীপুর জেলে বন্দী করে রাখা হয়। ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ৭-ই আর-দু'জনকে সঙ্গে করে জেল থেকে তিনি পলায়নে সক্ষম হন। বেশীদিন

স্বাধীনতা-ভোগ কপালে ছিল না ; ডিসেম্বর ১৭-ই একটা ছ'ঘরা-রিভলভার-সমেত চুঁচুড়াতে বোড়াল লেন আর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংযোগস্থলে ধরা পড়েন। ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১৫-ই চুঁচুড়াতেই অস্ত্র-আইন-ভঙ্গ, জেল থেকে পলায়ন, চোরাই মাল রাখা প্রভৃতি অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হন। ১৯৩৩ মার্চ ২৯-এ, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁর ভাগ্যে ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড জুটেছিল। ১৯৩৩ মে ২-রা, অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে, মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ সাজা পূর্ব্বদণ্ডভোগের পর শুরু হবার আদেশ হয়।

এসকল বিপ্লবীরা কোন্ ধাতুতে গঠিত—এইরকম কয়েকজনের দুর্ভোগ থেকে অনুমান করা যায়।

সরিষাবাড়ী (ময়মনসিংহ)

বিপ্লবীরা মোমার মালমশলা সংগ্রহে লেগে গেছে, আর পুলিশ পিছু পিছু ঘুরছে ; সামান্য সন্দেহক্ষেত্রে তল্লাসী না-করে ছাড়ে না।

জন-তিনেক যুবক কলিকাতার দোকান থেকে ১৯৩০ আগষ্ট ৫-ই কিছু রাসায়নিক মাল কিনে, ৬-ই কলিকাতা থেকে ময়মনসিংহ চলেছেন, সঙ্গে একটা ট্রাঙ্ক। জগন্নাথগঞ্জ গিয়ে ময়মনসিংহের ট্রেন ধরবার জন্য নেমে যখন অপেক্ষা করছেন, তখন এক সাব-ইন্সপেক্টর তাঁদের সন্দেহ করেন। তিনি ট্রাঙ্কের মালিকদের সঙ্গে নিয়ে সরিষাবাবাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে, ৭-ই সেখানকার দারোগার কাছে ট্রাঙ্ক ও মালিকদের জিম্মা করে দেন ; যাত্রী তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে বিচার শুরু হয় —১৯৩০ অক্টোবর ২০-এ ; সমাপ্তি হয়—নভেম্বর ৩০-এ।

আসামী ছিলেন ছ'জন ; তার মধ্যে একজন মুক্তিলাভ করেন, তিনজনের পাঁচ বছর ও দু'জনের তিন বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আপীলে (১) অবনী-রঞ্জন ঘোষ ও (২) ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরীর পূর্ব্বদণ্ড পাঁচ বছর হিসাবে এবং (৩) তারক-চন্দ্র কর ও (৪) সুনির্ম্মলচন্দ্র সেনগুপ্তর তিন বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড বহাল থাকে ; (৫) শিশিররঞ্জন রায় আপীল করেননি—তাঁর পূর্ব্বদণ্ড, তিন বছর সশ্রম, থেকে যায়।

শিবপুর

শিবপুর থানার দারোগাবাবুর ওপর বিপ্লবীদের আক্রোশ জমে উঠেছিল ; তিনি তাঁদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন গুপ্তচর লাগিয়ে। ফলে, ১৯৩০ মে ১৬-ই, ভোর ৩-৪৫ মিনিটের সময় তাঁর দোতলার জানলার ওপর এক বোমা এসে পড়ে। গর্জ্জন যেরকম হয়েছিল, সে-তুলনায় ক্ষতি কিছুই হয়নি।

পরদিনই সাতটা বাড়ীতে খানাতল্লাসী হয়। ১৭-ই ভবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৮-ই মনোমোহন (ওরফে নব) অধিকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গের অভিযোগে আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে, ১৯৩০ জুলাই ২৩-এ, প্রত্যেকের পাঁচ বছর হিসাবে কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৩১ জানুয়ারী ১৯-এ হাইকোর্ট এঁদের আপীল নাকচ করে।

জামালপুর জেটি

জামালপুর জেটির মালখানার ওপর হানা দিয়ে কয়েকজন যুবক ১৯৩০ আগষ্ট ২-রা কিছু মালপত্র লুঠপাট করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে পড়লে, একজন কন্‌ষ্টেবলকে গুলি করে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে, অক্টোবর ১৩-ই পুলিশ জামালপুরে গুড়ারা ঘাটে যায় এবং দেখে জন-চার-পাঁচ লোক একটা নৌকার ওপর বসে আছে। পুলিশের কথায় লোকগুলি নৌকা থেকে নেমে আসে। ঘাটের ওপর পৌঁছেই, একজন (নগেন্দ্রচন্দ্র দেব, ওরফে 'নগা') একটা রিভলভার বার করে আই.বি.-ইন্সপেক্টর ও তাঁর দেহরক্ষীকে আক্রমণ করেন।

তখনকার মতো পালাতে সক্ষম হলেও, পরে তাঁরা ধরা পড়েন। পরে দু'জন—সুধীরকুমার রায় (খোকা) আর 'নগা'কে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আসামীরূপে হাজির করা হয়। মে ১৯-এ হত্যা-প্রচেষ্টা ও বে-আইনী অস্ত্র-ব্যবহার অপরাধে দু'জনেরই চার বছর ও অতিরিক্ত (consecutive) এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ ডিসেম্বর ৯-ই তারিখে প্রদত্ত রায়ে হাইকোর্ট দু'জনেরই দণ্ড সমর্থন করে।

রাজসাহী

রাজসাহী ষ্টেশন ঃ রাজসাহী রেল-ষ্টেশনের কাছে ডাকপিয়ন টাকা নিয়ে যাবার সময়, ১৯৩০ অক্টোবর ৩-রা, কয়েকজন যুবক কর্তৃক আক্রান্ত হয়; ক্ষতির পরিমাণ ৩,৬৫০ টাকার মতো।

এ-সম্পর্কে অচ্যুতনাথ ঘটককে খোঁজাখুজি চলতে থাকে। ১৯৩০ অক্টোবর ১২-ই মুন্সীগঞ্জে এক বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে, একটা সুটকেসের মধ্যে পাট-জড়ানো দুটো বোমা পাওয়া যায়, এবং অচ্যুতকে গ্রেপ্তার করলেও, তিনি পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। ১৯৩২ জানুয়ারী ২৫-এ, যখন তিনি হাওড়ায় সংবাদপত্র বিক্রি করছেন, তখন পুলিশ পাকড়াও করে। পরের এপ্রিলেই স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার আরম্ভ হয়। মে ২-রা, তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৩২ আগষ্ট ২৬-এ, হাইকোর্ট আগের দণ্ডই বহাল রেখে দেয়।

আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট

সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে—১৯৩০ অক্টোবর ১০-ই, ৬-১৫ মিনিটের সময় চারজন সশস্ত্র যুবক ৪২-নং আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটে মাণিকচাঁদ-গোপালচাঁদ-এর গদিতে হামলা করে। বিশ্বস্ত দরোয়ান প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করতে গিয়ে, একজনের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান।

আহত লুণ্ঠনকারী ছুটে চলেছে, মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে—এক কন্‌ষ্টেবল বাধা দিতে এসে ছুরিকাহত হন। অন্য লোক এসে পড়ায়, আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সঙ্গীরা দোকান থেকে ২,৩৪৬ টাকা নিয়ে পালিয়ে যান। শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের আর সন্ধান করা গেল না।

ধৃত সুরেশচন্দ্র দাসের আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে ১৯৩০ ডিসেম্বর ১৫-ই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও তিন বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ জুন ১৯-এ হাইকোর্ট সুরেশের আপীল নাকচ করে।

সালদা (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহ জেলার সালদা গ্রামে, ১৯৩০ অক্টোবর ৩১-এ, চন্দ্রনাথ তেওয়ারীর বাড়ী থেকে মবলগে ৩৫ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই সামান্য টাকার জন্যে অনেকগুলি কর্ম্মীকে ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

কালবিলম্ব না-করে পুলিশ আসামীদের সন্ধান করতে ছড়িয়ে পড়লো। ঘটনার পরদিনই ময়মনসিংহ পিয়ারাপুরে কয়েকজন যুবক পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হলেন। নানা স্থানে তল্লাসী চালিয়ে, একজনের বাড়ীতে এক সুটকেসের মধ্যে তিনটি রিভলভার ও আনুষঙ্গিক মশলা কিছু পাওয়া গেল।

এ-সম্পর্কে আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। তার মধ্যে কয়েকজনকে তদন্তকালেই ছেড়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত ন'জনকে আসামী করে বিচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩১ সেপ্টেম্বর ১০-ই। তাতে তিনজনের মুক্তিলাভ ঘটে। পাঁচজন প্রত্যেকের সাত বছর আর একজনের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। একজন বাদে সকলেই আপীল করলেন হাইকোর্টে। রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩২ মে ৬-ই। তাতে একজন সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পান, আর চারজনের দণ্ড পূর্ণমাত্রায় সমর্থিত হয়।

আসামী (১) সুরুজ্জমা তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করলেন না; আর, (২) প্রবোধচন্দ্র রায়, (৩) রবীন্দ্র নিয়োগী, (৪) সুধেন্দু দাম ও (৫) নগেন্দ্রনাথ মোদক—প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড সমর্থিত হয়।

ঘড়িসার খাল (ফরিদপুর)

উপদ্রব যখন বেড়েই চলেছে—তখন থেকে পুলিশ নানা স্থানে অস্থায়ী চৌকি বা ক্যাম্প বসাতে থাকে ; এইরকম একটি ফরিদপুর ঘাড়সার খালের পুলের কাছে স্থাপিত হয়—১৯৩০ ডিসেম্বর ১৮-ই। পরেই, ২২-এ একজন টহলদার রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে টর্চের আলো জ্বলে উঠতে দেখে। ক্যাম্পে খবর দিতে, কয়েকজন চৌকিদার অগ্রসর হয়ে দেখে রাস্তার ওপর ছ'জন দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্নের কোনও সদুত্তর না পেয়ে সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তল্লাসীতে বড় এক বোতল এ্যাসিড আর কয়েকটা বোমা ও পট্‌কা পাওয়া যায়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার। ১৯৩১ আগষ্ট ৩-রা প্রত্যেকের তিন বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ৪-ঠা সব আপীল বাতিল হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিগণঃ (১) বীরেন্দ্রনাথ দে রায়, (২) গোপাল্‌চন্দ্র বক্সী, (৩) সুধীরচন্দ্র দে, (৪) নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, (৫) জলদিন্দুভূষণ সরকার ও (৬) ফণী-ভূষণ বসু।

ঘটনা-প্রবাহ

কলিকাতাঃ অস্ত্র সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে ; কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়নি। কলিকাতার ভিতরেই অস্ত্র-সমেত ধরা পড়েন নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত। সরাসরি বিচারে, ১৯৩০ অক্টোবর ১১-ই, তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

এই সহরেই সন্ধ্যা হবার কিছু পরেই পাঁচ-ছ'জন ভদ্রবেশী যুবক, ১৯৩০ এপ্রিল ১২-ই, হরিশ্চন্দ্র সেন ও রামকানাইয়ের গদিতে হানা দিয়ে ১৫ হাজার টাকা পান। কাকেও ধরা সম্ভব হয়নি।

খুলনাঃ ১৯৩০ এপ্রিল ২৯-এ, খুলনার অমৃতলাল রায় ও সুকুমার সেনের দোকান থেকে মবলগে ৩৬ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

ঢাকাঃ ঢাকার মুলচর থানার টাকা যাচ্ছে স্বর্ণগ্রাম পোষ্ট-অফিসে, ১৯৩০ জুন ২-রা। পথিমধ্যে কয়েকটি যুবক হামলা করে হাজারখানেক টাকা পেয়ে যান।

রংপুরঃ একখানা ছ্যাকড়া-গাড়ী ১৯৩০ জুলাই ১৯-এ রংপুর-গাইবাঁধা সদর রাস্তা দিয়ে চলেছে। হঠাৎ একটা বোমা এসে পড়লো গাড়ীর ওপর। কারও ক্ষতি হয়নি। কেবল প্রমাণ পাওয়া গেল—বিপ্লবীরা তৎপর আছে।

কলিকাতাঃ কলিকাতার মধ্যে স্থানে স্থানে বোমা-ফেলা চলছে যেন কেবল অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্যে। ১৯৩০ আগষ্ট ২৬-এ ও ২৭-এ যথাক্রমে জোড়াবাগান থানা ও ইডেন-গার্ডেন ফাঁড়ির ওপর বোমা পড়ে।

ময়মনসিংহ ঃ ৩০-এ ময়মনসিংহের পুলিশ-দারোগার বাসার ওপর বোমা পড়ে।

নানা স্থানে নানা দিনে ঃ সেপ্টেম্বর ৮-ই সেরাজদিখান ইছাপুরার (ঢাকা) এক বাড়ীতে ডাকাতি হয় এবং ১,৩৪৭ টাকা লুণ্ঠিত হয়। সেপ্টেম্বর ২৩-এ খুলনা থানার উঠানে বোমা পড়ে। ২৪-এ ফরিদপুর কালাচিনির কাছে গোপালপুর থানার চণ্ডীচরণ সাহা পোদ্দারের দোকান লুঠ হয়। ক্ষতির পরিমাণ মাত্র ৫৬১ টাকা।

অক্টোবর ২৩-এ কলাবেড়িয়ার জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী থেকে ৪০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ৩০-এ বরিশাল বাবুগঞ্জ থানা এলাকার মাধবপাশাতে রাজনাথ বণিকের বাড়ীর ডাকাতিতে ৩,৪৫১ টাকা লুণ্ঠিত হয়েছিল।

রাজসাহী কলেজের পিয়নের কাছ থেকে, নভেম্বর ১-লা, ৩৬৮ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার সংবাদ আছে। নভেম্বর ৪-ঠা, ময়মনসিংহের যশোদল থানার কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ডাকাতির প্রহসন আচরিত হয়। ক্ষতির পরিমাণ কিছুই নয়। ময়মনসিংহের ইলাসিনের 'সিম কোম্পানী' (R. Sim & Co.)-র জমাদার নভেম্বর ১২-ই টাঙ্গাইল থেকে কোম্পানীর অফিসে ১৫,০০০ টাকা নিয়ে যাবার সময়, পথে লুণ্ঠনকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, এবং পুরো টাকাটা ছেড়ে দিয়ে প্রাণে বেঁচে যান। বরিশাল কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামের শরৎকুমার গুহর বাড়ীতে নভেম্বর ২৬-এ ডাকাতির ফলে, মালিকের ৯৪০ টাকা ক্ষতি হয়।

ঢাকা লালবাগের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে ডিসেম্বর ৮-ই ট্রেজারী-বেয়ারা সরকারী তোষাখানায় ২,১০০ টাকা জমা দিতে নিয়ে যাবার সময় কয়েকটি যুবক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় ; ফলে, সমস্ত টাকাটাই ক্ষতির মধ্যে জমা পড়ে। পরে, ডিসেম্বর ১৮-ই ঢাকা টঙ্গিবাড়ীর পরসাগাঁওমের কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ডাকাতির ফলে ২,১৪৫ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

মরণ-যজ্ঞ

দেবেন্দ্রবিজয় ঃ একটি ঘটনা অবলম্বনে তেরোজন আসামী নিয়ে 'বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা' আরম্ভ হয়—১৯৩০ সেপ্টেম্বর ৮-ই ; রায় প্রদত্ত হয়—সেপ্টেম্বর ১৯-এ। বলা যায়, "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"। মামলা-চলাকালীন আটজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকী পাঁচজনের মধ্যে দু'জনের মুক্তিলাভ ঘটে, আর তিনজনের দু'বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কিন্তু এর পটভূমিকা স্মরণে রাখা বাঞ্ছনীয়। বরিশাল নলচিরা গ্রামের সকলের আদরের অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবক দেবেন্দ্রবিজয় সেনগুপ্ত (ওরফে 'বলু')। ১৯৩০ মে ২৬-এ এক কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে বিরাট এক শব্দ শুনে, লোক সেখানে

ছুটে গেল। করুণ দৃশ্য। দেবেন নিভৃতে বসে মহাশক্তিশালী বোমা তৈরী করছিলেন। হাতের মধ্যেই বোমা ফেটে যায়। ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গেই 'বল্লু'র জীবনান্ত ঘটে।

সুবোধ দে : যে-সকল তরুণ বিপ্লবী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সুবোধ দে তার মধ্যে একজন। মূল দল থেকে সরে পড়ার দরুন এবং অপরাপর কোনও প্রমাণ না-থাকায়, তাঁকে আর মামলায় না-জড়িয়ে, বিনা বিচারে আটক করে রেখে দেয়। ১৯৩০ নভেম্বর মাসে সুবোধ প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত হন।

এখানে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর টাইফয়েড হয়। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো এবং তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হ'ল। সেখানে বন্দী অবস্থায়, ১৯৩১ এপ্রিল ১৫-ই, মৃত্যুর আশ্রয়ে তিনি চিরমুক্তিলাভ করেন।

নৃপেন ও বীরেন : জলপাইগুড়িতে এক ডাকাতি সম্পর্কে টেলিগ্রাফের তার কাটার জন্যে দুই বন্ধু নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত আর বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী রেল-লাইন ধরে চলছিলেন; পিছন থেকে তাঁদের অমনোযোগিতার মধ্যে ট্রেন এসে পড়ে এবং দু'জনের ওপর দিয়েই দ্রুতবেগে চলে যায়।

প্রতিশোধ

চট্টগ্রাম : কিশোরগঞ্জ— ১৯৩০ মার্চ ১-লা, রামানন্দ ইউনিয়ন স্কুলের প্রধান-শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় নিহত হন।

ময়মনসিংহ : ভূপেন্দ্র রাহা (ওরফে 'পোলা') হঠাৎ নিখোঁজ হলেন। ১৯৩০ মার্চ ২৪-এ তাঁর মৃতদেহ ময়মনসিংহ টাউন রেল-ষ্টেশনের কাছে ভীষণ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। ভূপেনকে দলের লোকরা গুপ্তচর বলে সন্দেহ করতো; খুনটা তারই ফল।

কলিকাতা : রতনভূষণ হাজরার চালচলন সন্দেহজনক হয়ে পড়ায়, তাঁকে ১৯৩০ আগষ্ট ২৯-এ রাত্রে কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে হত্যা করে ফেলে রেখে দেওয়া হয়।

প্রতিরোধ-ব্যবস্থা

খুনজখম ও লুণ্ঠন যখন বন্ধ করা যাচ্ছে না, তখন গভর্ণমেণ্ট অনেকগুলি জরুরী আইনের ব্যবস্থা করে।

প্রথম বিল আসে—১৯৩০ এপ্রিল ১৯-এ; কেবল বে-আইনী অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্যাদি রাখাই যে অপরাধ, তা নয়,—এ-সংক্রান্ত কোনও জিনিসপত্র সংগ্রহ ও তার প্রয়োগের চেষ্টাও গুরুতর অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। এই অপরাধ-

তালিকার মধ্যে আঘাত, বলপূর্ব্বক অর্থাদি আদায়, ছিনতাই, ক্ষয়ক্ষতি, অনধিকার-প্রবেশ ও ভীতি-প্রদর্শন প্রভৃতি এসে পড়ে। প্রমাণ করতে পারলেই, এসকলের ভিতর দিয়ে অস্ত্র-সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল এরকম সন্দেহমাত্রেই, যে-কাউকেও আটক রাখার ব্যবস্থা হয়।

পরের অর্ডিনান্স—১৯৩০ এপ্রিল ২৭-এ ঃ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রণ ও প্রচারের ওপর নতুন করে বাধানিষেধ। তৃতীয়, লাহোর ষড়যন্ত্র (-সম্পর্কিত) অর্ডিনান্স। এর উদ্দেশ্য, আসামী আদালতে হাজির না হলেও, কাজ বন্ধ হবে না।

এইভাবে মে ১৫-ই চতুর্থ, মে ৩০-এ পঞ্চম, জুন ২-রা ষষ্ঠ, জুলাই ২৭-এ সপ্তম, আর আগষ্ট ১৫-ই অষ্টম অর্ডিনান্স জারি করা হয়েছিল। সর্ব্বোপরি বাঙ্গলার অপরাধমূলক আইনের সংস্কার ঘটেছিল ১৯৩০-এর ষষ্ঠ আইনে (Act VI of 1930), ১৯৩০ অক্টোবর ১৬-ই। এর বলে পুলিশের যখন-তখন যথা-তথা সন্দেহ হলেই গ্রেপ্তার করা, সন্দেহভাজন ব্যক্তির গতিবিধি পুলিশকে আগে থেকে জানাবার আদেশ, নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বাস, বিনা ওয়ারেণ্টে তল্লাসী, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ায় বিপত্তি, হাতের ছাপ, ফটো তুলতে বাধ্য করা প্রভৃতি অষ্ট-বাঁধনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এর যে-কোনওটি লঙ্ঘন করলে, সাত বছর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

একটা কথা এখানে স্মরণে রাখা যেতে পারে। এ-সময় নিরুপদ্রব আইন-অমান্য আন্দোলন বিরাট আকার ধারণ করেছে এবং শাসনযন্ত্র বহুলাংশে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। যে অর্ডিনান্স (জরুরী আইন)-গুলি প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, সেটা সশস্ত্র ও শান্ত দুই আন্দোলন দমনের জন্য প্রয়োগ করতে সরকার কোনও কৃপণতা করেনি।

গান্ধীজীর ভারতব্যাপী আন্দোলন দমন করতে গভর্ণমেণ্ট হিমসিম খাচ্ছে; ওদিকে সশস্ত্র আন্দোলন খানিকটা সুযোগ পাচ্ছে। এই দ্বিমুখী আন্দোলনই পরে ইংরেজ-বিতাড়নে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। সরকারপক্ষের ওপর জনসাধারণের যে বিরাগের ভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাতে পরোক্ষভাবে হলেও, বিপ্লবীরা লাভবান হয়েছেন। বিশেষ করে কোনও বড় ঘটনার পর গোপন আশ্রয়লাভে তাঁদের সুযোগ ঘটেছে। মহিলারা পর্য্যন্ত বলেছেন যে, যখন স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকল সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার লোক সবরকম নির্য্যাতন ভোগ করছেন, দেশের জন্য যাঁরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করছেন, বিপদকে যাঁরা আলিঙ্গন করে আছেন, জেল বা ফাঁসি যে-কোনও সময় ঘটতে পারে, তখন তাঁদের আশ্রয় দিয়ে যদি জেলই খাটতে হয়, তাতে ভয় পেলে চলবে না। বলা বাহুল্য, সদাশয় ইংরেজ বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা জেলে পাঠিয়েছিল, কিন্তু তাঁদের মনোবল ভাঙ্গতে পারেনি।

দাবানল (১৯৩১)

পূর্ব্ববৎসর বিপ্লবের ইতিহাসে প্রকাণ্ড স্বাক্ষর রেখে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তার পরেই খুব একটা শ্রান্তির লক্ষণ দেখা যায়নি। তবে তুলনায় সামান্য কম। তার কারণও যে নেই তা নয়; আইনের অক্টোপাস্ সারা বাঙ্গলাকে জড়িয়ে ধরেছিল; বিচারে যত লোক গেছে, সে-সংখ্যা তো উপেক্ষা করার মতো নয়, কিন্তু তার ওপর ছিল অর্ডিনান্স আর ফৌজদারী কার্য্যবিধি (অপরাধ-নিবারক) আইন।

কংগ্রেসের দিকে গান্ধীজীর সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একটা রফা হয়েছিল, যার ফলে তিনি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে, 'গোল টেবিল বৈঠকে' যোগ দিতে যান। দেশ যখন মারমুখী হয়ে উঠেছে, তখন প্রায় সমগ্র দেশের নেতা সংগ্রামের মধ্যেই আপোষের চেষ্টা করছেন, তাতে সংগ্রামী মনের ওপর ক্ষতিসাধক প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। গান্ধীজী ১৯৩১ আগষ্ট ২৯-এ ইংল্যাণ্ড অভিমুখে রওনা হয়ে যান। তিনি নিজে যে খুব একটা আস্থা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা নয়; তবে পারিপার্শ্বিক ঘটনা-স্রোত তাঁকে একরকম ঠেলেই নিয়ে চলেছিল। লণ্ডনে বৈঠক আরম্ভ হয়েছিল সেপ্টেম্বর ৭-ই। কেবল গোল টেবিল ঘিরে নয়, ঘরোয়া বৈঠকে সভ্যদের এক ঘণ্টাও বিরাম নেই। আলোচনার পর আলোচনা ক্রমেই জট পাকিয়ে তুলতে লাগলো। শেষটা এমন দাঁড়ালো যে, সবই "কেঁচে গণ্ডূষ" করতে পারলেই ভাল হয়। দিনের পর দিন মীমাংসার সামনে দুর্ভেদ্য কুয়াশা ঘনিয়ে উঠতে লাগলো। গান্ধীজী ডিসেম্বর ১-লা পর্য্যন্ত কন্‌ফারেন্সে অংশ-গ্রহণ করেছেন। শেষটা ক্ষুব্ধচিত্তে, মিটমাটের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, ডিসেম্বর ২৮-এ শূন্যহাতে ফিরে এসে, কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অসাফল্যের কাহিনী বর্ণনা করে নিরস্ত হলেন।

বিপ্লবীদের মনে যেন মরণপণ মাথা তুলে উঠেছে। সকল দলেরই নেতৃবৃন্দ কারাগারে আবদ্ধ, তথাপি বৈপ্লবিক ঘটনার বিরাম ছিল না। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের নিস্তার ছিল না। তা'ছাড়া, অন্যান্য দলবদ্ধ বা বিক্ষিপ্ত এককভাবে নানা কাণ্ড সংসাধিত হয়েছে।

পেডি-হত্যা (মেদিনীপুর)

মেদিনীপুরে একে একে তিন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হয়েছেন, তন্মধ্যে পেডি (James Peddie) প্রথম। স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলে এক প্রদর্শনী-খেলার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। তিনি শিকারে গিয়েছিলেন; ফিরেই সরাসরি

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে চলে যান। সেদিন ১৯৩১ এপ্রিল ১৭-ই। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক লোক চলেছে, কারণ তিনি সেদিন মহামান্য অতিথি।

প্রথমে একটা ঘরে ঢুকে ঘুরে-ফিরে সব দেখলেন। দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশের সময় দু'জন যুবক খুব কাছ থেকে রিভলভার ছোটাল—তখন সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট।

শব্দ হতেই পালাবার জন্য লোক ব্যস্ত। কারা গুলি ছুড়েছে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য দেবার মতো মনের অবস্থা নয়। এই পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা গেল, আততায়ীর মধ্যে একজন তরুণ যুবক, গায়ে লম্বা, ডোরা-ছিটের জামা। পেডির খবর নিয়ে দেখা গেল, অজ্ঞান অবস্থায় তিনি পাশের ঘরে দেওয়াল ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দেহের বুলেট-বিদ্ধ তিন স্থান থেকে রক্ত ঝরছে।

তাঁকে মেদিনীপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কলিকাতা থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে ডাক্তার ও নার্স ভোর ২-৩০ মিনিটে পৌঁছান। তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করে একটা বুলেট বার করা হয়। পরদিন বেলা ১০-টার সময় দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করার পর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। বিকাল ৫-৩০ মিনিটে পেডি ইহলোক ত্যাগ করেন।

গার্লিক-হত্যা (কলিকাতা)

আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে আসামীকে চরম দণ্ডদানে গার্লিক (R. R. Garlick)-এর খুব সুনাম হয়, এবং পর পর কয়েকটি ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট তাঁকেই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করে।

ঘটনাক্ষেত্র আলিপুরের জেলা ও সেসন জজের কোর্ট। তার পিছনে দক্ষিণ দিকে বেশ চওড়া খোলা-বারান্দা। ১৯৩১ জুলাই ২৭-এ, এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক দুপুরের কোন্ এক সময়ে সকলের অজ্ঞাতসারে সেখানে চলে যান। বেলা ২-টার সময় জেলা-জজ হিসাবে গার্লিক এক মামলার শুনানিতে ব্যস্ত, সেইসময় ঐ যুবক পিছনদিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে জজের বাঁ-দিকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে উঠেই পর পর দুটো গুলি ছোড়েন। প্রথমটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়; দ্বিতীয়টা গার্লিকের কপাল ভেদ করে এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আততায়ীকে লক্ষ্য করে গার্লিকের দেহরক্ষী গুলি ছোড়েন; সেটা ব্যর্থ হয়। আর, আততায়ী ফিরেই যে গুলি মারেন, সেটা রক্ষীর কাঁধের মাংস তুলে দেয়। ঘরের প্রবেশদ্বারে যে পুলিশ-সার্জ্জেণ্ট ছিলেন, তিনি আততায়ীর প্রতি দু'বার গুলি ছোড়েন। তার একটা তলপেটে ও অপরটা পায়ে লাগে। প্রথমটি মারাত্মক হয় এবং যুবকটি মৃত্যুবরণ করেন।

আগন্তুক হামলাকারীর পকেটে একটুকরা কাগজ পাওয়া যায়। তাতে লেখা

ছিল ঃ "ধ্বংস হও ; দীনেশ গুপ্তর অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও। ইতি— বিমল গুপ্ত"।

আততায়ীর পরিচয়-সংগ্রহের জন্য বহু চেষ্টা হ'ল ; বৃথা পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ল। সে-সময় কোনও কিনারা করতে পারা গেল না। অনেকদিন পরে জানা গেল—যুবকের নাম কানাইলাল ভট্টাচার্য্য। তিনি কোনওদিন বিপ্লবী-দলে ছিলেন না, রিভলভার কখনও ব্যবহার করেননি। এক সঙ্গী তাঁকে চব্বিশ-পরগনার এক বিপ্লবী নেতার কাছে নিয়ে যেতে, কানাই তড়িঘড়ি কোনও "কাজ"-এর জন্য ভয়ানক জিদ ধরেন। তিনি জীবনে রিভলভার নিয়ে লক্ষ্যবেধ করতে প্রথমবার বিফল হবার পর, দ্বিতীয়বারেই কৃতকার্য্য হন। নেতা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যান। কানাই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার জয়নগর-মজিলপুরের অধিবাসী ; সবে স্কুল ছেড়েছেন।

কমিশনার-হত্যা প্রচেষ্টা

টাঙ্গাইল ঃ ঢাকা বিভাগের কমিশনার ক্যাসেল্‌স্ (Alexander Cassels), ১৯৩১ আগষ্ট ২১, স্থানীয় এস্.ডি.ও. এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের সঙ্গে টাঙ্গাইল সহরের সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিদর্শনের জন্য মন্থরগমনে চলেছেন—এমন সময়ে এক যুবক অতর্কিতে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে রিভলভার ছুড়ে পালিয়ে যান। খানিকটা পিছু ছুটে গিয়েও আততায়ীকে ধরতে পারা গেল না। ক্যাসেল্‌স্-এর আঘাত গুরুতর নয় ; বুলেট ক্যাসেল্‌স্-এর ঊরুর খানিকটা মাংস উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

একদঙ্গল ছেলে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ ও মারধোরের পর ছেড়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত একজনকে নিয়ে আসামী খাড়া করা হয়েছিল। ১৯৩১ ডিসেম্বর ২-রা তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা-প্রচেষ্টা ও অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের মামলা শুরু হয়ে, আসামী ললিতচন্দ্র রাহার ডিসেম্বর ১৭-ই পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়—কেবলমাত্র অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের অপরাধে। ভাগ্যের জোরে খুব অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে।

আসানুল্লাহ্-হত্যা (চট্টগ্রাম)

'চট্টগ্রাম রিপাব্লিকান আর্মি'র পিছনে পুলিশ লেগেই আছে ; অপরপক্ষে সুযোগ সৃষ্টি করে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে। 'মাষ্টার-দা' গোপন আস্তানায় আছেন ; যতদূর সম্ভব সেখান থেকেই তাঁর "সৈনিক"দের নির্দ্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। গোপন বৈঠকে তিনি স্থির করলেন—পুলিশের ডেপুটী সুপার আসানুল্লাহ্কে সরাতে হবে।

ডেপুটীসাহেব চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-আক্রমণের পর থেকে বিপ্লবীদের সাজা-শাস্তি, অত্যাচার-নির্য্যাতন করেও স্বস্তি পাচ্ছেন না। পলাতকদের সন্ধান করে বেড়ানো,

সন্দেহভাজন যুবকদের ধরে নানা উৎপীড়ন প্রভৃতি সুসম্পন্ন করার জন্য সরকারী উচ্চমহলে তাঁর কদরের আর পরিসীমা নেই।

প্ল্যান ঠিক করে 'মাষ্টার-দা' সৈনিক খুঁজছিলেন, এবং এসে গেলেন অস্ত্র-চালনায় প্রায় অনভিজ্ঞ, অপরিণতবয়স্ক যুবক হরিপদ (প্রসাদ) ভট্টাচার্য্য। নির্ভরযোগ্য বিদ্যালাভ সমাপ্ত হলে, প্রয়োগক্ষেত্র তিনি নির্ব্বাচিত হলেন।

১৯৩১ আগষ্ট ৩০-এ, আসানুল্লাহ্-সাহেবের দল টাউন-ক্লাব আর কোহিনূর-ক্লাবের মধ্যে ফুটবল-প্রতিযোগিতা। খেলা শেষ হ'ল; পুলিশসাহেবের দল বিজয়ী, এবং প্রতিনিধি হিসাবে তিনি 'রেলওয়ে কাপ' গ্রহণ করছেন। বিনা-মেঘে বজ্রপাত! ভিড়ের ভিতর থেকে হরিপদ দৃঢ়পদে বেরিয়ে এসে আসানুল্লাহ্র গা ঘেঁষে রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলেন উপর্য্যুপরি চারবার। একটা বুলেটও বৃথা যায়নি। আসানুল্লাহ্ মাটীতে পড়লেন। কাজে যে ভুল-ত্রুটি হয়নি—আততায়ী নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে দেখলেন।

পালাবার মতলব ছিল না, সুতরাং গ্রেপ্তার হতে বাধা আসেনি। তারপর কি অকথ্য পীড়ন! সেটার বর্ণনা সম্ভব নয়। মৃত সন্দেহে, মার বন্ধ করে তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। সারা চট্টগ্রামের ওপর নারকীয় তাণ্ডব আরম্ভ হয়ে গেল। ক্রোধোন্মত্ত মহাকাল রুদ্রের দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গকারী ভূতপ্রেত, দানব-দৈত্যের যে তাণ্ডব সৃষ্টি-ধ্বংসের উপক্রম করেছিল, সেদিন গভর্ণমেণ্টের সমর্থনলাভে জিঘাংসু পুলিশ, সঙ্গে গুণ্ডা, বদমাস, দাগী, খুনী, ডাকাত, আইনশৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী বোম্বেটের দল মিলে চট্টগ্রামের যে অবস্থা করেছিল—সেটা দক্ষ-মহারাজ উপস্থিত থেকে স্বচক্ষে দেখলে স্বস্তিলাভ করতেন। তিনি বুঝতেন সর্ব্বধ্বংসী উৎপাতের অনেক-কিছুর হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন!

হিন্দু পুরুষ, ১৩ থেকে ৪৫ বয়স্ক, একজনও অত্যাচারের হাত থেকে বাদ পড়েনি। নিজ নিজ বাড়ীর মধ্যেই, আর না-হয় বাড়ীর সামনে টেনে এনে—লাঠি, লাথি, বেয়নেটের বাঁট প্রভৃতি দিয়ে মেরে অচৈতন্য বা চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় ফেলে রেখে দিয়ে গেছে; বাকী সব টেনে-হিঁচড়ে থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে হাজির করেছে। সারা পথ অবিশ্রান্ত প্রহার চলেছে। থানার ঘরের মধ্যে ফেলে অবিরাম প্রহারের ফলে রক্তের স্রোত নর্দ্দমা দিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়েছে। কলমের সাহায্যে সে নারকীয় অবস্থার বর্ণনা সম্ভব নয়; সম্পূর্ণ কল্পনাগ্রাহ্য ব্যাপার।

কোর্টে এক পুলিশ-অফিসারের জবানবন্দী থেকে পাওয়া যায়ঃ

"From the morning of the 31st August down to the 2nd of September, the condition of the Chittagong town was such that the

S.D.O. had practically to close his Court and papers used to be put up to him at the *Kotwali.*

* * *

"I have no knowledge if the accused was subjected to inhuman treatment.

"I read in the papers that the accused's village house was burnt down and his parents were tied to posts and beaten when the accused was away from the town."

অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

দোকানপাট তছনছ হয়েছে, বাজার-হাট লুঠ হয়েছে এবং বসত-বাড়ীতে আগুন ধরেছে। জীবন-সংশয় হয়েছে অগণিত লোকের।

হত্যা এবং দণ্ডবিধি আইনের কয়েকটা ধারায় অভিযুক্ত হলেন হরিপদ ন'জন জুরির সামনে, ১৯৩১ সেপ্টেম্বর ১৬-ই, দায়রা-জজের এজলাসে। অক্টোবর ১৪-ই রায় প্রদত্ত হ'ল। জজসাহেবের চক্ষু স্থির! ন'জন জুরির মধ্যে সাতজন বললেন হত্যার অভিযোগে, আর ছ'জন বললেন অস্ত্র-আইন-অভিযোগে নিরপরাধ।

জজসাহেব এ অভিমত মেনে নিতে পারলেন না। হাইকোর্টে তাঁর মতামত-সহ নথিপত্র প্রেরিত হ'ল। ১৯৩১ ডিসেম্বর ২২-এ আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হ'ল।

হিজলী ক্যাম্প (মেদিনীপুর)

বিপ্লবী রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহভাজন কর্ম্মীদের যে-কয়টি ক্যাম্পে আটক রাখা হ'ত, তার মধ্যে মেদিনীপুরে অবস্থিত হিজলী ক্যাম্প একটি। এখানে প্রায়ই বন্দীদের সঙ্গে মেট্-পাহারা ও কারারক্ষীদের সঙ্গে মন-কষাকষি লেগেই থাকতো। বাইরে থেকে অনেকসময় মনে হয়েছে এর পিছনে কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট উস্কানি আছে। তা না হলে, কখনও এটা সম্ভব হ'ত না। অনেকবার গভর্ণমেণ্টের কাছে সব অবস্থা জানানো হয়েছে; কোনও ফল পাওয়া যায়নি।

১৯৩১ সেপ্টেম্বর ১৬-ই এক ডেটেন্যুর সঙ্গে সশস্ত্র সেণ্টি (sentry)-র জোর বচসা হয়ে গেছে। এক সিপাহীর কাছ থেকে বেয়নেট কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে গুজবটা এতে রসান সংযোগ করলে। দুটোতে মিলে গোলমাল ভালভাবেই পাকিয়ে উঠলো। রাত্রি ৯-টার সময় জনা-পঞ্চাশেক পুলিশ, জেলের রক্ষী, ওয়ার্ডার প্রভৃতি পুলিশের লম্বা ও বেঁটে লাঠি, বেয়নেট, রাইফ্‌ল্ নিয়ে ব্যারাকের মধ্যে ঢুকে বে-পরোয়া মার দিলে; বন্দুক থেকে গুলি ছুটতে লাগলো; চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল। সীমিত জায়গায় আটক অবস্থায় যে যেদিকে পারলে, সরে দাঁড়াবার

চেষ্টা করতে লাগলো। স্বল্পকালের মধ্যে অন্ততঃ শ'খানেক বুলেট ছুটেছে ক্যাম্পের চৌহদ্দির মধ্যে, এমনকি হাসপাতাল পর্য্যন্ত বাদ যায়নি।

এক মহামারী অবস্থার উদ্ভব হ'ল নিমেষের মধ্যে। অন্ততঃ বিশজন বন্দী কম-বেশী আহত হয়েছিলেন; তার মধ্যে চারজনের অবস্থা দাঁড়ালো গুরুতর। দু'জন—সন্তোষকুমার মিত্র আর তারকেশ্বর সেন বুলেট-বিদ্ধ হয়ে মারা পড়লেন।

এই ঘটনা নিয়ে এক 'তদন্ত কমিটী' নিযুক্ত হয়েছিল। বন্দীদের নিন্দা না-করলে তাঁদের চলবে না, তৎসত্ত্বেও বাইরের সিপাহী ক্যাম্পের ভিতরে যে কাণ্ড করেছে, সেটাকে নিন্দে না-করে পারেননি। যাঁরা চিরতরে চলে গেলেন, তাঁদের আত্মীয়রা এতে যে কিছু শান্তি পেয়েছেন বলে মনে না-করাই ভাল।

ডুর্ণো-হত্যা প্রচেষ্টা (ঢাকা)

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর ডুর্ণো (Leslie George Durno), ১৯৩১ অক্টোবর ২৮-এ, বেলা ১২-৩০ মিনিটে যখন সহরের মদ্য-ব্যবসায়ী 'রায় এ্যাণ্ড কোম্পানী'র দোকানের সামনে গাড়ী থামিয়েছেন—সেইসময় পর পর কয়েকটা গুলি ছোড়া হয়। তার মধ্যে একটি তাঁর কপালে লাগে ও আর-একটি বুকের ছাল খানিকটা উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে 'এক্স-রে'-পরীক্ষায় দেখা গেল—প্রথম গুলিটা ডান কপালের মধ্যে দিয়ে ঢুকে, অক্ষিকোটর পার হয়ে বাঁ-চোয়ালের মধ্যে রয়েছে। কলিকাতায় এনে, বুলেটটা অপারেশন-সাহায্যে বার করে দিলে, তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

দুটি যুবককে এই অসমসাহসিক কাজ করতে দেখা যায়। কয়েকজন তাঁদের পিছনে তাড়া করে গিয়েছিল, কিন্তু ধরা সম্ভব হয়নি। পরে মামলা করাও সম্ভব হয়নি।

ভিলিয়ার্স-হত্যা প্রচেষ্টা (কলিকাতা)

ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের দুর্দ্দান্ত প্রেসিডেণ্ট ভিলিয়ার্স। বিপ্লবীদের ওপর যতরকম অত্যাচারের সম্ভাবনা হতে পারে, তার সুপরামর্শ দিতে তিনি কৃপণতা করেননি। ক্লাইভ বিল্ডিংস (Clive Buildings)-এ ভিলিয়ার্স (E. Villiers)-এর অফিস্। ১৯৩১ অক্টোবর ২৯-এ, বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় তিনজন আগন্তুকের সঙ্গে তিনি আলাপ করছিলেন। তখন পা-জামা, কোট ও মাথায় ফেজ পরা এক যুবক ঘরের খোলা-দরজা ঠেলে ঢুকেই ভিলিয়ার্স-কে লক্ষ্য করে পর পর তিনটে গুলি ছোড়েন। সন্দিগ্ধ মন, কাজেই নবাগত যুবককে দেখেই তিনি সামনের টেবিলের তলায় প্রবেশের চেষ্টা করেন। প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেলেন। একটা বুলেট তাঁর পিঠের খানিকটা ছাল উঠিয়ে নিয়ে যায়।

আততায়ী বুঝলেন শিকার ফস্কেছে। কালবিলম্ব না-করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু ঘরে উপবিষ্ট তিনজন মিলে আততায়ীকে ধরে ফেলতে সক্ষম হন। প্রশ্নের উত্তরে নাম বললেন "বিমল দাশগুপ্ত"। প্রথমটা কেউই বিশ্বাস করেনি। পরে প্রমাণিত হ'ল যে, এক্ষেত্রে বিমল মিছে কথা বলেননি।

ধরা-পড়ার সময় বিমলের কাছে দুটো রিভলভার ছিল। ভিলিয়ার্স-এর আঘাত অতি সামান্য। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি বাড়ী চলে যান।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার। ১৯৩১ নভেম্বর ১২-ই আসামীর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ষ্টীভেন্স-হত্যা (কুমিল্লা)

কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর ষ্টীভেন্স (C. G. B. Stevens) বেলা ১০-টা নাগাদ নিজের কোয়ার্টারে বসে কাজ করছেন; সামনে রয়েছেন এস.ডি.ও.। তারিখটা হচ্ছে ১৯৩১ ডিসেম্বর ১৪-ই। 'ইলা সেন' ও 'মীরা দেবী' নাম-লেখা একখানা কার্ড বেয়ারা কর্ত্তৃক তাঁর কাছে পৌঁছুলে, দেখলেন আগন্তুকরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

ষ্টীভেন্স এবং এস্.ডি.ও. দরজার নিকট এগিয়ে এসে আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করেন। এঁদের হাতে ছিল এক স্মারকলিপি, যার বক্তব্য ছিল—ফয়েজুন্নেসা গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে যাতে সন্তরণ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ইলা আর মীরা ঐ স্কুলেরই অষ্টম মানের ছাত্রী।

ষ্টীভেন্স লিপির কোণে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর মতামত জানতে চাইলেন, এবং তাঁর মত জেনে, পুনরায় ষ্টীভেন্স তাঁদের দেখা করতে বললেন। একজন হাত বাড়িয়ে কাগজটা ফেরত নিচ্ছেন, তখন অপরজন হঠাৎ রিভলভার বার করেই গুলি ছোড়েন মাত্র দু'হাত তফাৎ থেকে। আহত ষ্টীভেন্স ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে, খাবার-ঘর পার হয়ে ভাঁড়ার-ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ে যান। ততক্ষণে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে।

আততায়ীদের গ্রেপ্তার করতে কষ্ট হ'ল না। তাঁদের দেহ-তল্লাসীতে যে শালীনতাবর্জ্জিত পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল, তার তুলনা এসকল ব্যাপারে ইংরেজের সমস্ত কুৎসিত ঘটনাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।

দুটো রিভলভার ছিল আততায়ীদের কাছে—বেলজিয়ামে প্রস্তুত, ·৩২০ মাপ নলের। কোনওটারই লাইসেন্স ছিল না। ষ্টীভেন্স-এর শবব্যবচ্ছেদে হৃদ্‌পিণ্ডের ঠিক নীচেই বুলেট পাওয়া গেল; অন্য কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

অনুসন্ধানে নাম জানা গেল—আসামীদ্বয় শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী।

তাঁদের কলিকাতা হাইকোর্টে সেসন-মামলায় হাজির করা হ'ল—১৯৩২ জানুয়ারী ১৮-ই। জানুয়ারী ২৭-এ রায় প্রদত্ত হয়েছিল। কম বয়স, তার ওপর নারী, এ দু'কারণে আসামীদের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছিল।

বিপ্লব-সংশ্লিষ্ট মারাত্মক ঘটনায় নারীর সফল অংশগ্রহণের পরিচয় এইটাই প্রথম বলে পরিগণিত হয়।

ঘটনা-প্রবাহ

সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেকে একসঙ্গে অংশ নিয়েছেন বা একক আসামী, এরূপ ঘটনা প্রচুর হয়েছে ; সাজা-শাস্তিও পাইকারী হারে চলেছে। সেরকম কয়েকটি ব্যাপারের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

ময়মনসিংহ ঃ আঠারোবাড়ী— আঠারোবাড়ী আর সোহাগী দুই ষ্টেশনের মধ্যে ১৯৩১ এপ্রিল ১১-ই ডাক-লুঠ হয়েছিল। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ এক হাজার টাকাও নয় ; কিন্তু এর খেসারত দিতে হয় গুরুতরভাবে।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে অনেকগুলি যুবককে ধরে চালান দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত, ১৯৩১ নভেম্বর ৩০-এ, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে—(১) গোপালচন্দ্র (ননী, নলিনী) আচার্য্য, (২) শচীন্দ্রচন্দ্র হোম ও (৩) হেমচন্দ্র (ঘুঁটু) চক্রবর্ত্তীর অস্ত্র-আইন-ভঙ্গ, ডাকাতি প্রভৃতি অভিযোগে—প্রত্যেকের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

রেঙ্গুন ঃ কোনও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি, সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে—ডাকাতির অভিযোগে ১৯৩১ মার্চ ১৬-ই চারজন বাঙ্গালী যুবক দণ্ডিত হয়েছিলেন। আর. এন. রায়ের দশ বছর, জে. সি. দত্ত ও এ. কে. দাস প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। চতুর্থ ব্যক্তির দণ্ডকাল এক বছর মাত্র।

বরিশাল ঃ বরিশাল জেলা-স্কুলের এক চাপরাশী স্থানীয় ট্রেজারী থেকে ১৯৩১ মে ১-লা, ২৩৪ টাকা ২ আনা নিয়ে স্কুলে আসছিলেন। ক্রীশ্চানদের কবর-স্থানের গেটের কাছে যখন পৌঁছেচেন, পিছন থেকে একজন সাইকেল চড়ে এসেই ডাণ্ডা দিয়ে মাথার ওপর কয়েকটা ঘা মারেন। আঘাতের ফলে চাপরাশী মাটীতে পড়ে যান। এমন সময় উল্টোদিক থেকে অপর একজন সাইকেলে এসে, চাপরাশীর হাত থেকে টাকার থলেটা ছিনিয়ে নেন। হুটোপাটিতে থলে থেকে টাকা প্রভৃতি মুদ্রা ছড়িয়ে পড়ে। বিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী (ভোলা) সেগুলো কুড়িয়ে নেবার সময় গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

অপর আক্রমণকারী হীরামোহন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে থলে। বিমল তখন তাঁর গ্রেপ্তারকারীর প্রতি রিভলভার ছুড়তে বলেন এবং হীরামোহন সে-আদেশ পালন

করেন। লোকটা আহত হতেই বিমলকে ছেড়ে দেন। তখন বিমল আর হীরা সাইকেল চড়ে সরে পড়েন।

হীরামোহন অল্প কয়েকদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হন। বিচারে ১৯৩১ আগষ্ট ১১-ই তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

বিমল ধরা পড়লেন ১৯৩১ নভেম্বর ১১-ই এক ধানক্ষেতের ধারে। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৫-ই হীরামোহনের অনুরূপ সাজা দেন।

হাইকোর্টে বিমলের আপীল ১৯৩২ জুলাই ১২-ই নাকচ হয়ে যায়।

ময়মনসিংহ ঃ কুলিয়ারচরে ডাকাতির চেষ্টা হয় ১৯৩০-এর শেষদিকে। সে-সম্পর্কে আব্দুল রহমান (নন্দ সেখ)-এর বিচার হয়। ১৯৩১ মে ৩০-এ তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ময়মনসিংহ ঃ ময়মনসিংহে ইয়োরোপীয় ক্লাব এবং জেটির গুদাম (warehouse) থেকে মাল-চুরির অভিযোগে বিধুভূষণ সেনকে খুবই খোঁজাখুঁজি চলছিল।

এ দুটো ১৯৩০ মে মাসের ঘটনা।

জামালপুরে 'দয়াময়ী কুটীর'-এর সামনে ১৯৩০ আগষ্ট ২-রা তাঁর পাত্তা পাওয়া গেল। যখন গ্রেপ্তারের চেষ্টা হচ্ছে, থানা আর পোষ্ট-অফিসের মাঝখানে, তখন বিধু রিভলভার বার করে গ্রেপ্তারকারী কনেষ্টবলকে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যান। পরে ১৯৩১ জুলাই ১৩-ই আবার ধরা পড়েন। এবার রিভলভার নয়, পুলিশের হাতে কামড় দিয়েও পলায়নে বিফল হলেন। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৩২ মে ১৬-ই তাঁর চার বছর সশ্রম দণ্ড ঠুকে দেন।

হাইকোর্টে আপীল ডিসেম্বর ৯-ই নাকচ হয়ে যায়।

ময়মনসিংহ ঃ হালদিয়া— ময়মনসিংহের হালদিয়া এক পরিচয়বিহীন স্থান। এখানে এক "স্বদেশী" ডাকাতির কথা সরকারী নথিপত্রে স্থানলাভ করেছে। ১৯৩১ আগষ্ট ২৮-এ ডাকাতির অভিযোগে হাসান আলির তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

হুগলী ঃ মানকুণ্ডু— মানকুণ্ডুতে ১৯৩১ সেপ্টেম্বর ৯-ই এক ডাকাতি হয়। অনুসন্ধানে পুলিশ টের পায়, চুঁচুড়া রোডের ওপর কয়েকজন যুবক ২৪৫৪৫-নং ট্যাক্সি ভাড়া করে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে খানিকটা যাবার পর, রিভলভার দেখিয়ে ড্রাইভারকে পথে নামিয়ে দেন এবং ট্যাক্সি নিয়ে উধাও হয়ে যান। পুলিশ খবর পেয়েই সন্ধান করতে থাকে এবং বৈদ্যবাটীতে পলাতকদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়।

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও সাম্যবিহারী মুখোপাধ্যায়ের যথাক্রমে সাত বছর ও চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ময়মনসিংহ ঃ অরণ্যপাশা— ময়মনসিংহের নন্দাইল থানার অন্তর্গত

অরণ্যপাশায় ধরণীকান্ত চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। ধরণীর সহচররা বেশ কিছু দূরে দূরে বাস করে, কিন্তু ধরণীর আড্ডায় এসে সবাই মিলে সলাপরামর্শ করে ; অস্ত্রাদি সেখানেই জমা থাকে।

১৯৩১ সেপ্টেম্বর ২২-এ ষড়যন্ত্রকারী সকলেই এসে ধরণীর বাড়ীতে মিলেছিল। ইতিমধ্যে কয়েকটা ডাকাতি হয়ে গেছে আশপাশের গ্রামে। তার মধ্যে, ১৯৩১ মার্চ ২৭-এ খামারগাঁ-র (নন্দাইল থানা) উপেন্দ্র মজুমদারের বাড়ী আর আগষ্ট ৪-ঠা এক পাট-গুদামে ডাকাতি উল্লেখযোগ্য।

সেপ্টেম্বর ২৩-এ ধরণীর বাড়ী খানাতল্লাসী হয়। সেখানে বিস্ফোরক-প্রস্তুতের উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ধাতু-নির্ম্মিত বোমার খোল, বোমা-তৈরীর ফর্ম্মুলা প্রভৃতি পুলিশের কবলে পড়ে। বহু যুবককে একে একে গ্রেপ্তার করা হয়। বাদসাদ দিয়ে তার মধ্যে সাতজনকে বাছাই করে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। প্রতি আসামী পাঁচটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, পাঁচটি স্বতন্ত্র হলেও, সমকালীনভোগ দণ্ডপ্রাপ্ত হন। সে-কারণে দীর্ঘতম দণ্ডের কালটিই উল্লেখ করা হচ্ছে। রায় প্রদত্ত হয়—১৯৩২ মার্চ ১৪-ই ; তাতে—

(১) ধরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী, (২) প্রফুল্লকুমার মজুমদার—উভয়ের সাত বছর হিসাবে ;

(৩) সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (৪) জগদ্বন্ধু বসু—উভয়ের ছ'বছর হিসাবে ;

(৫) নিখিলভূষণ চৌধুরীর সাড়ে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে আরও দু'জনের যথাক্রমে পাঁচ ও সাড়ে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

১৯৩২ ডিসেম্বর ৭-ই, হাইকোর্ট উপরি-উক্ত পাঁচজনের পূর্ব্বদণ্ডাদেশ বহাল রাখে, আর দু'জন মুক্তি পান।

কলিকাতা : মাণিকতলা ২৮।১-নং কেনাল ওয়েষ্ট (Canal West) লেনে ১৯৩১ অক্টোবর ২-রা মোটর-ট্যাক্সি সাহায্যে 'কৃষ্ণচন্দ্র সনাতন পাল'-এর গদিতে হামলা হয়। তাতে যে ৩০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়, পুলিশ তার সবটাই উদ্ধার করে।

এ ব্যাপার নিয়ে পাঁচজনের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা চালায় স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে। ১৯৩১ ডিসেম্বর ১৪-ই রায় প্রকাশিত হয়। তাতে দু'জনের মুক্তিলাভ হয় ; আর, (১) কালীপদ রায় চৌধুরী ও (২) ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের পাঁচ বছর হিসাবে, এবং (৩) নরহরি সেনগুপ্তর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩২ এপ্রিল ২৮-এ হাইকোর্টে সকলের আপীল নাকচ হয়।

ঢাকা : এক বড় ব্যবসায়ীর দোকান থেকে নন্দলাল বসাককে ১৯৩১

অক্টোবর ১৩-ই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছে, সেখান থেকে টাকা এনে স্থানীয় পোষ্ট-অফিসে জমা দেবেন। তাঁর সঙ্গে একজন লোকও ছিল। টাকা নগদ ২,০০০ আর ২৪,০০০ টাকার নোট নিয়ে তিনি পোষ্ট-অফিসের কাছাকাছি এলে, জন-তিন-চার যুবক নন্দ ও তাঁর সঙ্গীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ব্যাপার দেখে পথচারী দু'-তিনজন লুণ্ঠনকারীদের পিছু ধাওয়া করে। তখনকার মতো ধরা-পড়ার হাত থেকে রক্ষা পেলেও, কিছুদূরে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ (Court of Wards)-এর বাড়ীর সামনে দু'জনকে সাইকেল চড়ে যেতে দেখে, সন্দেহবশে তাঁদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়।

দু'জন আসামী বঙ্গেশ্বর রায় আর বিনয় বসুকে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে হাজির করা হয়। ১৯৩১ ডিসেম্বর ১০-ই উভয়ের দশ বছর ও অতিরিক্ত দু'বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে আপীল ১৯৩২ এপ্রিল ২৬-এ বাতিল হয়ে যায়।

এ-সম্পর্কে প্রসন্নকুমার সেনগুপ্তকে অনেক পরে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। ১৯৩৩ মে ১৯-এ তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

কুমিল্লা ঃ নিজ বাড়ী হলেও, কালাচাঁদ সাহা ভিতরের খবর বিশেষ কিছুই রাখতেন না। রেবতীমোহন সাহা তাঁর পরিবারভুক্ত লোক হলেও, তাঁর গতিবিধি কালাচাঁদের অগোচর ছিল। রেবতীর এক সঙ্গী প্রায়ই সেখানে আসা-যাওয়া করতেন ; কেউ কোনও সন্দেহ করেনি।

পুলিশ খবর পেয়ে, ১৯৩১ অক্টোবর ১৪-ই বাড়ীটা ঘেরাও করে জোর তল্লাসী চালায় ; একটা কাঠের বাক্সর মধ্যে কয়েকটি বিস্ফোরক পদার্থ এবং এক বোতল গ্লিসারিন উদ্ধার করে।

এই বস্তুগুলি রাখার অপরাধে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মামলার রায় প্রকাশিত হ'ল—১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ৫-ই। দু'জনেরই সাত বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

হাইকোর্টে আপীলে ১৯৩২ মে ২-রা রেবতীমোহনের দণ্ডাদেশ সমর্থিত হয় ; সঙ্গীটি মুক্তিলাভ করেন।

ময়মনসিংহ ঃ কাদিয়াদি— ময়মনসিংহের কাদিয়াদি থানার নগরগাঁও পোষ্ট-অফিসের ১,২৭২ টাকা সমেত ব্যাগ লুণ্ঠিত হয়—১৯৩১ অক্টোবর ২০-এ। গছাহিটা পোষ্ট-অফিস থেকে ব্যাগে ১,১১৫ টাকার ইনসিওর-খাম দেওয়া হয় আমচিটা ব্র্যাঞ্চ-ডাকঘরে দেবার জন্য। এই ব্যাগ মুড়মুড়িয়া, আমচিটা ও মাসুয়া হয়ে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছুবার কথা। নাগেরগাঁও পৌঁছুলে, দু'জন লোক বাইসিকেল চেপে ডাকবাহী পিয়ন

(Runner)-এর বল্লমটা ফেলে দেন এবং রিভলভার দেখিয়ে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে, কেটে ফেলেন। অতঃপর টাকা নিয়ে সাইকেলে করে পালিয়ে যান।

এই ব্যাপারে অন্ততঃ একজনের খুব ঝামেলা জুটেছিল। ১৯৩১ নভেম্বর ১৮-ই এ-সম্পর্কে প্রবীরচন্দ্র গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩২ জুন ৩-রা তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১,০০০ টাকা জরিমানা হয়।

১৯৩৩ জানুয়ারী ১১-ই হাইকোর্ট প্রবীরের আপীল না-মঞ্জুর করে।

প্রবীর অপর এক মামলা (কিশোর সঙ্ঘ, পাইকসা)-র ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৪-ই প্রদত্ত রায়ে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন।

এই মামলায় (নাগেরগাঁ বা মুড়মুড়িয়া ডাকাতি) মণীন্দ্রচন্দ্র সেন দণ্ডিত হয়েছিলেন। তখনকার মতো পালালেও, ১৯৩১ ডিসেম্বর ২০-এ তিনি কলিকাতায় ধরা পড়েন। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে ডিসেম্বর ২৩-এ তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ দুই বন্ধু সুকুমার মজুমদার আর মুকুলচন্দ্র রায়, ১৯৩১ নভেম্বর ৪-ঠা, মেছুয়াবাজার (সূর্য্য সেন) ষ্ট্রীট আর আপার সার্কুলার (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র) রোডের মোড়ে রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময় খুব সতর্ক হয়ে চলেছেন। কিছুদিন থেকে পুলিশ এই মোড়টাকে কড়া চৌকি দিচ্ছিল। দু'জনকে ধরে তল্লাসীতে অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে ১৯৩২ মে মাসে তাঁদের প্রত্যেকের চার বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

রাজসাহী ঃ ধরাবালিয়া— রাজসাহীতে পোষ্ট-অফিসের ডাক-লুঠ প্রায় সংক্রামক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। এবারকার ঘটনা ১৯৩১ নভেম্বর ১০-ই পুটিয়া (ধরাবালিয়া)-তে ঘটে। ডাকপিয়ন ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ দু'জন এসে পিয়নকে মারধোর করে ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যান।

আসামীদের খোঁজ চলতে থাকে। দু'জন ধরা পড়েন এবং স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে তাঁদের বিচার-নিষ্পত্তি হয়। ১৯৩২ জানুয়ারী ২৫-এ আসামী অমলেন্দু বাগচী এবং বিজনকুমার সেন—প্রত্যেকের সাত বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বরিশাল ঃ ধামুরাখাল— কয়েকটি যুবককে বরিশাল ধামুরাখালের কাছে পুলিশ সন্দেহজনকভাবে বসে থাকতে দেখতে পায়। তল্লাসী করবার পর একজনের কাছে একটা রিভলভার পাওয়া গেল। চারজনকে ধরে আসামী করে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়েছিল। ১৯৩১ আগষ্ট ৭-ই—প্রদত্ত রায়ে অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের জন্য সরোজকুমার চক্রবর্ত্তীর তিন ও ডাকাতির প্রচেষ্টায় আড়াই বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আর, একজনের আড়াই এবং তৃতীয় জনের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম আসামীদ্বয় মুক্তিলাভ করেন।

কাশী ঃ বারাণসীতে এক গোপন আড্ডায় হানা দিয়ে পুলিশ বিস্ফোরক-প্রস্তুতের উপকরণ এবং কয়েকটা রিভলভার-কার্ত্তুজ উদ্ধার করে। তিনজন আসামীর বিরুদ্ধে বিচার আরম্ভ হয়। ১৯৩১ সেপ্টেম্বর ১-লা—প্রদত্ত রায়ে সুবিমলকুমার রায় ও মৃণালিনী দাসী—প্রত্যেকের চৌদ্দ বছর দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের জন্য আরও তিন বছর সমকালীনভোগ দণ্ড যোগ করা হয়। তৃতীয় আসামী, এক মহিলা, মুক্তিলাভ করেন।

চট্টগ্রাম ঃ ১৯৩১ জুন ২-রা, ভোর ৫-টায় চট্টগ্রাম লালদিঘীতে স্নান করছেন এক কন্‌ষ্টেবল। সেখান থেকে তাঁর নজরে পড়ে—এক যুবক একটা বাণ্ডিল নিয়ে চলেছেন—আর কন্‌ষ্টেবলকে দেখতে পেয়ে ছোটা আরম্ভ করলেন। তখন তাঁর পিছু ধাওয়া করে গ্রেপ্তার করা হয়। বাণ্ডিলের মধ্য থেকে টিনের একটা লম্বা নল আর তার গায়ে জড়ানো বেশ খানিকটা ইলেক্‌ট্রিকের তার পাওয়া গেল।

এর সঙ্গে আরও উপসর্গ জুটলো—১৯৩১ জুন ৪-ঠা, জাঙ্গালখাঁর এক গৃহস্বামী দেখতে পান যে, সামান্য মাটীর নিচে টিনের এক কানেস্তারা পোঁতা রয়েছে আর তার গায়ে জড়ানো ইলেক্‌ট্রিকের তার। পুলিশে খবর দিলে, তারা এসে সেখানে থেকে দশটা কানেস্তারা উদ্ধার করে। ঐ মেটে-বাড়ীখানি সম্প্রতি ভাড়া নিয়েছিলেন রবীন্দ্র-নারায়ণ সেন।

বেশ তোড়জোড় করে মামলা আরম্ভ হয়। মূল অস্ত্রাগার-আক্রমণের মামলায় দু'জন আসামী অর্দ্ধেন্দু গুহ আর অনিল রক্ষিত জামিনে মুক্ত ছিলেন। তাঁদের এনে এই মামলায় ভর্ত্তি করা হ'ল।

শেষ পর্য্যন্ত আসামী-সংখ্যা দাঁড়াল আট। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩১ অক্টোবর ১৪-ই যে রায় দিলেন, তাতে দু'জন দু'বছর হিসাবে আর দু'জন আট মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। বাকী (১) হৃদয়রঞ্জন দাসের পাঁচ, আর (২) অর্দ্ধেন্দু গুহ, (৩) রবীন্দ্রনারায়ণ সেন ও (৪) নিবারণচন্দ্র ঘোষ—প্রত্যেকের তিন বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

অর্দ্ধেন্দু হাইকোর্টে আপীল করলেন না। বাকী তিনজন করলেন বটে, কিন্তু ১৯৩২ মার্চ ২৩-এ, হাইকোর্ট সব দণ্ডই যথাযথ বাহাল রেখে দেয়।

কলিকাতা ঃ খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জের কাছে ১৯৩১ অক্টোবর ১১-ই সন্দেহ-জনকভাবে দু'জন লোকের চালচলন পুলিশ-গুপ্তচরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদেশী জাহাজের খালাসী প্রভৃতির কাছ থেকে 'বে-লাইসেন্স' রিভলভার কিনতে পাওয়া যায় বলে ঐ অঞ্চলের পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি ওখানে নিবদ্ধ থাকতো।

যে দু'জনকে পুলিশ নজরে-নজরে রাখলে, সরোজ বসু (ওরফে সিরাজুল হক্) আর পরেশ বিশ্বাস, একটা বাসে চড়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে এলেন। সেখান

থেকে হেঁটে চললেন—৪-নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়ীটার দিকে। বাড়ীটা চিনে রাখা হ'ল।

ওয়ারেণ্টের বলে, ১৯৩১ নভেম্বর ২-রা ভোরে জোর তল্লাসী চালিয়ে একটা ফাইবারের সুটকেস্ থেকে আপত্তিকর কিছু কাগজপত্র আর একটা কাঠের ক্যাশ-বাক্সের মধ্যে থেকে চামড়ার খাপে ভরা ছ'ঘরা একটা রিভলভার এবং একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তলের বড় একটা অংশ (টোটা-ধারণের গহ্বর বাদে) আবিষ্কৃত হ'ল। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মামলায়, ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১-লা প্রদত্ত রায়ে সিরাজুলের পাঁচ এবং পরেশের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়।

একা সরোজ আপীল করেন। সে-আপীল ১৯৩২ মে ২-রা বাতিল হয়ে যায়।

ঢাকা : ১৯৩১ সেপ্টেম্বর রেল-ষ্টেশনের কাছে সরকারী টাকা লুঠের চেষ্টা হয়। টাকা পাওয়া যায়নি। কিন্তু এ-সম্পর্কে অধীররঞ্জন নাগকে আসামী করে চালান দেওয়া হয়। ১১৩১ নভেম্বর ৩০-এ, অধীরের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

রাজসাহী : অন্যান্য নানা জায়গার মতো, ১৯৩০ সালে রাজসাহীর কর্ম্মীরা বোমা-তৈরী আরম্ভ করে। পুলিশ টের পেয়ে, গৌরগোপাল দত্ত এবং অভয়াপদ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করে। ১৯৩১ ডিসেম্বর ১৫-ই, বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গের অপরাধে প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

চব্বিশ-পরগণা : বরাহনগরে তল্লাসীতে সুধীর (সুবীর)-কুমার দাসের নিকট নিষিদ্ধ অস্ত্র আবিষ্কার হওয়ায়, ১৯৩১ অক্টোবর ১৩-ই তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

অর্থ-লুণ্ঠন

কড়া আইন পাশ হয়েছে ঠিকই, ধরা পড়েছে বহু, তা সত্ত্বেও ছোট-বড় ডাকাতি হয়েছে অনেকগুলি ; পুলিশ কিছুরই কিনারা করে উঠতে পারেনি। যে-সকল ঘটনায় কম-বেশী অর্থ লুণ্ঠিত হয়েছিল, তাদের পরিচয় আগে দেওয়া যাচ্ছে :

বছরের গোড়ার দিকে, ১৯৩১ জানুয়ারী ১১-ই, ময়মনসিংহ জেলার ভৈরব থানার নীলগঞ্জ রেল-ষ্টেশনের ওপর চড়াও হয়ে, মাত্র ২২ টাকা নিয়ে চলে যেতে হয়।

জানুয়ারী ২৬-এ ঢাকা সহরে ফরাসগঞ্জ রোডের ওপর এক ডাকপিয়ন আক্রান্ত হন ; লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ১,৫০০ টাকা।

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে 'রেলি ব্রাদার্স (Ralli Brothers) এজেন্সী'তে ফেব্রুয়ারী ১৪-ই যে ডাকাতি হয়, তাতে ৭,৯১৯ টাকা, এবং তারপর ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার কুয়াপাড়ায় ডাকাতির ফলে ২,০২২ টাকা লুঠ হয়।

ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডাকাতি হয়—মার্চ ৫-ই ; লুণ্ঠিত অর্থ ১০,৯৪২। মার্চ ১০-ই ডাকাতি হয় ফরিদপুর পালঙ থানার কাউখাল গ্রামে ; অর্থের পরিমাণ ২,৭৮৩। পরে ময়মনসিংহ জেলার খামারগাঁ থানার নন্দাইল গ্রামে উপেন্দ্র মজুমদারের বাড়ী মার্চ ২৭-এ তারিখের ডাকাতিতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৭৮৩ টাকা।

শিয়ালদহ রেল-ষ্টেশনের কাছে আক্রমণে, এপ্রিল ২০-এ, লুণ্ঠিত অর্থ ৪,৯৩৮ টাকা। ক'দিন বাদে ময়মনসিংহ সাঁতিয়াবাজারের সশস্ত্র ডাকাতিতে, মে ১১-ই, ৫৪০ টাকার ক্ষতি হয়।

জুন ৫-ই খুলনা সামন্তসেনার ডাক-লুঠে মাত্র ৭০ টাকা এবং জুন ১৭-ই আসাম-বেঙ্গল রেলের নয়নপুর ষ্টেশনের ওপর হামলায় ২৭৮ টাকা মিলেছিল।

গৌরীপুর ঈশ্বরগঞ্জ ষ্টেশনের ওপর আক্রমণে জুলাই ২-রা, ১,২০৬ টাকা এবং জুলাই ৭-ই ঢাকা নারায়ণগঞ্জের নিতাইগঞ্জে সশস্ত্র ডাকাতিতে লুণ্ঠিত অর্থ ৮,৪৭৯ টাকা।

ঢাকা মিউনিসিপ্যাল অফিসের ফটকের সামনেই আগষ্ট ১-লার হামলাতে মেলে ৬,২০৬ টাকা।

ময়মনসিংহ নন্দাইল রোড বাজার ষ্টেশনে পাট-ব্যবসায়-কেন্দ্রের ওপর আগষ্ট ৬-ঠার ডাকাতিতে, টাকা গেছে ৩৯৫। ঢাকা সহরের ওপর 'সরস্বতী সমাজ'-এর ওপর আগষ্ট ১৩-ই সশস্ত্র হামলায় প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৬২৭ টাকা।

ঢাকা সহরে হেয়ার ষ্ট্রীট আর ওয়ার (Wyre) ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে সেপ্টেম্বর ৩-রা আক্রমণ হয় ; সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মাত্র ৩৪৮ টাকা। এটা পোষ্ট-অফিসের টাকা। খুলনা রঘুনাথপুরে সেপ্টেম্বর ১১-ই সশস্ত্র ডাকাতিতে ২,০০০ টাকা ; ঐ মাসের ১৩-ই ময়মনসিংহ করিমগঞ্জ থানার নিয়ামতপুরে ভগবান সাহার বাড়ীর ডাকাতিতে লুণ্ঠিত অর্থ ২,৩৩৩ টাকা।

খুলনা তালতলা থানার সতীশচন্দ্র মালাকারের বাড়ীর অক্টোবর ১০-ই হামলায় লাভের পরিমাণ মাত্র ৪৯২ টাকা। অক্টোবর ১২-ই ময়মনসিংহ বাজিতপুর থানার কমলাপুর গ্রামের পূর্ণচন্দ্র সাহার বাড়ী আক্রান্ত হয় ; ক্ষতি ৯০০ টাকা। অক্টোবর ১৬-ই রংপুর সৈয়দপুরের ভৈরববাজার এলাকার জিনারদি ষ্টেশনে তহবিল-সহ মেল-ব্যাগে ছিল ৮৩ টাকা ; সেটা বাদ পড়েনি। ফরিদপুর নারিয়া থানার অন্তর্গত চন্দানী গ্রামের অধিবাসী রাধাকৃষ্ণ দেবনাথের বাড়ী আক্রান্ত হয়—অক্টোবর ২১-এ ; পারিশ্রমিক জোটে ৯৯৪ টাকা। আবার, ময়মনসিংহ কাদিয়াদি থানার গচিহাটার রুক্মিণীকান্ত সরকারের পাটগুদামের ঘটনা—অক্টোবর ২৮-এ ; লুণ্ঠিত অর্থ—১,২৪৫ টাকা।

রাজসাহী, থানা চরঘাট, গ্রাম ধরবিলায় ডাকপিয়নের ওপর সশস্ত্র হামলা—

১৯৩১ নভেম্বর ১০-ই ; মাত্র ১৯৫ টাকার ডাকাতি। ঘটনাস্থল—ফরিদপুর পালঙ থানার উত্তর মাধবপাশা, রাধামোহন পালের বাড়ীতে ডাকাতি—নভেম্বর ১১-ই ; লুণ্ঠিত অর্থ ১,৯৫০ টাকা। মাদারিপুর কানাইঘাটিতে ডাকপিয়নের ওপর নভেম্বর ১৬-ই তারিখে আক্রমণ ; লুণ্ঠিত অর্থ ২,৫০০ টাকা।

ঘটনার তারিখ ১৯৩১ ডিসেম্বর ৪-ঠা ; ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল থানার সেওরাকাণ্ডা গ্রামের আব্দুল মজিদের বাড়ীতে ডাকাতিতে ২,৬০৮ টাকা উধাও হয়। দিনাজপুর হেমতাবাদ থানা এলাকার দারাকপুর গ্রামে মহেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ীতে ডাকাতি হয়—ডিসেম্বর ৭-ই ; প্রায় রিক্তহস্তে ১০০ টাকা নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন। ফরিদপুর নারিয়া ষ্টীমার-ঘাটের কাছে ডিসেম্বর ১৫-ই মেল-পিয়নের ওপর আক্রমণে ১,৯০০ টাকা-শুদ্ধ ব্যাগ লাভ হয়। ডিসেম্বর ১২-ই ঢাকা টাঙ্গিবাড়ী থানার তেলিরবাগে মোহন নাথের বাড়ীর ডাকাতি ; লুণ্ঠিত অর্থ ৬৭৭ টাকা।

আক্রমণাত্মক কাজ অনেকগুলি ; তার কয়েকটাতে কম-বেশী কিছু অর্থলাভ হয়েছিল, অথচ আসামীদের শাস্তি হয়নি।

বছরের প্রথম আক্রমণ, ১৯৩১ জানুয়ারী ৫-ই, বরিশাল আমানতগঞ্জে বরাখোলা পোষ্ট-অফিসের ওপর। বাগেরহাটে মেল-ব্যাগ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা হয়—জানুয়ারী ২০-এ। ঢাকা কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্-এর কর্ম্মচারীর ওপর গুলি চলে—জানুয়ারী ১২-ই। যথেষ্ট বিপদ ছিল ; আর, শ্রম সবই বিফল।

বরিশালে ডি.আই.বি. অফিসের ওপর বোমা পড়ে—১৯৩১ ফেব্রুয়ারী ২৩-এ ; নদীয়া ডি.আই.বি. কোয়ার্টার্স আর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বাড়ীর ওপর মার্চ ১৭-ই। আর, বোমা পড়ে এপ্রিল ২৪-এ কলিকাতা রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের ওপর।

নদীয়া কুমারখালিতে ১৯৩১ জুলাই ১৭-ই, বরিশাল ঝালকাঠির নয়নপুর থানা এলাকায় জুলাই ২৪-এ এবং বরিশাল মেন্দিগঞ্জ থানার ধরমগঞ্জে জুলাই ৩১-এ ডাক-লুঠের চেষ্টা হয়।

সেপ্টেম্বর ৯-ই কালনা (বর্দ্ধমান) পুলিশ-লাইন ও মেমারী পুলিশ-কোয়ার্টার্সের ওপর সেপ্টেম্বর ১০-ই বোমা পড়ে। দুটো ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল রাজসাহী ঘোড়ামারা ডাকঘরের কাছে সেপ্টেম্বর ১৮-ই এবং ময়মনসিংহ মেলান্দা থানার কলাবাঁধার অধিবাসী হৃদয় পালের বাড়ীর ওপর।

ঢাকা নরসিংদি থানার মাধবদি বাজারে সুশীলমোহন সাহার দোকানে হামলা হয়েছিল—অক্টোবর ১০-ই, আর বর্দ্ধমান থানার খাগড়া-গড়িয়াতে নূরজাহান মল্লিকের বাড়ী বিফল চড়াও হয়—অক্টোবর ২০-এ।

মরণ-যজ্ঞ

চট্টগ্রাম ঃ অশ্বিনী গুহর বাড়ী রাওজানে ; পুলিশ সন্দেহবশে ১৯৩১ এপ্রিল ২৭-এ গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠায়। জুলাই ১৭-ই তিনি হিজলী ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হলেন। সেখান থেকে ১৯৩৩ অক্টোবর ৩-রা কুখ্যাত মেদিনীপুর জেলে।

সে-সময় তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেছে। সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেলে, ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ২০-এ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়—যাতে চিকিৎসা, শুশ্রূষা, তত্ত্বাবধান সমস্ত দায়িত্ব স্বল্পবিত্ত আত্মীয়ের ঘাড়ে পড়ে। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে, তাঁকে রাঁচি-উন্মাদাশ্রমে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই ১৯৩৪ জুন ২৭-এ তিনি আত্মহত্যা করেন।

চাঁদপুর ঃ চাঁদপুরে বোমা-তৈরী চলছিল। ১৯৩১ জুন ১৫-ই পুরানোবাজারের একটা ঘর থেকে বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেল। সেখানে দেখা গেল—গুরুতর-ভাবে আহত অতুল ঘোষ ও অশ্বিনী দাস—দুই বন্ধুর মৃতদেহ।

জুন ১৬-ই থেকে বহু ধরপাকড় হয় ; মামলাও ওঠে। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ফলে, ১৯৩১ অক্টোবর সকল আসামী মুক্তি পান।

প্রতিশোধ

উচ্চপদস্থ চারজন রাজকর্ম্মচারীর হত্যা-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বাকী তিনজনের কথা সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। এঁদের নিয়ে বড় হুজ্জুত কিছু হয়নি ; অবশ্য আততায়ীকে খুঁজে বার করবার পুলিশের যে বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল, সে-কথা বলা বাহুল্য।

চট্টগ্রাম ঃ অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের পর থেকে বিপ্লবী কার্য্যকলাপ অল্পবিস্তর চলতে থাকে। ডি.আই.বি. ইন্সপেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে হত্যার সঙ্কল্প গ্রহণ করে বিপ্লবীরা তৎপর হয়ে ওঠেন। পুলিশ-মহলে শশাঙ্কর খুব যশ ; অত্যন্ত কুশলী অফিসার। ১৯৩১ মার্চ ১৬-ই চট্টগ্রাম পটিয়া থানার বরমা গ্রামে তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে চলেছেন। হঠাৎ যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন তাঁর যমরূপী তারকেশ্বর দস্তিদার ; শশাঙ্কের পিছনদিকে খুব নিকটে এসে রিভলভার ছুড়লেন,—গুলি আক্রান্তের পিঠ ভেদ করে চলে গেল। শশাঙ্ক ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন ; সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

"যথা পূর্ব্বং—" (১৯৩২)

আন্দামানের বন্দীদের দুর্দ্দশার কথা যখন চেপে রাখা আর সম্ভব হ'ল না, ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন উঠলো—তখন গভর্ণমেণ্ট (রাজনৈতিক) বন্দী পাঠানো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তাই ১৯২১ জুলাই মাস থেকে ফিরতি-যাত্রা শুরু হয়। ১৯২৩ সাল থেকে আর এ-শ্রেণীর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী যায়নি।

ঠাট বজায় রাখা হ'ল ঠিকই, এখন বাঁধা ঘর কবে কোন্ সময় কাজে লাগে। আবার ১৯৩০ সাল নাগাদ ধূলো ছাড়া চুনকাম করা আরম্ভ হ'ল। বাঙ্গলায় আর পাঞ্জাবে আবার দামামা বেজে উঠেছে। মনে হয়েছে, বাঙ্গলার জেলে এসকল কয়েদী রাখা নিরাপদ নয়, কখন কি অঘটন ঘটিয়ে বসে! তা ছাড়া, সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে দিতে পারে। তার ওপর এল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের ব্যাপার। গভর্ণমেণ্ট তো বে-সামাল হয়ে পড়লো। সব দিক বিবেচনা করে ১৯৩২ সনের গোড়াতেই সেলুলার জেলের ফটক উন্মুক্ত হ'ল। তখন পুরাতন অনাচার ও অত্যাচার আবার নতুন করে অনুষ্ঠিত হতে লাগলো।

এবারে দলেও পুরু—পাঞ্জাবের দুর্দ্ধর্ষ বীরেরা আছেন। সঙ্গে দলে দলে গিয়ে জুটতে লাগলেন বাঙ্গালী বিপ্লবীরা। আগের মতো ব্যাপার অত সহজ হ'ল না। ১৯৩৩ সালে রাজবন্দীরা অনশন শুরু করে দিলেন। তাঁরা মানুষের মতো বাঁচার দাবী জানিয়েছিলেন; প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে এই আত্মনির্য্যাতন ও মরণপণ। জবরদস্তি বাঁচাবার চেষ্টায় যেসকল বৈজ্ঞানিক বিধি জানা আছে, হাতুড়ের হাতে পড়ে তারা মারণাস্ত্র হয়ে উঠলো। বাঁচাবার (অপ-) চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট কয়েকজন বন্দীকে প্রকারান্তরে হত্যা করেছে।

যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ ১৯৩০ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে, বাঙ্গলার বিপ্লবীরা পর পর ক'বছর তার মর্য্যাদা রক্ষা করে চলেছেন। ১৯৩২ সালেও বাছাই রাজকর্ম্মচারী ও স্বাধীনতার পরিপন্থী সম্ভ্রান্ত লোকেদের ওপর সফল ও বিফল সবরকম হামলাই হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। বহুর মধ্যে যেগুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, প্রথমদিকে সে-সকলের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা)

বৎসরের গোড়ার দিকে ঘটে গেল গুরুত্বে ভরপুর এক ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্সেলর (Chancellor) বাঙ্গলার লাট জ্যাক্সন (Stanley Jackson) ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ৬-ই বার্ষিক কনভোকেশনে বক্তৃতা দেবার কালে আক্রান্ত হন একটি

শিক্ষিতা, স্বল্পভাষিণী ও শান্তপ্রকৃতি ছাত্রী কর্তৃক। আততায়ী বীণা দাস (ভৌমিক) ডায়োশিসান (Diocesan) কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেছেন এবং সেইসূত্রে কনভোকেশনে উপস্থিত থাকার অধিকার লাভ করেছেন।

নিজ কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে তিনি বসে আছেন—লাটের সম্মুখ থেকে ষষ্ঠ সারিতে চতুর্থ স্থানে। লাট যখন নিজ উচ্চ আসনের দিকে চলেছেন—বীণা তখন আসন থেকে উঠে এসে তাঁরই কলেজের এক অধ্যাপিকার কাছে খাবার-জল চাইলেন। লাটের বক্তৃতা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দ্দেশ পেয়ে, ফিরে গিয়ে চতুর্থ চেয়ারে না-বসে, সেই সারিতেই পথের পাশেই এক খালি-চেয়ার দখল করেন, যাতে উঠে এগিয়ে যেতে কোনওরকম বাধা পেতে না-হয়।

অল্পক্ষণ পরেই বীণা আসন-ত্যাগ করেই ত্বরিতপদে সামনে একটু এগিয়ে গিয়েই পোশাকের মধ্য থেকে এক রিভলভার বার করে লাটকে লক্ষ্য করে গোটা-তিন-চার গুলি ছোড়েন (আততায়ী ও আক্রান্তের মধ্যে ব্যবধান ১১-১১॥০ ফুট মাত্র)। লাটের দেহে বুলেট লাগেনি, আর বীণার পাশেরই দুই আমন্ত্রিত ভদ্রলোক উঠে তাঁকে ধরে ফেলেন। তার মধ্যেও বীণা বার-দুই গুলি ছোড়েন ; তাতে কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। ব্যর্থতা বুঝেই বীণা পোশাকের মধ্যে একটা পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাতেও বিফল হলেন। পকেটে ছিল পটাসিয়াম সায়ানাইড।

সেইদিনই বিকালে ডায়োশিসান হোষ্টেলে বীণার ঘরখানা তল্লাসী হ'ল। সেখানে তাঁর রিভলভারে ব্যবহারযোগ্য পাঁচটা তাজা কার্ত্তুজ, আর ষ্টীভেন্স-হত্যাকারিণী দুই বীর রমণীর ছবি পুলিশ আবিষ্কার করে। ছবির নিচে লেখা ঃ "আমার রক্তে আজ খুন চেপেছে"।

কলিকাতা হাইকোর্টে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে মামলা আরম্ভ হ'ল—১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৫-ই। সরকারী সাক্ষীসাবুদ যথারীতি এলো গেল। আসামী এক বিবৃতি দিলেন। তাঁর বক্তব্য—দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি লাটকে গুলি করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। লাটের যে শারীরিক কোনও ক্ষতি হয়নি, তাতে তিনি পরম পুলকিত। জ্যাক্‌সন-কে তিনি পিতৃতুল্য মনে করেন এবং লাটপত্নী তাঁর মাতৃসমা। ত্রিশ কোটি লোককে দাসত্বে পরিণত করেছে এক শাসনযন্ত্র। লাট সেই বিধি-বিধানের প্রতীক এবং মাত্র সেই কারণেই তাঁর ওপর এই আক্রমণ।

ফেব্রুয়ারী ১৫-ই বীণার নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

বে-পরোয়া

ফরিদপুর ঃ চরমুগুরিয়া— অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় পোষ্ট-অফিসের ওপর হামলা হামেসাই ঘটতে দেখা গেছে। এইরকমই একটা ঘটে, ১৯৩২ মার্চ ১৪-ই, মাদারিপুর চরমুগুরিয়া পোষ্ট-অফিসের ওপর, বেলা ৩-৩॥০-টার সময়।

লুণ্ঠনকারীরা সংখ্যায় জন-পাঁচেক। দু'জনের হাতে রিভলভার, একজনের কাছে ছোরা। পোষ্টমাষ্টার ও এক সহকারী একই টেবিলের দু'পাশে বসে কাজ করছেন। আগন্তুকরা ঘরে প্রবেশ করেই সমস্ত টাকা দিয়ে দিতে বলেন, আর টেবিলের ওপর টাকার থলি, ইনসিওরের খাম প্রভৃতি যা হাতে পান তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অপর কর্ম্মচারীরা ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করতে থাকেন এবং পিয়ন তাহির আলি পলায়মান মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে ধরে ফেলেন। মনোরঞ্জন ছোরা মারলে, তাঁর মৃত্যু ঘটে। ডাকাত সব-ক'জনই ঘটনাস্থলে ধরা পড়েন। বিচারের জন্য স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হয়। ১৯৩২ মে ১২-ই প্রদত্ত রায়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ফাঁসির হুকুম হয়। তা'ছাড়া, (২) সুরেন্দ্রমোহন করের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, এবং (৩) সন্তোষ দত্ত, (৪) রামচন্দ্র দাস সাহা ও (৫) সুবল-চন্দ্র রায় কর্ম্মকার—প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩২ জুলাই ৪-ঠা হাইকোর্ট সব দণ্ডই সমর্থন করে।

আগষ্ট ২২-এ বরিশাল জেলে মনোরঞ্জনের ফাঁসি হয়।

ডগ্‌লাস-হত্যা

মেদিনীপুর (দ্বিতীয় অধ্যায়): মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা যেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যার দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন। পেডি-হত্যা হয়ে গেছে। তাঁর স্থলে এলেন ডগ্‌লাস (Robert Douglas)। চাকরির খাতিরে না-এসে উপায় ছিল না। তিনি কিন্তু একটা আসন্ন বিপদাশঙ্কা নিয়েই এসেছিলেন। ১৯৩১ আগষ্ট ৫-ই রাজমহেন্দ্রীতে তাঁর ভ্রাতাকে লিখেছিলেন যে, তিনি নিশ্চিৎ বিপদ মাথায় করে আসছেন, সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই।

সতর্কতামূলক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জেলা-শাসক হিসাবে বাইরের নানা কাজে যোগ দিতে হয়; সরকারী ও আধা-সরকারী অনুষ্ঠানেও তাঁকে উপস্থিত থাকতে হয়। ১৯৩২ এপ্রিল ৩০-এ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মিটিংয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। বিকাল ৫-৩০ মিনিট নাগাদ তাঁর আসনে বসে কাগজপত্র দেখছেন—এমন সময় দু'জন যুবক তাঁর বাম ও দক্ষিণ পাশে পাঁচ-ছ'হাত দূরে এসে দাঁড়ান। একই সঙ্গে দু'জনেই গুলি ছুড়লে, ছ'টার মধ্যে তিনটা বুলেট ডগ্‌লাস-এর হাত, বুক ও তলপেটে প্রবেশ করে। আঘাত অতি গুরুতর। রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটে চিকিৎসকের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন।

আততায়ী দু'জন ঘটনাস্থল থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়েন এবং কতকটা দূর একসঙ্গে গিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে যান। একজনকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়জনের পশ্চাদ্ধাবন করে একটা পোড়ো-ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে গ্রেপ্তার করা

হয়। ইনি হচ্ছেন প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য। প্রদ্যোতের কাছে একটা দু'ঘরা রিভলভার তখনও রয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটিতে কার্ত্তুজ-ভরা, আর অবশিষ্ট কার্ত্তুজ সেই ঘরের মধ্যেই পাওয়া গেল, অর্থাৎ প্রদ্যোতের রিভলভার ঘটনার আগেই বিগড়ে যায় ; ডগ্‌লাস-এর দেহে প্রদ্যোতের গুলি লাগেনি। সাহেবের ময়না-তদন্তে যে গুলি পাওয়া যায়, সেটা অপর আততায়ীর রিভলভারের গুলি বলে গ্রহণ করতে হয়।

প্রদ্যোতের পকেটে দু'-টুকরো কাগজ পাওয়া যায়। একটিতে লেখা ঃ "হিজলী বন্দী-নিবাসের অমানুষিক অত্যাচারের সামান্য প্রতিবাদ। এইসকল মৃত্যু থেকে ইংরেজ শিক্ষালাভ করুক, আর এই ত্যাগে ভারত জেগে উঠুক"। আর একটাতে ছিল ঃ "আমাদের প্রাথমিক পাটীগণিত"। এটার নানারকম ভাষ্য দেওয়া হয়েছিল। অত্যাচারের বিরুদ্ধে চরম শাস্তি গণিতের ধারার ন্যায় পরস্পরকে অনুসরণ করে চলে।

আসামীর বিচার স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে আরম্ভ হ'ল—১৯৩২ জুন ৮-ই। সেখানে হত্যার সঙ্গে ষড়যন্ত্র যোগ করে দেওয়ায়, অপরাধটা হত্যার পর্য্যায়ে তুলে দেওয়া হয়। যদিও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'ল যে, প্রদ্যোতের গুলি ডগ্‌লাস-এর দেহ স্পর্শ করেনি, তবুও প্রাণের প্রতি উপেক্ষাহীন এমন এক যুবককে ফাঁসিতে লটকাতে না-পারলে ইংরেজ শাসনযন্ত্র তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। হত্যার চেষ্টাই তাঁর ফাঁসির কারণ বলে ১৯৩২ জুন ২৫-এ ট্রাইবিউন্যাল রায় দিয়েছিল।

হাইকোর্টে আপীল হয়। আগষ্ট ১৬-ই হাইকোর্টের রায় পূর্ব্বদণ্ডাদেশের সমর্থন জানায়।

১৯৩৩ জানুয়ারী ১২-ই মেদিনীপুর জেলে প্রদ্যোতের ফাঁসি হয়ে যায়।

প্রাণদণ্ডের আদেশ পেয়ে প্রদ্যোৎ যেন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। ফাঁসির পূর্ব্বে তাঁর দেহের ওজন বেড়ে যায়। কানাই দত্ত থেকে আরম্ভ করে আরও কয়েকজনের জীবনে এ-ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। এর পিছনে নিরুদ্বেগ প্রশান্তি যে কাজ করছিল, তাঁর জীবনের প্রায় শেষ পত্র থেকে বোঝা যায়। শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র লিখিত 'শহীদ প্রদ্যোৎকুমার' থেকে কতকটা অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। এতে অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণের মনের চিত্র সুনিপুণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ১৯৩২ জুলাই ১৩-ই মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে লিখিত পত্রাংশ (পৃঃ ৭৯) ঃ

"··· জগতে কেউ কখনও চিরদিনের জন্য আসে নাই এবং কেউ চিরদিন জগতে থাকবেও না। প্রাণ বাঁচানই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। জীবন যদি জীবনের কাজেই না লাগলো, তবে সেরকম জীবনের প্রয়োজন কি ?"

পরেই নভেম্বর ২২-এ বড়বৌদিকে লিখেছেন (পৃঃ ৮১) ঃ

"আমার যাবার কল্পনা যা এতদিন মনে করে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে এসেছি, তা সফল হতে চললো। ··· আজকের এই আনন্দকে কোন কথাই

ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। আমার এ যে আশাতীত ধারণাতীত লাভ (ধর্ম্মের জন্য), দেশের জন্য, যে-কোন উপাস্যের জন্য ত্যাগের, এমনকি জীবন-বিসর্জ্জনের দৃষ্টান্তের জন্য পুরাণ বা ইতিহাসের পাতা উল্টাইবার প্রয়োজন নাই; আমাদের চেখের সামনে আমরা প্রতিনিয়তই তা দেখতে পাচ্ছি।

"··· রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে ঃ

'আকাশ হতে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙ্গা কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠল রে, ঐ উঠল রে"

—আমার অন্তরে স্পন্দিত হচ্ছে। এটা পড়ে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, এই দেখে যে, কবির এই ছন্দটা যেন আমার জীবনেরই প্রতিধ্বনি। আমার জীবনের পাতায় যেন তাঁর কোন অক্ষরটিও বাদ যাচ্ছে না। সবই যে সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ তো গান শোনা নয়, কাব্য পড়া নয়, এ যে একেবারে প্রাণে প্রাণে অনুভব।"

মাতা পঙ্কজিনীর নামে লিখিত (পৃঃ ৮২) ঃ

"আমি যে আজ মরণের পথে যাত্রা শুরু করেছি তার জন্য কোন শোক করো না। আমার ভাইদের বলো যে আমার অসমাপ্ত কাজের মধ্যে আমার হৃদয় রেখে গেলাম। আমার জন্য দু'দিন চোখের জল ফেলে ভুলে যাওয়ার চেয়ে আমার সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চেষ্টা করলে আমার ঢের বেশী তর্পণ করা হবে। আজ যদি কোন ব্যারামে আমায় মরতে হোত তবে কি আপশোষই না থাকতো লোকের মনে; কিন্তু আজ একটা আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করছি, তাতে আনন্দ আমার মনের কানায় কানায় ফুটে উঠছে, মন খুশিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফাঁসির কাঠটা আমার কাছে ইংরেজের একটা পুরানো রসিকতা বলে মনে হচ্ছে।"

এই মনের শক্তিতে প্রদ্যোৎ মরণের ভয়কে জয় করেছেন। আর, মন যখন আনন্দে ভরপুর তখন দেহে কিছু ওজন বৃদ্ধি হওয়া—এসকল মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের কাছে, বিশেষ একটা কিছু ব্যাপার নয়।

মরণের পাওনা

চট্টগ্রাম (ধলঘাট) ঃ নানা স্থান ঘুরতে ঘুরতে 'মাষ্টার-দা' আর তাঁর অন্তরঙ্গ নির্ম্মল সেন, অপূর্ব্ব সেন আর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে চট্টগ্রাম সহর থেকে দশ মাইল এবং পটিয়া পুলিশ-ছাউনি থেকে মাত্র চার মাইল দূরে এক গৃহস্থ-বাড়ীতে আশ্রয় নেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে, ১৯৩২ জুন ১৩-ই রাত্রি ৯-টা নাগাদ তাঁরা খেয়ে উঠেছেন, এমন সময় বাড়ীর একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা সংবাদ দিলে যে, ঐ বাড়ীর দিকে বহু পুলিশ ও মিলিটারী আসছে।

তৎপর হয়ে মাঠকোঠার দোতলায় উঠলেন সকলে। বাড়ী সম্পূর্ণরূপে পুলিশ ও সিপাহী দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়লো। তারপরই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলেন ক্যাপ্টেন ক্যামেরন (Captain Cameron) ও এক হাবিলদার। 'মাষ্টার-দা' আর একজন সঙ্গী বাঁশের মই সাহায্যে রান্নাঘরের করোগেট-টিনের ছাদের ওপর নেমে, লাফ মেরে মাটিতে পড়ে পিছন দিয়ে সরে পড়তে সমর্থ হন।

হাবিলদার সামনে, ক্যামেরন পিছনে। অপূর্ব্ব হাবিলদারকে সজোরে এক ধাক্কা দিতে তিনি গড়িয়ে মাটীতে পড়লেন। সাহেবকে সামনে পেয়েই অপূর্ব্ব রিভলভার ছুটিয়ে দিলেন। সাহেবের প্রাণহীন দেহ সিঁড়ি থেকে মাটীতে গিয়ে পড়লো। তখন সামনের শত্রু বিদেয় হলে, অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসেন। তৎক্ষণাৎ এক সিপাহীর বন্দুকের গুলি এসে লাগে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দোতলায় নির্ম্মলকে দেখা যাচ্ছিল; তখন তিনি এক জানালা দিয়ে ঘরের বাইরে বেরুবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর ওপর টর্চ্চের আলো এসে পড়লো এবং অবিলম্বে রাইফেলের গুলি এসে লাগায় তিনি আহত হন।

বাড়ী দস্তুরমত ঘিরে রেখে যুদ্ধবিরতি ঘটলো স্বল্পক্ষণের জন্য। এক হাবিলদার মিলিটারী ছাউনি থেকে নতুন একদল রাইফেল-ধারী আর একটা লুইস্ (Lewis) কামান এনে হাজির করলেন। বাড়ী আরও ভাল করে ঘিরে, বাড়ীর একটা জানালার ফাঁকে কামানের গোলা-নিক্ষেপ চললো। উপর থেকে মাঝে মাঝে রিভলভারের গুলি ছুটছে, কিন্তু তাতে কারও ক্ষতি হচ্ছে না।

কামানের গোলা আরও কিছুক্ষণ চলবার পর, ওপরের ঘরে আর জীবিত লোকের সাড়া পাওয়া বন্ধ হ'ল।

রাত্রি কেটে গেল। ভোরে বাড়ীর ধারে অপূর্ব্বর মৃতদেহ পাওয়া গেল। উপরের ঘরে নির্ম্মল চিরনিদ্রায় মগ্ন—দেহ ক্ষত-বিক্ষত।

এইবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু : আশ্রয়দাত্রীদের দুর্ভোগের পালা। সেদিনের নতুন অর্ডিনান্সের বলে আশ্রয়দাতাদের শাস্তির বহর অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তার মধ্যে যাঁরা এগিয়ে এসে এই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েছিলেন, তাঁদের সৎসাহসের উদাহরণ শ্রদ্ধালাভের যোগ্য।

গ্রেপ্তার করা হ'ল বাড়ীর সাতজনকেই। পলাতকদের আশ্রয়দান, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অভিযোগে সকলের বিচার স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হয়েছিল। এখানে ১৯৩২ অক্টোবর ২৪-এ—(১) সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পুত্র (২) রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, (৩) অজিত বিশ্বাস, (৪) দীনেশ ওয়াদ্দেদার (দাশগুপ্ত), (৫) মণীন্দ্র দে—এই পাঁচজনের বিভিন্ন অভিযোগে—প্রত্যেকের (১) চার বছর, (২) চার বছর ও (৩) ছ'মাস—সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড লাভ হয়েছিল।

অজিত আর মণীন্দ্র হাইকোর্টে আপীল করেন। ১৯৩২ ডিসেম্বর ২৮-এ সে-আপীল নাকচ হয়।

এইবার তৃতীয় অধ্যায়। ব্যাপারটি বিশেষ মর্ম্মান্তিক। দারুণ দুর্দ্দৈব ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও, জেনেশুনে লোক বিপদ ঘাড়ে নিয়েছে। কিন্তু মানুষের চিরন্তন স্নেহের প্রবৃত্তিতে সেখানে মানুষ নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি।

যখন রামকৃষ্ণ গ্রেপ্তার হন, তখন তিনি ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত। এ অসুস্থতা তাঁকে নতুন গুরুতর বিপদ বরণ করা থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। বিচারের পর তাঁকে ও মাতা সাবিত্রী দেবীকে কুখ্যাত মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। রামকৃষ্ণর স্বাধীন মন জেল-আইন সম্পূর্ণ মেনে নিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর দুর্ব্বল শরীর এ-কাজে প্রতিবন্ধক হয়নি। জেলের 'ফালতু', ওয়ার্ডার, ঝাড়ুদার প্রভৃতির সাহায্যে মায়ের কাছে সন্তানের খবর এসে পৌঁছায়; জেলের যন্ত্রণা ছাড়া সন্তানের স্বাস্থ্যের উদ্বেগ ভোগ করতে করতে তাঁর দিন কাটে। অনেকবার সন্তানকে দেখবার জন্য সরকারকে দরখাস্ত করেছেন; বলা বাহুল্য, অনুমতি জোটেনি।

শেষ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ মিলেছিল বটে। হয়তো না-পেলে ভালই হ'ত। রামকৃষ্ণকে জেল-শাসন বশীভূত করতে পারেনি। একটার ওপর আর একটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাতে-পায়ে শিকল লাগানো থাকতো প্রায়ই—জেলের শৃঙ্খলা-ভঙ্গের "পুরস্কার"। ক্রমশঃ রোগীর অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। যে বন্দীকে 'বাগ মানানো' যায় না, তার চিকিৎসা তদনুপাতেই হতে থাকে।

একদিন সকালে দেখা গেল শৃঙ্খলিত অবস্থায় অচৈতন্য রামকৃষ্ণ মাটীতে পড়ে আছেন--জীবনের কোনও লক্ষণ বর্ত্তমান নেই। সদাশয় জেল-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাবিত্রী দেবীকে সন্তান-দর্শনের অনুমতি দিলেন। মৃতদেহ পড়ে আছে মাটীতে ঃ দু'জনের মাঝে লোহার গরাদের ব্যবধান। বাইরে থেকে একবার চোখের দেখা মাত্র। ভিতরে যাবার অনুমতি নেই। সাশ্রুনয়নে সন্তানহারা মা নিজ কারাকক্ষে ফিরে এলেন। ঘটনার সাল ১৯৩৬; এর বেশী আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ফাঁসি পর্য্যন্ত নানা শাস্তি সহস্র সহস্র নরনারীর কপালে জুটেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাবিত্রী দেবীর শাস্তি বেদনায় তুলনাবিহীন মর্ম্মান্তিক।

আমন্ত্রিত মৃত্যু

ঢাকা ওয়াড়ি ঃ বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ ফুটে উঠেছে বেশী করে, কারণ সঙ্গে রসদ জুগিয়েছে নিরুপদ্রব আইন-অমান্য আন্দোলন। যখন অল্পে হ'ল না, তখন মুন্সীগঞ্জের নিরুপদ্রব আন্দোলনকারীদের শিক্ষা দেবার জন্য কামাখ্যাপ্রসাদ সেনকে ১৯৩২ জানুয়ারীতে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট করে পাঠানো হয়। তিনি নির্ম্মম হস্তে

আন্দোলন দমন করবার কাজে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। মহিলারাও তাঁর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাননি।

কাম্যাখ্যার কাজে গভর্ণমেণ্ট খুব তালিম দিচ্ছে, কিন্তু তিনি নিজে একটা অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ছেন। উত্তপ্ত আবহাওয়া থেকে সরে পড়বার জন্য তিনি তিন মাসের ছুটি নিলেন। মাহিনা নেবার জন্য ঢাকায় এসে ওয়াড়িতে এক বন্ধুর বাড়ী আশ্রয় নিলেন। একতলার একটা ঘরে তিনি রাত্রে নিদ্রা যান। ঘরের জানালাতে গরাদে নেই ; গ্রীষ্মকাল, জানালা খুলেই কামাখ্যা শয্যা আশ্রয় করেছেন।

কামাখ্যার অপকর্ম্মের প্রতিশোধ নেবার জন্য বিক্রমপুরের কালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং কামাখ্যার গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করছিলেন। ১৯৩২ জুন ২৪-এ তিনি ওয়াড়ি এলেন, আর পটুয়াটুলি অঞ্চলে এক দর্জ্জির দোকানে বাসা গাড়লেন। পরের দিন মিটফোর্ড হাসপাতালে এক বন্ধুর অপারেশনের সময় উপস্থিত থাকবেন বলে নতুন বাসা থেকে বিদায় নিলেন।

শিকারের সন্ধানে কালীপদ ১৯৩২ জুন ২৭-এ কামাখ্যার আবাসের নিকট পৌঁছে ভোর চারটা পর্য্যন্ত ঘাপটি মেরে রইলেন। তারপর গরাদেহীন জানালা দিয়ে কামাখ্যার ঘরে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে মশারি তুলে নিদ্রিত কামাখ্যার দেহের চার জায়গা বুলেট-বিদ্ধ করেন। যেমন প্রবেশ করেছিলেন তেমনই নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে সরে পড়লেন। বাড়ীর মালিক শব্দ শুনে এসে, সব ব্যাপার দেখে একেবারে স্তম্ভিত।

কালীপদ যখন দর্জ্জিবন্ধুর দোকানে ফিরলেন—মুখের ভাব শান্ত, মানসিক চঞ্চলতার কোনও লক্ষণ নেই ; একেবারে সমাহিত ভাব।

চারিদিকে খোঁজাখুঁজি পড়ে গেল ; কোনও সূত্রে সন্ধান কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বনের জন্য জেলা-হাকিমের হুকুম ছড়িয়ে পড়লো ; পোষ্ট-অফিসকে জানাতে ভুল হয়নি। বেলা ২-টা নাগাদ একজন একটা টেলিগ্রামের বয়ান নিয়ে আসে। প্রেরক ঃ "সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭ পটুয়াটুলি, ঢাকা"। টেলিগ্রামটি পাঠানো হচ্ছে—"ডাক্তার, সারদা মেডিক্যাল হল্, ইছাপুরা"। তাতে লেখা ছিল ঃ "কামাখ্যার অপারেশন সফল, চিন্তার কারণ নেই।" ("Kamakshya's operation successful no anxious")

আগন্তুককে বসিয়ে রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হ'ল, আর অনতিবিলম্বে পুলিশ এসে হাজির। টেলিগ্রাম-বাহককে সঙ্গে নিয়ে দর্জ্জির দোকানে পৌঁছালে, লোকটি কালীপদকে দেখিয়ে দেয়। কালীপদকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁর হাজত-বাস চললো। পুলিশের উত্তরে তিনি বলেন—র‍্যান্‌কিন ষ্ট্রীটে সদর মহকুমা-হাকিমের বাড়ীতে দেশের কল্যাণের জন্য কামাখ্যাকে হত্যা করা হয়েছে। এ কাজের জন্য তিনি একাই দায়ী। তিনি পিস্তল কোথা হতে পেয়েছেন, সে কথা প্রকাশ করবেন না (পাঠক কল্পনা

করতে পারেন, এ তথ্য আদায় করবার জন্য পুলিশ কতরকম প্রক্রিয়া গ্রহণ করে থাকবে)। নিরুপদ্রব আইন-অমান্য-আন্দোলনে বিক্রমপুরে কামাখ্যা মহিলাদের ওপর যে অকথ্য অভাবনীয় অত্যাচার করেছেন, এটা তারই প্রতিবাদ। "আমি সব স্বীকার করছি, যাতে নিরীহ লোক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়।"—কালীপদ বলেছিলেন।

স্পেশ্যাল জজের কাছে ১৯৩২ নভেম্বর ১-লা বিচার আরম্ভ হ'ল। তাঁর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়ে নভেম্বর ৮-ই রায় প্রকাশিত হ'ল। ডিসেম্বর ৯-ই হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় সমর্থন করে।

একটু অত্যুৎসাহর জন্য সব বানচাল হয়ে গিয়েছিল। এটা তাঁর মারাত্মক ভুলের মাশুল। ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। 'পূর্ব্ব-বাঙ্গলা ব্রাহ্মণ সমাজ'কে অন্ত্যেষ্টির জন্য শবদেহ ছেড়ে দেওয়া হয়।

অতুলনীয় মনোবল

ফরিদপুর ঃ আঙ্গারিয়া— নানা দিক থেকে বিচার করলে, পালং থানার আঙ্গারিয়ার ডাকাতি একটা বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা বলা যেতে পারে।

আঙ্গারিয়া পোষ্ট-অফিসে সাধারণতঃ বেলা ৫-টায় ডাক বন্ধ করা হয় এবং পরদিন ভোর ৫-টায় ষ্টীমার-ঘাটে ডাক-পাঠানো নিয়ম ছিল। অপরাপর দিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে ১৯৩২ মে ১৬-ই। যখন পিয়ন পিয়ারী ষ্টীমার-ঘাট থেকে ফিরতি মেল্ নিয়ে ফিরছেন তখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রোডের ওপর দাদপুর ভাসানচরে চারজন লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁর চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ঘষে দেওয়া হয়। তথাপি বহুকষ্টে তিনি লক্ষ্য করেন যে, আততায়ীরা রাস্তার দক্ষিণের ঢালু দিকটা বেয়ে নেমে, খাল পার হবার পর দক্ষিণ দিকেই চলে গেছেন।

পিয়ারী চীৎকার করতে ভোলেননি। আশপাশের লোক অনেকেই পলায়নপর আক্রমণকারীদের পিছু ধাওয়া করে চলতে থাকেন। ডাকাতরা তখন ছাউনিওয়ালা একটা নৌকার মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং তাকে চালিয়ে দেন। প্রায় সেই সময় তাঁরা পশ্চাদ্ধাবনকারীদের রিভলভার ছুটিয়ে নিরস্ত করতে সক্ষম হন। আর একটা ডিঙ্গিতে করে পিছে লোক ছুটছে এবং দ্বিতীয় এক ডিঙ্গি এসে তাদের দলপুষ্টি করে।

তখন ডাকাতরা ডিঙ্গি থেকে নেমে ছুটতে আরম্ভ করেন; মাঝে মাঝে পিছন ফিরে রিভলভার ছুড়ে চলেছেন। ধীরে ধীরে পিছনের লোক কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। এমন সময় একজন পিছে থেকে সঙ্গে-আনা একটা ট্যাটা (বর্শার মতো মাছ-শিকারের কোঁচ) ছুড়ে আক্রমণ করে এবং ডাকাতদের একজনকে ট্যাটা এসে বিদ্ধ করে। ডাকাতের এক সঙ্গী সেটাকে আহত দেহ থেকে খুলে নিয়ে, পশ্চাদ্ধাবনকারীদের একজনকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারেন এবং তাতে একজন আহত হয়।

তাড়া খেয়ে ছুটছেন সকলেই, কিন্তু পানা, দাম প্রভৃতি কাটিয়ে চলার অসুবিধে বলে তাঁরা অগভীর জলে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করেন। তখনই দু'জন ধরা পড়ে যান (এঁদের মধ্যে একজন—জ্যোতির্ম্ময়, টঁ্যাটা-বিদ্ধ হয়েছিলেন)। সামান্য দূরেই বাকী দু'জন জলের মধ্যেই ধরা পড়েন।

আততায়ীদের ডিঙ্গির ভিতর থেকে যাবতীয় অপহৃত দ্রব্যাদি, রিভলভার, কার্ত্তুজ সবই উদ্ধার করা হয়েছিল।

জ্যোতির্ম্ময়কে ১৯৩২ মে ১৭-ই মাদারিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। অবস্থা খারাপ দেখে, পুলিশ প্রশ্নবাণে মুমূর্ষুকে জর্জ্জরিত করে তুললে। 'সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে কিনা' জিজ্ঞাসায় জ্যোতির্ম্ময়ের উত্তর ঃ "হ্যাঁ, আছে"। 'কি করে তাঁর আঘাত লাগলো ?'—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন—"আঘাত! কিসের আঘাত? যান্, বিরক্ত করবেন না।"

ধরা পড়ার পর যা হয়, তার ব্যতিক্রম হয়নি। মাথার ওপর, মাথার বাঁ-দিকে এবং ডান তলপেটে গুরুতর আঘাত-চিহ্ন বর্ত্তমান। সেরে আর তিনি ওঠেননি। ময়না-তদন্তে দেখা গেল—অপর কর্ত্তৃক মারাত্মক আঘাত, মানসিক শক্ (shock), রক্তক্ষরণ এবং অস্ত্রদ্বারা ক্ষতই তাঁর মৃত্যুর কারণ।

১৭-ই মে, বেলা ১০-টায় হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার পর ২-টা থেকে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ১৮-ই রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে জ্যোতির্ম্ময়ের দেহাবসান ঘটে।

ডাকাতরা দলে চারজনই ছিলেন। বিধির বিচার তড়িঘড়ি শেষ করেছে জ্যোতির্ম্ময় মিত্রের প্রাণহানিতে। জীবিত তিনজনের বিচারের জন্য স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হয়। ১৯৩২ জুলাই ১২-ই রায় প্রকাশিত হয়। (১) যজ্ঞেশ্বর দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, (২) অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইঁদুর)-এর দশ বছর এবং (৩) যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (টোটা)-র পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩২ নভেম্বর ৩০-এ, হাইকোর্ট সকলের আপীল বাতিল করে দেয়।

বিফল প্রচেষ্টা

কুমিল্লা ঃ কুমিল্লা সহরে ষ্টীভেন্স-হত্যার পর অতিরিক্ত (Additional) পুলিশ-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট-এর হত্যা খুবই চাঞ্চল্য ঘটিয়েছিল। ১৯৩২ জুলাই ২৯-এ এলিসন (E. B. Ellison) অপরাহ্নে কর্ম্মস্থল থেকে নিজ বাংলোতে ফিরে আসছেন একখানা সাইকেল চড়ে। খুব জোর শব্দে একটা পট্‌কা ফাটলো তাঁর সাইকেলের ঠিক পিছনেই। ব্যাপার বোঝবার জন্য যেমন ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেছেন সেই মুহূর্ত্তে এক যুবক তাঁর বাহু, পিঠ ও তলপেটে গুলি মেরে উধাও হয়ে যান। আহত

এলিসন সাইকেল থেকে নেমে আততায়ীকে লক্ষ্য করে কয়েকবার নিজ রিভলভার ছোড়েন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। আততায়ী নির্বিঘ্নে পলায়ন করেন।

এলিসন-এর জান্ খুব কড়া ; দেহের নানা স্থানে মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়েও তিনি মৃত্যুর সঙ্গে এক সপ্তাহ ধরে সমানে সংগ্রাম করেছেন। তাঁকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু যম যাঁকে ধরেছেন, তাঁর আর নিষ্কৃতি সম্ভব হয়নি।

আত্মাবলুপ্তি

চট্টগ্রাম পাহাড়তলী ঃ শ্বেতাঙ্গদের ক্লাব 'পাহাড়তলী ইন্‌ষ্টিটিউট'। অস্ত্রাগার-আক্রমণের দিন ঈষ্টারের জন্য বন্ধ ছিল বলে বিপ্লবী একদল কোনও হুজ্জুত না-করে ফিরে যান। কিন্তু তাঁদের মন থেকে কেন্দ্রটি দূর হয়নি, কেবল ছিল সুযোগের অভাব। ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ২৪-এ, প্রায় চল্লিশজন শ্বেতাঙ্গ রমণী-পুরুষ আনন্দে মেতে আছেন, রাত্রি ১১-টায় খোলা জানালার ভিতর দিয়ে এসে হল্-এ একটা বোমা ফাটলো ; পর পর আরও কয়েকটা। বন্দুক ও রিভলভার থেকেও গুলি ছোড়া হয়েছিল। ফলে, জন-বারো লোক আহত হন। এর ভিতর এক বৃদ্ধা এঁদেরং গুলিতে মারা যান।

মিনিট তিনের মধ্যে আক্রমণকারীরা ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করে চলে যান। পরে দেখা গেল, পুরুষ-বেশে এক নারী ক্লাব-ঘরের শ'খানেক গজ দূরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার—'মাষ্টার-দা' প্রভৃতি পলাতকদের সঙ্গিনী। কাছে পতিত কিছু সাদা গুঁড়া দেখে বোঝা গেল—তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

আশেপাশে নানা মুদ্রিত কাগজ পাওয়া গিয়েছিল ঃ 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্ম্মি'র ইস্তাহার। এসকলে ছিল শ্বেতাঙ্গ-ধ্বংসের নির্দ্দেশ, মুক্তি-যোদ্ধা-দলে ভর্ত্তি হবার অনুরোধ, এবং মৃত বা জীবিত ধরে 'রিপাবলিকান আর্ম্মি'র প্রধান কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিলে পুরস্কারের আশ্বাস, প্রভৃতি।

এ ব্যাপারের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।

বারে বারে

কলিকাতা ঃ চৌরঙ্গী— শ্বেতাঙ্গসমাজ, কৃষ্ণচর্ম্মধারী রাজভক্ত ও বিদেশী মালিকদের পত্রিকারা একযোগে বিপ্লবীদের মুণ্ডপাতের সুপরামর্শ দিচ্ছে। সবার ওপর টেক্কা দিয়েছে ওয়াট্‌সন (Alfred Watson)-সম্পাদিত কলিকাতার 'ষ্টেট্‌সম্যান' (*The Statesman*) ; গভর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করছে নানা রকমে—নির্ম্মম কঠোরতা অবলম্বনের পন্থা নির্দ্দেশ করছে।

বিপ্লবীরা ওয়াট্সন-কে হত্যা করে কণ্টক দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজে অগ্রসর হ'ল। ১৯৩২ আগষ্ট ৫-ই, হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ সেরে চৌরঙ্গী-অফিসে ফিরছেন ওয়াট্সন ; গেটের কাছে এসে গাড়ীর গতি মন্থর হয়েছে, এমন সময় এক যুবক গাড়ীর মধ্যে দিয়ে রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলেন। বুলেট ছুটলো ঠিকই ; গাড়ীর পিছনের কাচ ভাঙ্গলো, কিন্তু ওয়াট্সন রয়ে গেলেন অক্ষত-দেহ।

চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, আততায়ী মনের বল হারিয়ে ফেললেন ; হাত থেকে রিভলভারটা গাড়ীর মধ্যেই খসে পড়লো। পত্রিকা-অফিসের দ্বারোয়ান আর উপস্থিত এক কন্‌ষ্টেবল আততায়ীকে ধরে ফেলেন। দারুণ শক্তিতে একটা হাত মুক্ত করে যুবকটি মুখের মধ্যে কিছু সাদা পাউডার পুরে দিলেন।

ওয়াট্সন গেটের মধ্যে প্রবেশের সময়, আক্রমণকারীকে অফিসে তাঁর সামনে হাজির করার কথা বললেন। ধৃতব্যক্তি অবিলম্বে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। হাসপাতালে যাবার পথেই তাঁর শেষনিঃশ্বাস অনন্তে মিলিয়ে যায়। অনেক অনুসন্ধানের পর নামটা সংগ্রহ করা হয়েছিল ঃ অতুলচন্দ্র সেন। তাঁর আদিনিবাস খুলনা, সেনহাটী ; হাল সাকিম—১০-নং নারকেলডাঙ্গা লেন।

প্রথম চেষ্টা নিষ্ফল হ'ল ; কিন্তু বিপ্লবীরা নিশ্চেষ্ট রইলেন না। ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ২৮-এ, ওয়াট্সন সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে অফিস থেকে মহিলা-সেক্রেটারী সমভিব্যাহারে মোটরে চলেছেন। গাড়ী চলেছে অক্টারলোনি রোড, ইডেন গার্ডেন, ষ্ট্র্যাণ্ড ও নেপিয়ার রোড ধরে। ক্লাইড রোডের মোড়ের কাছে একখানা ছাউনি-ঢাকা খোলা-গাড়ী (tourer) তিনজন আরোহী ও ড্রাইভার সমেত ওয়াট্সন-এর গাড়ীর ডান-পাশে এসেই উপর্য্যুপরি তিনবার রিভলভার ছুড়লেন। দুটো বুলেট ওয়াট্সন-এর কাঁধে অগভীর ক্ষত করে চলে যায়।

ওয়াট্সন ড্রাইভারকে খুব তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাতে বললেন, কিন্তু একটা ভাড়াটে ঘোড়ার-গাড়ী সামনে পড়ায় গতি ব্যাহত হ'ল। রাস্তা খালি হতেই ওয়াট্সন-এর গাড়ী ছুটলো, কিন্তু খানিকটা যেতেই আততায়ীদের গাড়ী পিছন থেকে এসে ওয়াট্সন-এর গাড়ীর পাশে ধাক্কা মারে। দুটো গাড়ী পরস্পরে আট্‌কে যেতে, ওয়াট্সন-এর গাড়ীর ওপর আর এক দফা গুলিবর্ষণ চললো।

এক শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জেণ্ট নিকটেই ছিলেন। ছুটে ঘটনাস্থলে এসেই আততায়ীদের লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে আততায়ীরা আবদ্ধ গাড়ী ছাড়িয়ে নিয়ে দক্ষিণমুখে ছুটে চললেন। জিরাট পুল পার হয়ে গাড়ী সাহাপুরে পৌঁছালো। গাড়ীতে আলো নেই, অথচ অতি দ্রুত ছুটতে হচ্ছে। অবিশ্রান্ত উৎকট শব্দে ইলেক্‌ট্রিক-হর্ন বেজে চলেছে। যান-নিয়ন্ত্রণকারী এক কন্‌ষ্টেবল বাধা দিতে এলে, তাকে ধাক্কায় প্রায় ধরাশায়ী করে গাড়ী ছুটেই চলেছে।

ওয়াট্‌সন-এর ক্ষত সামান্যই ; হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক সাহায্য দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রায় ৭-টার সময় গাড়ীখানা মাঝেরহাটের কাছে দেখা গেল। সামনে দুটো গরুর গাড়ী ও একটা ঘোড়ার গাড়ী দিয়ে বুড়োশিবতলার কাছে রাস্তা বন্ধ দেখে, পাশ কাটিয়ে যাবার সময় এক ল্যাম্প-পোষ্টে ধাক্কা লেগে গাড়ী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সকলেই নেমে ছুটতে আরম্ভ করেন। পরিত্যক্ত মোটরের মধ্যে একটা ছ'ঘরা রিভলভার, পাঁচটা তাজা আর চারটে ব্যবহৃত কার্তুজ পাওয়া গেল।

চারজন পূর্ব্বদিকে রায়বাহাদুর রোড ধরে ছুটতে থাকেন। তার মধ্যে একজন চণ্ডীতলা রোডের মোড়ে এসে, দক্ষিণ দিকের একটা রাস্তা ধরে সরে পড়েন। বাকী তিনজন রাজাবাবুর চালকলের কাছে এসে ধরা পড়েন। এঁদের মধ্যে দু'জন—ননী লাহিড়ী আর অনিল ভাদুড়ী অতিকষ্টে সুযোগ করে নিতে পেরে, পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তৃতীয় ব্যক্তিকে ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার-হাউসে আট্‌কে রাখা হয়।

যে যুবকটি আগে পলায়নে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনি এক ভদ্রলোককে এক করুণ কাহিনী বলে তাঁর মোটরে চড়ে বেহালা-পাড়া ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। তাঁর গাড়ীতেই মধ্য-কলিকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে মোটর-মালিক লক্ষ্য করলেন, যুবকটি ৯০।৩-নং মেছুয়াবাজার (বর্ত্তমান কেশব সেন) ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ঢুকে গেলেন। ঐ বাড়ীর ভিতর থেকে একজন লোক এসে মোটর-মালিকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন আর পলাতক যুবকটি পোশাক বদল করে, বিনা বাক্যব্যয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। মোটর-মালিককে ভাড়া হিসাবে কিছু টাকা নিয়ে আর কোনও গোলমাল না-করতে অনুরোধ করা হয়েছিল।

পরদিন বেহালার পুলিশ মোটর-মালিকের কাছে সব কাহিনী শুনে, মেছুয়া-বাজারের বাড়ীটি তল্লাসী করে এবং প্রধান আসামী সুনীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ২৯-এ ভোরে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য সহকর্ম্মীদের বিভিন্ন স্থান হতে গ্রেপ্তার করে এক মামলা জুড়ে দেওয়া হয়।

মূল আসামী ছ'জন ; স্পেশ্যাল জজের নিকট বিচার। ১৯৩২ নভেম্বর ১৭-ই রায় প্রকাশিত হলে, দেখা গেল, সুনীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, প্রমোদরঞ্জন বসুর দশ বছর আর তৃতীয় এক আসামীর দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। ভাগ্যক্রমে তিনজন মুক্তিলাভ করেন।

হাইকোর্ট ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১-লা, আপীলকারী সুনীল ও প্রমোদের দণ্ড সমর্থন করে।

লিউক-এর বিপত্তি

রাজসাহী ঃ সারাদিনের পরিশ্রমের পর, রাজসাহীর জেল-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট লিউক (C. A. W. Luke) স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে পোষ্ট অফিস রোডের ওপর নিজ মোটরে চড়ে বেড়াতে চলেছেন—১৯৩২ নভেম্বর ১৮-ই। আরোহীরা দূর থেকে দেখতে পান দু'জন লোক নিজেদের মধ্যে কথায় ব্যস্ত আর তার কিছু ব্যবধানে এক যুবক একখানা সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

লিউক-এর গাড়ী কাছে আসতেই সাইকেলখানা সামনে ফেলে দিতে মোটর দাঁড়িয়ে যায়; আর দূরে দণ্ডায়মান যুবক-দুটি ছুটে এসে রিভলভার থেকে গুলি ছুড়তে থাকেন। একটা বুলেট লিউক-এর চোয়ালের মধ্যে প্রবেশ করে। আঘাত গুরুতর হলেও, মারাত্মক নয়।

গুলি মেরেই আততায়ী দু'জন সরে পড়েন। সাইকেল-ধারী তৃতীয় ব্যক্তি ভোলানাথ রায় কর্ম্মকার ধরা পড়েন। স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে বিচার। ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১-লা আসামীর সাত বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

মার্চ ২৩-এ, হাইকোর্ট ভোলানাথের আপীল সরাসরি বাতিল করে দেয়।

পুনরাবৃত্তি

ঢাকা ঃ নবাবপুর— ঢাকা ডি.আই.বি.-র অতিরিক্ত (Additional) পুলিশ-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট গ্রাসবী (C. G. Grassby), ১৯৩২ আগষ্ট ২২-এ, বিকাল ৫-৩০-এর সময় মোটরে নিজ কোয়ার্টারে ফিরছিলেন; গাড়ীতে তাঁর দেহরক্ষীও ছিলেন। মোটর-সাইকেল চড়ে এক শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জেণ্টও গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। যখন নবাবপুর রেল-ক্রসিং-এর কাছে এসেছেন তখন দেখা গেল গেট্ বন্ধ, যদিও তখন কোন ট্রেন যাবার সময় নয়। গেট্-বন্ধের কারণ নির্ণয়ের জন্য গ্রাসবী দেহরক্ষীকে খোঁজ নিতে বললেন। তিনি কয়েক পা এগিয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ এক যুবক বাঁ-দিক থেকে এসে গ্রাসবী-কে লক্ষ্য করে গুলি চালান। সাহেবের বাহুতে চোট লাগে; গুরুতর কিছু নয়।

আততায়ী ছুটে পালাতে থাকেন; খুব বেশী দূর যেতে পারেননি, পুলিশ-পক্ষ থেকে গুলি চলে—দুই উরু এবং ডান হাতের আঙ্গুলে গুলি এসে লাগে; আহত হয়েও ছুটে খানিকটা গিয়ে রেল-খালাসীর কোয়ার্টারের কাছে গিয়ে তিনি মাটীতে পড়ে যান। প্রথমে খালাসী আর পরে গ্রাসবী-র দেহরক্ষী এসে ধরে ফেলেন।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে, নভেম্বর ১৮-ই প্রদত্ত রায়ে আসামী বিনয়-ভূষণ দেব রায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

মরণ-যজ্ঞ

মোহিত মৈত্র—কলিকাতা ঃ ব্যাপারটা অতি সাধারণভাবেই আরম্ভ হয়েছিল, এ শ্রেণীর অপরাপর শত শত ঘটনার মতো। যুবক মোহিতমোহন মৈত্রকে ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৯-এ, বেলা ১০-টায় আপার সার্কুলার (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র) রোডের ওপর শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে একটা পাঁচ-ঘরা রিভলভার সমেত পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিচারে এপ্রিল ১৮-ই তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

সাধারণতঃ এরকম শাস্তিতে কয়েদীকে আন্দামান পাঠানো হ'ত না। ললাটের লিখন ! তাঁকে ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১২-ই 'কালাপানি' যেতে হ'ল সরকারী আদেশে। মে মাসে তিনি জেল-কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করেন। বলপূর্ব্বক নল-সাহায্যে নাকের মধ্যে দিয়ে তরল পথ্য দিতে গিয়ে খানিকটা ফুস্‌ফুসে চলে যায়, তার ফলে তিনি উৎকট নিউমোনিয়া রোগের কবলে পড়েন।

১৯৩৩ মে ২৮-এ, জেল-হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

স্বদেশভূষণ ঘোষ—ঢাকা ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের অপরাধে ১৯৩২ এপ্রিল ১৮-ই ঢাকার স্বদেশভূষণ ঘোষের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। মেয়াদ-অন্তে জেলের বাইরে এলে, তাঁকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয়। কিছুকালের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁছুলে, ১৯৩৭ এপ্রিল ১৪-ই তাঁকে সর্ত্তাধীনে জেলের বাইরে আসতে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হলে. ডিসেম্বর ২৩-এ সব সর্ত্ত উঠিয়ে দিয়ে সরকার সদাশয়তার প্রমাণ দেয়। মাত্র দু'মাস বাদে, ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারী ১৮-ই, মৃত্যু এসে তাঁর ভববন্ধন মুক্ত করে।

শ্যামকুমার নন্দী—চট্টগ্রাম, পটিয়া ঃ পুলিশের তৎপরতায় চট্টগ্রামের বিপ্লবী-দল ছত্রভঙ্গ হয়ে বেড়াচ্ছেন। যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করে গোপন আস্তানায় প্রাণ হাতে করে বাস করার দিন চলেছে। খবর পেয়ে, পুলিশ ১৯৩২ নভেম্বর ২৭-এ পটিয়ার জঙ্গলখান গ্রামের এক পরিত্যক্ত বাড়ী ঘেরাও করে। সব চুপচাপ ; জীবনের কোন লক্ষণ সেখানে নেই। পুলিশ কিন্তু পাকা খবর নিয়ে এসেছে ; হয়তো গুপ্তচর পুলিশ-দলের সঙ্গেই রয়েছে।

পুলিশ আত্মসমর্পণের হাঁক ছাড়লে। কিছুই ফল হ'ল না তাতে। হঠাৎ এক ফাঁকে ব্যূহ ভেদ করে পালাবার চেষ্টা করলেন শ্যামকুমার নন্দী। পুলিশ-রাইফেল গর্জ্জে উঠলো। লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। শ্যামকুমার বুলেটের আঘাতে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিলেন।

বাড়ী-তল্লাসীতে অগ্নিদগ্ধ এক যুবক এবং তাঁর চিকিৎসক ও বোমা-তৈরীর উপযোগী বোতল-খানেক এ্যাসিড পাওয়া গিয়েছিল।

সুখেন্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বরিশাল ঃ বাখরগঞ্জের অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবক সুখেন্দুকে ১৯৩০ আগষ্ট ২৯-এ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বন্দী তখন যক্ষ্মারোগে ভুগছেন। সুতরাং দয়ার অবতার বাঙ্গলা-সরকার বন্দীকে বরিশাল জেল থেকে সিউড়ীতে পাঠিয়ে দিল।

অবস্থা মন্দের দিকেই চলেছে, সে-কারণে সুখেন্দুকে বাঙ্গলা থেকে নির্ব্বাসন-আদেশ দেওয়া হ'ল—১৯৩১ এপ্রিল ২২-এ। অতিকষ্টে যুক্তপ্রদেশের ভাওয়ালী যক্ষ্মা-হাসপাতালে একটা স্থান সংগ্রহ করা হয়। ১৯৩২ আগষ্ট ১৭-ই গভর্ণমেণ্টের সকল দুশ্চিন্তা দূর করে তিনি সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

সুধাংশুশেখর নন্দী—বগুড়া ঃ অনভিজ্ঞ কিশোররাও বিপজ্জনক পথে নেমে পড়েছিল। বগুড়া জয়পুর-হাটের এক গোপন স্থানে বোমা তৈরী হচ্ছিল। ১৯৩২ অক্টোবর ২৪-এ হঠাৎ একটা বোমা ফেটে গিয়ে, ঘটনাস্থলে সুধাংশুর জীবনান্ত ঘটে।

নারায়ণচন্দ্র দাস—ঢাকা, ধানমণ্ডী ঃ প্রায় অনুরূপ ঘটনা। ঢাকা ধানমণ্ডী অঞ্চলে বোমা তৈরী হচ্ছে। একটা বোমা উৎকট শব্দে ফাটলো—১৯৩২ নভেম্বর ৬-ই। সেখানে অতি সাংঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় নারায়ণকে পাওয়া গেল। মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিনই তাঁর দেশোদ্ধার-বাসনা প্রাণ-বায়ুর সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়।

শৈলেশ চক্রবর্ত্তী—চট্টগ্রাম, পাহাড়তলী ঃ পাহাড়তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের ওপর আক্রমণ-প্রচেষ্টায় দু'বার দারুণ বিফলতা ঘটে। একবার প্রীতিলতা প্রাণ হারিয়েছেন ; এবার শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পালা।

১৯৩২ সেপ্টেম্বর ক্লাব-আক্রমণের চেষ্টা হ'ল। শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বোমা প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত থাকার কথা ; যথাসময়ে সঙ্গীরা এসে শৈলেশ্বরকে না-পেয়ে চলে যান। যাবার সময় শৈলেশ্বরের সঙ্গে দেখা। তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না। নিতান্ত দুর্লঙ্ঘ্য কারণ ছাড়া এ-কাজ হয়নি, এটাই সবাই ধরে নিয়েছেন।

সরাসরি যে-যার বাসায় না-ফিরে গোপন আস্তানায় এসে আশ্রয় নিলেন। সেখানে চাটাইয়ের উপর শুয়ে বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা হ'ল। সঙ্গীদের একজন লক্ষ্য করলেন শৈলেশ্বর উপুড় হয়ে শুয়ে একটা কাগজের ওপর কি লিখছেন। সঙ্গীরা মাঝে একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন,—রাত্রি ২-টার সময় একজন লক্ষ্য করলেন শৈলেশ্বর ঠিক একভাবেই শুয়ে আছেন, কিন্তু মাথাটা চাটাইয়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না। দেহ নাড়া দিতে গিয়ে, দেখা গেল, সেটা প্রাণহীন নিস্পন্দ।

দলবদ্ধ প্রচেষ্টা

যে-সব ঘটনায় সোরগোল খুব বেশী উঠেছিল, তার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। সবেরই পিছনে 'দল' ছিল, আবার বহুস্থলে একক চেষ্টায় নানা ঝামেলা জুটেছে। এ ছাড়া, কয়েকটা ক্ষেত্রে হামলা হয়েছে, ফল কিছুই হয়নি। কেবল অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের দণ্ড এই শ্রেণীতে পড়ে। যতদূর সম্ভব ঘটনাসমূহ স্বতন্ত্রভাবে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ ঃ নেত্রকোণা— স্থানীয় বিপ্লবীদের চক্রান্তে ১৯৩২ জানুয়ারী স্থির হয়—জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেহাম (Harold Graham)-কে হত্যা করতে হবে। গুপ্তচরের সাহায্যে সংবাদটা পুলিশের গোচরে আসে এবং পুলিশ খুব তৎপর হয়ে, বড় করে জাল বিছিয়ে বসলো ; সঙ্গে ধড়পাকড় চললো প্রচুর ; অভিযোগ ঃ নরহত্যার প্রচেষ্টা।

আসামী দশজন ; তার মধ্যে একজন ফেরার। একজন রাজসাক্ষী, এবং ন্যায়ানুমোদিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। একজনকে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দিতে হয়। রইলেন বাকী সাত। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার ; রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩৩ জুন ১৩-ই। তাতে সকলেরই সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল ঃ

(১) সীতাংশুভূষণ দত্ত রায় (খুশু), (২) শশীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, (৩) মণীন্দ্রচন্দ্র সেন—প্রত্যেকের ছ'বছর ;

(৪) জয়েশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পাঁচবছর ;

(৫) বিপ্রদাস দত্ত রায় (যীশু), (৬) মাখনলাল ভট্টাচার্য্য—প্রত্যেকের সাড়ে চার বছর ;

(৭) ধীরেন্দ্রচন্দ্র হোড়ের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ভূপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ফেরার ছিলেন। পরে ১৯৩৪ এপ্রিল ১০-ই তাঁর ছ'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

সীতাংশু, জয়েশ, বিপ্রদাস আর মাখন হাইকোর্টে আপীল করেছিলেন। ১৯৩৪ জানুয়ারী ৩-রা সেটা নাকচ হয়।

মণীন্দ্র সেন আর শশীন্দ্র চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে 'কমলপুর আর বেতাল ডাকাতি' সম্পর্কে দণ্ডিত হন। বর্ত্তমান সাজা পূর্ব্বদণ্ডের সমকালে ভোগ করার আদেশ হয়।

ময়মনসিংহ ঃ সোয়ারী-কাণ্ডাপাড়া— নেত্রকোণা সোয়ারি-কাণ্ডাপাড়ায় ১৯৩২ জানুয়ারী ১২-ই, রাত্রি ১-৩০ মিনিট নাগাদ সূর্য্যনারায়ণ সাহার বাড়ী ডাকাত পড়ে। বাধা পেয়ে ডাকাতরা বন্দুক চালায়। বাধাদানকারীদের কয়েকজন আহত হন। নেত্রকোণার পুলিশ এ-সম্পর্কে চৌদ্দজনকে আসামী করে চালান দেয়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের বিচারে, ১৯৩২ মে ৩১-এ রায় প্রদত্ত হয়। সকল আসামী দণ্ডিত হন।

(১) মন্মথনাথ দত্ত, (২) ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (বিশ্বাস), (৩) দেবেন্দ্রনাথ তালুকদার, (৪) উপেন্দ্রনাথ সাহা ও (৫) অধীরচন্দ্র সিংহ—প্রত্যেকের সাত ও পাঁচ বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয় ;

(৬) মন (মোহন) কিশোর নমদাস, (৭) সুরেন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য (ওরফে কর্ম্মকার), (৮) অখিলচন্দ্র বণিক্য (সেন) ও (৯) ললিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—প্রত্যেকের পাঁচ বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ; এবং

(১০) একজনের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আসামীরা সকলেই সারারচরের অধিবাসী ; তাঁদের মিলন হ'ত মন্মথর দর্জ্জির দোকানে।

অপর আসামী (১১) গোবিন্দচন্দ্র করের দণ্ডের তারিখ—১৯৩২ মে ৩০-এ। সমকালীনভোগ সশ্রম ছয় ও পাঁচ বছর কারাদণ্ড নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল।

(১২) বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (বীরু)-র সাজা সশ্রম পাঁচ ও চার বছর সমকালীন-ভোগ দণ্ডের আদেশ দেন স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৯৩৩ মে ৫-ই। হাইকোর্টে আপীল বাতিল হয়—আগষ্ট ১০-ই।

আসামী অখিলচন্দ্র বণিক্য আর বাড়ী ফিরে আসেননি। তিনি ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট জেলে আবদ্ধ ছিলেন। কেউই কিছু জানতে পারলে না,—গভর্ণমেণ্ট-পক্ষের খবর হ'ল—সামান্য কয়েকদিনের অসুখে ১৯৩২ জুন ৭-ই থেকে ১৪-ই তারিখের মধ্যে জেলখানায় অখিল দেহত্যাগ করেছেন।

অখিলের মতো মন (মোহন) কিশোর নমদাসের প্রাণবায়ু জেলের মধ্যে নিঃশেষ হয়। মোহনকে আন্দামানে পাঠানো হয়, দণ্ডকাল ভোগ করবার জন্য। বন্দীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের আচরণে অপর কয়েদীদের সঙ্গে তিনি ১৯৩৩ মে ১৬-ই থেকে অনশন শুরু করেন। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার পরদিনই নাকের ভিতর দিয়ে নল-সাহায্যে পথ্য উদরে পৌঁছাবার চেষ্টা হয়। এমন সুন্দররূপে কাজটি সুসিদ্ধ হচ্ছিল যে, মে ১৯-এ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ফুস্‌ফুসে জলীয় পথ্য প্রবেশ করার ফলে, তাঁর কঠোর নিউমোনিয়া রোগ হয় এবং ১৯৩৩ মে ২৬-এ তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁর সঙ্গী মোহিতমোহন মৈত্র ঐ একই সঙ্গে অনশন-ধর্ম্মঘটে যোগ দেন ; ১৯৩৩ মে ২৮-এ তাঁর মৃত্যু ঘটে। অন্যত্র সে-পরিচয় দেওয়া আছে।

হুগলী ঃ হরিপাল— রঘুবাটী গ্রামে ডাকাতি পর্য্যন্ত গড়ায়নি, কেবল তোড়জোড়ের সূত্রপাত্রেই বিপদ। এ ধাক্কা সামলাতে কয়েকজনের দীর্ঘমেয়াদী দণ্ড কপালে জুটেছিল।

১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ৬-ই ডাকাতির প্রস্তুতি ("assembling for purpose of committing dacoity") উপলক্ষে ষ্টেশনের কাছে জমায়েত উদ্যোক্তারা ধরা পড়লেন,—সঙ্গে একটা রিভলভার ও ডাকাতি-সম্পর্কিত কিছু যন্ত্রপাতি।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের মে ১৯-এ প্রদত্ত রায়ে—(১) আব্দুল মজিদ, (২) জগদ্বন্ধু রায়, (৩) হুসেনুদ্দিন, (৪) মীর বিল্লাই হোসেন ও (৫) হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ওরফে কার্ত্তিক দাস)—প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগে পাঁচ, তিন ও এক বছর সমকালীন-ভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

জগৎ, হোসেন আর হরেন আপীল করেননি। আব্দুল ও বিল্লাই হোসেনের আপীল হাইকোর্ট ডিসেম্বর ১২-ই বাতিল করে।

এ-সম্পর্কে রামপ্রতাপ দাসকেও আসামী করা হয় এবং মে ১৯-এ তাঁরও সমপরিমাণ দণ্ডভোগের আদেশ হয়।

ময়মনসিংহ ঃ কুলিয়ারচর— মাসিমপুর (ভবানীপুর) গ্রামের গগনচন্দ্র দাসের বাড়ীতে ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১০-ই ডাকাতি হয়েছিল। গগনের জামাতা হেমের এক দত্তক-কন্যা-গ্রহণ উপলক্ষ করে সামান্য এক উৎসবের আয়োজন হয়েছে। রাত্রি ৯-টা নাগাদ কয়েকজন যুবক উপস্থিত হয় এবং মারাত্মক অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নগদ ও অলঙ্কারে ৩,৬৪৩ টাকা নিয়ে পলায়ন করে।

এ-সম্পর্কে ছ'জনকে আসামী করে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলা শুরু করা হয়; রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩২ জুলাই ২-রা; তাতে (১) শৈলেশচন্দ্র দত্তর সাত বছর, (২) দ্বিজেন্দ্রনাথ (টেনিয়া) নাহা ও (৩) মহেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিকের প্রত্যেকের ছ'বছর, (৪) নেপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পাঁচ বছর এবং (৫) তেজেন্দ্রনাথ ভৌমিক, (৬) কালীপদ চক্রবর্ত্তী—প্রত্যেকের সাড়ে-চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

১৯৩২ ডিসেম্বর ১৩-ই হাইকোর্ট সকলের দণ্ডই সমর্থন করে।

ত্রিপুরা ঃ আগরতলা— বক্সা ক্যাম্পে ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৪-ই শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' অভিনীত হচ্ছে। সকলের মনোযোগ সেই দিকে,—শান্ত্রী-পাহারা একটু স্বস্তিবোধ করছে। ইত্যবসরে কাঁটা-তার পার হয়ে কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী আর-একজন সঙ্গীকে নিয়ে ক্যাম্প থেকে রওয়ানা দেন। পরে এপ্রিল ৫-ই 'ত্রিপুরা আগরতলা ডাকাতি' সম্পর্কে কৃষ্ণপদ, শচীন্দ্রকুমার দত্ত ও পবিত্রমোহন পালকে গ্রেপ্তার করে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। সেপ্টেম্বর ১৩-ই কৃষ্ণপদর সাত ও শচীন্দ্র আর পবিত্রর চার বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ময়মনসিংহ ঃ কিশোরগঞ্জ— পাইকসায় ১৯৩১ অক্টোবরে রিভলভার আবিষ্কৃত হবার ফলে চারজন আসামী দাঁড় করানো হয়েছিল। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৪-ই; তাতে (১) প্রবীর

গোস্বামীর সাত, (২) মথুর দত্ত ও (৩) পূর্ণ গোস্বামী—উভয়ের ছয়, আর (৪) দীনেশ-চন্দ্র ধরের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

প্রবীর নাগেরগাঁ (মুড়মুড়িয়া) ডাক-লুঠের মামলায় (১৯৩২ মে ৩০-এ) সাত বছর সশ্রম দণ্ড ভোগ করছিলেন, এমন সময় দ্বিতীয় ঘটনা।

ময়মনসিংহ ঃ চরপাড়া (সোয়ালিচরপাড়া)— টাঙ্গাইল, (সোয়ালি) চরপাড়া, মির্জ্জাপুর থানার কেশবলাল চৌধুরীর বাড়ী ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৫-ই সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটা নাগাদ কয়েকজন যুবক এসে চড়াও হন। গৃহস্থরা প্রবল বাধা দেয়। ডাকাতদের মধ্যে বীরেন্দ্রকুমার দত্ত তলপেটে বর্শাবিদ্ধ হন। চলচ্ছক্তিহীন বীরেন পুলিশের কবলে পড়ে এবং টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার পর, ফেব্রুয়ারী ১৬-ই তাঁর সেখানে মৃত্যু ঘটে।

কয়েক মাস চেষ্টার পর পুলিশ তিনজনকে ধরে এক ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করে। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন রাজসাক্ষী দাঁড়িয়ে যাওয়ায়, মামলা খানিকটা সরল হয়ে পড়ে। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচার, আর রায় প্রকাশিত হ'ল—১৯৩২ আগষ্ট ২৮-এ।

আসামী সত্যরঞ্জন ঘোষের সাত ও পাঁচ বছর এবং শশীমোহন ভট্টাচার্য্যের ছয় ও পাঁচ বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৩ জানুয়ারী ১০-ই হাইকোর্ট উভয়েরই আপীল নাকচ করে দেয়।

ময়মনসিংহ ঃ সারারচর— বাজিতপুর থানার উপেন্দ্রচন্দ্র সাহার বাড়ী, ১৯৩২ মার্চ ২৪-এ, রাত্রি সাড়ে-আটটায় ডাকাত এসে পড়ে। পুলিশী তৎপরতায় চার আসামী খাড়া করা সম্ভব হয়েছিল। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিচার; রায় প্রদত্ত হয়—১৯৩২ সেপ্টেম্বর ৩০-এ। যতীন্দ্রচন্দ্র দে (মোটা) ও পূর্ণ (ক্ষিতীশ)-চন্দ্র রায় প্রত্যেকের ছ'বছর, এবং ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ও চতুর্থ আসামী প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্ট ১৯৩৩ জানুয়ারী ২৩-এ যতীন, পূর্ণ ও ক্ষীরোদের দণ্ড সমর্থন করে এবং একজনকে মুক্তি দেয়।

বরিশাল ঃ কেওড়া— ঝালকাঠি (কেওড়া)-তে ১৯৩২ এপ্রিল ৫-ই ডাক-লুঠ হয়। মেলবাহী পিয়ন ঝালকাঠি থেকে দুটো ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছেন, একটা বাসন্দা আর একটা কেওড়া পোষ্ট-অফিসের জন্য। বাসন্দার ডাক দিয়ে যখন পিয়ন বেরিয়ে আসেন, তখন রাত সাড়ে-ন'টা। সবেমাত্র কীর্ত্তিপাশা আর কেওড়া রোডের সংযোগস্থলে এসেছেন, এমন সময় একজন তাঁর মাথায় ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে; অপরজন কাছে দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে দু'জনের হাতে শাণিত ছোরা। পিয়ন চীৎকার করাতে, ছোরা দেখিয়ে তাঁকে নিরস্ত করা হয়। একজন বড় থলিটা কেটে ফেলে, তার ভিতর থেকে চামড়ার ব্যাগ বার করে নিলে, তিনজনেই ছুট দেন। স্থানীয় লোকরা

পিয়নের চীৎকার শুনে পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করে। স্বল্প ব্যবধানে এক-জনের পর একজন করে তিনজনেই ধরা পড়েন।

বাখরগঞ্জ স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩২ মে ২০-এ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (কাব্‌লি) ও কৌমুদীকান্ত ভট্টাচার্য্য—প্রত্যেকের পাঁচ বছর, আর শশীকুমার সমাদ্দার (নসু)-এর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। শশী আর আপীল করার হাঙ্গামায় গেলেন না। কেশব আর কৌমুদীর আপীল-শুনানির পর হাইকোর্ট ডিসেম্বর ১৩-ই দুই দণ্ডাদেশই অপরিবর্ত্তিত রাখে।

কুমিল্লা : রাজনগর (কামেল্লা)— ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড রোডের ওপর ১৯৩০ মে ১৩-ই ডাক-লুঠ হয়ে গেল। ঘটনাস্থলে কেউ ধরা পড়েনি ; পরে পাঁচজনকে আসামী করে চালান দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ২০-এ, (১) গোপালচন্দ্র দে, (২) চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও (৩) সারদাপ্রসাদ বসু—প্রত্যেকের আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। (আর দু'জনের সাজা তিন বছর হিসাবে সশ্রম। নাম সংগ্রহ করা যায়নি।)

ঢাকা : নীলক্ষেত— আসাম-বেঙ্গল রেলের ২১-নং আপ্‌-ট্রেন ভৈরব থেকে ঢাকা আসছে, ১৯৩২ মে ১৩-ই। যখন ট্রেন নীলক্ষেত-ক্রসিং-এর কাছে পৌঁছুবে তখন জন-চার-পাঁচ সশস্ত্র যুবক ট্রেন লুঠ করে। তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করানো হয়। ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ২৮-এ রায় প্রদত্ত হয়। জ্যোতির্ম্ময় সেনের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। একজন মুক্তি পান আর তৃতীয়টি রাজসাক্ষী দাঁড়িয়ে যান।

১৯৩৩ মার্চ ১৬-ই হাইকোর্ট জ্যোতির্ম্ময়ের আপীল নাকচ করে।

বরিশাল : ডাকাতি, ষড়যন্ত্র ও অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের অপরাধে বরিশালের কার্ত্তিকচন্দ্র দাস (বড়-খোকা, হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাখন) মে ১৯-এ তিন, পাঁচ ও এক বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

ময়মনসিংহ—পানাসিয়া : 'চাঁদপুর-পানাসিয়া ডাকাতি'র মালপত্র লুকিয়ে রেখে, আসামীদের সমপর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়তে হয় নন্দ সেখকে। তার সঙ্গে অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের অপরাধ জুড়ে দেওয়ায়, মে ২২-এ তাঁর পাঁচ ও ছ'বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ফরিদপুর : পালঙ— পালঙ পোষ্ট-অফিস থেকে পিয়ন ডাকের থলি নিয়ে ১৯৩২ মে ২১-এ দামোদিয়া সাব-পোষ্ট-অফিস চলেছেন। পথে এরিকাটি ডাক-ঘরের ব্যাগ নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসছেন। কাণেশ্বর (কনকসর) বাজারের কাছে বেলা সাড়ে-এগারোটার সময় তিনজন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন পিয়নকে ধরে রাখে, আর একজন ব্যাগটা ছিনিয়ে নেয়। পিয়নের চীৎকারে লোক

এসে পড়ে, তখন ডাকাতরা পালাতে চেষ্টা করে, জনতাও পিছে তাড়া করে যায়। একজন ঘটনাস্থলেই, আর একজন কিছু তফাতে ছোরা-সমেত ধরা পড়ে। তৃতীয় ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩২ জুলাই ১১-ই মদনমোহন রায়চৌধুরী আর রমণী-রঞ্জন গাঙ্গুলী—প্রত্যেকের ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

ডিসেম্বর ১২-ই হাইকোর্ট দু'জনেরই আপীল নাকচ করে।

ময়মনসিংহ ঃ নেত্রকোণা (কমলপুর)— বেশ করে জট পাকিয়ে দুটো ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারীদের একসঙ্গে মামলায় জুড়ে দেওয়া হয়। ১৯৩২ জানুয়ারী ১১-ই নেত্রকোণার সত্যনারায়ণ সাহার বাড়ীতে হামলা হয়। সত্যনারায়ণ রিভলভারের গুলিতে আহত হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ৬,০০০ টাকা।

এরপর ১৯৩২ মে ২৯-এ ময়মনসিংহ বাজিতপুর থানার কমলপুর গ্রামের মোহনকিশোর বণিকের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। এবার আর নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রকাণ্ড মামলা জুড়ে দেওয়া হ'ল—স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল গঠন করে। আসামী-সংখ্যা চব্বিশ।

একজন এ্যাপ্রুভার ছাড়া, আর আটজনকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দিয়ে, ১৯৩৩ এপ্রিল ১৯-এ পনেরো জনের সাজা হয় ঃ

(১) মণীন্দ্রচন্দ্র সেন, (২) বীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, (৩) সুধাংশুকিরণ লাহিড়ী—প্রত্যেকের দশ বছর ;

(৪) ইন্দুভূষণ দাস, (৫) জানকীমোহন দাস, (৬) ভুবনমোহন চন্দ্র, (৭) শ্রীধর গোস্বামী, (৮) ধরণী বণিক, (৯) দীনেশচন্দ্র বণিক, (১০) হেমচন্দ্র দত্ত, (১১) প্রকাশচন্দ্র শীল, (১২) দীনেশচন্দ্র সাহা, (১৩) হরিবল চক্রবর্ত্তী—প্রত্যেকের সাত বছর ;

(১৪) যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (১৫) দীনেশচন্দ্র দে—প্রত্যেকের তিন বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়।

১৯৩৩ আগষ্ট ৩-রা হাইকোর্ট সকল আসামীর দণ্ড সমর্থন করে রায় দেয়।

এই ডাকাতি সম্পর্কে আগেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে বিচার শেষ করা হয়েছিল। অস্ত্র গোপন করে রাখার অভিযোগ। দু'জনেরই দু'বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় ; তন্মধ্যে ছিলেন কিরণবালা সাহা—আশী বছরের বৃদ্ধা।

ময়মনসিংহ ঃ কুনিয়াটি— কেণ্ডুয়া থানার রামনগরপাড়ায় ১৯৩২ জুন ৫-ই খোদা নেওয়াজের বাড়ীতে একদল লোক ডাকাতির উদ্দেশ্যে হাজির হয়। লুঠপাট যা হ'ল, তার ওপর দুটো খুনও হয়ে গেল। বাড়ীর অল্পবয়স্ক এক পরিচারক

বাইরে পালাতে চেষ্টা করে। খবর দিতে পারে এই আশঙ্কায় তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এক গ্রামবাসীও সেখানে এসে পড়ায়, গুলির আঘাতে মারা যান।

ধরপাকড় প্রচুর হয়েছিল ; কিন্তু যথোপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে ওঠা সম্ভব হয়নি। দশজন সন্দেহভাজন যুবককে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১১০ ধারা মতে প্রত্যেককে দু'বছর সচ্চরিত্রতার অঙ্গীকার ও ৫০০ টাকার জামিন-মুচলেখায় আবদ্ধ করা হয়।

মামলা হয়—শরৎচন্দ্র দাস (ধুপী)-এর বিরুদ্ধে। ১৯৩৩ মে ৪-ঠা স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে তাঁর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৪ জানুয়ারী ৯-ই হাইকোর্ট শরতের আপীল বাতিল করে।

ময়মনসিংহ ঃ গাঙ্গাইলপাড়া— নানা দুর্ঘটনা জড়িয়ে 'গাঙ্গাইলপাড়া (করিমগঞ্জ থানা) ডাকাতি' বিশেষ পরিচয় রেখেছে। তালিয়াপাড়ায় (গাঙ্গাইলপাড়া) গৌরচাঁদ নাথের বাড়ী ১৯৩২ জুলাই ১৭-ই এক ডাকাতি হয়। অতি সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী ; কিন্তু উৎপাত হ'ল খুব।

প্রথমেই গৌরের ভাই গণেশকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হ'ল। বড় একটা ট্রাঙ্ক দু'জনে ঘর থেকে বার করে নিয়ে যায়। তারপর গৌরকে লাথি মেরে, ভগ্নী শ্যামাসুন্দরীর চুল ধরে টেনে ফেলে, বাক্স-আলমারি সবকিছু তছনছ করা হয়েছিল। ততক্ষণে গ্রামবাসী এসে জুটেছে অনেক। বেগতিক দেখে ডাকাতরা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ছুটতে থাকে ; গ্রামবাসীর অনেকেই পিছু নিয়েছে।

দু'পক্ষই রঘুখালি পর্য্যন্ত এসে পৌঁছায়, আর ডাকাত ও গ্রামবাসীদের মধ্যিখানের দূরত্ব কমতে দেখে ডাকাতরা এক নৌকায় চড়ে পালাতে চেষ্টা করে। পাড়ের লোক সমানে ইটপাটকেল ছুড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে থাকে ; প্রত্যুত্তরে ডাকাতরা গুলি ছোড়ে। এইভাবে চলবার পর নৌকা নীলগঞ্জে এসে পৌঁছলে, ডাকাতরা ডাঙ্গায় নেমে সরে পড়ে।

আসামীদের জন্য তল্লাসী চললো। আসন্ন বিপদ বুঝে ছ'জন ডাকাত আত্মসমর্পণ করেন ; একজন ধরা দিয়ে প্রকাণ্ড এক বিবৃতি দেন। মামলা-নিষ্পত্তির পরও পলাতক আসামী এসে স্বীকারোক্তি করে দণ্ড গ্রহণ করেছেন।

বিচারের জন্য স্পেশ্যাল জজ নিযুক্ত হয়েছিল ; ১৯৩২ ডিসেম্বর ২২-এ রায় প্রদত্ত হয় ঃ

(১) নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (২) আব্দুল গফুর ভুঁইয়া (মউলার বাপ)—দু'জন প্রত্যেকের দশ বছর ;

(৩) অমরচন্দ্র সূত্রধর, (৪) মহম্মদ জান মহম্মদ (জনু), (৫) যামিনী-কুমার দে সরকার, (৬) জলিলুদ্দিন চৌধুরী (জলু), (৭) আব্দুল জব্বর (হীরার বাপ)—প্রত্যেকের আট বছর ;

(৮) মণিরুদ্দিন (ডাক্তার)-এর ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

জলিলুদ্দিন আর আব্দুল জব্বর হাইকোর্টে আপীল করলেন না; বাকী সকলেই করেছিলেন। ১৯৩৩ জুন ২০-এ পাইকারী হারে হাইকোর্ট সব আপীল খারিজ করে দেয়।

পরে আরও দু'জন—সামেদ আর রাজমোহন নমদাস দোষ কবুল করেন। উভয়ের আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সামেদ হাইকোর্টে বৃথা আপীল করেছিলেন। রাজমোহন আপীলের খরচ আর ঝক্কি বাঁচিয়েছিলেন।

বরিশাল ঃ সিঙ্গা (গৌরনদী)— ডাকাতির বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি, তবে সাজার পরিমাণ দেখে মনে হয় ব্যাপারটা কিছু গুরুতর। গৌরনদী থানার সিঙ্গা গ্রামে বেচারাম নাথের বাড়ী। সেখানে ১৯৩২ জুলাই ১৮-ই এক ডাকাতি হয়েছিল। অনেকগুলি যুবক ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে গ্রেপ্তার হন এবং তদন্ত-শেষে বিচারের জন্য প্রেরিত হন।

প্রথম দফায় আসামী-সংখ্যা পাঁচ। স্পেশ্যাল জজের আদালতে বিচার ; রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩২ ডিসেম্বর ৮-ই। একজন রাজসাক্ষী হলেন। একজন মুক্তিলাভ করলেন ; বাকী তিনজন—(১) ফণীভূষণ দাশগুপ্তর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, (২) নেপাল (উপেন্দ্রচন্দ্র) সরকারের দশ বছর, (৩) ভবরঞ্জন (মণ্টু) পতিতুণ্ডর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ফণী অনেকদিন থেকেই রাজনীতিতে পোক্ত। তিনি একসময় 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদকতা করেছিলেন।

পরে ননীগোপাল দাশগুপ্তকে ধরে অতিরিক্ত (supplementary) মামলায় আসামী করে খাড়া করা হয়। ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ২১-এ স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। হাইকোর্ট আপীল-গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে—মে ২৫-এ।

ফণীর দুঃসাহসের আরও পরিচয় আছে। তিনি হিজলী ক্যাম্প থেকে ১৯৩১ নভেম্বর ৬-ই উধাও হন। অধুনা-য় (বরিশাল) অস্ত্র আবিষ্কার হলে, ১৯৩২ ডিসেম্বর ১৩-ই, সঙ্গী সুধাংশুর সঙ্গে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পান। পরে এই 'সিঙ্গার মামলা'। এভাবে বারে বারে বিপদ বরণ করা খুব বেশী দেখা যায় না।

বগুড়া ঃ করোনেশন স্কুলের টাকা, ১৯৩২ আগষ্ট ১৫-ই, যাচ্ছিল স্থানীয় পোষ্ট-অফিসে। বেয়ারা কয়েকজন যুবক কর্তৃক আক্রান্ত হন। এই ঘটনা অবলম্বন করে 'উত্তর-বাঙ্গলা ষড়যন্ত্র মামলা' (North-Bengal Conspiracy Case) আরম্ভ হয়। ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ১৪-ই আসামী পবিত্র রায়ের সাত বছর এবং ষড়যন্ত্র অপরাধে ১৯৩৩ জুলাই ২১-এ এক বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ফরিদপুর ঃ বঙ্গেশ্বরদি— কয়েকজন যুবক ভূষণা থানার বঙ্গেশ্বরদি গ্রামে ডাকাতির উদ্দেশ্যে বোমা প্রভৃতি সংগ্রহ করতে থাকে। মূল লক্ষ্য, 'রাজবাড়ী মামলা'র আসামীদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ। ১৯৩২ জুন ১২-ই ফরিদপুরের জেলা-হাকিম ও পুলিশ-সুপার ফরিদপুর থেকে রাজবাড়ী যাচ্ছিলেন। তাঁদের গাড়ী লক্ষ্য করে সে-সময় বোমা ছোড়া হয়। সে-বোমা রাজকর্ম্মচারীদের গাড়ীতে না-লেগে পিছনের একটা গাড়ীতে লাগে। বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়নি।

এসবের পিছনে একটা ষড়যন্ত্র গজাচ্ছে বলে পুলিশ সতর্ক হয়ে ওঠে। ১৯৩২ আগষ্ট ৩০-এ একটা ডাকাতি হবার সম্ভাবনা বলে গুজব পুলিশের কাছে আসে। বেলা ১১-টা নাগাদ পুলিশ সতর্কতার ফাঁস দৃঢ় করে তোলে এবং হেরম্বচন্দ্র রায়চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে, এবং মোটামুটি সব খবরই পেয়ে যায়।

আসামী চারজন নির্ব্বাচিত হ'ল। তার মধ্যে হেরম্ব দোষ স্বীকার করলে, ডাকাতির প্রস্তুতি ও বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গের দায়ে তিন বছর ও আরও এক বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩২ ডিসেম্বর ২৩-এ—(১) রবীন্দ্রনাথ গুহ, (২) হৃদয়কান্ত দাস ও (৩) শচীন্দ্রনাথ মিত্র—প্রত্যেকের চার ও অতিরিক্ত এক এবং আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। শাস্তির ভোগ—একটি শেষের পরে দ্বিতীয় ও পরে তৃতীয় (consecutive)।

১৯৩৩ জুন ১৬-ই হাইকোর্ট আসামীদের আপীল অগ্রাহ্য করে।

ঢাকা রেল-ষ্টেশন ঃ ঢাকার বসন্তকুমার চৌধুরী একটা ঘোড়ার গাড়ী চেপে ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ১৭-ই নিকটস্থ 'চন্দ্রকুটীর'-এ যাবেন বলে বেরিয়ে রেল-ষ্টেশনের কাছে পৌঁছেচেন, এমন সময় চারটি তরুণ যুবক এসে গাড়ী থামায়। তারা টাকা আদায় করবার উদ্দেশ্যে রিভলভার ছোড়ে এবং একটা গুলি বসন্তকে বেশ গুরুতররূপে আঘাত করে।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট নির্ব্বাচন পর্ব্বের পর, ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে গুরুতর জখম করার অভিযোগে বিচার আরম্ভ হয়। নভেম্বর ৩০-এ প্রদত্ত রায়ে ভূপেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১৬)-এর দশ বছর, বসন্তকুমার সেনগুপ্ত (বয়স ১৬) এবং অধীরচন্দ্র নাগ—উভয়ের সাত বছর কারাদণ্ড হয়।

জলপাইগুড়ি ঃ পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পায় যে, এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ১৪-ই রংপুর থেকে জলপাইগুড়ি পৌঁছেচেন। ষ্টেশনের বাইরে যাবার দরজায় একখানা টিকিটও নেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে, আগন্তুক ষ্টেশনের কাছে খানিক পাইচারি করে রাইকতপাড়ায় এক সাবানের দোকানে প্রবেশ করছে।

পরদিন সকালে নবাগত একটা সুটকেস হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে তল্লাসী করায়, একটা পিস্তল ও একটা রিভলভার আর কয়েকটা তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া যায়।

বিচারের উদ্দেশ্যে জেল থেকে অন্য জেলে নিয়ে যাবার সময়, আসামী সুরেশচন্দ্র দাস, ওরফে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী পুলিশ-হেপাজত থেকে চম্পট দেন। কিছুকাল পরে তাঁকে ধরতে পারা যায়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার চলে। ১৯৩২ নভেম্বর ২-রা তাঁর সাত বছর, সাত বছর আর তিন বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

বর্দ্ধমান ঃ বেগুটিয়া— মেমারি থানার বেগুটিয়া গ্রামে ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ১৫-ই এক ডাকাতি হয়। বাধা দিতে গিয়ে এক ব্যক্তি নিহত হন। বহু চেষ্টার পরে হরেকৃষ্ণ কোঙারকে গ্রেপ্তার করে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে বিচারের জন্য হাজির করা হয়। তড়িঘড়ি ব্যাপার ; জানুয়ারী ২০-এ আসামীর ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ত্রিপুরা ঃ মেদ্দা— এখানে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়, আসামীদের মধ্যে চৌদ্দ বছরের এক কিশোর ছিলেন। ১৯৩২ নভেম্বর ১-লা, সন্ধ্যা ৭-টায় প্রকাশ বণিক্যের বাড়ী ডাকাত পড়ে ; এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে জন-কয়েক বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে পরিবারের লোকজনকে বেদম প্রহার আরম্ভ করে, এবং ঘরের লণ্ঠনটাকে আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেলে। প্রকাশের মাথার ওপর একখানা বড় দা তুলে ধরে নিরস্ত করে রাখে এবং তাঁর ক্যাশ-বাক্স ভেঙ্গে, সেইদিনই আনা ৬০০ টাকা এবং স্ত্রীলোকদের গহনাপত্র নিয়ে সরে পড়ে। কিন্তু বেশীদূর যাবার আগে পশ্চাদ্ধাবনকারী গ্রামবাসীদের হাতে জন-দুই ধরা পড়ে যান।

আসামী-সংখ্যা আট ; আর, বিচারক স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট। রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩৩ মার্চ ৭-ই ; এতে (১) চিত্তরঞ্জন দত্তর ছ'বছর ;

(২) গোপীমোহন সাহা, (৩) রাধিকামোহন সাহা (দাস), (৪) ভারতচন্দ্র শর্ম্মা, (৫) নৃপেন (নিরাপদ) দত্ত ও (৬) চুর্ণীলাল দে—প্রত্যেকের পাঁচ বছর ;

(৭) কুমুদবন্ধু রায় ও (৮) সুনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত—প্রত্যেকের চার বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৩ জুলাই ১৬-ই হাইকোর্ট, সুনির্ম্মলের বয়সের স্বল্পতা-হেতু (বয়স ১৪), সাজার পরিমাণ দু'বছরে পরিণত করে ; অন্য-সকলের দণ্ড অপরিবর্ত্তিত থেকে যায়।

ঢাকা ঃ ধামরাই— ধামরাই থানা, ইসলামপুর গ্রামে ডাক-লুঠের চেষ্টা হয়— ১৯৩২ নভেম্বর ৫-ই। সাভার পোষ্ট-অফিস থেকে মেল্ নিয়ে পিয়ন চলেছেন

ধামরাই। কয়েকটি যুবক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গুলি চালায়। পিয়ন আহত হয়েও চীৎকার করতে থাকেন; ভয়ে নিরস্ত হননি। পার্শ্ববর্তী লোকে তাড়া করলে, ভূপেশচন্দ্র সাহা নিকটস্থ একটা খালি-ঘরে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি ধরা পড়লেন, সঙ্গে পাওয়া গেল একটা রিভলভার আর সঙ্গে কয়েকটা কার্তুজ।

পরে মাখনলাল দে ও তৃতীয় এক যুবককে গ্রেপ্তার করে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। ১৯৩৩ এপ্রিল ২৬-এ প্রদত্ত রায়ে তৃতীয় আসামী মুক্তি পান। ভূপেশের সাত ও আর পাঁচ বছর সমকালীনভোগ এবং মাখনের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯৩৩ জুলাই ১৯-এ হাইকোর্ট দণ্ড সমর্থন করে।

ত্রিপুরা ঃ কালিকচ্ছ (সরাইল)— গুপ্তচরবৃত্তিতে কুমিল্লার আব্দুল খালেক পাঠান সরকারের কাছে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। বলা বাহুল্য, অপরদিকে তিনি বিপ্লবী-মহলের চক্ষুঃশূল হয়ে ওঠেন। ১৯৩২ নভেম্বর ১৯-এ সন্ধ্যায় আব্দুল বাড়ী ফিরছেন—তখন বিরাজমোহন (বাঘা) দেব রিভলভার দ্বারা তাঁকে আক্রমণ করেন। আব্দুল কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে ওঠেন, দীর্ঘকাল চিকিৎসার পর।

বিরাজ ছাড়া, বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও আরও চারজনকে আসামী করে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচার হয়।

১৯৩৩ জুন ২৪-এ বিরাজের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আর বীরেনের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। চারজন মুক্তিলাভ করেন।

হাইকোর্ট-আপীলের রায় ১৯৩৪ জানুয়ারী ১৭-ই উক্ত আদেশ সমর্থন করে।

নোয়াখালি ঃ বিজয়পুর— ফেণী মহকুমার কিস্মৎপুর-বিজয়পুরে ১৯৩২ নভেম্বর ২৮-এ, ব্রজবাসী বণিক্যের বাড়ী এক ডাকাতি হয়। এ-সম্বন্ধে জ্যোৎস্নাময় নন্দীকে খোঁজ করা চলছে। ডিসেম্বর ২৪-এ যখন তিনি কুমিরা ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেছেন তখনই তাঁকে ধরে তল্লাসী করে কয়েকটা সোনার গহনা পাওয়া গেল।

ডাকাতি-লব্ধ মাল রাখার অভিযোগের মামলা। সেইসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং আর তিনজনকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। তার মধ্যে জ্যোৎস্না ও যতীন—উভয়ের ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়, ১৯৩৩ জুলাই ১৭-ই; আর, তিনজন মুক্তি পান।

কলিকাতা ঃ শিব ঠাকুর লেন-এর ৩৫-নং বাড়ীটা হঠাৎ পুলিশ খানাতল্লাসী চালিয়ে একটা ছ'ঘরা রিভলভার পায়। খোঁজ করতে বেশ বোঝা গেল, এর পিছনে একটা বড় ষড়যন্ত্র আছে। ক্রমে গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করে চারজনকে আসামী খাড়া করে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাঠগড়ায় হাজির করে।

বিচার-শেষে ১৯৩২ ডিসেম্বর ৩০-এ—(১) হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (২) বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (৩) সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী ও (৪) জ্যোতিষচন্দ্র মজুমদার—প্রত্যেকের চার বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

এর মধ্যে বিমলের আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

ময়মনসিংহ ঃ কিশোরগঞ্জ (বেতাল)— লোক ধরা পড়লেও, "মাল" যাতে পুলিশের কবলে না-পড়ে, সেজন্য অনেক সময় সন্দেহ-সম্ভবনাহীন স্থানে সরিয়ে রাখা হ'ত। এইরকম ক্ষেত্রে এক প্রৌঢ়ার ঘরে রিভলভার লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। গোপনসূত্রে সংবাদ পেয়ে পুলিশ হাজির হয় এবং প্রৌঢ়ার ঘর থেকে রিভলভার আবিষ্কার করে।

খোঁজখবরে দেখা গেল, এর পিছনে একটা বড় ষড়যন্ত্র আছে। কয়েকজন যুবককে এ-সম্পর্কে ধরে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। রায় প্রদত্ত হয়—১৯৩২ সিসেম্বর ২১-এ; তাতে (১) শশীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (২) বীরেন্দ্র লাহিড়ী, (৩) ধীরেন্দ্র বাগচী, (৪) নরেন্দ্র বাগচী ও (৫) কাশীনাথ দেবনাথ—প্রত্যেকের তিন বছর এবং বয়স ও দায়িত্বর কথা ভেবে প্রৌঢ়ার এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

সম্ভবতঃ (ময়মনসিংহ) 'কমলাপুর ষড়যন্ত্র ও ডাকাতি' সম্পর্কে বীরেন্দ্রর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল (১৯৩৩ এপ্রিল ১৯-এ)।

বিফল প্রচেষ্টা

ঢাকা ঃ মীরকাদিম ও মুন্সীগঞ্জে ১৯৩২ জানুয়ারী ৩-রা ও ৪-ঠা যথাক্রমে একটা বাড়ী চড়াও হয়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুন্সীগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরোয়ানের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেবার বিফল প্রয়াস হয়। পুলিশও কিছুই করে উঠতে পারেনি। জানুয়ারী ১৮-ই ছ'জন যুবক আসাম-বেঙ্গল রেলের নাথের-পিটনা আর উত্তরদা দুই ষ্টেশনের মাঝে রিভলভার দেখিয়ে ডাক লুঠ করে। ঐ তারিখেই ফরিদপুর ভূষণা থানার এক বাড়ীতে ডাকাতি হয়। পরবর্ত্তী ঘটনায় জানুয়ারী ২২-এ হাওড়ার আমতা থানার কল্যাণচকে অনুরূপ চেষ্টা হয়েছিল। হাওড়ার জেলা-হাকিম হাওড়া-আমতা লাইনের ছোট রেলে যখন যাচ্ছেন, জানুয়ারী ২২-এ, তখন একটা বোমা এসে পড়ে। ক্ষতি কিছুই হয়নি।

ফেব্রুয়ারী ৭-ই খুলনা কাচুয়া থানার কৈলাসবাটীতে ডাকাতি সংঘটিত হয়। সম্পূর্ণ বাজে প্রচেষ্টা। মুন্সীগঞ্জের নিকট গঙ্গাধরপট্টিতে ফেব্রুয়ারী ১৮-ই ডাকলুঠের চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। 'রেলি ব্রাদার্স (Ralli Brothers)'-এর এক কুঠী ময়মনসিংহের

ঈশ্বরগঞ্জ থানার আঠারোবাড়ীতে অবস্থিত। ২৩-এ ফেব্রুয়ারী সেখানে লুণ্ঠনে সামান্য টাকা খোয়া যায়। ঐ জেলারই বাজিতপুর থানার সারারচর গ্রামে, ফেব্রুয়ারী ২৭-এ, ডাকাতি মাত্র হয়েছিল; ক্ষতির কোনও খবর নেই।

রাজসাহীর ঘোড়ামারায় বিয়ালিয়ার নগণ্য এক পোষ্ট-অফিসে মার্চ ২-রা তিন যুবক ডাকবাহী পিয়নকে আক্রমণ করে। বিনা লাভেই সরে পড়তে হয়। মার্চ ৫-ই যশোহর নড়াইলে উত্তর-বাঘডাঙ্গায় এক গৃহস্থ-বাড়ী আক্রান্ত হয়। পল্লীতে ডাক-হাঁক পড়ায়, পালিয়ে গ্রেপ্তার থেকে রক্ষা পায়। মার্চ ১৪-ই ঢাকা তেঘরিয়ায় পূর্ব্ব দুই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। মুর্শিদাবাদ কান্দীতে এস্.ডি.ও.-র বাসার ওপর মার্চ ১১-ই বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সালদা (ময়মনসিংহ)-র প্রথম ডাকাতি (১৯৩০ অক্টোবর ৩০) অনেক কর্ম্মীর বন্ধনদশা ঘটিয়েছিল। এবার মার্চ ১৫-ই ডাকাতিটাই হ'ল; আর বিশেষ কিছু নয়। ঐ দিনই "ভদ্রলোক" যুবক কয়েকজন ঢাকা লালবাগ থানা এলাকার মধ্যে ডাকশুদ্ধ ব্যাগ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। মার্চ ২২-এ বরিশাল নলচিটি থানার মধ্যে ষ্টীমার-ঘাটে ডাকপিয়নকে আক্রমণ করে ডাকের ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। ঢাকা সেরাজদিখান থানার ইছাপুরাতে ডাক-লুঠের চেষ্টা হয়—মার্চ ২৮-এ। ঐ দিনই রংপুর লালমণিরহাটে সেট্‌ল্‌মেণ্ট-অফিসের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় রিভলভার-চুরির উদ্দেশ্যে। সেটা অবশ্য সফল হয়নি।

এপ্রিল ৪-ঠা মুর্শিদাবাদ যাবার পথে বহরমপুর সদর রাস্তার ওপর সশস্ত্র ডাকাতি হয়। ঘটনার কোনও কিনারা হয়নি। এপ্রিল ৫-ই ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় এক ডাকাতি হয়। তার বেশী আর কিছু খবর নেই। এপ্রিল ১১-ই বেলেঘাটার হরিমোহন রায় লেনে খুন-সমেত যে ডাকাতি হয়, তার কোনও কিনারা করা যায়নি। এপ্রিল ১২-ই রংপুরের নীলফামারি ষ্টেশনের কাছে তিন যুবক রিভলভার দেখিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা লুঠ করে পালাতে সক্ষম হয়। ফরিদপুর নারিয়াতে জোরসা ষ্টীমার-ঘাটে এপ্রিল ১৩-ই ডাক-লুঠ হয়ে যায়। কলিকাতা শিয়ালদহে অবস্থিত এক দোকানে এপ্রিল ১৫-ই ডাকাতির প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়।

মে ১১-ই বরিশাল বানরীপাড়ায় ছোটখাটো এক লুণ্ঠন সম্পাদিত হয়। চট্টগ্রাম লামাবাজার পোষ্ট-অফিসে, ১৯৩২ মে ১৮-ই, ডাকে পাঠাবার একটা প্যাকেট ফেটে যায়। ফলে, এক কর্ম্মচারী আহত হবার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

ত্রিপুরার কসবা থানার মগরাবাজারে জুন ১৩-ই, ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ বিন্নাহাটিতে জুন ১৪-ই ও যশোহর কোতোয়ালি থানার বাইপাড়া রোডের ওপর এক বাড়ীতে জুলাই ২-রা ডাকাতি হয়েছিল। আগষ্ট ১৫-ই ঢাকা আর তেজগাঁ ষ্টেশনের মধ্যে জন-তিন-চার যুবক ট্রেনে সামান্য টাকা লুঠ করে। ঐ তারিখেই চরমুগুরিয়ার

দুটো বাড়ী থেকে নামমাত্র লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। চট্টগ্রাম রাওজান থানার নোয়াপাড়ায় এক ডাকাতি হয়—আগষ্ট ৩০-এ।

এক সশস্ত্র যুবক ঢাকার খানখানপুর ষ্টেশনের কাছ থেকে ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ১৫-ই মেল-ব্যাগ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে বিফল হয়। ফরিদপুর লোনসিং পোষ্ট-অফিসে সেপ্টেম্বর ২৫-এ, ফরিদপুর কেশবপুর থানার পান্‌জিয়া গ্রামে সেপ্টেম্বর ২৬-এ, আর হুগলী জেলার কামারপুকুরে ডাক-লুঠ হয় অক্টোবর ২৯-এ। এ-বছরের মতো এটাই শেষ।

নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ঘটনায় প্রচুর কারাবাস ঘটেছে; এখানে কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে ঃ

কালীঘাট ঃ প্রায় মাঝ-রাত্রি, পৌনে ১২-টা হবে—১৯৩২ জানুয়ারী ১১-ই দু'জন লোক সন্দেহজনকভাবে কালীঘাটে একখানা দোতলা বাস্ চেপে উত্তরদিকে চলেছেন। পুলিশ পিছনে চলেছে। মিনিট কয়েকের মধ্যে বাস্‌খানা চৌরঙ্গী আর কর্পোরেশন (সুরেন্দ্রনাথ) ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে পৌঁছুলে, পুলিশ ঐ দু'জনকে বাস্ থেকে গ্রেপ্তার করে নামিয়ে আনে। তাঁদের কাছে ছিল একটা দেশী ছ'ঘরা রিভলভার, একটা বিদেশী পাঁচ-ঘরা রিভলভার ও একটা অটোমেটিক পিস্তল।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে, ফেব্রুয়ারী ৬-ই আসামী সত্যেন্দ্রকুমার (সত্যরঞ্জন) বসু ও মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—উভয়ের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মে ২-রা হাইকোর্ট দু'জনেরই আপীল নাকচ করে।

চুঁচুড়া ঃ ডাক্তার নীলরতন গাঙ্গুলী তাঁর এক বন্ধুর কাছে একটা ছ'ঘরা রিভলভার আর কয়েকটা কার্ত্তুজ রাখতে দেন। বন্ধুর বাড়ী বাটাগোড়ে ১৯৩২ জানুয়ারী ১৩-ই খানাতল্লাসীতে বামাল ধরা পড়ে যায়। পুলিশকে বেশী কষ্ট করতে হয়নি; স্বীকারোক্তি থেকে সব ব্যাপার ফাঁস হয়ে যায়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রদত্ত রায়ে, ফেব্রুয়ারী ৫-ই নীলরতনের সাত ও বন্ধুটির দু'বছর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। বন্ধুটি আপীল করলেন না; নীলরতনের আপীল হাইকোর্ট নভেম্বর ৭-ই বাতিল করে দেয়।

কলিকাতা ঃ শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে আপার সার্কুলার (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র) রোডে কাইজার (Kaiser) ষ্ট্রীট এসে মিশেছে। সেখানে ১৯৩২ জানুয়ারী ১৯-এ দুই বন্ধু বিধুভূষণ রায় আর রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে পুলিশ রিভলভার-সহ গ্রেপ্তার করে। এপ্রিল ১৮-ই প্রত্যেকের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

কলিকাতা ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে ১৯৩২ জানুয়ারী ২৫-এ চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিধুভূষণ গুহর পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাসের দণ্ড বিধান করেন।

বালেশ্বর : একটা অস্ত্র নিয়ে দীনেশ ধর বালেশ্বরের বানিয়াগ্রামে রেখে দিয়েছিলেন। সেটা ধরা পড়ে যাওয়ায়, ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৪-ই তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

বাখরগঞ্জ : পিরোজপুর রাজারহাটে তন্ন তন্ন পুলিশ-তল্লাসীর ফলে বোমা আবিষ্কৃত হয়। এই ব্যাপারে ফেব্রুয়ারী ১৬-ই ভূপেশচন্দ্র গুপ্তর পাঁচ বছর সশ্রম দণ্ড হয়।

কলিকাতা : চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু আর প্রিন্সেপ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৭-ই পোর্ট-পুলিশ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে। কোমরে-জড়ানো কাপড়ের মধ্যে একটা ন'ঘরা অটোমেটিক পিস্তল আবিষ্কৃত হ'ল। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অস্ত্র-আইন-ভঙ্গ ও সন্ত্রাস-দমন-মূলক (Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act) আইনে, ১৯৩৩ মার্চ ৩০-এ, আসামীর ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। অভিযুক্তের আপীল জুন ১২-ই হাইকোর্ট বাতিল করে।

কলিকাতা : টালিগঞ্জ ২৭১-নং প্যারালাল (Parallel) রোডে দীনেশচন্দ্র দে সরকারের কাপড়ে-রঙ-করার দোকান। হয়তো পুলিশ সেখানে নিজে রেখে দিয়ে থাকবে, কিন্তু তল্লাসীতে একটা রিভলভার পাওয়া গেল। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ১৯৩২ মার্চ ১৩-ই সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা দেন।

কলিকাতা : আপার সার্কুলার (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র) রোডের ওপর ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৮-ই একটি রিভলভার আর কয়েকটি কার্ত্তুজ সমেত ললিতমোহন সিংহ রায় ও আর-একজন ধরা পড়লে, এপ্রিল ২৭-এ স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। সহ-আসামীর সাজা হয় দু'বছর।

কলিকাতা : পুলিশ ১৯৩২ মার্চ ১৬-ই, ২-নং কালু ঘোষ (কৈলাস বসু) ষ্ট্রীটে হানা দিয়ে একটা রিভলভার উদ্ধার করে। এ-সম্পর্কে দু'জনকে চালান দেওয়া হয়। তার মধ্যে, এপ্রিল ৩০-এ যোগেন্দ্রমোহন গুহর ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অপর আসামী মুক্তি পান। সেপ্টেম্বর ১-লা হাইকোর্ট স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় সমর্থন করে।

কলিকাতা : পুলিশ লক্ষ্য রাখে—এণ্টালীর ১-নং শম্ভুবাবু লেন থেকে এক ভদ্রলোক একটা বাণ্ডিল বগলে করে ১৯৩২ এপ্রিল ২৫-এ বেরিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ সন্দেহবশতঃ ট্যাক্সি করে পিছু ধাওয়া করে শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে বহুবাজার (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী) ষ্ট্রীট-এর সংযোগস্থলে অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। অনুসন্ধানে টের পাওয়া গেল শম্ভুবাবু লেনের বাড়ীতে বোমার খোল তৈরী হয়।

পাঁচজনকে আসামী খাড়া করে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির করা হয়। জুলাই ১৬-ই অমরেন্দ্রনাথের পাঁচ এবং অপর দু'জনের প্রত্যেকের দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। হাইকোর্টে আপীলে, ডিসেম্বর ২০-এ, অমরের পাঁচ ও আর-একজনের দু'বছর দণ্ডই সমর্থিত হয়। তৃতীয় ব্যক্তির দণ্ড দুইয়ের স্থলে এক বছরে পরিণত করা হয়।

কলিকাতা ঃ মেছুয়াবাজার (সূর্য্য সেন) ও আপার সার্কুলার (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র) রোডের সংযোগস্থলে ১৯৩২ এপ্রিল ২০-এ পুলিশ দেবকুমার দাসকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর সঙ্গে ছিল একটা দশ-ঘরা রিভলভার আর ৪২-টা কার্ত্তুজ। অপরাধ কবুল করতে হয়। জুন ১০-ই তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হয়। ডিসেম্বর ১২-ই হাইকোর্ট তাঁর আপীল বাতিল করে।

ত্রিপুরা ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার ভাদুড়গড় অঞ্চলে ১৯৩২ এপ্রিলে বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং কামিনী দে-কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ দু'টি রিভলভার ও অন্যান্য বে-আইনী মাল উদ্ধার করে। জুন ২৫-এ প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

——সিদ্দীক রহমান (ত্রিপুরা) জুলাই ২৫-এ অস্ত্র-আইনে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

কলিকাতা ঃ অস্ত্রের কারবার কলিকাতার নানা স্থানে চলে। কাশীপুর ৭২।২-নং সিঁথি রোড থেকে স্বদেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে একটা ছ'ঘরা রিভলভার আর ৩৮-টা কার্ত্তুজ-সহ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দোষ কবুল করলে, ১৯৩২ জুলাই ২৯-এ তাঁর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড কপালে জোটে।

বিডন ষ্ট্রীট আর আপার সার্কুলার (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র) রোডের সংযোগস্থলে হৃষীকেশ বসু নিরীহ লোকটির মতো চলে যাচ্ছিলেন। সন্দেহক্রমে পুলিশ ১৯৩২ আগষ্ট ৯-ই তাঁকে গ্রেপ্তার করলে, কিছু অস্ত্রাদি পাওয়া যায়। কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সেপ্টেম্বর ২২-এ তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাসের ব্যবস্থা করে দেন।

ত্রিপুরা ঃ ধর্ম্মনগরে ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ২-রা বিকালের দিকে এক কন্‌ষ্টেবল লক্ষ্য করেন—এক ভদ্রলোক, অনন্তলাল দে, একটা ছাতা হাতে নিয়ে চলেছেন। সন্দেহ করে লোকটির নাম জিজ্ঞাসা করে পুলিশ সদুত্তর পায়নি। তখন অনন্তকে সঙ্গে করে নিয়ে কন্‌ষ্টেবল চলতে থাকেন। খানিকটা গিয়েই অনন্ত ছাতা আর গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় এক কন্‌ষ্টেবল এসে পড়েন। অনন্ত হঠাৎ পিস্তল বার করে গুলি ছুড়তে চেষ্টা করেন, এবং রিভলভারটি পাশের খানার মধ্যে ফেলে দেন।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদত্ত ১৯৩২ নভেম্বর ১৮-ই তারিখের রায়-মতে দুই অভিযোগে স্বতন্ত্র তিন ও তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড (মোট ছয় বছর) হয়। ১৯৩৩ এপ্রিল ২৪-এ হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

পিস্তল আর আটটি কার্ত্তুজ ধরমনগরের এস্.ডি.ও.-র সম্পত্তি বলে সনাক্ত করা হয়।

ঢাকা ঃ পরিমলচন্দ্র ঘোষ ডাকাতির অভিযোগে মে ৩০-এ পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে আদিষ্ট হন।

ঢাকা ঃ বর্ত্তমান ঘটনার নজির আছে—অর্থাৎ সাটিরপাড়াতেই আগে একবার নৌকা-চুরি হয় এবং আসামীরা জেল খাটেন। এবার সন্তোষকুমার ঘোষ ১৯৩২ জুন ৭-ই একই অপরাধে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

রাজসাহী ঃ ডাক-লুঠের মামলায় চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ও বীরেন্দ্রনাথ রায় অভিযুক্ত হন। ১৯৩২ জুলাই ১০-ই দু'জনের যথাক্রমে চার ও তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। জেল-আইন-ভঙ্গের অপরাধে চিত্তর প্রথমে ছ'মাস, আর দ্বিতীয় দফায় অতিরিক্ত এক বছর সশ্রম কারাবাস লাভ হয়।

রাজসাহী ঃ অপর এক ডাক-লুঠের চেষ্টা হয়—১৯৩২ মার্চ ২-রা। এ-সম্পর্কে জুলাই ১০-ই রমেশচন্দ্র দেবনাথের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ একটা রঙের দোকান ৯৩।১-নং লোয়ার সার্কুলার (আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু) রোডে অবস্থিত। পুলিশ গোপন-খবরে নির্ভর করে দুর্গাশঙ্কর দাসের উপস্থিতিতে দোকান তল্লাসী করে বোমার খোল আর কয়েক বোতল এ্যাসিড আবিষ্কার করে। ১৯৩২ আগষ্ট ৮-ই দুর্গার পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড জোটে।

বিহার ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গ মামলায় ১৯৩২ আগষ্ট ২০-এ মোহিত অধিকারীর বিশ (?) বছর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি জেলের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন।

কলিকাতা ঃ বেলেঘাটার মোড় পুলিশের গুপ্তচরদের একটা প্রকাণ্ড ঘাঁটি। তবুও সেখানে মেলামেশার ভুল বিপ্লবীরা বারে বারে করেছেন। ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ১৩-ই ঐখানেই পুলিশ সুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী, বিভূতিভূষণ ঘোষ ও তৃতীয় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তখন তল্লাসীতে একটা লাইসেন্স-বিহীন ছ'ঘরা রিভলভার ও স্বল্পপরিমাণ বিষ পাওয়া যায়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩২ ডিসেম্বর ২৩-এ সুবোধ আর বিভূতি উভয়কে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেন ; তৃতীয় আসামীর দু'বছর হয়েছিল।

এই ব্যাপারের অপর এক আসামী যোগেন্দ্রনাথ বসাক পলাতক ছিলেন। ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে তিনি বহুবাজার ষ্ট্রীট থেকে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৪ জুলাই ১৭-ই তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের এক বাসা থেকে ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ১৪-ই ভোরে বেরিয়ে অবনীরঞ্জন সরকার এক সঙ্গীকে নিয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পড়েছেন ; সঙ্গে বাদামী কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। সন্দেহক্রমে পুলিশ অবনীকে ধরে প্যাকেটটা খুলতে, ক্ষুদ্রাকার একটা পিস্তলের ছবি-সমেত, লাল রঙের কতগুলি ইস্তাহার পাওয়া গেল।

এ-সম্পর্কে আসামী খাড়া করা হয় চারজন। অভিযোগটি উর্ব্বর-মস্তিষ্কের প্রমাণ-স্বরূপ। দণ্ডবিধি আইনের ৫০৬ ধারা অর্থাৎ ভীতি-প্রদর্শন ঃ পিস্তলের ছবি মাত্র ("Punishment for criminal intimidation .... if threat be to cause death or grievous hurt, etc.") ; তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ১১৭ ধারা, অর্থাৎ অপরাধ করার উৎসাহদান ("abetting commission of offence by the public"), আর ষড়যন্ত্র।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট চারজনের প্রত্যেককে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। হাইকোর্ট আপীলের রায় দিয়েছিল ১৯৩৩ জানুয়ারী ২০-এ। অবনী আপীল করেননি। নির্ম্মলকুমার গুহর আপীল নাকচ হয়ে যায়। দু'জন মুক্তি পান।

কলিকাতা ঃ আপার চিৎপুর রোডের এক বাড়ীতে হানা দিয়ে, পুলিশ একটা রিভলভার আর কয়েকটা কার্ত্তুজ আবিস্কার করে এবং শ্যামসুন্দর পাণ্ডেকে বিচারের জন্য চালান দেয়। রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩২ সেপ্টেম্বর ২৭-এ। পাণ্ডের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

কলিকাতা ঃ শ্যামপুকুর এলাকায়, ৭৫-সি রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ১৯৩২ অক্টোবর ১৫-ই যখন হরিপদ চৌধুরী এসে ঢুকছেন, পুলিশ তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে ; সঙ্গে ছিল একটা পোষ্টকার্ড ; ঠিকানা ঃ '৭।২-এ তেলিপাড়া লেন'। সে-বাড়ীটা তল্লাসী করে একটা ষ্টীল-ট্রাঙ্কের মধ্যে টোটা-ভরা একটা দেশী ছ'-ঘরা অটোমেটিক পিস্তল, ৫২-টা তাজা কার্ত্তুজ এবং বিস্ফোরক-তৈরীর উপযোগী কিছুটা এ্যাসিড, তৎসংক্রান্ত কাগজ ও বড় বড় গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী-হত্যার 'স্কীম'।

স্পেশ্যাল জজের বিচারে, নভেম্বর ২৪-এ, আসামীর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৩৩ মার্চ ৭-ই, হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

বীরভূম ঃ নানুর থানার পুলিশ, ১৯৩২ অক্টোবর ১৯-এ, কালীকৃষ্ণ রায়ের বাড়ী খানাতল্লাসী করে। কিছুই পাওয়া গেল না ; পুলিশ ফিরে যাবার সময় হয়েছে, এমন সময় দেখলে কালীকৃষ্ণর স্ত্রী আঁচল-ঢাকা দিয়ে একটা পুঁটুলি নিয়ে যাচ্ছেন। ধমকা-ধমকিতে তিনি সেটা বার করে দিলেন ; সেটা একটা কার্ত্তুজের কেস্, ওপরে লেখা ঃ 'প্রভাতচন্দ্র রায়' ; ভিতরে রয়েছে সাতটা ব্যবহৃত কার্ত্তুজের খোল।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৩ ডিসেম্বর ১২-ই, আসামী প্রভাতের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৪ মে ২১-এ হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

কলিকাতা ঃ রিপন কলেজের ছাত্র সুনেত্র সেনগুপ্ত, ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ২৮-এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে কার্ত্তুজ-ভর্ত্তি একটা সাত-ঘরা পিস্তল-সমেত ধরা পড়েন। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে নভেম্বর ২-রা তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

এই পিস্তলটা ১৯৩১ ডিসেম্বর ২৪-এ খিদিরপুর থেকে চুরি গিয়েছিল।

কলিকাতা ঃ কর্পোরেশন (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ষ্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার (জগদীশচন্দ্র বসু) রোডের সংযোগস্থলে ১৯৩২ নভেম্বর ৫-ই গ্রেপ্তার হলেন কলেজের ছাত্র শান্তনু মুখোপাধ্যায়, ওরফে কৃষ্ণপদ ঘোষ। সঙ্গে ছিল একটা পিস্তল। তার ছ'টা খোপের ভিতর চারটে তাজা কার্ত্তুজ ও দুটোতে ব্যবহৃত খোল। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ১৯৩২ ডিসেম্বর ১০-ই আসামীর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ঢাকা ঃ সূত্রাপুরের বনগ্রাম লেনের ভূপেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, ডাকাতির সময় গুরুতর আঘাত করার অভিযোগে, ১৯৩২ নভেম্বর ৩০-এ দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদত্ত হয়।

ঢাকা ঃ প্রশান্তকুমার সেনকে ফুলবেড়িয়া ষ্টেশন রোডে গ্রেপ্তার করে ডাকাতি ও অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের অপরাধে, নভেম্বর ৩০-এ, সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

প্রশান্ত ১৯৩৪ জুন ১৯-এ মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে যান। ধরা পড়লে, ১৯৩৪ আগষ্ট ৪-ঠা আরও দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড পূর্ব্বের সঙ্গে যোগ হয়।

কলিকাতা ঃ টেরিটিবাজার (লালবাজার পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সের সন্নিকট) বিপ্লবীদের একটি মিলনকেন্দ্র। ১৯৩২ ডিসেম্বর ১২-ই, সাদা-পোশাক-পরা পুলিশ লক্ষ্য করে—দু'ব্যক্তি লুঙ্গি-পরা অপর একজনের সঙ্গে অতি সতর্কতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হ্যালিডে (মহম্মদ আলি) পার্ক-এর দিকে চলেছে। তখন আত্মপ্রকাশ করে পুলিশ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ গায়ের চদারখানা ফেলে তখনকার মতো গ্রেপ্তার এড়িয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু কাছেই পিয়ারীচরণ সরকার ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার হন।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে, জানুয়ারী ২৫-এ, ইন্দুর পাঁচ ও বারীনের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আগষ্ট ১৫-ই হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

বরিশাল ঃ গৈলার অধুনা গ্রামের সুধাংশুকুমার সেনগুপ্তকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১৯৩২ ডিসেম্বর ১৩-ই তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এইসঙ্গে সাজা হয়েছিল ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর। শেষপর্য্যন্ত 'সিঙ্গা (বরিশাল) ডাকাতি'তে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ঘটে।

বগুড়া : বগুড়া রেল-ষ্টেশন থেকে ১৯৩২ ডিসেম্বর ১৯-এ বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত একটা পেটি খালাস করে নিয়ে বেরিয়েছেন। সন্দেহক্রমে পুলিশ মাল তল্লাসী করে। তার মধ্যে পাওয়া গেল পুরাতন ধাঁচের গাদা পাঁচ-ঘরা একটা রিভলভার, হাতে-তৈরী উনিশটা বুলেট, ন'টা পার্কসন্ ক্যাপ (percussion cap), দুটো ছোরা এবং আরও কিছু। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৩ মার্চ ১৪-ই, আসামীর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জুন ১২-ই, হাইকোর্টে আপীল নাকচ হয়ে যায়।

"তথা পরম্—" (১৯৩৩)

বিপ্লবী কার্য্যকলাপে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ বিব্রত। ১৯৩০ ও ১৯৩১ সাল পূর্ব্বের সকল সীমা প্রায় অতিক্রম করে চলেছে। সুতরাং গভর্ণমেণ্টও আইনের যে-সকল বাঁধন কিছু শিথিল করেছিল, এখন সেগুলো দৃঢ়তর করতে আরম্ভ করে। ১৯৩২ সালটা 'অর্ডিনান্স বছর (year)' বললে ভুল হবে না। জীবনযাত্রায় এমন কিছু ছিল না, যার জন্য আইন হয়নি। তার ওপর বিপ্লব-সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি গুরুতর করা হয়। সংবাদপত্র বিপ্লবী-সংক্রান্ত বা বিশেষ ঘটনার বিবরণ, এমনকি শিরোনামার টাইপ পর্য্যন্ত ইচ্ছামত ব্যবহার করবার শক্তি হতে বঞ্চিত হয়। মারণাস্ত্র ধরা পড়লে, ফাঁসির বিধি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। পলাতকদের, এমনকি পুলিশের সন্দেহভাজন ও বিপ্লব-সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত যে-কোনও লোককে আশ্রয়দান গুরুতর অপরাধের পর্য্যায়ে তোলা হয়। এসকল কাজে কোনও সহায়তা বা সহায়তার সন্দেহ মূল অপরাধের শাস্তির সমপর্য্যায়ে ওঠে। যানবাহন, সদর রাস্তা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হয়। মামলার প্রক্রিয়া সহজ করবার জন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের বিধান প্রায় অবলুপ্ত। এসব নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

নানা ঘটনার সংঘাতে যে অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল, তার কারণ-নির্ণয়ে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ তদন্ত ব্যবস্থা করে। প্রথমতঃ, মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সকল স্তরের ভিতর বিপ্লবীদের প্রতি প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সমর্থন বিশেষ লক্ষণীয় হয়। "নির্য্যাতিত" রাজবন্দী বা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী সাধারণ লোকের শ্রদ্ধার পাত্র বলে পরিগণিত হতে থাকে। বেকার অবস্থা অনেককালই আছে, কিন্তু তার সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা এ-সময় (১৯৩২-৩৩ সালে) তীব্র হয়ে উঠেছে, সুতরাং "রিক্রুট" বা নতুন সদস্য পাওয়া সহজ হয়ে উঠেছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তো বটেই, বহু শিক্ষক এই আন্দোলনের সমর্থক। সংবাদপত্র ইন্ধন যোগাচ্ছে—অবিশ্রান্ত বিপ্লবের বাণী প্রচার করছে, যদিও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকতর হয়েছে। অসহযোগ বা নিরুপদ্রব আইন-অমান্য-আন্দোলনের সঙ্গে এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও, পরোক্ষ প্রেরণা যুগিয়েছে। আইন-আদালত ও জেলের ভয় দূর হয়ে যায়; গুরুতর শাস্তির ভয় বিপজ্জনক কাজ থেকে আর নিরস্ত করে না।

এর ফলে বিপ্লবী-সংস্থাগুলি পুষ্ট হয়ে উঠছে। দলে নতুন-প্রবেশ করবার সময়, যে-সকল দীর্ঘ প্রক্রিয়া, অনুশাসন, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি আগে ছিল, আজ সে-সব তিরোহিত হয়েছে। নেতা বলে একজনকে পেলে এবং তাঁর আদেশ মেনে চললে,

আর কোনও বাধা নেই। চরিত্রবত্তার ওপর যতটা জোর দেওয়া হ'ত, আজ আর সে বালাই নেই। সন্দিগ্ধ-চরিত্রের লোক দলের মধ্যে পাওয়া এখন আর বিরল নয়।

স্কুল-কলেজ, এমনকি সঙ্ঘবদ্ধ অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ও সাধারণ লোকের মধ্যেও গভর্ণমেণ্টের কাজের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা, উপরন্তু প্রতিবন্ধক প্রবৃত্তি ঘনীভূত হয়ে উঠছে। মফস্বলে এমন স্কুল-কলেজ নেই, যেখানে একটা ছোট গুপ্ত-ঘাঁটি জমে ওঠেনি।

সাধারণতঃ বাঙ্গালী মহিলারা একটু ভীরুপ্রকৃতি এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভয় পান, কিন্তু অসহযোগ আর নিরুপদ্রব আইন-অমান্য-আন্দোলন অজস্র মহিলা-কর্ম্মী এনে দিয়েছে। এঁরা জেলের ভয় কাটিয়ে উঠেছেন। তার পরের ধাপ বিপ্লবী-দলে যোগদান। পুরুষদের সঙ্গে মিশে আন্দোলন চালানো, নিতান্ত প্রয়োজন-ক্ষেত্রে একত্রে এবং একান্তে বাস সমাজ উপেক্ষা করেছে; মাতাপিতা ও আত্মীয় প্রথমে আপত্তি করেছেন, কিন্তু অনেকেই "দেশের সেবা" মনে করে (অনেকসময় বাধ্য হয়ে) মত করেছেন; আবার অনেকেই কন্যা-ভগ্নীকে নিরস্ত করতে পারেননি। গোপনে স্থান হতে স্থানান্তরে বাস অসামাজিক ঘটনার খবর এনে দিয়েছে, কিন্তু সে-সকলই স্বপ্নের কাহিনীর মতো মিলিয়ে গিয়েছে।

"আপনার মান রাখিতে" নয়, পরাধীনতার অপমান দূর করতে এগিয়ে এলেন একদল শিক্ষিতা যুবতী। কবি কামিনী ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন—

"আপনার মান রাখিতে, জননি !
আপনি কৃপাণ ধর গো !
পরিহরি চারু কনক-ভূষণ
গৈরিক বাস পর গো !

* * *

এলাইয়ে দাও কুটিল কুন্তল
জ্বাল মা হৃদয়ে প্রতিহিংসানল,
নয়নের কোণে লুকায়ে গরল
মরণে বরণ করিয়া লও গো !

ঐ শুন বাজে বিধাতার ভেরী,
বাঁধি কটিতটে সুশাণিত ছুরি,
দানবদলনী সাজ গো জননি !
কাঙ্গালিনী বেশ ছাড় গো !"

'সু-শাণিত ছুরি'র দিন গিয়েছে, "উল্কাপাত বজ্রশিখা" ধরে এসে গেলেন— "নয়নের কোণে লুকায়ে গরল—মরণে বরণ করিয়া" নিলেন কয়েকজন। মহিলারা

দেহতল্লাসীর অবর্ণনীয় গ্লানির অশালীন আচরণ কাটিয়ে উঠেছেন—সকলেই দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। বছরের পর বছর জেলে কালযাপন করেছেন। আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি নিজ হেপাজতে রেখে, বিপ্লবীদের (বিশেষতঃ পলাতক বিপ্লবীদের) আশ্রয় দিয়ে, বিপদের মধ্যে আহারাদি সরবরাহ করে এবং গোপন তথ্যাদি পরিবেশন করে বহু মহিলা কর্তৃক নিদারুণ বিপদ বরণ করার উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

১৯৩০ সাল থেকে নারীরা এসে ঝাঁপ দিলেন আগুনের মধ্যে। এই কারণে বিপ্লবের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় লেখা হয়ে রইল বছর কয়েক ধরে।

সুবলপুর (বীরভূম)

বীরভূমে বিপ্লবী উপদ্রব খুব বেশী হয়নি। ১৯৩২-৩৩ সালে কয়েকটা ডাকাতি হয়। সে-সম্পর্কে কয়েকটি যুবক দণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু তার পিছনে যে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠেছিল সেটা আবিষ্কৃত হয়, অথবা পুলিশ গড়ে তুলতে সমর্থ হয় এবং বহু কর্ম্মীর কপালে দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস ঘটে।

শুরু হয়েছিল 'সুবলপুর ডাকাতি' নিয়ে। ঘটনার তারিখ ১৯৩৩ মার্চ ৫-ই, লাবপুর থানার যুধিষ্ঠির সাহার বাড়ী। ডাকাতরা সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। পরিচারকটি বিপদ উপেক্ষা করে একটা সতর্কবাণী দেয় ; পরিবারের লোক উঠে পড়ে, আর আগন্তুকরা বিফল হয়ে ফিরে যায়।

ধড়পাকড় অনেক হ'ল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত (১) সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়, (২) সত্যনারায়ণ চন্দ্র ও (৩) নিত্যগোপাল ভৌমিককে ডাকাতির অভিযোগে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। ১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ২২-এ প্রদত্ত রায়ে আসামীদের প্রত্যেকের সাড়ে-চার বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আপীল হলে, হাইকোর্ট ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ২-রা সেটা নাকচ করে।

পুলিশ এবার ষড়যন্ত্র নিয়ে পড়লো। একেবারে একদঙ্গল যুবককে আসামী খাড়া করা হ'ল। সম্রাটের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য নানা স্থানে ডাকাতি, বন্দুক-চুরি, মেল-ব্যাগ ছিন্‌তাই প্রভৃতি অভিযোগ। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচরে আনীত অপরাধের তালিকায় দেখা যায়—১৯৩৩ মার্চ ৫-ই—সুবলপুর ডাকাতি। এই প্রকাশ্য ঘটনার পিছনে ছিল একটা বিরাট প্রস্তুতি বা ষড়যন্ত্র। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ মে মাসের মধ্যে সিউড়ি, আহম্মদপুর, হালসাট, নবগ্রাম, দুবরাজপুর প্রভৃতি স্থানে ঘাঁটিতে বসে তোড়জোড় চলেছে। স্থানে স্থানে সব্‌জির আবরণে ঝুড়িতে করে রিভলভার, বোমা, কার্ত্তুজ, ডাইনামাইট প্রভৃতি সংগৃহীত হয়েছে।

গোড়া থেকে ধরলে দেখা যায়, ১৯৩১ মে ১৪-ই সিউড়ি সহরে ডাকাতি, মে ৩০-এ ভবানীপুরে রিভলভার-চুরি, আগষ্ট ১-লা সিউড়িতে পিস্তল-চুরির মামলা,

আগষ্টে বেলিয়া-তে ডাকাতির প্রচেষ্টা, অক্টোবর ৩-রা দুবরাজপুরে মেল-ডাকাতি, ডিসেম্বরে বাব্‌নায় ডাকাতি-প্রচেষ্টা, ১৯৩২ জানুয়ারীতে দুবরাজপুরের কাপড়ের দোকানে ডাকাতির প্রচেষ্টা, জানুয়ারী ৫-ই একটা রিভলভার চুরির চেষ্টা, ফেব্রুয়ারী ১২-ই বনোয়ারীবাদ ডাকাতি, এপ্রিল ২৭-এ জাজিগ্রামে ডাকাতির চেষ্টা, মে ২৫-এ আহম্মদপুর ডাকাতি, মে মাসে রাণীগঞ্জে মোটর-ডাকাতি, জুন ১৮-ই ট্রেন-ডাকাতির চেষ্টা, জুলাই ২১-এ শ্রীকান্তপুর ডাকাতি, ১৯৩৩ জানুয়ারী ২৭-এ আমচুয়া ডাকাতি, ফেব্রুয়ারীতে গোপালপুরে ডাকাতির প্রচেষ্টা, ফেব্রুয়ারী ২২-এ দিক্‌সুই (?) ডাকাতি এবং সর্ব্বশেষে 'সুবলপুর ডাকাতি'।

পুলিশের সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে বিরাট 'বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা'। এক রাজসাক্ষী পেয়ে পুলিশের খুব সুবিধা হয়ে যায়।

১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ২৪-এ স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় প্রকাশিত হয় ঃ

(১) রজতভূষণ দত্ত ও (২) প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বারো বছর দ্বীপান্তর ;

(৩) সমাধীশ রায়ের দশ বছর ও (৪) প্রভাতকুসুম ঘোষের সাত বছর ;

(৫) সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (৬) হারাণচন্দ্র খাঁড়ার, (৭) ধরণীধর রায়, (৮) উমাশঙ্কর কোঙার ও (৯) বিজয় ঘোষ—প্রত্যেকের ছ'বছর ;

(১০) বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, (১১) নৃত্যগোপাল ভৌমিক, (১২) কালীপ্রসন্ন চৌধুরী, (১৩) বনবিহারী রায়, (১৪) সত্যগোপাল চন্দ্র, (১৫) হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৬) জয়গোপাল রায়, (১৭) প্রদ্যোৎকুমার চৌধুরী, (১৮) সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়—প্রত্যেকের সাড়ে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

সকলেই হাইকোর্টে আপীল করেছিলেন। ১৯৩৫ সেপ্টেম্বর ২০-এ, সর্ব্বক্ষেত্রেই পূর্ব্বদণ্ডাদেশ বহাল থেকে যায়।

ঘটনা-প্রবাহ

চট্টগ্রাম ঃ পটিয়া— অস্ত্রাগার-আক্রমণ-সংক্রান্ত যে মামলা হয়, তাতে অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও সরোজকান্তি গুহ জড়িত ছিলেন। পুলিশ বহু খোঁজাখুঁজিতে তাঁদের সন্ধান করতে পারেনি ; পরে পটিয়া থানার কচুয়াই গ্রামে ১৯৩০ অক্টোবরে অম্বিকাকে এবং নোয়াখালির ধরমপুরে সরোজকে ১৯৩২ আগষ্টে গ্রেপ্তার করে।

এক অতিরিক্ত মামলায় স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল, ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১০-ই, অম্বিকার মৃত্যু আর সরোজের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেয়। হাইকোর্টে আপীলের ১৯৩৩ মে ৩রা প্রদত্ত রায় অনুযায়ী অম্বিকার ফাঁসির পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় ; সরোজের দণ্ড বহাল থাকে।

গোহিরা (চট্টগ্রাম)

আনোয়ার থানার অন্তর্গত গোহিরা গ্রামটি পুলিশ-মিলিটারী ঘিরে ফেলেছিল ১৯৩৩ মে ২৫-এ। সেখানে নিশি তালুকদারের বাড়ীতে গোপনে ছিলেন তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, সুধীন্দ্র দাস ও মনোরঞ্জন দাস। বাড়ীর মালিক পূর্ণচন্দ্র তালুকদার। চারিদিক ঘেরা ; পালাবার রন্ধ্রমাত্র নেই। যদি পথ করে নেওয়া যায়, সেই আশার অবরুদ্ধ কক্ষ থেকে বুলেট ছুটলো ; বুলেট-ই তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল।

যখন সঙ্ঘর্ষ থেমে এল, তখন পূর্ণচন্দ্র আর মনোরঞ্জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। গ্রেপ্তার হলেন তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত, আর বূ্যহ ভেদ করে পালালেন সুধীন্দ্র। অবশ্য এ-স্বাধীনতা তাঁকে বেশীদিন ভোগ করতে হয়নি ; অল্পদিনের মধ্যে তিনিও গ্রেপ্তার হন।

পলাতকদের আশ্রয়দান, অস্ত্র-আইন-ভঙ্গ ও বিপ্লব-কার্য্যে সহায়তা বা অংশ-গ্রহণ করার অপরাধে সুধীন্দ্র দাসের চার বছর, চার বছর ও দু'দফায় ছ'মাস হিসাবে সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয়, ১৯৩৩ জুলাই ৩১-এ।

তারকেশ্বর ও কল্পনার বিচার 'মাষ্টার-দা'র সঙ্গে সম্পন্ন হয়—১৯৩৩ আগষ্ট ১৪-ই।

গৈরালা (চট্টগ্রাম)

এক স্কুলের শিক্ষক, তাই কর্ম্মীদের কাছে নাম হয়ে গিয়েছিল 'মাষ্টার-দা'—আর এই নামই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর আসল নাম "সূর্য্য সেন"-এর চেয়ে ঢের বেশী পরিচিত থাকবে, যাঁর পরিচালনায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন থেকে আরও বহুতর দুঃসাহসিক ঘটনা একের পর একটা ঘটেছে, তাঁর নাম ভারতবাসী সগর্ব্বে স্মরণ করবে।

পলাতকরা ক্রমে ক্রমে ধরা পড়ে যেতে লাগলেন। 'মাষ্টার-দা'ও প্রায় ধরা পড়েছেন বারে বারে। বিশেষ করে ১৯৩১ আগষ্ট ৩০-এ, ধলঘাট আশ্রয় থেকে তিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে বিস্ময়করভাবে রক্ষা পান। সেখানে তাঁর দুই বাহু—নির্ম্মল আর অপূর্ব্ব মিলিটারীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন।

এবারে এক কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে তিনি আর গ্রেপ্তার এড়াতে পারেননি। ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই, 'ঐ নরাধমের ইঙ্গিতে' ২।৯ গুর্খা রাইফেল্‌স্‌ এসে গৈরালা গ্রামে নিরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়ী সন্ধ্যার পর থেকেই ঘেরাও করে। যখন 'কর্ডন' চেপে বসছে তখন বাড়ীর ভিতর থেকে টর্চ্চের আলো সামরিক বাহিনীর ওপর পড়ে এবং সঙ্গে গুলি ছুটতে থাকে। মিলিটারীও ফিরিয়ে গুলি চালাতে থাকে।

স্বল্প বিরতির পর অবরুদ্ধদের মধ্যে দু'জন গুলি ছুড়তে ছুড়তে 'কর্ডন' ভেদ

করে পালাবার চেষ্টা করেন। পুলিশ তখন সম্পূর্ণরূপে বাড়ীটা ঘিরে রয়েছে, সুতরাং গুলি চালালে, নিজের লোকের আহত হবার সম্ভাবনা বেশী বলে অবরোধকারীরা গুলি চালাবার অসুবিধা ভোগ করতে থাকেন।

এর মধ্যেই যে একজন পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তার প্রমাণ যে, নিকটস্থ জলাশয়ে হঠাৎ কিছু পড়ে যাবার শব্দ পাওয়া গেল। সকালবেলা দেখা যায়, রক্তর একটা ধারা কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। রক্তাক্ত একখানা শাড়ী, স্ত্রীলোকের অন্য কিছু পরিচ্ছদ, একজোড়া চপ্পল এবং কিছু বিপ্লব-সম্পর্কিত কাগজপত্র পড়ে থাকতে দেখা যায়।

কিন্তু বিপদ ঘটে গেল আসল ব্যাপারে। সুযোগমত বেরিয়ে পড়ে 'মাষ্টার-দা' বাড়ীর বেড়া টপ্‌কে বাইরে পড়লেন একেবারে এক হাবিলদারের সামনে এবং গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

প্রত্যূষে তাঁকে নানা স্থানে ঘুরিয়ে সহরের কয়েদখানার বন্দী করা হ'ল।

জেলখানার ভিতরে বসে তিনি বাইরের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডাইনামাইট-সাহায্যে জেল ভেঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টা হয়েছিল ; সামান্য ভুলের জন্য সেটা পণ্ড হয়ে যায়।

যথাকালে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল গঠন করে ১৯৩৩ জুন ১৫-ই সূর্য্য সেন, কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদারের বিচার আরম্ভ হয়। ফলাফল সম্বন্ধে কারও মনে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। সূর্য্য সেন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন থেকে সকল ঘটনার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেন। তাঁর 'বিরহ' আর 'বিজয়া' দুই প্রবন্ধ সরকারপক্ষে আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ দাখিল হ'ল। প্রথমটিতে বলা ছিল ঃ শুরু থেকেই তিনি চট্টগ্রামের বিপ্লবী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। দ্বিতীয়টিতে ছিল ঃ তিনি বহু নিকটতম বন্ধুর বিজয়া দেখেছেন এবং সে-সবের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর।

তারকেশ্বর 'লুণ্ঠন' ব্যাপার থেকে প্রায় সকল ঘটনার অংশীদার। উপরন্তু ১৯৩১ মার্চ ১৬-ই বরমা গাঁয়ে ডি.আই.বি.-ইন্সপেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে হত্যার অপরাধ যোগ করে দেওয়া হয়।

কল্পনা নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত; তার ওপর, আইন এড়িয়ে পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

১৯৩৩ আগষ্ট ১৪-ই রায় প্রদত্ত হয়। সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসি ও কল্পনার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 'মাষ্টার-দা'র আপীল নেই। তারকেশ্বর ও কল্পনার পক্ষে হাইকোর্টের আপীল নভেম্বর ১৪-ই বাতিল হয়ে যায়।

১৯৩৪ জানুয়ারী ১২-ই ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর ও তাঁর অন্যতম প্রধান সঙ্গীটির ফাঁসি হয়। ফাঁসির উদ্দেশ্যে কারাকক্ষ থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এ সংবাদ

ছড়িয়ে পড়লে, "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে জেল কেঁপে উঠলো। 'মাষ্টার-দা' নিজে "বন্দে মাতরম্" বলছেন আর অজস্র লাঠির ঘা পড়ে চলেছে তাঁর ওপর। তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন,—হয়তো মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়ে ফাঁসির দড়িতে লট্‌কে দেওয়া হয়েছিল।

তিনি দিয়ে গেলেন "একটি সোনালী স্বপ্ন—স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন"। তাঁর সেই স্বপ্ন সফল করার জন্য সংগ্রামের পথ উন্মুক্ত আত্মোৎসর্গ দ্বারা আলোকিত রাখবার আদেশ দিয়ে যান।

ফাঁসির পর দুই বীরের মৃতদেহ সামরিক জাহাজে চড়িয়ে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দেহের সঙ্গে ভারী পাথর বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

'মাষ্টার-দা'র গ্রেপ্তার সম্পর্কে আশ্রয়দাতাদের নিয়ে গভর্ণমেণ্ট আক্রোশ-নিবৃত্তির ব্যবস্থা করতে ভোলেনি। এ-সম্পর্কে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ সেনের ১৯৩৩ আগষ্ট ২১-এ চার বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টা

চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে ভুল হবে, কারণ সেখানে সার্থকতা ছিল প্রচুর। কিন্তু তারপর 'আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র' পরিকল্পনায় ও ব্যাপকতায় ছিল তুলনাহীন। আসামী-সংখ্যা, উদ্যোগপর্ব্ব এবং শাস্তির পরিমাণ বিচার করলে, এ ষড়যন্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

বক্সা বন্দীশিবিরে বসে চার বন্ধু এই বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরে কেউ বন্দীশালা, কেউ-বা অন্তরীণ-বন্দী-অবস্থা থেকে পালিয়ে গিয়ে একত্র এসে জুটেছিলেন। এঁদের লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হচ্ছেঃ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমগ্র ভারতে একটা সশস্ত্র আকস্মিক আক্রমণ চালানো সম্ভব করে তুলতে হবে। আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হবে—ডাকাতি, জুলুমবাজি, খুন, সরকারী শক্তিকেন্দ্রগুলির ওপর নানারকমের আঘাত—ইত্যাদি। গরিলা-যুদ্ধ হবে সংগ্রামের পদ্ধতি এবং এ-বিষয়ে আয়ার্ল্যাণ্ড হবে আদর্শ।

প্রতিষ্ঠানের শাখা ছিল ভারতের নানা স্থানে এবং বর্ম্মা তা থেকে বাদ পড়েনি। দিন নির্দ্দিষ্ট করে বড় মিলিটারী ছাউনি আক্রমণের তোড়জোড় চলতে থাকে। কলিকাতা থেকে দূত গেছে যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে। উতাকামণ্ডের পাহাড়ের মধ্যে জায়গা স্থির করে অস্ত্র-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে।

এই দলের সভ্য কর্তৃক ডাকাতি হয়েছে—ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, ত্রিপুরা এবং আরও নানা স্থানে। ১৯৩৩ মে ৪-ঠা, মাদ্রাজে পুলিশ এঁদের গোপন আড্ডায় উপস্থিত হলে, প্রকাশ্য সশস্ত্র-সংঘর্ষ হয়েছে। উতাকামণ্ডে ব্যাঙ্ক-লুঠ এই দলের লোক দ্বারা সংসাধিত হয়েছে বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আরও নানা উপসর্গ জড়িয়ে, ১৯৩৩ আগষ্ট ৭-ই স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের এজলাসে মামলা শুরু হয়। দীর্ঘকাল চলবার পর, ১৯৩৫ মে ১-লা, ট্রাইবিউন্যালের রায় প্রকাশিত হয়। আসামী-সংখ্যা চৌত্রিশ। প্রথম দফায় চারজন মুক্তি পান; দু'জনের এক বছর ও দু'জনের তিন বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অন্যান্য সব দীর্ঘ-মেয়াদী আসামী। হাইকোর্টে আপীলের রায় ১৯৩৬ জুলাই ৩০-এ প্রকাশিত হয়। ট্রাইবিউন্যাল ও হাইকোর্টের রায়ের ফল যা দাঁড়াল, তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ

	ট্রাইবিউন্যাল	হাইকোর্ট
	১.৫.৩৫	৩০.৭.৩৬
প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	যাবজ্জীবন দ্বীঃ	বহাল
জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত	,,	,,
সীতানাথ দে	,,	,,
নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	,,	১৪ বঃ সঃ
পর্ণানন্দ দাশগুপ্ত	,,	,,
ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	,,	,,
কিশোরীমোহন দাশগুপ্ত	১০ বঃ সঃ	৭ বঃ সঃ
মণীন্দ্র চৌধুরী	,,	,,
পরেশ গুহ	,,	,,
যতীন চক্রবর্ত্তী	৭ বঃ সঃ	বহাল
দ্বিজেন্দ্র তলাপাত্র	,,	,,
অবনী ভট্টাচার্য্য	,,	৫ বঃ সঃ
প্রভাতকুমার মিত্র	,,	বহাল
সত্যেন্দ্র মজুমদার	,,	,,
হরিপদ দে	,,	,,
নিরঞ্জন ঘোষাল	,,	,,
অমূল্যচরণ সেনগুপ্ত	,,	,,
অমিয়কুমার পাল	,,	,,
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৬ বঃ সঃ	,,
বিমল ভট্টাচার্য্য	,,	,,
সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী	,,	,,
জ্যোতিষচন্দ্র মজুমদার	,,	,,
সুধীর ভট্টাচার্য্য	৫ বঃ সঃ	৩ বঃ সঃ

আসামীদের মধ্যে যে পাঁচজনের তিন বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়, তাঁদের হাজতবাস (অর্থাৎ ১.৩.৩৫ থেকে ৩০.৭.৩৬ পর্য্যন্ত) দণ্ডভোগের কাল বলে গ্রহণ করে মুক্তি দেওয়া হয়।

অজিতকুমার বসু আপীল করেননি ; ট্রাইবিউন্যাল-প্রদত্ত তিন বছর সশ্রম দণ্ড বজায় থেকে যায়।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রাজসাহী জেলে দেহত্যাগ করেন।

'দ্বিতীয় সোয়ালিচর মামলা'য় ১৯৩৩ মার্চ ৩১-এ নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। বর্ত্তমান দণ্ড পূর্ব্বদণ্ডের একসঙ্গে ক্ষয় হবার আদেশ হয়।

সীতানাথ দে মামলার শুরু থেকেই পলাতক ছিলেন ; গ্রেপ্তার হবার পর তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডভোগ চলতে থাকে।

মামলা চলার সময়. আসামীরা নানা ক্রিয়াকাণ্ড ঘটিয়েছেন। ১৯৩৪ জুলাই ৩১-এ—সীতানাথ দে, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল এবং পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের পাঁচিল টপ্‌কে চম্পট দেন। হরিপদ সেই বিকালেই বালিগঞ্জ রেল-ষ্টেশনের কাছে ধরা পড়েন। পূর্ণানন্দ ১৯৩৫ জানুয়ারী ২০-এ টিটাগড়ে এবং নিরঞ্জন আরও বেশ কিছুদিন পরে গ্রেপ্তার হন। সীতানাথকে রায়-দান পর্য্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া গেল না। জেল হতে পলায়নের অপরাধে তাঁর স্বতন্ত্র সাজা হয়েছিল।

নানা স্থানে বাস করবার সময় অদ্ভুতভাবে যোগাযোগ সংস্থাপিত হয়েছিল। জিতেন দাশগুপ্ত বক্সা ক্যাম্প থেকে, পরেশ গুহ ফরিদপুরের অন্তরীণ আবাস থেকে এবং প্রভাত আসানসোল থেকে রওয়ানা দিয়ে কলিকাতায় এসে জুটেছিলেন। জাল যেরকম ছড়ানো হয়েছিল, ফল সে-তুলনায় কিছুই হয়নি। উপরন্তু অনেকগুলি "ধুরন্ধর" একসঙ্গে দীর্ঘকালের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত হয়েছিলেন।

জিতেন্দ্রনাথ দে মজুমদারকে এই মামলায় প্রচুর খোঁজাখুঁজি হয়েছিল, কিন্তু পাওয়া যায়নি। কুমিল্লা গৌরীপুর ডাক-লুঠের মামলায় স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে, ১৯৩৪ মার্চ ৭-ই, তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। ১৯৩৪ জুলাই ২৪-এ প্রদত্ত রায়ে হাইকোর্ট সেটা সমর্থন করে।

বিমল ভট্টাচার্য্যর 'শিব ঠাকুর লেন অস্ত্র-আবিষ্কার মামলা'য় ১৯৩২ ডিসেম্বর ৩০-এ চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। বর্ত্তমান সাজাটা উপরন্তু বলে ধরা যায়।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট (কলিকাতা)

প্রকাণ্ড দলবল নিয়ে কলিকাতার পুলিশ ১৯৩৩ মে ২২-এ কর্ণওয়ালিশ (বিধান সরণী) ষ্ট্রীট-এর খানকয়েক বাড়ী একসঙ্গে ঘেরাও করে ফেলে ভোর ৪-টা

থেকে ; ১৩৬।৩-বি নং বাড়ীটা উদ্দেশ্য করে পাশের বাড়ী ১৩৬।৪-এ নং বাড়ীর ওপর উঠে যায়। তখন প্রথম বাড়ীর ছাদে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে কয়েকজন লোক গোপনে আছে বুঝে এক ইন্‌স্পেক্টর দ্বিতল বাড়ীর ছাদ থেকে ঐ বাড়ীটায় আসেন। ব্যাপারটা বোঝবার জন্য তিনি একটা জানলার ফাঁক দিয়ে ভিতরের অবস্থাটা দেখবার চেষ্টা করেন। হঠাৎ ভিতর থেকে জানলা খুলে যায় এবং রিভলভারের একটা গুলি ছুটে যায়।

তখন দু'পক্ষেই গুলি-বিনিময় চলতে থাকে। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি দরজা সামান্য ফাঁক করে বেরিয়ে, বারান্দার খুঁটি-সাহায্যে পাশের বাড়ীর ছাদে গিয়ে পড়লে, সেখানেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ লোকরা মাঝে মাঝে গুলি চালাতে থাকেন। পুলিশ তখন কেবল আত্মরক্ষা করে চলেছে, আর ঘরের ভিতর এলোপাথাড়ি গুলি করছে। ভোরের আলোর সঙ্গে তিন ব্যক্তি যুদ্ধ-বিরতির সঙ্কেত দিলে, বিনা বাধায় পুলিশ সকলকেই গ্রেপ্তার করে।

এর মধ্যে প্রধান হচ্ছেন দীনেশচন্দ্র মজুমদার। বর্ত্তমান বিবরণ শেষ করবার আগে তাঁর অন্য একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। টেগার্ট-হত্যা-প্রচেষ্টায়, ১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ১৮-ই, তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছিল। দণ্ডিত আসামী কড়া পাহারার মেদিনীপুর জেলে বন্দী। ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৮।১৯ রাত্রে তিনি জেল থেকে পলায়নে সক্ষম হন। নানা স্থানে পলাতক জীবন কাটিয়ে, ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে আশ্রয়গ্রহণ করেন।

সেখানের পুলিশ সংবাদ পায় যে, কয়েকটি বাঙ্গালী যুবক তাদের এলাকায় বাসা বেঁধে আছে। পুলিশ-কমিশনার কুঁই (Quinn) ১৯৩৩ মার্চ ৯-ই সাইকেল করে গুপ্ত আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হন। সদর দরজায় এক যুবক বসে ছিলেন, পুলিশের আবির্ভাব দেখে তিনি ত্বরিতে বাড়ীর ভিতর চলে যান এবং অনতিকাল-মধ্যেই তীরবেগে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। একজন হোঁচট খেয়ে সেখানে পড়েন এবং গ্রেপ্তার হন।

দু'জনে রাস্তায় পড়ে প্রাণপণে দৌড়তে থাকেন। সামনে এক যুবক বাধা দিতে গেলে, বুলেটের আঘাতে ধরাশায়ী হন। ঘটনাস্থল থেকে কুঁই সাইকেল চড়ে ফিরলেন যে-রাস্তায় পলাতকদের পালাবার সম্ভাবনা। বেশ কিছুদূর গিয়ে তিনি দু'জন পথচারীকে গজ-দশেক অতিক্রম ক'রে গিয়ে, সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালেন তাঁদের পরিচয় জানবার জন্য। যখন খুব কাছে এসে পড়েছেন তখন একজন হঠাৎ রিভলভার বার করে একেবারে গায়ের কাছে এসে গুলি ছোটালেন। কমিশনার-সাহেব সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে লুটিয়ে পড়লেন। ঘণ্টা-কয়েক মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে তিনি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন।

এই দলের মধ্যে দীনেশ ছিলেন প্রধান। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দীনেশ কলিকাতায় বাসা পেলেন। এখানে অপর তিন সঙ্গী সমেত ধরা পড়লেন। এবার আর নিস্তার নেই। চার আসামী খাড়া করে আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে ১৯৩৩ অক্টোবর ৫-ই বিচার আরম্ভ হ'ল। অক্টোবর ১০-ই রায় প্রদত্ত হয়। তাতে দীনেশের ফাঁসি আর সঙ্গী নলিনীমোহন ঘোষ ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। অপর অভিযোগের সঙ্গে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামীর জেল থেকে পলায়ন ও পুলিশ-হত্যা-প্রচেষ্টার অপরাধে দীনেশের ফাঁসির আদেশ হয়; অপর দু'জন "রক্ষা" পান।

আপীল করা হয়েছিল হাইকোর্টে। ১৯৩৪ জানুয়ারী ১৫-ই সেটা নাকচ হয়। ১৯৩৪ জুন ৯-ই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দীনেশের ফাঁসি হয়।

আসামী নলিনী ঘোষ হিজলী ক্যাম্প থেকে পলায়ন করেন এবং বাইরে এসেই অপর বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট-হত্যা (মেদিনীপুর)

খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট-হত্যার এটি তৃতীয় পর্ব্ব। পেডি ও ডগ্‌লাস-এর কথা বলা হয়ে গেছে। এবার শিকার হচ্ছেন—বার্জ্জ (B. E. J. Burge), যিনি মেদিনীপুর জেলার ভার নেন, ১৯৩২ মে।

আতঙ্কবশতঃ বার্জ্জ বাঙলোর বাইরে বিশেষ ঘোরাফেরা করতেন না; কিন্তু ফুটবল-খেলার বাতিক ছিল খুব। ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে জেলার নানা স্থানে বার্জ্জ-এর অত্যাচারের কাহিনী লোকমুখে চলতো। অনূর্দ্ধ বিশবছর বয়সের একদল যুবক বার্জ্জ-এর কৃতকর্ম্মের 'পুরস্কার' দেবার জন্য উদ্যোগী হলেন।

ছোট্ট দল, বড় করে করবার কোনও উপায় ছিল না। জন-দুই কলিকাতায় এসে রিভলভার-ছোড়া শিখে গেলেন। মাঝে মাঝে এসে সেখান থেকে রিভলভার সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন। কয়েক মাসের চেষ্টায় গোটা-পাঁচেক রিভলভার সংগ্রহ করা গিয়েছিল।

এইবার বার্জ্জ-হত্যার পালা। ১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ২-রা একটা ফুটবল-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বার্জ্জ-এর অংশগ্রহণ করার কথা। খবরটা সংগৃহীত হবার পর উদ্দেশ্য-সাধনের পন্থা স্থির করবার জন্য ষড়যন্ত্রকারীর দল এক গোপন স্থানে মিলিত হন। ঘটনার দিন পূর্ব্বনির্দ্ধারিত অবস্থায় মাঠের ধারে যে-যার নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত আর অনাথবন্ধু পাঁজা মাঠে নেমে একটা বল নিয়ে খেলা করতে লাগলেন; শিকারের ওপর লক্ষ্য স্থির রইল।

বার্জ্জ এলেন তাঁর মোটরে; সঙ্গে দুই দেহরক্ষী। আগে থেকেই অনেক

পুলিশ মাঠে মোতায়েন আছে। মোটর থেকে নেমে বার্জ্জ মাঠের মধ্যিখানে চললেন। মৃগেন আর অনাথ বল গড়াতে গড়াতে বার্জ্জ-এর খুব কাছে এসে পড়লেন এবং কাল-বিলম্ব না করেই রিভলভার ছোটালেন ; একজনের সংখ্যা পাঁচ আর দ্বিতীয়জনের তিন। অব্যর্থ সন্ধান ; সব-ক'টা বুলেট-ই বার্জ্জের দেহের মধ্যে স্থানলাভ করে। নিমেষমাত্রেই তিনি মাটীতে লুটিয়ে পড়েন।

মৃগেনের ঘাড়ের ওপর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার মধ্যেই মৃগেন রিভলভার ছুটিয়েছেন ; কারও গায়ে সেটা লাগেনি। দল বেঁধে আততায়ীকে ধরাশায়ী করে ফেলা হ'ল। নির্ম্মম আঘাতে মৃগেন জর্জ্জরিত হলেন। মারের প্রচণ্ডতা বোঝা গেল যখন হাসপাতালে নেবার পর সকাল সাড়ে-আটটায় মৃগেন দেহত্যাগ করেন।

অনাথের বেলায় অতটা হাঙ্গামা হয়নি। রিজার্ভ-পুলিশ গুলি করে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল খাড়া হলে, এগারো-জন আসামীকে এজলাসে হাজির করা হ'ল। ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ১০-ই রায় প্রকাশিত হয় ; অসম্ভব ঘটনা ঃ চারজন বিচারে মুক্তিলাভ করেন।

(১) রামকৃষ্ণ রায়,

(২) নির্ম্মলজীবন ঘোষ

এবং (৩) ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুদণ্ড ;

আর, (১) সনাতন রায়, (২) নন্দদুলাল সিংহ, (৩) কামাখ্যা ঘোষ ও (৪) সুকুমার সেনগুপ্তর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

হাইকোর্টে আপীলের ফলাফল জানা গেল—১৯৩৪ আগষ্ট ৩০-এ। প্রত্যেক দণ্ডই বহাল রেখে দেওয়া হয়।

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে অক্টোবর ২৫-এ ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণর ফাঁসি হয় ; তার পরদিন, ২৬-এ—হয় নির্ম্মলজীবনের।

অনশন করার অপরাধে ঢাকা জেলে সুকুমারের বিশ-ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়। এটা সম্পূর্ণ 'ফাউ' !

বার্জ্জ-হত্যার 'শ্রাদ্ধ অনেক দুর গড়িয়েছে'। বহু চেষ্টায় এক আসামীর সন্ধান করতে পারা যায়নি। পরে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলে, ষড়যন্ত্রকারী বলে মামলা করা হয়েছিল। তরুণ বয়স এবং মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সে।

১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ২১-এ শান্তিগোপাল সেনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। অপর আসামীদের আপীলের ফলাফল দেখে, শান্তি আর আপীল করেননি।

ইটাখোলা (শ্রীহট্ট)

হবিগঞ্জের ইটাখোলা পোষ্ট-অফিসের পিয়ন, ১৯৩৩ মার্চ ১৩-ই, মেল-ব্যাগ নিয়ে রেল-ষ্টেশনে যাচ্ছিলেন, বেলা ৫-৩০ নাগাদ। গ্রীষ্মকালের বিকাল, তখনও বেশ বেলা রয়েছে। পিয়ন লোক্যাল-বোর্ড অফিসের কাছে গেছেন—এমন সময় একজন একটা বোতল হাতে নিয়ে, এসে উপস্থিত। মিনিটখানেক বাদে দ্বিতীয় ব্যক্তি এসেই পিয়নকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

পিয়ন মাটীতে পড়ে যান ; সেই সময় আরও চারজন লোক এসে পিয়নকে একটা ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে এবং মেল-ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। হৈ-হল্লা শুনে আশপাশের লোক পলাতকদের পিছে ধাওয়া করে। লুণ্ঠনকারীদের একজন পিছু ফিরে রিভলভার ছোড়েন এবং তাতে এক রেলকর্ম্মী মারা যান।

নিরস্ত না হয়ে, গ্রামবাসীরা অনুসরণ করতে থাকে এবং মাইলখানেক রাস্তা অতিক্রম করে ছ'জনকে ধরে ফেলে।

সব-ক'জনকে আসামী করে ১৯৩৩ জুলাই ২২-এ স্থানীয় জেলের মধ্যে দায়রায় মামলা উঠলো। নিয়মিত সাক্ষী-সাবুদ শুরু হয়—নভেম্বর ২১-এ ; পরিসমাপ্তি হয়—১৯৩৪ জুলাই ১৬-ই। কিন্তু জজ ও জুরি ভিন্নমত হওয়ায়, বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত রায়ের জন্য নথিপত্র হাইকোর্টে প্রেরিত হয়। ১৯৩৫ মে ২৪-এ হাইকোর্টের রায়ে—

(১) অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুদণ্ড, আর

(২) বিরাজমোহন দেব, (৩) বিদ্যাধর সাহা ও (৪) গৌরমোহন দাস—প্রত্যেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।.

আসামীদের বয়স যথাক্রমে ১৮, ১৬, ২০ ও ১৮ বছর।

বয়সের বিচার করে অসিতের প্রাণভিক্ষা করে আসামের লাটের কাছে আবেদন করা হয়। ১৯৩৪ জুন ২৬-এ সেটা না-মঞ্জুর হলে, শ্রীহট্ট জেলের মধ্যে অজস্র পুলিশ মোতায়েন অবস্থায় জুলাই ২-রা অসিতের ফাঁসি হয়।

অন্ত্যেষ্টির জন্য আত্মীয়রা মৃতদেহ চেয়ে বিফল হন।

হিলি (দিনাজপুর)

আবার ডাক-ছিন্‌তাই ; এবার হিলিতে। ১৯৩৩ অক্টোবর ২৮, ভোর ২-১৭ মিনিটের সময় পিয়ন কালীচরণ মাহালি দার্জ্জিলিং মেল-ট্রেন থেকে হিলি আর বালুরঘাটের ব্যাগ নিচ্ছিলেন। এমন সময় জন-তেরো যুবক মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে পিয়নকে আক্রমণ করেন। বাধা পেতেই, একজন পিয়নকে গুলিদ্বারা গুরুতরভাবে আঘাত করেন। পিয়নকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনলেও, জীবনরক্ষা করা

সম্ভব হয়নি ; মারা যান—অক্টোবর ২৯-এ। উপরন্তু, ষ্টেশনমাষ্টারের লোহার সিন্দুক ভেঙ্গে ফেলা হয়। সব মিলিয়ে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে পড়ে—২,৯০০ টাকার নোট, দুটো ইন্‌সিওর-খামের মধ্যে ৪০০ টাকা এবং আরও দুটো ইন্‌সিওর-করা খাম।

ধরপাকড় চলতে লাগলো। শেষপর্য্যন্ত বারোজন আসামীকে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের এজলাসে হাজির করা হয়। অভিযোগঃ ১৯৩৩ অক্টোবর ২৪ থেকে ২৮-এর মধ্যে ডাকাতির ষড়যন্ত্র এবং ডাকাতির চেষ্টায় নরহত্যা।

মামলার শুরুতে আসামী (১) অলোকরঞ্জন দাস, (২) শশধর সরকার ও (৩) লালু পাণ্ডে অপরাধ কবুল করলে, ১৯৩৪ জানুয়ারী ৩-রা প্রথম দু'জনের প্রত্যেকের পাঁচ বছর এবং তৃতীয় ব্যক্তির সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

অপর আসামী সম্পর্কে ট্রাইবিউন্যাল রায় দেয়—১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ২৭-এ এবং হাইকোর্টে আপীলের রায়—সেপ্টেম্বর ৬-ই। দুই বিচারালয়ের রায়ে আসামীদের দণ্ডের পার্থক্য নিম্নের তালিকায় দেওয়া হচ্ছেঃ

	ট্রাইবিউন্যাল ২৭. ২. ৩৪	হাইকোর্ট ৬. ৯. ৩৪
প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী	মৃত্যু	যাঃ দ্বীঃ
হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য	"	"
সরোজকুমার বসু	"	১০ বঃ সঃ
সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী	"	"
প্রফুল্লকুমার সান্যাল	যাঃ দ্বীঃ	"
আবদুল কাদের চৌধুরী	"	"
কিরণচন্দ্র দে	"	৫ বঃ সঃ
হরিপদ বসু	১০ বঃ সঃ	৭ বঃ সঃ
রামকৃষ্ণ সরকার (মণ্ডল)	"	"

প্রধান আসামী প্রাণকৃষ্ণর-ই (ওরফে সুরেশচন্দ্র দাস) অস্ত্র-আইনে ১৯৩২ নভেম্বর ২-রা সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। কিন্তু এক জেল থেকে ভিন্ন জেলে নিয়ে যাবার সময়, তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে তিনি পলায়নে সমর্থ হন।

সত্যব্রতকে রাজসাহীতে লিউক-হত্যা-প্রচেষ্টার অপরাধে খোঁজাখুঁজি চলছিল। এযাবৎ তিনি সকল ফাঁদ এড়িয়ে চলেছেন।

'হিলি মামলা' সম্পর্কে বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর খোঁজ হচ্ছিল খুব জোর। কোথাও না পেয়ে, তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়ে যায় এবং পলাতক দাগী আসামী (proclaimed offender) বলে পুলিশ-গেজেটে নাম প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৪ জুন ২৯-এ বিজয়কে

ঢাকা সহরের লক্ষ্মীবাজারে একটা বাড়ী থেকে এক মহিলা ও তিনটি শিশুসন্তান সমেত বেরিয়ে, নদীর দিকে যেতে দেখা যায়। যখন সেখান থেকে ফিরছেন সেই সময়ে পুলিশ পাকড়াও করে।

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে, ১৯৩৪ ডিসেম্বর ৪-ঠা, বিজয়ের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৩৫ মে ১৭-ই হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

বাঁকুড়া ঃ গঙ্গাজলঘাটি— ১৯৩৩ মে ২৪-এ, পোষ্টমাষ্টার দুপুরে মেল-ব্যাগ গঙ্গাজলঘাটি থেকে বাঁকুড়া পাঠাবার কাজ শেষ করে পিয়নের কাছে বুঝিয়ে দিলেন। ছোটচৌকী বলে জায়গাটায় এসে পিয়ন লক্ষ্য করেন দু'জন যুবক কিছুদূরে রাস্তার ধারে যেন কিসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। কাছাকাছি আসতেই তাঁরা পিয়নের পিছে পিছে চলতে থাকেন, ব্যাগটা ছিনিয়ে নেবার জন্য। রিভলভার ছোড়া হ'ল একবার পিয়নকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে। পিয়ন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে, আক্রমণ-কারীরা এসে ধরে ফেলেন এবং সাহেবসিঙ্গীর বাঁধের কাছে রাস্তা থেকে পিয়নকে তাঁরা টেনে নিয়ে যান। বল্লমের সঙ্গে থলি-বাঁধার দড়িটা খুলে নিয়ে, পিছমোড়া করে পিয়নকে বেঁধে, মুখের মধ্যে খানিকটা ন্যাকড়া গুঁজে দেওয়া হয়। তখন ব্যাগটা খুলে মালপত্র নিয়ে দু'জনে সরে পড়েন।

সপ্তাহ-দুয়ের মধ্যে আসামীরা ধরা পড়েন। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৪ এপ্রিল ৩০-এ মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিমল সরকার—উভয়ের পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৩৫ জানুয়ারী ২২-এ, হাইকোর্ট আসামীদের আপীল প্রত্যাখ্যান করে।

ঢাকা ঃ শিবালয়— সাধারণ ঘোড়ার-গাড়ীতে ১৯৩৩ জুন ১৩-ই শিবালয় ডাকঘর থেকে মাণিকগঞ্জে ডাক চলেছে। আসামীরা সাইকেল চড়ে গাড়ীর পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে, ফলসাটিয়া পুলের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গাড়ীখানা সেখানে আসতেই, দু'জন রিভলভার দেখিয়ে গাড়ী থামান এবং নিমেষের মধ্যে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজ নিজ সাইকেল চড়ে উধাও হন।

পথচারীরা পিছু ছুটতে লাগলো। তাদের হাতে সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ একটা পাঁচ-নলা রিভলভার সমেত ধরা পড়লেন। দিন-সাতেকের মধ্যে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার ; রায় প্রদত্ত হয়—১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ৭-ই।

(১) সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ, (২) যাদবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, (৩) ভূপেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী, (৪) রবীন্দ্রনাথ দাস ও (৫) খগেন্দ্রকুমার সরকার—প্রত্যেকের সাত ও পাঁচ বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৪ মে ১০-ই হাইকোর্ট পাইকারী হারে আপীল নাকচ করে।

ময়মনসিংহ ঃ কিশোরগঞ্জ— মুন্সীগঞ্জ বাহাদুরাবাদে ১৯৩১ মে ১-লা সীতানাথ শীলের বাড়ী ডাকাতি হয়। চীৎকারে গ্রামের লোক এসে পড়ে এবং আক্রমণকারীদের অনুসরণ করতে গিয়ে ডাকাতদের গুলিতে একজন গ্রামবাসী প্রাণ হারান।

আসামীরা গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলেছেন বহুদিন ; পরে ১৯৩৩ সালে ধরা পড়লে, ঢাকা (মুন্সীগঞ্জ)-য় স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে বিচারের জন্য খাড়া করা হয়। ইতিমধ্যে এক আসামী হাজতেই মারা যান। দ্বিতীয় আসামী মুকুন্দমুরারি পালের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়—১৯৩৩ জুলাই ৫-ই। দণ্ড-সমর্থনের জন্য হাইকোর্টে পাঠালে, সেপ্টেম্বর ১২-ই সেটা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পরিণত হয়।

চট্টগ্রাম ঃ বোয়ালখালি— পলাতক বিপ্লবীরা যাতে কোথাও আশ্রয় না পান, তার জন্য আশ্রয়দাতার গুরু শাস্তির ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৩ জানুয়ারী ৮-ই বোয়ালখালির এক গৃহস্থবাড়ীতে হানা দিয়ে পলাতক দীপ্তিমেধা চক্রবর্ত্তীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

আশ্রয়দানের অপরাধে জুলাই ৩১-এ স্বর্ণসীতা দেবী, তাঁর পুত্র মণীন্দ্র শর্ম্মা ও সতীশচন্দ্র দে—প্রত্যেকের চার বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ পটুয়াটোলা— মারাত্মক বিস্ফোরক সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা ; কিছুটা হস্তগত হতে, ৭।১।১-এ নং পটুয়াটোলার ১৪-সংখ্যক ঘরে জমা হয়েছে। ১৯৩৩ মার্চ ১৬-ই পুলিশ ঐ ঘরে তল্লাসী চালিয়ে, ৭৮-টা ডাইনামাইট-ষ্টিক্ (stick) আবিষ্কার করে। ঘরটিতে থাকেন মায়া দেবী। তল্লাসীর জন্য পুলিশ প্রস্তুত, এমন সময় দাশরথি হালদার এসে দরজায় ঘা মারেন ; পাশেই দাঁড়িয়ে পুলিশ। তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।

বামাল পাবার পর দু'জনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গের মামলা হয়। মে ২৫-এ স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেককে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

এ মামলার জের চলেছে আরও কিছুদিন ধরে এবং ফলস্বরূপ 'ঝরিয়া ষড়যন্ত্র মামলা'র উদ্ভব হয়।

ডাইনামাইট-সংগ্রহের পিছনে আর কারা আছে, পুলিশ সন্ধান করতে থাকে, এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করে। শেষপর্য্যন্ত তিনজন আসামী খাড়া করে ষড়যন্ত্র ও বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গের মামলা রুজু করা হয়। ১৯৩৩ ডিসেম্বর ৪-ঠা মামলা আরম্ভ হয়ে, রায় প্রদত্ত হয়—১৯৩৪ জানুয়ারী ৫-ই।

(১) প্রমথনাথ ঘোষ, (২) ভবেশচন্দ্র হাজরা ও (৩) জ্যোতির্ম্ময় রায়— প্রত্যেকের সাত বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

শাস্তির পরিমাণ—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ঃ ১ ; ১২ বছর দ্বীপান্তর ঃ ৫ ; ১০ বছর দ্বীপান্তর ঃ ৩ ; পাঁচ বছর দ্বীপান্তর ঃ ৪ ; চার বছর সশ্রম ঃ ৬ ; তিন বছর সশ্রম ঃ ৫ ; মুক্তি ঃ ২ ; এবং কয়েদ-অবস্থায় মৃত্যু ঃ ২ ।

১৯৩৩ আগষ্ট ৩-রা হাইকোর্টে আপীলের রায় প্রদত্ত হয়। তাতে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু সাজা তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে তিন আসামীর এবং দু'বছরের হয় একজনের ; বাকী সব পড়েন এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা মুক্তির পর বন্দী-তালিকায় ।

চট্টগ্রাম ঃ ফতেহাবাদ— স্কুলের প্রধানশিক্ষক ১৯৩৩ জুন ৫-ই পোষ্ট-অফিস থেকে যখন বাড়ী ফিরছেন তখন তাঁর মাথার ওপর প্রচণ্ড জোরে ঘা-কয়েক (কাগজে লাইন-টানা) রুলের আঘাত পড়ে। ছাতা দিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা বিফল হয় ; তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটীতে পড়ে যান। জ্ঞান হলে, দেখেন তাঁর বাঁ-কান কেটে দেওয়া হয়েছে ।

কারণ হিসাবে বলেন যে, জ্যোৎস্না নন্দীর মামলায় তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় এই কাণ্ড ঘটেছে। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ১৯৩৩ আগষ্ট ২৮-এ আসামী সুধীর রায়চৌধুরীর ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। ১৯৩৪ জানুয়ারী ২৮-এ হাইকোর্ট সুধীরের আপীল অগ্রাহ্য করে ।

নলডাঙ্গা (রংপুর)

বিপ্লব-সংক্রান্ত কাজের জন্য ডাকাতির ষড়যন্ত্র এবং ১৯৩৩ অক্টোবর ২০-এ রংপুর সাদুল্লা থানার নলডাঙ্গা গ্রামে ভবানীপ্রসাদ তালুকদারের বাড়ীতে ডাকাতির অভিযোগে এক ষড়যন্ত্র মামলা স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে চলে। ১৯৩৪ জানুয়ারী ৮-ই রায় প্রকাশিত হয় ।

মাত্র একজনের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। বাকী ক'জনের মধ্যে—

(১) হেমচন্দ্র বক্সীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ;

(২) সতীশচন্দ্র বসু রায়, (৩) জ্ঞানগোবিন্দ গুপ্ত ও (৪) ষোড়শীমোহন মৈত্র—প্রত্যেকের দশ বছর ;

(৫) শচীন্দ্রনাথ নন্দীর সাত বছর ;

(৬) হরিদাস সাহা, (৭) ফণীন্দ্রনাথ উকিল ও (৮) ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—প্রত্যেকের ছ'বছর ; এবং

(৯) আব্দুল রসিদের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় ।

হাইকোর্টে আপীলের ১৯৩৪ নভেম্বর ২৬-এ প্রকাশিত রায়ে সকলেরই দণ্ড

বহাল থাকে। কেবল আব্দুলের পাঁচ বছরটা হ্রাস পেয়ে, তিন বছর হয়; আর যাঁর দু'বছর সাজা হয়েছিল, তাঁর মুক্তি ঘটে।

'দ্বিতীয় নলডাঙ্গা ষড়যন্ত্র মামলা' হয়—১৯৩৪-৩৫ সালে।

কুড়িগ্রাম (রংপুর)

১৯৩৩ অক্টোবর ২৪-এ কুড়িগ্রাম থেকে লালমণির-হাটের ট্রেন ছাড়বার কিছু পরেই আক্রমণকারীরা রিভলভার ও ছোরা দেখিয়ে যাত্রীদের যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে দিতে বলেন। একজনের কাছে পাওয়া যায় ৪২৪ টাকা ও দ্বিতীয় এক যাত্রীর কাছে মাত্র ৩ টাকা; আর একজন পয়সার থলি জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেন।

কুড়িগ্রাম আর টোগরাই-হাটের মধ্যে ডাকাতরা গাড়ীর চেন টেনে দিয়ে নেমে পড়ার চেষ্টা করেন। গাড়ী থামেনি। তখন চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ মেরে পড়ে ডাকাতরা ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড রোডের রাস্তা ধরে ছুটতে থাকেন। রাস্তাটা রেল-লাইনের সমান্তরাল, সুতরাং ট্রেনের যাত্রীরা সবই দেখতে পাচ্ছে আর ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার করে চলেছে। ও-ধারে পথচারীরা পিছু ধাওয়া করতে থাকে। তখন এক পলায়মান ডাকাত পিছু ফিরে গুলি চালান। কারও অবশ্য লাগেনি।

এই সময় দলটি দু'ভাগ হয়ে যায়। একদল কোনও গৃহস্থের বাড়ী প্রবেশের সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। আর, দু'জনকে পরে কুড়িগ্রামে স্ব স্ব বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারের রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩৪ জানুয়ারী ৮-ই :

(১) কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছর ও আরও দশ বছর সমকালীনভোগ;
(২) নরেন্দ্রনাথ দাস, (৩) রাজমোহন করঞ্জিয়া—প্রত্যেকের আট বছর;
(৪) কৃষ্ণমোহন সেন (লালু)-এর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯৩৪ মে ২-রা হাইকোর্ট সব আসামীর আপীল নাকচ করে।

কলিকাতা : শিয়ালদহ, কড়েয়া প্রভৃতি স্থানে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা টাকা আদায়ের জন্য চিঠি দিতেন। না-দিলে যে বিপদ, সে-কথার উল্লেখ থাকতো।

পর পর তিনজনকে চিঠি দেবার পর, প্রথম দফার ৩৫০ টাকা আদায় হয়। দ্বিতীয় স্থানে যৎসামান্য মেলে; কিন্তু ভবিষ্যতে বেশী টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

পুলিশ-তদন্তে প্রকাশ পায়, এই অর্থ দিয়ে তাঁরা রিভলভার প্রভৃতি কেনা, সঙ্গে চট্টগ্রাম স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ১৯৩৪ মে ২৮-এ প্রদত্ত রায়ে—(১) রমেশচন্দ্র দাস, (২) মহম্মদ ইব্রাহিম (ওরফে তারাপদ) ও (৩) মহম্মর সালাউদ্দিন—প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

রমেশ আত্মপক্ষ-সমর্থনের ব্যবস্থা করেননি; হাইকোর্টে আপীলও নয়। অপর দু'জনের আপীল ১৯৩৫ জানুয়ারী ২৯-এ হাইকোর্ট নাকচ করে দেয়।

বিহার: রাঁচি— বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গে মলয় ব্রহ্মচারীর আট বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

চট্টগ্রাম: বিদগ্রাম— ভরত দত্তর বাড়ী ১৯৩৩ ডিসেম্বর ১৩-ই পুলিশ ঘেরাও করে। ভরতকে তাড়াহুড়ো করাতে, তিনি মণীন্দ্র দত্তকে এনে পুলিশের সামনে হাজির করান। কিছু পরে ঝুল-মাখা অবস্থায় কালীকুমার দে পুলিশের কাছে হাজির হন।

সেদিন ঐ পর্য্যন্ত। ঠিক পরের দিন তন্ন তন্ন তল্লাসী করায়, খড়ের চালের মধ্যে থেকে একটা রিভলভার, অন্য আর এক স্থান থেকে পাঁচটা তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। ধলঘাট থানায় তার পরদিন ভরতকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দিয়ে, মণীন্দ্র আর কালীকুমার (কালীকিঙ্কর)-এর বিরুদ্ধে মামলা জুড়ে দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৪ জুন ৩০-এ কালীকুমারের সাত ও তিন বছর পর-পর (consecutive)—মোট দশ বছর আর মণীন্দ্রের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। সেপ্টেম্বর ১৩-ই হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

এইবার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর ঘটনার কথা বলা যাক:

কলিকাতা: শিয়ালদহর জনবহুল অঞ্চলে অস্ত্রের হাত-ফেরত হ'ত। ১৯৩৩ জানুয়ারী ৩০-এ অমূল্যচরণ দাসকে একটা পাঁচ-নলা রিভলভার ও ৪৩-টা কার্ত্তুজ-সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। এগুলি তিনি রাজাবাজার ট্রাম-ডিপোর কাছে বিক্রীর জন্য আসেন। ক্রেতা হচ্ছে ছদ্মবেশধারী পুলিশ। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ১৯৩৩ মার্চ ২২-এ আসামীর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্ট আগষ্ট ১-লা আপীল নাকচ করে।

ঢাকা: আটপাড়া ডাকাতি সম্পর্কে অনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তীর, ১৯৩৩ জানুয়ারী ৩০-এ, পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কোন্নগর: পারুলিবাগান রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে পিয়ার আলি সেখ, রহমান মল্লিক ও আফসার খাঁ—প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ফরিদপুর: ডাকাতি ও অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে হরবন্ধু মজুমদারের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়—১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১২ তারিখে।

বরিশাল: শিঙ্গা— বাখরগঞ্জ 'শিঙ্গা ডাকাতি'তে অংশগ্রহণ করায় ননীগোপাল দাশগুপ্তর ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ২১-এ দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

চট্টগ্রাম: অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে ১৯৩৩ মার্চ ২৭-এ তিন বছর এবং পলাতকদের আশ্রয়দানের অপরাধে জ্যোৎস্নাময় নন্দীর জুলাই ১৭-ই পুনরায় ছ'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ময়মনসিংহ ঃ কেওটখালি— কয়েকজন যুবক এক জনবিরল স্থানে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। পুলিশ সন্ধান পেয়ে, ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১২-ই গোপনে পিছু নিয়ে গিয়ে দেখতে পায় সেখানে রিভলভার-সাহায্যে টার্গেট (লক্ষ্যভেদ) প্র্যাক্‌টিস হচ্ছে। কালবিলম্ব না-করে পুলিশ চার যুবককে গ্রেপ্তার করে। শীতল মল্লচৌধুরী জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একটা রিভলভার জলে ফেলে দেন। সেটা পুলিশের নজর এড়ায়নি ; পাঁক ঘেঁটে রিভলভার উদ্ধার করা হয়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে দু'জনের নামে মামলা হ'ল। ১৯৩৩ মে ১৬-ই শীতলের তিন বছর ও পাঁচ বছর সমকালীনভোগ এবং সঙ্গীটির তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

শীতল আর আপীল করলেন না। দ্বিতীয় আসামী আগষ্ট ১০-ই হাইকোর্টের রায়ে মুক্তিলাভ করেন।

বগুড়া ঃ সাভার— ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করতেন। তিনি সাভারে নিজ বাড়ী বসে কিছু মালপত্র সংগ্রহ করেন এবং বগুড়া পার্শেল-অফিসে নিজ নামে বাক্সটা পাঠান। যখন পেটি খালাস করতে গেছেন তখন সন্দেহ-বশে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করে। সদুত্তর না পেয়ে, পার্শেল খুলে ফেলা হয়। তার মধ্যে পুরাতন ধরনের একটা পাঁচ-নলা রিভলভার, কিছু বারুদ, সীসা-নির্ম্মিত কয়েকটি বুলেট, পারকসন ক্যাপ্ (percussion cap) এবং কয়েকটা ছোরা দেখতে পাওয়া যায়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৩ মার্চ ১৪-ই, ধীরেনের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জুন ১২-ই হাইকোর্ট তাঁর আপীল বাতিল করে।

কলিকাতা ঃ বৌবাজার— এ অঞ্চলটার ওপর পুলিশ খুব তীক্ষ্ণ নজর রাখতো। ১৯৩৩ মে ৮-ই পোর্ট-পুলিশ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ— বিভূতি পোর্ট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে বিক্রী করেন। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৩ জুন ২৬-এ তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

ময়মনসিংহ ঃ চান্দেওকাণ্ড— এখানের বোর্ড-স্কুলের ডাকাতির অপরাধে ১৯৩৩ মার্চ ১৬-ই দীনেশচন্দ্র দাসের সাত।ও ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়ার অভিযোগে হট্টু সেখ, হাকিম সেখ, আব্বাস আলি, আব্দুল মজিদ, মণিরুদ্দিন—এই ক'জন প্রত্যেকের তিন বছর হিসাবে কারাদণ্ড হয়।

যশোর ঃ ফরিদপুর 'পপুলার ব্যাঙ্ক'-এর বন্দুকটা ১৯৩৩ জানুয়ারী ২৫-এ থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ।

ফেব্রুয়ারীতে যশোরে তিনজন লোককে সন্দেহজনকভাবে চলতে দেখে পুলিশ পিছু নেয়। তাঁদের মধ্যে অমূল্যকুমার মিত্র একজন।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে অমূল্য একটা বন্দুকের বাঁট জলে ফেলে দেন। ধরা-পড়ার পর দেখা গেল বন্দুকের নলটা দেহের সঙ্গে সরাসরি লম্বা করে একটা কাপড়ের ফালি দিয়ে জড়ানো রয়েছে, আর দেহের ওপরটা একটা চাদর দিয়ে ঢাকা।

চোরাই-মাল-রাখা আর অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৩৩ মার্চ ২০-এ তাঁর ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। হাইকোর্ট জুন ৫-ই 'তথাস্তু' বলে শেষ করে।

কলিকাতা ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে কালীপদ ভট্টাচার্য্যর ১৯৩৩ মার্চ ৩০-এ চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ছ'বছর কঠোর দণ্ড হয়।

বাঁকুড়া ঃ বৌলতলী— বাজারের কাছ দিয়ে, ১৯৩৩ আগষ্ট ৪-ঠা, সুধাংশুভূষণ দাশগুপ্ত আপন-মনে চলেছেন ; সন্দেহক্রমে এক হাবিলদার দু'-চারটা প্রশ্ন করার সঙ্গেই গ্রেপ্তার করেন। তল্লাসী করে তাঁর কাছ থেকে একটা রিভলভার, পাঁচটা তাজা ও একটা ব্যবহৃত কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। সুধাংশুর মতে, হাবিলদার জোর করে তাঁকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যান, আর যা পাওয়া গেছে, সেটা পুলিশের সম্পত্তি,—তাঁর ঘাড়ে দোষ-চাপানো।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৩৪ এপ্রিল ১৯-এ তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। ১৯৩৫ জানুয়ারী ১০-ই হাইকোর্টে আপীলে দণ্ডাদেশ বহাল থাকে।

বহরমপুর ঃ নিষিদ্ধ-অস্ত্র-সমেত ধরা পড়ার জন্য সূর্য্য সরকারের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়—১৯৩৩ এপ্রিল ২০-এ।

কলিকাতা ঃ শ্যামবাজার— একটা ছদ্মনামে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস ৬০-নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট বাসার তিনতলায় থাকতেন ; সেখান থেকে ১৯৩৩ এপ্রিল ২০-এ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। যখন বাসাটায় তল্লাসী চলছে, রাত্রি ১২-৩০, তখন পাশের টালির ছাদের ওপর একটা কিছু পড়ার শব্দ হয়। খোঁজ করে একটা বাণ্ডিল পাওয়া গেল, তার মধ্যে চারটে-টোটা-ভরা একটা রিভলভার আর দশটা কার্ত্তুজ ছিল।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৩ জুন ৬-ই আসামীর ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ডিসেম্বর ১২-ই হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

একটু পূর্ব্ব-ইতিহাস বলা মন্দ নয়। 'সালদা ডাকাতি মামলা'য় প্রাপ্ত দণ্ড ১৯৩২ মে ৬-ই হাইকোর্ট কর্ত্তৃক মকুব হয়। অর্ডিনান্স-বলে তাঁকে সঙ্গে-সঙ্গেই বহরমপুর-ক্যাম্পে ঠেলা হয়। আগষ্ট মাসে সেখান থেকে পলায়নে কৃতকার্য্য হয়ে, শ্যামবাজারে জুটেছিলেন। এবার আর নিষ্কৃতি ঘটেনি।

মেদিনীপুর ঃ বেলদা রেল-ষ্টেশনে অস্ত্র-সমেত ধরা পড়ার অপরাধে ভূপালচন্দ্র পাণ্ডার ১৯৩৩ মে ৫-ই পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ঢাকা ঃ সূত্রাপুর— ১৯৩২ সালে বহরমপুর-ক্যাম্প ; ১৯৩৩ মে ১৬-ই ঢাকার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ৫৭-নং নর্থ (উত্তর) মৈশূণ্ডীতে বাস করবার এক হুকুম ধরিয়ে দেওয়া হয়। সপ্তাহে একদিন থানায় হাজিরা দেবার আদেশ থাকে। ১৯৩৪ জুন ২৬-এ তিনি আস্তানা ছেড়ে উধাও হন। নারায়ণগঞ্জের এক সিনেমা-হল্ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে, জুলাই ১৭-ই তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য খাড়া করা হয়। বিনা সংবাদে নির্দ্দিষ্ট সীমানা পার হওয়া এবং পুলিশের অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে কথা-বলা হ'ল অভিযোগ।

আসামী অপরাধ স্বীকার করেন। ১৯৩৪ আগষ্ট ৪-ঠা স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ২০-এ হাইকোর্ট তাঁর আপীল ডিস্মিস্ করে।

বর্দ্ধমান ঃ ফরিদপুর— প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার ফরিদপুর গ্রামে ১৯৩১ জুলাই থেকে অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। ১৯৩২ জানুয়ারী ৯-ই তিনি সে-স্থান পরিত্যাগ করেন। শেষপর্য্যন্ত, জানুয়ারী ১৪-ই কলিকাতার ১৪-নং আহিরীটোলা ফার্ষ্ট লেনে পুলিশ গিয়ে হাজির হয়। প্রভাতের দেখা পাওয়া গেল না, তবে সংবাদ পাওয়া গেল—প্রভাত ১১-নং শীতলা লেনে চলে গেছেন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ সেখানে হাজির হয়ে বাড়ীওয়ালাকে বলে যে, প্রভাতকে যেন খবর দেওয়া হয়, তাঁর দেশ থেকে লোক এসেছে। খবর পেয়ে, প্রভাত একটা হ্যারিকেন-লণ্ঠন নিয়ে নেমে আসতে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচারে ১৯৩৩ মে ১৮-ই প্রভাতের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। জুলাই ৩১-এ হাইকোর্ট প্রভাতের আপীল নাকচ করে দেয়।

চট্টগ্রাম ঃ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ছবি-সমেত ছোট একটা পত্রিকা ক্ষীরোদবন্ধু সেন 'টিকটিকি' পুলিশ-ইন্সপেক্টারের বাড়ী ফেলেছিলেন। উদ্দেশ্য যে ঠিক কি, সেটা বোঝা শক্ত। আরও গুরু অপরাধ সেইসঙ্গে যোগ হয়। তাঁর কাছ থেকে ২২-টা তামার নল আবিষ্কৃত হয়। এর সাহায্যে ডাইনামাইট-বিস্ফোরণের সুবিধা হয়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৩ মে তাঁর চার বছর ও ছ'মাস সমকালীন-ভোগ দণ্ডাদেশ হয়।

ঢাকা ঃ ডাকাতির ষড়যন্ত্র, ডাকাতি প্রভৃতির অভিযোগে, হাইকোর্টের বিচারে জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্ত ও ললিতচন্দ্র মণ্ডলের ১৯৩৩ মে ৩০-এ পাঁচ বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ময়মনসিংহ ঃ ডাকাতির অভিযোগে ১৯৩৩ মে ৩০-এ অবনীকুমার বল-এর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

বরিশাল ঃ বেলদাখাঁ— বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর ডাকাতি সম্পর্কে রমেন্দ্রনাথ গুপ্তকে ১৯৩৩ জুন ১৮-ই স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ব্যবস্থা করেন।

কলিকাতা ঃ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে কয়েকদিন লক্ষ্য রাখবার পর, ১৯৩৩ জুন ২৯-এ, একটা রিভলভার-সমেত সরোজভূষণ রায় ও আর-এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেপ্টেম্বর ২-রা সরোজের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় ; দ্বিতীয় আসামী মুক্তিলাভ করেন।

ময়মনসিংহ ঃ 'কমলপুর ডাকাতি মামলা'র নিষ্পত্তি হয়েছিল ১৯৩৩ এপ্রিল ১৯-এ। তাতে বেশ কয়েকজনের দীর্ঘ-মেয়াদী দণ্ড হয়। তারপরে পলাতক মহেন্দ্র দে-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। নিষিদ্ধ অস্ত্র রাখার জন্য মামলা হয়। জুলাই ৫-ই তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

ময়মনসিংহ ঃ কুলিয়ারচর— ছায়াসুটি-তে অস্ত্র-চুরির অভিযোগে ১৯৩৩ জুলাই ৬-ই উপেন্দ্রনাথ সাহার চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ইতিমধ্যে 'হেলোচিয়া ডাকাতি'র অভিযোগে উপেনের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মামলা জড়ানো ছিল। ঐ মামলায় আগষ্ট ২৮-এ তাঁর আবার চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। দণ্ড-দুটি সমকালীনভোগ।

ফরিদপুর ঃ বিজয়পুর— পরশুরাম (বিজয়পুর)-এ ডাকাতি সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়—১৯৩৩ জুলাই ১৭-ই।

রাজসাহী ঃ রাজসাহী, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ঢাকা, যশোহর ও মেদিনীপুর জেলার পনেরোজন যুবককে গ্রেপ্তার করে এক ষড়যন্ত্র মামলা স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে রুজু করা হয়। ১৯৩৩ জুলাই ২১-এ প্রদত্ত রায়ে সব আসামীই দণ্ডিত হন। মাত্র একজন মুক্তি পেয়েছিলেন। দু'জন রায়ের দিনটায় আদালত-কক্ষে আটক, আর বারোজন তিন মাস থেকে দু'বছর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

সাজার গুরুত্বে অনেকগুলি কর্ম্মী আবদ্ধ হয়ে পড়ায় বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপে অসুবিধা ঘটে।

ত্রিপুরা ঃ সাদাকপুর— এখানে একটা ডাকাতি সম্পর্কে রাধিকা চৌধুরীর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ ভবানীপুর— মহিলা-কলেজ (Diocesan)-এর হোষ্টেল। ১৯৩৩ আগষ্ট ১-লা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছে নালিশ করা হয়—এক ছাত্রীর ১২ টাকা চুরি গেছে। কতক মেয়ে ধরে পড়লো অধিবাসিনীদের তল্পিতল্পা সার্চ্চ করা হোক। বেশ চাপ দেওয়ার পর কাজ শুরু হয়। টাকার কথা ভুল হয়ে গেল। ফোর্থ-ইয়ার ক্লাশের ছাত্রী জ্যোতিকণা দত্তর হেপাজতে দুটো ছ'ঘরা রিভলভার, দুটো পিস্তল আর ৫৩-টা কার্ত্তুজ পাওয়া গেল।

বিচার শীঘ্র সম্পন্ন হ'ল। ১৯৩৩ অক্টোবর ২৫-এ আসামীর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা : বৈঠকখানা রোড— নিরীহ সংসারী মানুষের মতো ১৯৩৩ আগষ্ট ১৭-ই সুরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত বাজারের থলিতে শাকসব্‌জি নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ ওৎ পেতে ছিল। বমাল ধরে তল্লাসীতে একটি সাত-ঘরা রিভলভার ও ১৩-টি তাজা কার্তুজ ধরা পড়ে। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট অক্টোবর ১১-ই আসামীর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

কলিকাতা : গ্রে ষ্ট্রীট (অরবিন্দ সরণী)— পুলিশ ১৯৩৩ আগষ্ট ২৯-এ, ভোর ৫-টায় ১২৪-নং গ্রে ষ্ট্রীটের তিনতলায় উঠে যায়। সেখানে একটা সুটকেসের মধ্যে তিনটে নারকেল-বোমা, দু'বোতল বিস্ফোরক-তৈরীর এ্যাসিড, তিন প্যাকেট পটাসিয়াম নাইট্রেট, খানিকটা গন্ধক, কাঠকয়লা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে, নভেম্বর ২৮-এ, (১) হরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও (৩) ভবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৪ মে ২৩-এ হাইকোর্ট আসামীদের আপীল নাকচ করে।

কলিকাতা : কর্পোরেশন ষ্ট্রীট— আগলপাশা (ঢাকা) ও ধেনুয়াবাড়ী (বরিশাল) ডাকাতিতে দুর্দ্দান্ত সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় সুরেন্দ্রনাথ সরখেলের কার্য্যক্রম দেখলে। প্রথমে কলিকাতার হিন্দুস্থান-বিল্ডিং থেকে তাঁকে টোটা-ভরা রিভলভার সমেত গ্রেপ্তার করা হয় এবং চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ১৯৩৩ অক্টোবর ১৭-ই তাঁর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

এর আগে দুটি ঘটনা সম্পাদন করে এসেছেন ; তার একটি হচ্ছে 'ঢাকা আগলপাশা ডাকাতি'। তাতে ১৯৩৪ মার্চ ২৮-এ দশ বছর এবং 'বরিশাল ধেনুয়াবাড়ী ডাকাতি' সম্পর্কে ১৯৩৫ মার্চ ১৮-ই সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তা'ছাড়া জেল-আইন-ভঙ্গে "শাকের আঁটি" আর-একবছর জোটে।

এটি সমকালীনভোগ পর্য্যায়ে পড়েছে কিনা, খবর পাওয়া যায়নি। দশ বছরের কম যে নয়, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

কলিকাতা : মলঙ্গা— বেপারিটোলা লেনে ১৯৩৩ আগষ্ট ১৯-এ একটা রিক্সা থেকে পুলিশ সুধীন্দ্রমোহন রায়কে গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছে একটা ছ'ঘরা নিকেল্-পালিশ রিভলভার পাওয়া যায়। বিচারে অক্টোবর ২১-এ তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ঢাকা : শিখসাহেব— পুলিশ তল্লাসী করবার জন্য সমন বার করে নিয়ে, ১৬-নং শিখসাহেব বাজার (লালবাগ)-এ নগেন্দ্রচন্দ্র দাসের বাড়ী হাজির হয়, ১৯৩৩ আগষ্ট ২৩-এ। একটা সুটকেসের মধ্যে পাওয়া গেল রাইফেলের তাজা কার্তুজ

২০-টা, দুটো ব্যবহৃত কার্ত্তুজ, দো-নলা গাদা-বন্দুকের দুটো ব্যারেল বা নল, বড় ৯-ইঞ্চি-লম্বা একটা উকো, ইত্যাদি।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে অক্টোবর ১০-ই নগেনের পাঁচ ও তিন বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ১২-ই হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

কুষ্ঠিয়া : নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর কাছে একটা রিভলভার পাওয়া গেলে, বিচারে ১৯৩৩ আগষ্ট ৪-ঠা তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

কলিকাতা : ভবানীপুর— চড়কডাঙ্গার মোড়ে ১৯৩৩ নভেম্বর ২২-এ পুলিশ অজয়চন্দ্র সিংহকে গ্রেপ্তার করে। তল্লাসীতে একটা রিভলভার ও কয়েকটা কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে তাঁর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৪ আগষ্ট ২০-এ হাইকোর্ট পূর্ব্বদণ্ড সমর্থন করে।

মেদিনীপুর : তমলুক— ডাকাতির অপরাধে তমলুকের গোবিন্দচন্দ্র বেরার চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বাঁকুড়া : ডাকাতি এবং বিভিন্ন অপরাধে দিবাকর দত্তর চার বছর, এক বছর ও ছ'মাস সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

কলিকাতা : নিমতলা— ২-নং নিমতলা লেন বাড়ী ১৯৩৩ আগষ্ট ৩১-এ খানাতল্লাসী করে ২০৯-টি ছড়ি (stick)-ডাইনামাইট, গেলিগ্নাইট, তিন রোল (বাণ্ডিল) সেফ্‌টি-ফিউজ (safety-fuse), ১১৮-টি ডিটোনেটর প্রভৃতি আবিষ্কৃত হ'ল।

তিনজন আসামী নিয়ে বিচার। নভেম্বর ২৩-এ রায় প্রকাশিত হয়। দু'জন মুক্তি পান; যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আপীল হলে, পুনর্বিবচারের জন্য নিম্ন-আদালতে মামলা ফেরত আসে। তার ফলে, ১৯৩৪ মার্চ ২২-এ দণ্ড হ্রাস হয়ে সাড়ে ছ'বছরে পরিণত হয়।

কলিকাতা : মাণিকতলা— নানা ঠিকানায় বাস করার জন্য রাধাবল্লভ গোপকে ধরার অসুবিধা হচ্ছিল। অবশেষে ১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ২-রা পুলিশ তাঁকে ১৭-নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার করে ২২-নং হরলাল দাস লেন হয়ে, প্রথমে ৩১-নং টেগোর ক্যাস্‌ল্ ষ্ট্রীটে ও পরে ৩৩।১-নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটে নিয়ে হাজির করে। ধরা-পড়ার দিনই ভোর ৫-টায় প্রথম আড্ডার দোতলা তন্ন তন্ন করে তল্লাসী হয়ে গেছে। সেখান থেকে কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য, কার্ত্তুজ প্রভৃতি মেলে। ঐদিনই দ্বিতীয় আস্তানায় কয়েকটা রিভলভার, বিস্তর টোটা ও বিস্ফোরক-প্রস্তুতের নানা উপকরণ আবিষ্কৃত হয়।

অপরাধ এক, আসামীও এক; মালপত্র দু'জায়গা থেকে উদ্ধার হয়েছে—মামলা আরম্ভ হ'ল দুটি। প্রথম, অর্থাৎ টেগোর ক্যাস্‌ল্ ষ্ট্রীটের মামলায় স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট

নির্ব্বাচিত হলেন। আসামী তিনজনের মধ্যে দু'জন মুক্তি পান। রাধাবল্লভের, নভেম্বর ২৫-এ, সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

দ্বিতীয় মামলায় (প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটের) চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটকে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট করা হয় (বেশী সাজা দেবার সুবিধার জন্য)। নভেম্বর ৩০-এ আসামীর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। পূর্ব্বদণ্ডের মেয়াদ-অন্তে দ্বিতীয় দণ্ডের শুরু (consecutive)—অর্থাৎ মোট চোদ্দ বছর।

দু'মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীলে, ১৯৩৪ জুন ৭-ই, দণ্ডের পরিমাণ বজায় থেকে যায়।

কলিকাতা ঃ ফরিদপুরের এক ছাত্র সুধীরকুমার সমাদ্দার ১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ১৩-ই (স্যার) আর. এন্. মুখার্জ্জীর দ্বারোয়ানের কাছে ১৫,000 টাকা চেয়ে এক চিঠি রেখে যায়। শেষদিকটায় লেখা ছিল ঃ "Obediently yours, Sons of Bengal", পরে নাম।

দু'দিন বাদে লোক গিয়ে টাকা আনবার কথা। সকাল ৭-টায় আসামী গিয়ে হাজির, আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার। হস্তাক্ষর-বিশারদের মতে, চিঠিখানি আসামীর নিজ হাতেই লেখা। নামটি ছিল "রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; শান্তিপুর, নদীয়া"।

অভিযোগ ঃ মৃত্যুভয়-প্রদর্শন ("criminal intimidation to cause death")। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৩ নভেম্বর ১৫-ই সুধীরের ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। ১৯৩৪ মে ৩০-এ হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

ময়মনসিংহ ঃ গাঙ্গাইলপাড়া— গাঙ্গাইলপাড়ায় ১৯৩২ জুলাই ১৬-ই এক ডাকাতি হয়। সে-সম্পর্কে জন-দশেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। প্রফুল্লচন্দ্র ভৌমিককে সে-সময় পাওয়া যায়নি ; ধরা পড়ে ১৯৩৩ অক্টোবর ১৪-ই তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

চট্টগ্রাম ঃ হাবিলাস দ্বীপ— 'মাষ্টার-দা'র দুঃসাহসিক সৈনিকদলের মধ্যে শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী ছিলেন অন্যতম। পাহাড়তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে শান্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপর থেকে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে। 'মাষ্টার-দা'র সঙ্গে শান্তির যোগাযোগ ছিল অক্ষুন্ন। ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই যখন গৈরালায় 'মাষ্টার-দা' ধরা পড়েন, শান্তি 'কর্ডন' ভেদ করে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন— এতটা ছিল সাহস, এতটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

পরে ১৯৩৩ নভেম্বর ২৯-এ, ভোর সাড়ে ৫-টায় হাবিলাস দ্বীপে রমণী চৌধুরীর বাড়ী পুলিশ ঘেরাও করে তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালায়, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। হঠাৎ পুলিশ আবিষ্কার করে একটা ঘরের আড়ার তলার ছাউনি (ceiling)-র মধ্যে একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে। মই (বাঁশের সিঁড়ি) লাগিয়ে সেখানে উঠতে কেউ সাহস

করলে না। নিচে থেকেই দেখা গেল একটি যুবক ওপর থেকে একটা পিস্তল দেখাচ্ছে। তাঁকে নেমে আসতে বলে কোন ফল হ'ল না। তখন রাইফেল থেকে গুলি ছুড়ে ভয় দেখাবার চেষ্টাও হ'ল। সাড়া-শব্দ নেই। অতঃপর বাড়ীর পাশেই এক গাছে উঠে বলা হ'ল যে, আত্মসমর্পণ না-করলে, চাল ফুঁড়ে গুলি চালানো হবে, আর বাড়ীতে আগুন লাগানো হবে।

তখন দু'জনের কাছ থেকে আত্মসমর্পণের সঙ্কেত পাওয়া গেল—এবং বলে দেওয়া হ'ল, তাঁদের কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তখন আড়াতে তল্লাসী করা হয়। ফলে, একটা বালি-ভরা হাঁড়ির মধ্যে একটা অটোমেটিক পিস্তল ও সাতটা তাজা কার্তুজ পাওয়া যায়।

বিচারে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩৪ জুন ২৮-এ, শান্তির অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে সাত, ষড়যন্ত্রের অপরাধে তিন, আর সরকারী-ঘোষণা (notification)-উপেক্ষায় ছ'মাস সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

সঙ্গী নেপাল (ওরফে ত্রিপুণ্ড্র)-নারায়ণ দস্তিদার (বয়স ১৫ বছর)-এর তিন বছর বোর্স্ট্যাল স্কুলে বাস ঘটে।

১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ১-লা হাইকোর্ট শান্তির আপীল অগ্রাহ্য করে।

মেদিনীপুর ঃ বঙ্গীয় সন্ত্রাস-দমন-আইনে কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের ১৯৩৩ নভেম্বর ৩০-এ তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

রংপুর ঃ নবাবগঞ্জ— 'কালীধন লজ'-এ ১৯৩২ জুন ২৬-এ একটা সিঁধেল-চুরি হয়, আর তাতে একটা গাদা-বন্দুক ও কিছু কার্তুজ চুরি যায়। নীলফামারিতে একটা বাড়ীতে খানাতল্লাসী হয়—১৯৩৩ ডিসেম্বর ৪ঠা এবং বিমলারঞ্জন দে ভৌমিকের ঘর থেকে বন্দুকটাকে পাওয়া যায়। গভীর মাটীর তলায় ভেসেলিন মাখিয়ে, তার ওপর অয়েল-ক্লথ মুড়ে পুঁতে রাখা হয়েছিল। তার ওপর একটা মাচা করে বসবার ব্যবস্থা করা ছিল।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৪ মার্চ ১২-ই বিমলারঞ্জনের পাঁচ ও এক বছর (পারম্পরিক) সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। মে ১০-ই, হাইকোর্ট অক্ষুণ্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

চট্টগ্রাম ঃ কানুনগো-পাড়া— যত্র-তত্র খানাতল্লাসী চলছে,—১৯৩৩ অক্টোবর ৩০-এ কানুনগো-পাড়ার কয়েকটা বাড়ী ঘেরাও হয়ে পড়লো। একটা বাড়ীতে যখন জোর তল্লাসী চলছে তখন পুলিশের লোক টের পায়, কে-যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাবার চেষ্টা করছেন। থামতে বলা সত্ত্বেও তিনি নিরস্ত হলেন না। তখন বন্দুক থেকে গুলির আঘাতে পড়ে যাওয়ায়, গ্রেপ্তার করা হ'ল।

ঘরের ভিতর আড়ায় উঠলে দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে চালি (ceiling)

তৈরী করে বাস করার ব্যবস্থা রয়েছে। একটা পাটি, আর তার ওপর একটা কাঁথা বিছানো আছে। তার ওপর টোটা-ভরা একটা পিস্তল আর পাঁচটা-কার্তুজ-আঁটা একটা বেল্ট পড়ে আছে।

ধৃত সুশীলচন্দ্র দে-র ১৯৩৪ আগষ্ট ১৩-ই স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সাত বছর ও আরও দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদত্ত হয়। সেপ্টেম্বর ৬-ই হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

কলিকাতা ঃ দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড ও লোয়াব সার্কুলার (আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু) রোডের সংযোগস্থলে অজিতকুমার মিত্র তাঁর সাইকেলের ওপরই ধরা পড়েন। কার্ডবোর্ড-বাক্সে ভরা একটা রিভলভার আর ১০-টা কার্তুজ সঙ্গে ছিল।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৪ জানুয়ারী ৩১-এ তাঁর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। জুলাই ৬-ই হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

চব্বিশ-পরগণা ঃ বনগাঁ— নিষিদ্ধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে বনগাঁর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৩ ডিসেম্বর ১৪-ই প্রভাসচন্দ্র রায়কে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন। ১৯৩৪ মে ২১-এ হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

বীরভূম ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় রায়ের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ গোপ লেন— ১৯৩৩ ডিসেম্বর ২০-এ, বিজয়কুমার পাল ও সুধাংশুকুমার কর যখন গোপ লেন আর ইসমাইল ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে পৌঁছেচেন তখন পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তল্লাসীর সময় একটা পাঁচ-ঘরা রিভলভার আর এগারোটা কার্তুজ পাওয়া যায়। বিচারে প্রত্যেকের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

মরণ-যজ্ঞ

হরিপদ বাগচি ঃ রাজসাহীতে ডাক-লুঠ হ'ল ১৯৩০ সেপ্টেম্বর ৪-ঠা, আর সে-সম্পর্কে হরিপদ বাগচিকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা খাড়া করলেও, উপযুক্ত প্রমাণাভাবে সেটি প্রত্যাহার করতে হয়—১৯৩০ সেপ্টেম্বর ১৮-ই। তখন হরিপদকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে বন্দী করার আদেশ বেরুলো—১৯৩১ জুন ১২-ই। আগষ্ট ৪-ঠা তিনি বক্সা-ক্যাম্পে প্রেরিত হন। সেখানে স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে এবং ব্যাধিটা যক্ষ্মা বলেই সন্দেহ হয়।

এ-অবস্থায় তাঁকে ঠেলে দেউলী-ক্যাম্পে পাঠিয়ে সরকার তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছিল। সেখানে এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্-এর জন্য আজমীর ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু নিউমোনিয়া (বা, সকল মিলিয়ে সরকারী আক্রোশ) এসে তাঁকে ১৯৩৩ আগষ্ট ২২-এ সকল যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়।

ধীরেন দে ঃ ময়মনসিংহ জামালপুর-এর বাড়ীতে দু'দিন ধরে ধীরেন দে-কে

কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে ১৯৩৩ আগষ্ট ২৩-এ গভর্ণমেণ্ট-স্কুলের খেলার মাঠে সমস্ত দেহে বুলেট-বিদ্ধ অবস্থায় তাঁর শব আবিষ্কৃত হ'ল।

মৃতের পিতা গভর্ণমেণ্টকে এক পত্রে মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য লিখলেন। তাঁর বক্তব্য, হত্যা সাধিত হয়েছে সহরের এক নির্জ্জন প্রান্তে এবং মৃত্যু ঘটেছে বুলেটের আঘাতে। যেখানে শব পাওয়া গেছে আর যেখানে হত্যা সংঘটিত হয়েছে, নিশ্চয়ই সে-স্থান এক নয় এবং কেবল বুলেট দ্বারা মৃত্যু ঘটেনি, অন্য শাণিত অস্ত্রও ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়, মৃতের বস্ত্রে রক্তের কোন দাগ নেই। তিনি নানা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন—এটা বিপ্লবী সঙ্গীদের কাজ নয়, একমাত্র পুলিশ-ই এ-দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

তিনি প্রকাশ্যেই এক আই.বি.-ইন্সপেক্টর ও তাঁর সশস্ত্র দেহরক্ষীকে গুপ্তহত্যার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করেন। বলা বাহুল্য, গভর্ণমেণ্ট থেকে কোন তদন্তই হয়নি।

কৃষ্ণকান্ত দাস ঃ বরিশালের ঝালকাঠির ভারুকাঠি গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড রোডের সন্নিকটে আখ-ক্ষেতের মধ্যে ১৯৩৩ জানুয়ারী ৭-ই এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেল। পুলিশ-সমেত স্থানীয় লোক ঘটনাস্থলে পৌঁছুলে, দেখা গেল, গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে আছেন কৃষ্ণকান্ত দাস; আরও একজন (সুধাংশুদাস মজুমদার) জীবন্মৃত অবস্থায়। ঘটনার চার ঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণকান্তর মৃত্যু ঘটে।

সুধাংশুকে সারিয়ে তুলে, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচার হয়। মে ১-লা আসামীর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

শৈলেশ চট্টোপাধ্যায় ঃ দেউলী-ক্যাম্পের (রাজপুতানা) মরুভূমির উষ্ণ বাতাসে কয়েকটি বন্দীর জীবনান্ত ঘটে; তার মধ্যে শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম।

চট্টগ্রামে বাড়ী; বে-ওয়ারিশ ধরপাকড়ের মধ্যে শৈলেশকে নিয়ে হিজলী-ক্যাম্পে রাখা হয়। তিনি প্রায়ই ম্যালেরিয়া-জ্বরে ভুগতেন, সুতরাং "চেঞ্জ" বা বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠানো হ'ল দেউলীতে, ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ১২-ই। সেখানে ম্যালেরিয়া-জ্বরে প্রাণান্ত অবস্থা। যেখানে কুইনিন চলে না, এমনকি কম্পাউণ্ডারের নিষেধ উপেক্ষা করে ডাক্তার মাত্রাতিরিক্ত কুইনিন ইন্‌জেক্‌শন দেন—এবং স্বল্পকালের মধ্যে সব তাপ নিঃশেষ হয়ে গিয়ে, দেহ হিমশীতল হয়ে যায়।

শৈলেশের পিতৃদেব ছিলেন কুমিল্লায়। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ প্রতিভূ জেলা-শাসক এক তার-যোগে পিতাকে জানান ঃ জেল-হাসপাতালে সন্তানের মৃত্যু হয়েছে—১৯৩৩ অক্টোবর ১৭-ই।

তারাদাস মুখোপাধ্যায় ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগরের তারাদাস মুখোপাধ্যায় বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য ১৯২৬ থেকে দু'বছর বিনা বিচারে বন্দী থাকেন। ১৯৩০ সালে আবার

যখন ঐ একই অবস্থায় ধরা পড়েন এবং বারিপদাতে অন্তরীণ থাকেন—তখন সেখানে পুলিশের অত্যাচারে ১৯৩৩ জুলাই ৫-ই তিনি আত্মহত্যা করেন।

প্রতিশোধ

চট্টগ্রাম ঃ পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা-মহাশয় মাখনলাল দীক্ষিত। খবর ছড়িয়ে পড়ে—'মাষ্টার-দা'র গ্রেপ্তারের জন্য প্রধানতঃ তিনিই দায়ী। এ কাজের প্রতিশোধ নেবার জন্য বিপ্লবীরা তৈরী হলেন। ১৯৩৩ মার্চ ২৬-এ, যখন মাখনলাল সন্ধ্যা ৭-টায় বাইরে থেকে সবে বাড়ী এসে পৌঁছেচেন—সে-সময় দুটি যুবক অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে উপর্য্যুপরি কয়েকটা গুলি ছুটিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান। মাখনের প্রাণহীন দেহ মাটীতে লুটিয়ে পড়ে। যখন বাড়ীর লোক এসে পৌঁছান, ততক্ষণে তাঁর শেষনিঃশ্বাস অনন্তে মিলিয়ে গিয়েছে।

বিরামহীন সংগ্রাম (১৯৩৪)

কিছুটা স্তিমিত হলেও, আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ সমানে চলেছে দু'পক্ষে। ক্ষয়-ক্ষতির অনুপাত সমতা রক্ষা করে চলেছে। অন্য আন্দোলনের অতি ক্ষীণ লক্ষণও নেই। শত্রুর সঙ্গে সশস্ত্র বিরোধই বাঙ্গালী ছেলেদের মন অধিকার করে বসেছে।

বাইরের উপদ্রব না থাকায়, ইংরেজ সরকার কঠোরভাবে বাঙ্গলার বিপ্লব দমন করতে নেমেছে। শাসনের শিখর অধিকার করে বসে আছেন আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের ওপর অবর্ণনীয় নির্য্যাতনের প্রয়োগকর্ত্তা এ্যাণ্ডারসন। কিছু আগে থেকে ভার নিয়ে, সকল আটঘাট বেঁধে তিনি চলেছেন, কিন্তু খুনখারাপি ও বিপজ্জনক কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার ছেলের অভাব হচ্ছে না।

আইনের কড়াকড়ি ও সাজার পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা হ'ল 'বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধিত আইন' (Act VII of 1934) ১৯৩৪ মার্চ ২৯-এ গৃহীত হয়ে। তাতেও যা দাঁড়ায়, সেটা বিবৃত হচ্ছে।

পল্টনের মাঠ (চট্টগ্রাম)

পল্টন-মাঠে ১৯৩৪ জানুয়ারী ৭-ই ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। নানা বয়সের ইয়োরোপীয় মহিলা ও পুরুষের খুব ভিড়। খেলা শেষ হ'ল, জনতা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প করছে।

ইংরেজ পুলিশ-সুপার মাঠ থেকে ক্লাব-ঘরে ফিরলেন; সেখান থেকে মোটরে নিজ বাঙলোয় ফিরছেন প্রায় সাড়ে-পাঁচটার সময়। সামান্য একটু এগিয়ে এসেই তিনি শ্রমিক-বেশী দুই যুবককে ক্লাব-ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পান। তল্লাসী করবার উদ্দেশ্যে গাড়ী থামালেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা বোমা তাঁর কাছে ফাটলো বটে, কিন্তু সাহেব অনাহত রইলেন। পর পর দুটো বোমা এসে পড়লো, কিন্তু ফাটলো না। পুলিশসাহেব নিজেই এসে আততায়ী নিত্যরঞ্জন সেনের সঙ্গে ধবস্তাধবস্তি জুড়েছেন—এমন সময় তাঁর ড্রাইভার নিজের রিভলভার থেকে গুলি ছোড়েন এবং তার আঘাতে নিত্যরঞ্জনের মৃত্যু ঘটে।

হট্টগোল পড়ে গেল। সেই সময় পুলিশসাহেবের গাড়ী আর পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলের ভিড়ের মধ্য থেকে একটি যুবককে পালাতে চেষ্টা করতে দেখা যায়। তাঁকে লক্ষ্য করে দু'বার গুলি ছোড়া হয়। দ্বিতীয় গুলির আঘাতে যুবক হিমাংশু-বিমল চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু ঘটে।

এই দুই নিহত যুবকদের সঙ্গী কৃষ্ণকুমার চৌধুরী ও হরেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা একযোগে ক্লাবের তাঁবু আর টাউন-ইন্সপেক্টরের বাঙলোর মধ্যে বোমা ফেলেন, কিন্তু তাও ফাটে না। কৃষ্ণ তখন রিভলভার চালাতে থাকেন ; কেউ আহত হ'ল না। তখন কৃষ্ণ ও হরেন্দ্রকে সকলে মিলে ধরে ফেলে। দু'জনের বয়স ১৮-১৯ বছরের বেশী নয়।

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে, জানুয়ারী ৩১-এ দু'জনেরই মৃত্যুদণ্ড হয়। হাইকোর্ট দু'জনেরই আপীল নাকচ করে—১৯৩৪ এপ্রিল ১৮-ই।

মেদিনীপুর জেলে জুন ৫-ই দুই বন্ধুর ফাঁসি হয়।

দেওভোগ (ঢাকা)

নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে ১৯৩৪ এপ্রিল ১০-ই একটা বাড়ীর বাইরের দাওয়ায় (বারান্দা) বসে রাত্রি দু'টা পর্য্যন্ত কয়েকজন গল্প করছে। সে-সময় ঝরঝরে পোশাক-পরা, খালি-পাযে কয়েকটি যুবককে তারা সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখতে পায়। গভীর নিশীথে ঐভাবে চলা-ফেরাটা দাওয়ায় উপবিষ্ট লোকদের সন্দেহের উদ্রেক করে। পথচারীদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করবার সময়, একা দাঁড়ালেন সেই গ্রামের মতি মল্লিক। তাঁর সঙ্গীরা সরে পড়তে চেষ্টা করেন।

প্রশ্নের উত্তর হ'লঃ নিমন্ত্রণ খেয়ে তাঁরা বাড়ী ফিরছেন, তাইতে বিলম্ব হয়ে গেছে। টর্চ দিয়ে পরীক্ষা করতে, মতির বগলে একটা পুঁটুলি দেখা গেল। হঠাৎ টান মারতে, তার ভিতর থেকে তিনটে বালাক্লাভা (balaclava cap) ক্যাপ্ মাটীতে পড়ে যায়। সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ায়, গ্রামবাসীরা সকলকে ঘিরে ফেলে। তখন প্রতিপক্ষ রিভলভার থেকে গুলি ছোড়েন। গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষার চেষ্টায় সামান্য অসতর্ক হলে, তিনজন কতকটা পথ পালাতে সক্ষম হন। চারিদিকে হৈচৈ পড়ে যায় এবং অন্যান্য বাড়ী থেকে লোক বেরিয়ে পড়ে ঐ তিনজনকে ধরে ফেলে।

আহত দুই গ্রামবাসীর মধ্যে একজন মারা যায় এবং দ্বিতীয়জনের ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে। ধৃতব্যক্তিদের কল্পনাতীত নির্য্যাতন করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

মতি ও সঙ্গীদের পুলিশের কবলে সমর্পণ করা হ'ল। দুই আসামীর বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের এজলাসে মামলা চলে। অস্ত্র-আইন (১৯৩৪ সালে শাস্তির বৰ্দ্ধিত-গুরুত্ব-সমেত), ষড়যন্ত্র, হত্যা-প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে অভিযোগ। সেপ্টেম্বর ২৭-এ মতির প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সনাক্ত করার গোলযোগে মতির সঙ্গীরা মুক্তিলাভ করেন।

অক্টোবর ১-লা হাইকোর্ট মতির দণ্ড সমর্থন করে।

ডিসেম্বর ১৫-ই ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসির দড়ি মতিলাল মল্লিকের প্রাণ হরণ করে।

বাথুয়া (চট্টগ্রাম)

ফতেহাবাদঃ আসামী-সংখ্যা ও দণ্ডের পরিমাণ বিচার করলে, হাটহাজারি থানার 'বাথুয়া ডাকাতি'র গুরুত্ব খুব বেশী। বড় রকমের ষড়যন্ত্রের ফলে, ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ২৪-এ, প্রসন্নকুমার মালাকার ও ত্রিপুরা মালাকারের বাড়ী রাত্রি নাগাদ দেড়টার সময় বড় রকমের হামলা হ'ল।

ডাকাতরা ঘটনাস্থল থেকে রওনা দিলে, খবর পাওয়া গেল, একটা দল চৌধুরীহাটের দিকে গেছে। কালবিলম্ব না-করে পুলিশ সমস্ত এলাকা ঘিরে ফেলে। পরদিন সকালে প্রিয়দা, মহেশ, মনোমোহন, নীরেন, হরিহর, জীবেন ও শরদিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছে একটা থলির মধ্যে প্রচুর গোলাগুলি, সোনার গহনা প্রভৃতি পাওয়া গেল। আর একটা বাণ্ডিলে অনেকগুলি তাজা কার্ত্তুজ, কয়েকখানা ছোরা ও কয়েকটা টর্চ ছিল।

তারপর বিভিন্ন স্থান থেকে মোক্ষদা, কীর্ত্তি, নগেন ও মনোরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছিল। তার মধ্যে কীর্ত্তিকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। সেই-দিনই সন্ধ্যায় গগন, মণীন্দ্র ও অরবিন্দকে তাঁদের যে-যার বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হয়।

চৌদ্দজন আসামী নিয়ে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার হয়। ১৯৩৪ আগষ্ট ২৭-এ রায় প্রদত্ত হয়েছিল ঃ

(১) প্রিয়দারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, (২) মোক্ষদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, (৩) মহেশচন্দ্র বড়ুয়া, (৪) মনোমোহন সাহা, (৫) গগনচন্দ্র দে, (৬) মণীন্দ্রচন্দ্র দে ও (৭) হরিহর দত্ত—প্রত্যেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ;

(৮) জীবেন্দ্রকুমার দাস ও (৯) শরদিন্দু দত্ত—উভয়ের দশ বছর হিসাবে দ্বীপান্তর ;

(১০) নগেন্দ্রলাল দে, (১১) অরবিন্দ দে ও (১২) নীরেন্দ্রলাল দে—প্রত্যেকের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ;

(১৩) কীর্ত্তি মজুমদার ও (১৪) মনোরঞ্জন চৌধুরী—উভয়ের সাত বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ২৬-এ হাইকোর্ট সব দণ্ডই বহাল রাখে।

মহেশচন্দ্র ১৯৩৮ জানুয়ারীতে রাজসাহী জেলে দেহত্যাগ করেন।

লেবং (দার্জ্জিলিঙ)

সন্ত্রাস-দমনের জন্য বাঙ্গলা সরকার নিত্য নূতন—কঠোর থেকে কঠোরতর আইন পাশ বা অর্ডিনান্স জারি করছে। আয়র্ল্যাণ্ডের বিপ্লবী-দমন-প্রচেষ্টার

প্রধান নায়ক এ্যাণ্ডারসন (John Anderson)-কে বাঙ্গলার লাট করে আনা হ'ল এবং তিনি তাঁর নির্ব্বাচনের সার্থকতা প্রমাণ করছেন—কেবল নির্য্যাতন নয়, দণ্ডের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে।

গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে জনসাধারণ মনে করেছিল বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপ দমিত হয়ে যাবে। কিন্তু কথায় আছেঃ "যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল"। একটি সংক্ষিপ্ত-সংস্করণ তরুণের দল "যত অনিষ্টের মূল" এ্যাণ্ডারসন-কে পৃথিবী থেকে অপসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বাঙ্গলার তরুণদের বোধ হয় দুঃসাহসিকতার সীমা নেই। তাঁরা কালবিলম্ব না-করে কাজে লেগে গেলেন। ধন্য তাঁদের সাহস, ধন্য তাঁদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং সংবাদ-সংগ্রহের কৃতিত্ব! জীবন-যৌবন তাঁদের কাছে রাস্তার খোলামকুচি!

প্রধানতঃ ঢাকা আর কলিকাতায় বসে এ্যাণ্ডারসন-হত্যার ষড়যন্ত্র পাকিয়ে ওঠে। বড় বড় "নাম-করা" বিপ্লবী "নেতা"রা এঁদের মধ্যে স্থান পাননি। জন-আষ্টেক যুবক-যুবতী এতবড় একটা বিরাট কাজে নেমে পড়েছিলেন। লাটকে ঘিরে প্রকাশ্য ও গোপন ভাবে সান্ত্রী-রক্ষী-প্রহরী গিজগিজ করছে। তাঁকে "কায়দা" করতে হলে একটু খোলা-মেলা হাল্‌কা-আল্‌গা অবস্থার প্রয়োজন।

ভেবে ঠিক করা হ'ল—দার্জ্জিলিঙ হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। সেইমত তোড়জোড় চলতে লাগলো। ১৯৩৪ মে মাসে লাট যাচ্ছেন শৈলাবাসে। বিপ্লবীরা একক বা দু'জনে পৌঁছুলেন দার্জ্জিলিঙে। হাতিয়ার সংগ্রহ করে সেখানে দুটি হোটেলে আশ্রয় নিলেন। লাটসাহেব পুষ্প-প্রদর্শনীতে যাবেন, সংবাদটা সংগ্রহ করে, সেখানে "শিকার"-আক্রমণের অসুবিধা বোধ করে নিরস্ত হলেন।

তার দু'-তিনদিন বাদে, মে ৮-ই লাট যাবেন রেস্ দেখতে ঘোড়দৌড়ের মাঠে। আততায়ীরা সুজ্জিত হয়ে, লাটের আসনের ডাইনে ও বাঁয়ে—ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য আর রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি আসন সংগ্রহ করলেন। সবে ঘোড়দৌড় শেষ হয়েছে, লাট একবার উঠে দাঁড়িয়ে যেই বসতে যাচ্ছেন—ভবানী কাছে এসে ৮-৯ ফুট তফাৎ থেকে রিভলভার চালালেন। লাট অক্ষত রইলেন। পাশ থেকে একজন লাফ দিয়ে পড়ে ভবানীকে ভূপাতিত করে। ভবানীকে গুলি ছুড়তে দেখে রবীন লাটের একেবারে সামনে এসে রিভলভার ছোটান, মাত্র ফুট-পাঁচেক তফাৎ থেকে। এবারও সব বিফল হ'ল। পাশ থেকে লোক রবীনকে আক্রমণ করে মাটীতে পেড়ে ফেললো।

ভবানীর সঙ্গে '৩২ মাপের দশটা কার্ত্তুজ পাওয়া যায়; রবীনের কাছে ন'টা। ভবানীর হাতের রিভলভারটায় পাঁচটা কার্ত্তুজ-ঘর ছিল। মাত্র একটা গুলি ছোড়া হয়েছে; একটা আটকে রয়েছে, আর তিনটে ছোড়া হয়নি। রবীনের রিভলভারটা সাত-নলা; ছ'টা কার্ত্তুজ ঠিকই আছে; একটা ছুটেছে।

ধৃত আততায়ীদের পরীক্ষায় দেখা গেল, ভবানীর দেহ চার স্থানে গুলি-বিদ্ধ হয়েছে। রবীনের কপাল ফেটেছে অনেকখানি। নির্য্যাতনের আরও নিদর্শন ছিল।

বিশেষ শ্রমে পুলিশ একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। আসামী মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ভবানীপুরের জাষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র রোড এবং উজ্জ্বলা মজুমদার ১১৬-নং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড থেকে ১৯৩৪ মে ১৮-ই গ্রেপ্তার হন। সুশীল চক্রবর্ত্তী জুলাই ১০-ই মির্জ্জাপুর (সূর্য্য সেন) ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট (নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র সরণী)-এর সংযোগস্থলে, আর সুকুমার ঘোষ গার্ডেনরীচ পাহাড়পুর রোডের ওপর জুলাই ১১-ই ধরা পড়েন। মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরে গ্রেপ্তার করে আসামী-দলভুক্ত করা হয়।

ষড়যন্ত্র, হত্যা-প্রচেষ্টা, মারাত্মক অস্ত্রের অধিকার, অস্ত্র-আইন-ভঙ্গ প্রভৃতি অভিযোগ আনা হয়। স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল বসে আগষ্ট ১৪-ই। সেখানে ভবানীপ্রসাদ বললেন, তাঁর বড় ক্ষোভ যে তিনি লাটকে হত্যা করতে পারলেন না। জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে তিনি নিরপরাধ। উজ্জ্বলা মজুমদার (রক্ষিত রায়) সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন; সহঃ-আসামী মনোরঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্ক জড়িয়ে তাঁকে আসামী করা হয়েছে। লেবং-হত্যা-প্রচেষ্টার সঙ্গে মনোরঞ্জনের সংযোগ আছে তিনি জানতেন না।

সেপ্টেম্বর ১২-ই রায় প্রকাশিত হয় এবং যথারীতি হাইকোর্টে আপীল করা হয়। ১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ৩-রা হাইকোর্ট সব দণ্ডই সমর্থন করে, পরিমাণে সামান্য তারতম্য ক'রে। শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াল ঃ

	ট্রাইবিউন্যাল ১২. ৯. ৩৪	হাইকোর্ট ৩. ১২. ৩৪
ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	মৃত্যু	বহাল
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	"	"
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	"	যাঃ দ্বীঃ
উজ্জ্বলা মজুমদার	যাঃ দ্বীঃ ও ১৪ বঃ সঃ	১৪ বঃ সঃ
মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪ বঃ সঃ	বহাল
সুকুমার ঘোষ	"	"
সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী	১২ বঃ সঃ	"

লাটের কাছে সফল আবেদন করায়, ডিসেম্বর ২৫-এ রবীন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড চোদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে পরিণত হয়। তারপরও চেষ্টা চলতে থাকে এবং কিছুকাল পরেই তিনি ইংল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি লাভ করেন।

১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ৩-রা রাজসাহী জেলে ভবানীপ্রসাদের ফাঁসি হয়।

এ্যাণ্ডারসন-হত্যা-প্রচেষ্টার সঙ্গে আরও দু'জনকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ ঃ বিজন সেনগুপ্ত ও খগেন বসু মল্লিকের হেপাজত থেকে একটি রিভলভার আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩৫ জানুয়ারী ২৩-এ (?) উভয়ের চার বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

তিল্‌নী-কাক্‌না (দিনাজপুর)

দুটো ডাকাতি নিয়ে খুব বড় এক ষড়যন্ত্র মামলা ফাঁদা হয়েছিল। পুলিশের মতে, ১৯৩৩ নভেম্বর থেকে ১৯৩৪ এপ্রিলের মধ্যে ডাকাতি ও অন্যান্য বৈপ্লবিক কর্ম্মকাণ্ড পালন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে, ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই কাক্‌নার মহেন্দ্র সমাদ্দার ও তিল্‌নীর প্রেমচাঁদ দাসের বাড়ী ১৯৩৪ মার্চ ২১-এ ডাকাতি হয়েছিল।

বল্লাতে জুলাই ১৭-ই যে ডাকাতি সংঘটিত হয়, তার সঙ্গে উপরি-উক্ত দুই ঘটনার সংযোগ প্রমাণিত হয়েছিল।

বহু যুবককে গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং তাঁদের দু'দল, অর্থাৎ (১) গোপালপুর-কৈতারা, আর (২) রামচন্দ্রপুর-ভিখাহার—এই দুই দলে বিভক্ত করা হয়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারের রায় ১৯৩৫ মার্চ ১৯-এ প্রকাশিত হয়।

প্রথম দলে আসামী-সংখ্যা আট। তার মধ্যে একজনের সাত, পাঁচজন প্রত্যেকের ছয় এবং দু'জন প্রত্যেকের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। ১৯৩৬ জানুয়ারী ২১-এ হাইকোর্ট নিম্ন-আদালতের রায় কিছু অদল-বদল করে।

(১) হরেন্দ্র দাস (ওরফে চৈতু)-এর সাত বছর ;

(২) উপেন্দ্র মণ্ডল ও (৩) রজনীকান্ত সরকার—প্রত্যেকের ছয় বছর ; এবং

(৪) শোভনের পুত্র—মাতলা সাঁওতালের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড বহাল থাকে।

তিনজন প্রত্যেকের ছ'বছর এবং একজনের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড বাতিল হয়।

দ্বিতীয় ঝাঁকে পাঁচজন প্রত্যেকের দশ বছর এবং তিনজন প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হাইকোর্ট কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়।

দশবছর-দণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচজন ঃ

(১) দীনেশচন্দ্র দাস, (২) প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী, (৩) নিত্যরঞ্জন চৌধুরী, (৪) রমেন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও (৫) কুমুদনাথ ঘোষ ;

প্রত্যেকে সাতবছর-দণ্ডপ্রাপ্ত ঃ

(৬) ধরণী কোচ, (৬) রামের পুত্র—মাতলা সাঁওতাল ও (৭) রেজকা সাঁওতাল।

একসাথে অনেকগুলি কর্ম্মীর দীর্ঘ বন্ধনদশা ঘটে গেল।

এখানেই এর জের মেটেনি। নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে সে-সময় ধরতে পারা যায়নি। এ মামলা ছাড়া, 'বল্লা ডাকাতি'তে তাঁর অংশ ছিল। পরে ধরা-পড়ায় স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৬ মার্চ ২৩-এ, তাঁর দু'দফা দশ বছর দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। আপীলের শুনানিতে জুলাই ২-রা হাইকোর্ট দুটা মিলিয়ে মোট দশ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড করে দেয়।

বল্লা (দিনাজপুর)

বালুরঘাট থানার বল্লা গ্রামে ১৯৩৪ জুলাই ১৩-ই প্রাণবন্ধু চৌধুরীর বাড়ী ডাকাতি হয়। পুলিশের অভিযোগ, এটা ১৯৩৪ জুন ১০ থেকে জুলাই ১৩ তারিখের মধ্যে আসামীদের ষড়যন্ত্রের ফল। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ মাত্র ২৮৪ টাকা।

ডাকাতি, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি মিলিয়ে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলা হয়। ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ১২-ই প্রদত্ত রায়েঃ

(১) ননীগোপাল দাস, (২) অনাথবন্ধু সাহা ও (৩) হরেন্দ্রচন্দ্র দাস—প্রত্যেকের দশ বছর;

(৪) সমরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, (৫) অক্ষয়কুমার চৌধুরী ও (৬) গমির সেখ—প্রত্যেকের ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

দু'জন মুক্তিলাভ করেন।

১৯৩৫ সেপ্টেম্বর ১৯-এ হাইকোর্ট সকলের আপীল নাকচ করে।

গমির সেখ আপীল করেননি। হরেন্দ্র দাসের তিল্‌নী-কাক্‌না মামলায় সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

ঢাকা ঃ কাপাসিয়া— কাপাসিয়া থানার ধুন্দিয়া গ্রামের কয়েকজন যুবক কিছু গোলাগুলি, নেপালী দা প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন, আর তাঁদেরই মধ্যে ইদ্রিস আলি (ইদু) ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কাছে কয়েকটা কার্ত্তুজ এ একখানা বড়-দা জমা দেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও তখনকার মতো ছেড়ে দেয়; কিন্তু ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ৮-ই তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে।

এ-সম্পর্কে মার্চ ১৪-ই পর্য্যন্ত আরও পাঁচ-ছয়জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার মধ্যে একজন রাজসাক্ষী হয়ে মুক্তি পান। বাকী ক'জনের বিচার হয় স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে; রায় প্রদত্ত হয়—জুলাই ১৬-ই।

(১) ইদ্রিস আলি (ইদু), (২) শশীভূষণ দাস, (৩) সুরেন্দ্রমোহন বণিক্য, (৪) মহেন্দ্রচন্দ্র নাথ ও (৫) দেবেন্দ্রনাথ সাহা—প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

এক আসামী ২৫০ টাকার একটি জামিনদার যোগাড় করতে না-পারায়, ন'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

দণ্ডিত পাঁচজনই হাইকোর্টে আপীল করেন। ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ২৬-এ সমস্ত আপীল নাকচ হয়।

দ্বিতীয় স্তবক

তার পরের ঘটনাগুলির মধ্যে কয়েকটির গুরুত্ব নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নয়। গভর্ণমেণ্ট বিফল হয়নি সত্য, কিন্তু বিচলিত হয়েছিল প্রচুর।

পাবনা ঃ বৈপ্লবিক কর্ম্মকাণ্ডের কতটা সহায়তা করেছে বলা খুব কঠিন, কিন্তু পাবনার কার্ত্তিকচন্দ্র সরকারকে বিপ্লবী-দলের তালিকায় দেখতে পাওয়া যায়। অর্থ-আদায় বা বিপ্লবের প্রতাপ বোঝাবার জন্য লোককে ভীতিপ্রদর্শন করার অপরাধে, ১৯৩৪ জানুয়ারী ১০-ই রাজসাহী স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তিনি চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। অনুরূপভাবে, ১৯৩৪ মে ২১-এ মেদিনীপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদত্ত হয়। দণ্ড-দুটি পর পর বিধায়, কার্ত্তিকের মোট কারাবাসকাল বারো বছরে পরিণত হয়।

মেদিনীপুর ঃ সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, কিন্তু তার যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা যাচ্ছে না—অথচ শিবপ্রসাদ পাইন ও ভোলানাথ দে সরকারকে মুক্ত অবস্থায় চলে-ফিরে বেড়াতে দেওয়া পুলিশের অনভিপ্রেত। অতএব জীবিকার্জ্জনের প্রকাশ্য পথ নেই, অর্থাৎ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১১০ ধারা প্রয়োগ করে উভয়ের কাছে ১,০০০ টাকা হিসাবে জামিন চাওয়া হয়। জামিনদার না-পাওয়ায়, পরিবর্ত্তে উভয়ের তিন বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

হাওড়া ঃ অপরিণত বয়স হলেও, হাওড়ার সুধীরচন্দ্র ঘোষ বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে "পাকা" কাজের লোক হয়ে উঠেছেন। বয়স মাত্র আঠারো হলেও, তিনি একজন "চেলা" আবিষ্কার করেন, যাঁর নাম গোলোকচন্দ্র সাধু এবং বয়স মাত্র পনেরো। গোলোকের পিতার ছ'ঘরা রিভলভারটা চুরি যায়—১৯৩৪ আগষ্ট ২০-এ থেকে ২৩-এর মধ্যে।

বহু চেষ্টায় পুলিশ রিভলভারটি উদ্ধার করে। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ২-রা সুধীরচন্দ্রের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

গোলোকচন্দ্রের বয়স কম হওয়ায় কারাদণ্ড হয়নি ; কিন্তু প্রতিটি দশহাজার টাকার দুটি জামিনে জেল-বাস থেকে অব্যাহতি ঘটে।

কলিকাতা ঃ কালীঘাটের কালী লেন থেকে ১৯৩৩ ডিসেম্বর ২২-এ কেশবচন্দ্র সমাদ্দারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কোমরে একফালি-কাপড়ে-জড়ানো অবস্থায় দুটো বোমা বাঁধা ছিল। ১৯৩৪ মার্চ ১৯-এ তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ পার্শীবাগান বস্তিতে পুলিশ সুধীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছে একটা রিভলভার পায়। অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের অপরাধে, ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ২০-এ তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ আহিরীটোলার রাখাল দাস মল্লিকের কাছে নিষিদ্ধ অস্ত্র পাওয়া গেলে, ১৯৩৪ মার্চ ১৬-ই তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ আড়পুলি লেন— বহিরাগত জাহাজের কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ হয় বলে পোর্ট-পুলিশ এ-সময়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে। সন্ধান পেয়ে আড়পুলি লেনে হানা দিয়ে, ১৯৩৪ জানুয়ারী ২৫-এ, পুলিশ ১৪-টা তাজা কার্ত্তুজ পায়, এবং এ-সম্পর্কে রাখালদাস মল্লিক ও কমলাকান্ত শ্রীমানীকে গ্রেপ্তার করে বিচারার্থে চালান দেয়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৪ মার্চ ১৬-ই প্রত্যেককে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

ঢাকা ঃ বিক্রমপুর— ঢাকা কেওটখালির জন-পাঁচেক যুবক জবরদস্তি টাকা-আদায়ের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁরা ১৯৩৪ মার্চ ২০-এ, দেওভোগ হাট থেকে ফেরবার পথে বীরপাড়া গ্রামে তিনজন গরু-ছাগল-ব্যবসায়ীকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করেন।

কত টাকা পাওয়া গিয়েছিল, সেটা ঠিক প্রকাশ পায়নি। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক রায় প্রদত্ত হয়—১৯৩৬ জানুয়ারী ৩০-এ। তাতে একজনের সাত বছর, তিনজন প্রত্যেকের পাঁচ বছর, আর একজনের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে আপীলের রায় প্রদত্ত হয়—জুন ১৬-ই। তাতে রঙ্গলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও অনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তীর পাঁচ বছর হিসাবে দণ্ড বহাল থাকে ; বাকী ক'জন মুক্তি পান।

বরিশাল ঃ আগলপাশা— ঝালকাটি থানার এক গণ্ডগ্রাম আগলপাশা। ১৯৩৩ আগষ্ট ২-রা তিনজন ডাকাতির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে, রাত্রি ১০-টার সময় যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী জল খেতে চাইলে। তারা বাড়ীর ভিতর পদার্পণ করেই রিভলভার দেখিয়ে টাকা বার করে দিতে বলে। বিশেষ সুবিধা হবার আগেই ঘটনার চাপে সরে পড়তে হয়।

ধরপাকড়ের পর তিনজনকে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে হাজির করলে, ১৯৩৪ মার্চ ২৮-এ প্রত্যেকের দশ বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। আসামী সুরেন্দ্রনাথ সরখেল আপীল করেননি। অপর দু'জন করেছিলেন। তার মধ্যে রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দশ বছর দণ্ড বহাল থাকে। তৃতীয় আসামী মুক্তি পান।

সুরেন্দ্রনাথ সরখেলের অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘ-মেয়াদী দণ্ডাদেশ হয়েছিল।

বাঁকুড়া ঃ বাড়ীতে একটা রিভলভার ও কয়েকটা কার্ত্তুজ আবিষ্কৃত হওয়ায়, ১৯৩৪ ডিসেম্বর মাসে বিক্রমপুর থেকে পুলিশ ভবতোষ কর্ম্মকারকে গ্রেপ্তার করে। বিচারালয়ে এপ্রিল ৩-রা ভবতোষের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ঢাকা ঃ নারায়ণগঞ্জ— অনিল মুখোপাধ্যায়কে বারকয়েক আটক-বন্দী করা হয়েছে। ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি নিজ বাড়ীতে সর্ত্তাধীনে আবদ্ধ ছিলেন। হঠাৎ ৭-ই মে থেকে তাঁকে আর পাওয়া গেল না। পরে ৮-ই এপ্রিল, ত্রিপুরার সাহাতলীতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অপরাধ-দমন-মূলক আইনে জুন ১৪-ই তাঁর তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। পরে জেল-আইন-ভঙ্গে, জুন ১৯-এ আর-এক বছর এবং ঐ একই অপরাধে আগষ্ট ৮-ই দণ্ডভোগের কাল আরও একবছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

কলিকাতা ঃ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড— ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ৪-ঠা সকাল পৌনে-আটটা নাগাদ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ও উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীটের সন্নিকটে সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্দেহজনক-ভাবে চলা-ফেরা করতে দেখে পুলিশ কাছে এগিয়ে এলে, সুশীল পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাঁর কাছে একটা রিভলভার এবং বারোটা তাজা কার্ত্তুজ পায়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ১৯৩৪ এপ্রিল ১৬-ই তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জুন ২১-এ হাইকোর্ট তাঁর আপীল নাকচ করে।

ময়মনসিংহ ঃ খলিল সরকার, অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে, ১৯৩৪ এপ্রিল ১৯-এ স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

হাওড়া ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে, বিজয়কৃষ্ণ পাল ১৯৩৪ এপ্রিল ২৭-এ তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কলিকাতা ঃ ফরিদপুর থেকে সুধাংশু করের কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতায় এসেছে। শিয়ালদহের কাছে সন্দেহবশে পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাঁর দেহ-তল্লাসীতে একটা রিভলভার পায়। ১৯৩৪ এপ্রিল ২৪-এ আসামীর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

কলিকাতা ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের অভিযোগে আলিপুর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৪ মে ২৮-এ মহম্মদ সালাউদ্দিনের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

বাঁকুড়া ঃ কাঞ্চনপুর ডাক-লুঠের ব্যাপারে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল-কুমার সরকারের, ১৯৩৪ এপ্রিল ৩০-এ, উভয়ের পাঁচ বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

শিবপুর ঃ শিবপুর থানার ওপর বোমা পড়েছিল ১৯৩৪ মে মাসের প্রথমদিকে। সে-ব্যাপারে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় আর মোহনলাল নাগকে গ্রেপ্তার করা হয়—

মে ৭-ই। অবনীকুমার মুখোপাধ্যায়কে পরে গ্রেপ্তার করে আসামী-তালিকা-ভুক্ত করা হয়। বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গের অভিযোগে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট আগষ্ট ১৫-ই অবনীর ছয় এবং ভোলানাথ ও মোহনলাল প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

ময়মনসিংহ ঃ কুলিয়ারচর— বড়কাসিমপুর (কুলিয়ারচর)-এ ডাকাতি-প্রচেষ্টায়, ১৯৩৪ মে ৩১-এ, আব্দুল আলি (ওরফে সুন্দর আলি)-র তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আসাম ঃ তিনসুকিয়া— ট্রেন থেকে ডাক-লুঠ করবার মতলবে, ১৯৩৪ জুন ১০-ই, বিপুলানন্দ কর চৌধুরী ও রমাকান্ত দাস তিনসুকিয়া গিয়ে তৃতীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরের দিন শচীন্দ্রনাথ দাস কুশির সঙ্গে সকলে 'তিনসুকিয়া মেল' চাপেন ; সঙ্গে একটা রিভলভার ও একটা পিস্তল।

চরালি আর তিনসুকিয়ার মাঝে শিকল টেনে ট্রেন থামিয়ে এবং রিভলভার উঁচিয়ে ডাক-লুঠ হয়। গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়ে ব্যাগটা বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তারপরই গাড়ী থেকে সকলে নেমে, ব্যাগ নিয়ে সে-স্থান দ্রুত পরিত্যাগ করেন।

ঘটনার পরদিনই অন্য এক আসামী (পরে রাজসাক্ষী) আর শচীন্দ্র থানায় হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। বিপুল আর রমাকান্ত পরের দিনই গ্রেপ্তার হন।

দায়রায় মামলা উঠতে, শচীন অপরাধ কবুল করেন এবং সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডভোগের আদেশ পান। খানিকটা মামলা চলবার পর, বিপুল ও রমাকান্ত দোষ স্বীকার করলে, ১৯৩৫ জানুয়ারী ১৬-ই প্রতিজন সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পান।

দোষ স্বীকার করে দণ্ডিত হলেও, বিপুল ও রমাকান্ত হাইকোর্টে আপীল করেছিলেন। ১৯৩৫ সেপ্টেম্বর ১৬-ই হাইকোর্ট দু'জনেরই দণ্ড সমর্থন করে।

শচীন্দ্র আপীলের হাঙ্গামায় আর যাননি।

চট্টগ্রাম ঃ 'বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী'র এজেন্ট বিশ্বম্ভর চৌধুরীর বাড়ী একটা ডাকাতি হয়েছিল—১৯৩৪ জুন ১৩-ই। ডাকাতরা পুলিশের বেশে এসে, বিশ্বম্ভরের বাড়ী পলাতক আসামী আছে এবং তল্লাসী করবার অছিলায় ডাকাতিটি করেন। দায়রা-জজের বিচারে ইন্দ্রকুমার দে-র সাত ও রেবতী চক্রবর্ত্তীর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

হাইকোর্টে আপীল ১৯৩৫ অক্টোবর ৩১-এ নাকচ হয়ে যায়। তখন

রেবতীর বয়স মাত্র ষোলো, সেইজন্য হাইকোর্ট তাঁকে চরিত্র-সংশোধনী জেলে (borstal school) রাখা যায় কিনা, সে-বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য আদেশ দেয়।

কলিকাতা ঃ পার্ক ষ্ট্রীট থানার অন্তর্গত স্যাণ্ডেল ষ্ট্রীটে, ১৯৩৪ এপ্রিল ২৪-এ, ভুবনচন্দ্র দাস (মাইতি)-কে একটা রিভলভার-সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে জুন ২৩-এ তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ঢাকা ঃ পাইকপাড়া (মুন্সীগঞ্জ) কংগ্রেস ক্যাম্পে ১৯৩৩ ডিসেম্বর ৫-ই একটি বোমা ফাটে এবং অষ্টাদশবর্ষীয় মনোরঞ্জন রায়ের বাঁ-হাত গুরুতররূপে জখম হওয়ায়, কেটে বাদ দিতে হয়। "বোঝার ওপর শাকের আঁটি"—স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে, ১৯৩৪ জুন ৩০-এ, তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

দিনাজপুর ঃ পুলিশ সন্দেহ করে—কুলদা চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায়, ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১১০ ধারায় (অর্থাৎ উপজীবিকার প্রকাশ্য-উপায়-হীন) ১৯৩৪ জুলাই ৩-রা তাঁর তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

ঢাকা ঃ ধনদিয়ার শশী মাঝি ও মহেন্দ্রচন্দ্র নাথ-এর অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে, ১৯৩৪ জুলাই ১৬-ই, পাঁচ বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ত্রিপুরা ঃ কান্দিরপাড়ায় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি রাখার অপরাধে, ১৯৩৪ জুলাই ১৭-ই, রূপেন্দ্রলাল দাসের ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ কৃষ্ণ সাহা লেনে, ১৯৩৪ মে ৩-রা, সত্যরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর বাড়ী খানাতল্লাসী হয়। তক্তাপোষের তলা থেকে বোমার দুটো ফাঁকা খোল এবং একটা দিয়াশলাই-বাক্সর মধ্যে দুটো তাজা আর একটা ব্যবহৃত কার্ত্তুজ আবিষ্কৃত হ'ল। ১৯৩৪ আগষ্ট ৪-ঠা স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আসামী ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ১৪-ই হাইকোর্ট আপীল নাকচ করে।

চব্বিশ-পরগণা ঃ বরাহনগর— তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক স্কুলের ছাত্র বিপ্লবীদের সংগৃহীত অস্ত্রাদি গোপনে রাখতো। পুলিশ টের পেয়ে, আলমবাজারে বীণা দেবীর ঘর তল্লাসী করে দুটো স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ও একটা ছ'ঘরা রিভলভার আবিষ্কার করে।

এইসূত্রে আরও খবর পেয়ে, পুলিশ আসামী অশ্বিনীকুমার ঘোষের বাড়ী-সংলগ্ন বাগান থেকে একটা স্বয়ংক্রিয় স্পেনীয় পিস্তল, একটা ছ'ঘরা রিভলভার ও চারটে তাজা কার্ত্তুজ উদ্ধার ফরে।

প্রথম দলের তিন বালকের প্রত্যেকের ছ'মাস কারাদণ্ড হয়। দ্বিতীয় দলের তিন আসামীকে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। ১৯৩৪ জুলাই ২৩-এ—একজনের সাত বছর, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

হাইকোর্টে আপীলে, ১৯৩৫ জানুয়ারী ২৫-এ, অশ্বিনীকুমার ঘোষের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড সমর্থিত হয় ; অপর দু'জন মুক্তি পান।

রাজসাহী ঃ সাগরপাড়া ও বোসপাড়ায় বসে ১৯৩৪ এপ্রিল-মে মাসে সৌরীন্দ্রমোহন লাহিড়ীর একটি দো-নলা বন্দুক চুরি করবার ষড়যন্ত্র হয়। খবরটা পুলিশের কাছে পৌঁছে যায়। প্রমোদকান্ত মৈত্র ও তাঁর এক সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে মামলা শুরু হয়। ১৯৩৪ আগষ্ট ৯-ই, প্রমোদের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও সঙ্গীর দু'বছর কিশোর-বন্দীশালায় (borstal school) বাসের আদেশ হয়।

এর পিছনে ছিলেন অবনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ১৭-ই তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

শ্রীহট্ট ঃ কয়েকজন যুবক ডাকাতির উদ্দেশ্যে একটা পিস্তল ও একটা বড় ছোরা সংগ্রহ করেছিলেন। পরে ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারীর শেষে কানাইলাল সুরানার দোকানে ডাকাতি করবার সলাপরামর্শের জন্য এক রাত্রে একসঙ্গে জমায়েতও হয়েছিলেন। ১৯৩৪ মার্চ ২-রা একসঙ্গে মিলে চালিবন্দরে উপস্থিত হয়ে কালীঘাটের লক্ষ্যস্থলের দিকে চললেন তিনজনে।

সন্ধ্যার পরই দোকানে গিয়ে হাজির, কিন্তু সেখানে কয়েকজন লোককে দেখে, রাত্রি সাড়ে-ন'টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তারপরেই হামলা করতে গিয়ে দোকান থেকে বাধা পেয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু খানিকটা যেতেই সকলে ধরা পড়েন এবং তাঁদের দোকানে ফিরিয়ে এনে, পরে পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারের ফল প্রকাশিত হয়—১৯৩৪ আগষ্ট ৯-ই। আসামী অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও বিনয়ভূষণ লস্কর—প্রত্যেকের সাত ও মতিলাল রায়ের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ১১-ই হাইকোর্ট সকলের আপীল নাকচ করে।

কলিকাতা ঃ ভবানীপুর— পুলিশ ১০-ডি, রাণী শঙ্করী লেন তল্লাসী করে ঘরের ভিতর ছাদের কাছ থেকে ৮৮টি কার্ত্তুজ উদ্ধার করে। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে অপরাধ কবুল করলে, ১৯৩৪ আগষ্ট ১১-ই আসামী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাসের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

হাইকোর্ট সেপ্টেম্বর ১৩-ই দণ্ড সমর্থন করে।

বরিশাল ঃ বাখরগঞ্জ কলেজ রোডে শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নিকট অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায়, ১৯৩৪ আগষ্ট ১৮-ই স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ঢাকা ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের অভিযোগে, ১৯৩৪ আগষ্ট ২০-এ, হরিপদ দে-র পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ঢাকা ঃ ১৯৩৪ জুন ৬-ই তারিখের সরকারী হুকুমে অনন্তকুমার চক্রবর্ত্তীকে ঢাকার পুলিশ-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলা হয়। বাড়ীতে বারে বারে না-পেয়ে, জুলাই ২৪-এ গেজেটে এই আদেশ প্রচার করা হয়। তাতে কোনও ফল হ'ল না।

ছদ্মনামে তিনি আই.বি.-পুলিশ-বিভাগের কেরানীর বাড়ী আশ্রয় নিয়েছিলেন। আগষ্ট ৯-ই পুলিশ সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অক্টোবরের ১-লা তারিখে প্রদত্ত আদেশে তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা হয়।

১৯৩৫ মার্চ ৩-রা হাইকোর্ট কারাদণ্ড সমর্থন ক'রে জরিমানা বাতিল করে।

বাখরগঞ্জ ঃ নলচিটি— অভায়ানীল গ্রামে ১৯৩৪ মে ১৫-ই রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ হাজরার বাড়ী ডাকাতি হয়। এক ডাকাত বাড়ীর এক মহিলার হার কেড়ে নিয়ে, ছোরা দেখিয়ে টাকা বার করে দিতে বলে। এর মধ্যে এক লুণ্ঠনকারীর মুখের আবরণ সরে যাওয়ায় তাঁকে চিনে ফেলা সম্ভব হয়।

এ-সম্পর্কে ১৯৩৪ অক্টোবর ৩-রা দুই আসামী প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ২৫-এ হাইকোর্ট আপীলের বিচারে তাঁদের মুক্তি দেয়।

নদীয়া ঃ কোতোয়ালি থানা এলাকায় ১৯৩৪ জুলাই ৯-ই অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বাড়ীতে সুটকেসের মধ্যে একগোছা কাপড়ের নিচে রক্ষিত একটা রিভলভার পাওয়া যায়।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অক্টোবর ১০-ই প্রদত্ত রায়ে তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৫ জুন ১২-ই হাইকোর্ট দণ্ড সমর্থন করে।

বরিশাল ঃ বঙ্গীয় সংশোধিত অপরাধ-নিবারণ-মূলক আইনে বাখরগঞ্জের জীবনকুমার গুহঠাকুরতার ১৯৩৪ অক্টোবর ১১-ই তিন বছর, ছ'মাস ও এক বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মেদিনীপুর ঃ সিমুরালিতে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালে গড়বেতার কয়েকজন যুবক এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সন্ধান করে পুলিশ জন-পাঁচেককে আসামী খাড়া করে। একজন রাজসাক্ষী হয়। ১৯৩৪ নভেম্বর ৩-রা চারজনের মধ্যে একজনের সাত, একজনের ছয় আর দু'জন প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ইতিমধ্যে আরও একজন অতিরিক্ত আসামী স্বতন্ত্রভাবে যুক্ত হন এবং তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

হাইকোর্টে আপীলের ফলে দু'জন মুক্তিলাভ করেন। সরোজভূষণ (টোপা) রায়, হরিহর (হাবু) সিংহ ও কানাই (অতুল) কুণ্ডু এই তিনজন প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বজায় থাকে।

রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে অস্ত্র-সমেত ধরা পড়ায়, ১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ২-রা, সরোজের পাঁচ বছর সাজা হয়।

বরিশাল ঃ গতিবিধি-নিয়ন্ত্রণ, নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস প্রভৃতি ব্যবস্থা-সমন্বিত আইন-ভঙ্গে বাখরগঞ্জের নির্ম্মলচন্দ্র গুহঠাকুরতার ১৯৩৪ নভেম্বর ১০-ই তিন বছর, ছ'মাস ও এক বছর তিন দফা সমকালীনভোগ দণ্ড হয়েছিল।

কলিকাতা ঃ মুচিপাড়া থানা এলাকায় অস্ত্র-চুরি-সম্পর্কে পুলিশ ১৯৩৪ আগষ্ট ২৪-এ গণেশচন্দ্র গুণিনকে গ্রেপ্তার করে। গণেশ পুলিশকে সঙ্গে করে গোষ্ঠবিহারী দাসের বাড়ী—২৫-নং জেলিয়াপাড়া লেনে গিয়ে হাজির হন। গণেশের আদেশমত গোষ্ঠ একটা বাণ্ডিল বার করলে, তার মধ্যে থেকে একটা রিভলভার পাওয়া যায়।

১৯৩৪ নভেম্বর ১৩-ই স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট দু'জনেরই সাত বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। হাইকোর্ট ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ১৮-ই দু'জনেরই আপীল নাকচ করে।

ঢাকা ঃ সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে ঢাকার শিশিরকুমার বসুর ১৯৩৪ নভেম্বর ২৬-এ তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বাখরগঞ্জ ঃ ভারুকাটির হরকান্ত দাসের বাড়ী ১৯৩৪ জুন ১৮-ই তল্লাসীর ফলে একটা ছ'ঘরা রিভলভার ও আটটা তাজা কার্তুজ পাওয়া যায়। আসামী সাব্যস্ত হলেন নন্দলাল দাস। অপরাধ কবুল করায়, ১৯৩৪ নভেম্বর ২৯-এ স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

১৯৩৫ এপ্রিল ১৭-ই হাইকোর্ট দণ্ড সমর্থন করে।

বাঁকুড়া ঃ বারজোড়া থানার প্রভাকর বিরুণির কাছে নিষিদ্ধ অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায়, ১৯৩৪ ডিসেম্বর ২২-এ তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

বাখরগঞ্জ ঃ বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ব্যতিক্রম হওয়ায়, মণীন্দ্রনাথ গুহর ১৯৩৪ ডিসেম্বর ২৪-এ দু'দফায় তিন বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

চট্টগ্রাম ঃ কানুনগোপাড়ার সুশীলকুমার দে-র কাছে একটা রিভলভার ও কয়েকটা কার্ত্তুজ পাওয়া গেল, ১৯৩৩ নভেম্বর ৩০-এ ; তাঁকে গ্রেপ্তার করে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করলে, ১৯৩৪ আগষ্ট ১৩-ই তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ চক্রবেড়িয়া রোডে একটি পিস্তল-সমেত ধরা পড়ায়, পঞ্চানন দত্তর ১৯৩৪ অক্টোবর ১১-ই তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মরণ-যজ্ঞ

ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া ঃ 'মাষ্টার-দা' আর তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির ব্যবস্থা হচ্ছে—১৯৩৪ জানুয়ারী ১২-ই, চট্টগ্রাম জেলের মধ্যে। কেবল রাজনৈতিক নয়, সাধারণ কয়েদীরাও সমস্বরে 'বন্দে মাতরম্' ও অন্যান্য ধ্বনি দিয়ে জেলখানা ফাটিয়ে ফেলছে বলে মনে হ'ল।

সরকারী ব্যবস্থায় এ অনাচার বন্ধের যথারীতি ব্যবস্থা গৃহীত হ'ল ঃ বেদম প্রহার, লাঠি ও বন্দুকের কুঁদো (butts), দু'-একটা বা বেয়নেটের খোঁচা। বহু কয়েদী গুরুতর আহত হয়েছিলেন, আর তার মধ্যে ছিলেন তরুণ যুবক ধীরেন্দ্রলাল। প্রচণ্ড আঘাতে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়েন। যেন যন্ত্রণার তীব্রতা উপলব্ধির জন্য জ্ঞান ফিরেছিল। কিন্তু এটা প্রদীপ নির্ব্বাপিত হবার আগে দপ্ করে জ্বলে-ওঠার মতো। পরেই যে অচৈতন্য হলেন, সেটাই জীবনের শেষ লক্ষণ।

সহায়সম্পদ চৌধুরী ঃ চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা দুই জেলার কর্ম্মী সহায়সম্পদকে ১৯৩৩ জুলাই ১৩-ই গ্রেপ্তার করে কুমিল্লা জেলে রাখা হয়। পরে পাবনার রায়গঞ্জের এক অস্বাস্থ্যকর স্থানে অন্তরীণ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেই সহায়হীন অবস্থায়, ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ১৮-ই তাঁর জীবনান্ত ঘটে।

যতীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ময়মনসিংহের জামালপুরের যতীন্দ্রনাথকে অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের মামলায় ফেলা হয়। প্রমাণাভাবে মুক্তি পেলেও, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১১০ ধারা (জীবিকার্জ্জনের প্রকাশ্য উপায়ের অভাব)-মতে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৪ এপ্রিল ৪-ঠা আত্মীয়রা খবর পেলেন যতীন গুরুতর পীড়িত। অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেবার জন্য দরখাস্ত করা হয়, এবং সে-আবেদন মঞ্জুর হয়। কোনও জামিনদার পুলিশের মনঃপূত না-হওয়ায় যতীন জেলেই রয়ে গেলেন। ১৯৩৪ এপ্রিল ৯-ই যতীন বিনা-জামিনেই চিরকালের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

নন্দদুলাল ঘোষ ঃ বহুসংখ্যক সন্দেহভাজন যুবকের ভাগ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নন্দদুলালকে হিজলী-ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়। ১৯৩৪ এপ্রিল ১৫-ই নন্দ অসুস্থ

হয়ে পড়েন এবং রোগটা বসন্ত বলে সাব্যস্ত হয়। অতএব এপ্রিল ২৭-এ তাঁকে ক্যাম্পের হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

সংবাদ পেয়ে নন্দর পিতা আস্থাভাজন চিকিৎসক নিয়ে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। রোগী দেখবার অনুমতি পাওয়া গেল না। এপ্রিল ২৯-এ নন্দর জীবনলীলা শেষ হয়। জেলের মধ্যেই তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়েছিল।

সন্তোষ বেরা ঃ মেদিনীপুরের সন্তোষ বেরাকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে ১৯৩৪ জুন ৯-ই গ্রেপ্তার করে আটক-বন্দী করে রাখা হয়। স্বল্পকালের মধ্যে তিনি সেখানে আত্মহত্যা করে সকল বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করেন।

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কাকোরী ট্রেন-লুঠের মামলায় আসামীদের কারও কারও ফাঁসি এবং অপরদের দীর্ঘ-মেয়াদী কারাদণ্ড হয়। সে-মামলার তদ্বিরকারক ছিলেন পুলিশের এক ডেপুটি-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। মণীন্দ্র এই পুলিশ-অফিসারের ভাগিনেয়।

আসামীদের দুর্ভোগের গুরুত্ব মণীন্দ্রের মনের ওপর দারুণ বেদনা সৃষ্টি করে। ১৯২৮ জানুয়ারী ১২-ই মণীন্দ্র পিস্তল-সাহায্যে মাতুলকে হত্যা করেন। সেই অপরাধে তাঁর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। তখনকার মতো মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেই পরিণামই ঘটে গেল। জেলের মধ্যে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৪ জুন ২১-এ তিনি পরলোকের যাত্রী হন।

অশ্বিনীকুমার গুহ ঃ সন্দেহক্রমে অশ্বিনীকে হিজলী-ক্যাম্পে রাখা হয়। ক্রমে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁকে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অশ্বিনীকে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্ত্তে রাঁচির পাগলের হাসপাতালে (lunatic asylum) পাঠানো হয়।

বন্ধনের যন্ত্রণা সম্বন্ধে অশ্বিনীর সচেতনতা ছিল বলেই মনে হয়। ১৯৩৪ জুন ২৭-এ, আত্মহত্যার সাহায্যে তিনি নিজেই মুক্তির ব্যবস্থা করে নেন।

ব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী ঃ 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনে' অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের অধিকাংশের বয়স পনেরো থেকে আঠারো বছরের মধ্যে। আর, তাঁদের সহায়তা করেছেন, বিশেষতঃ আশ্রয়স্থল খুঁজে বার করতে আরও স্বল্পবয়সী যুবকেরা একটা বড় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৪ জানুয়ারী মাসে যুবক ব্রজেন্দ্রকে এ-কাজে লিপ্ত থাকার সন্দেহে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং চট্টগ্রাম থেকে হিজলী-ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়।

১৯৩৪ আগষ্ট ২৭-এ, রাত্রি পৌনে-দশটায় যখন বন্দী-গণনা চলছে তখন ব্রজেনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল—সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার করবার ঘরের (common room) এক উঁচু জানালার গরাদের সঙ্গে পাকানো-ধুতি গলায়-বাঁধা অবস্থায় ব্রজেনের দোদুল্যমান মৃতদেহ।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ মুন্সীগঞ্জের অধিবাসী উপেন্দ্রকে ১৯৩২ জানুয়ারী ১০-ই গ্রেপ্তার করে এক মাস বাদে বক্সা-ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ১৯৩৪ সালে মুর্শিদাবাদের অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ভগবানগোলায় অন্তরীণ করা হয়। বারে বারে রোগে পড়ে গভর্ণমেণ্টকে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে কোনও ফল পান না। শেষপর্য্যন্ত ১৯৩৪ নভেম্বর ১৮-ই স্বয়ং ধর্ম্মরাজ এসে তাঁর সকল রোগ থেকে অব্যাহতির ব্যবস্থা করেন।

সান্ত্বনা গুহ ঃ নানা গুণের সমাবেশ ছিল যুবক সান্ত্বনা গুহর মধ্যে। তাঁর কর্ম্মকুশলতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল দেশপ্রেম ও সাহিত্যানুরক্তি। অপরিণত বয়সে লিখিত নানা প্রবন্ধ বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩১ অক্টোবর ৩০-এ কলিকাতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ডিসেম্বর ১৩-ই তাঁর হিজলী-ক্যাম্পে বাস ঘটে। ১৯৩৩ জুন ১-লা তারিখের আদেশে তাঁকে যশোহরে অন্তরীণ করা হয়। স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁকে রংপুরের উলিপুর পাঠালে, দারোগার সঙ্গে খটাখটি বাঁধে। সেখান থেকে নভেম্বর ২২-এ জেলে পাঠানো হয়। কুড়িগ্রাম সাব-জেলে বন্দী-থাকাকালীন. ১৯৩৪ অক্টোবর ২২-এ, নানা অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট মামলা শুরু করে। অন্তরীণ-আইন-ভঙ্গ, উলিপুরের দারোগাকে প্রহার, কুড়িগ্রাম জেল-ওয়ার্ডারের কাজে বাধা-দান এবং মামলা চলার সময় অকারণে তাকে প্রহার—এই চার দফা অপরাধে যথাক্রমে চার বছর, দেড় বছর, ছ'মাস ও ছ'মাস সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়।

গভর্ণমেণ্টের এত তোড়জোড় বৃথা যাবার উপক্রম। পরের মাসে তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগ-নির্ণয়-ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত উপেক্ষা করে। আর, প্রহারের ফলেও হতে পারে,—১৯৩৪ ডিসেম্বর ১৯-এ তাঁর প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর হতে অনন্তে উড়ে যায়।

চট্টগ্রাম ঃ পলাতকদের আশ্রয় দেওয়ার সন্দেহে, পুলিশ সুরেশ বণিক্যকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখে। ঢাকা থেকে তাঁর বাড়ীতে হঠাৎ খবর আসে যে, বসন্তরোগে জেলের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ('চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ আলেখ্যমালা', পৃঃ ৭৫)।

প্রতিশোধ

ঢাকা ঃ নারায়ণগঞ্জ— গুপ্তচর হীরেন্দ্রনাথ গুহকে অজ্ঞাত আততায়ীরা হত্যা করেছে বলে ১৯৩৪ নভেম্বর ৮-ই নারায়ণগঞ্জ থেকে এক সংবাদ প্রচারিত হয়।

চট্টগ্রাম ঃ সন্ধ্যার পর গৃহস্থ-বাড়ী থেকে এক মহিলা কিছু ভোজ্য নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেটা গৃহকর্ত্তা নেত্ররঞ্জন সেনের দৃষ্টিতে পড়ে। বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ

করে তিনি কারও সন্দেহ উৎপাদন করলেন না। কিন্তু সন্দেহভাজন লোক তাঁর বাড়ীর নিকট গোপনে বাস করে সে-সংবাদ পুলিশে দিতে ভুললেন না। এরই ফলে 'মাষ্টার-দা' প্রভৃতি ধরা পড়েন।

নেত্ররঞ্জন আপন কৃতিত্বে আনন্দে আছেন। কিছু সরকারী 'পুরস্কার'ও মিলেছে। কিন্তু ১৯৩৪ জানুয়ারী ৮-ই যখন তিনি নৈশভোজনে ব্যাপৃত, সে-সময় এক যুবক বাড়ীতে হঠাৎ প্রবেশ করে একটা ভারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে নেত্রকে কুপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যান। সেখানেই আহত নেত্র মৃত্যুবরণ করলেন। আততায়ীকে পাওয়া গেল না।

ঢাকা ঃ কেরানীগঞ্জ— ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে সন্দেহবশতঃ ১৯৩৪ এপ্রিল ২৪-এ গ্রেপ্তার করে হিজলী-ক্যাম্পে আটক রাখা হয়। ১৯৩২ জুলাই ১০-ই দেউলী-ক্যাম্পে বাস ঘটে। ১৯৩৩ অক্টোবর মাসে বন্দীর ডান হাত ও পায়ে খানিকটা জায়গার ত্বকে অসাড়ভাব (anaesthetic patch) ফুটে ওঠে।

এ-কারণে ১৯৩৪ জানুয়ারী ২১-এ তাঁকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে আনা হয়। রোগটা কুষ্ঠ বলেই নির্ণীত হলে, মে ১৮-ই তাঁকে বর্দ্ধমান জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। অবস্থা খারাপ হওয়ায়, জুন ১১-ই তাঁকে 'বাঁকুড়া কুষ্ঠ-হাসপাতালে' পাঠাবার পর, তিনি আগষ্ট ২৫-এ সরে পড়েন।

সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি ঢাকা কেরানীগঞ্জ থানা এলাকার সাকতা-য় আসেন এবং দুর্গাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে আশ্রয় নেন। সেপ্টেম্বর ১৪-ই পুলিশ এসে ধনেশকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে, তাঁর ঘর-তল্লাসীতে একটা সুটকেসের মধ্যে ছোট এক ব্যাগে ৩৩৩ টাকা ৪ আনা ৯ পাই মুদ্রা, পাঁচটা-টোটা-ভরা ২০২৯-নং একটা পাঁচ-নলা পিস্তল এবং অন্যান্য আপত্তিকর বস্তু পায়।

১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। হাইকোর্ট, জুন ২৫-এ, সেটা সমর্থন করে।

অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বোধে, ১৯৩৫ নভেম্বর ১-লা তাঁকে পুলিশ স্বগৃহে অন্তরীণ করে। রোগশয্যা আর ত্যাগ-করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩৭ নভেম্বর ২৫-এ তিনি সকল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পান।

নির্ব্বাপণের পথে (১৯৩৫)

হঠাৎ যখন অগ্নিশিখা ফুটে বেরিয়ে পড়েছিল ১৯৩০ সালে—তারপর ক'বছর সে-আগুন বিভীষিকা সৃষ্টি করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দু'পক্ষই প্রাণপণে লড়েছে। গভর্ণমেণ্ট বাইরে আস্ফালন বজায় রাখলেও, বিব্রত যে খুব বেশী পরিমাণে হয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই ; কিন্তু বিপ্লবীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়—ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ আক্রমণাত্মক কাজের সংখ্যা দেখে। ১৯৩৫ সাল সেই লক্ষণ প্রকাশ করছে।

সহন-সীমার পরপারে

চট্টগ্রামের রাওজান থানার অধিবাসী, অপরিণতবয়স্ক ছেলে রোহিণী বড়ুয়া। সন্দেহের বশে ধরে ১৯৩২ জুন ২৭-এ তাঁকে চট্টগ্রাম জেলে ভরা হ'ল। তিন মাস পার হয়নি, হিজলী-ক্যাম্পে তিনি স্থানান্তরিত হলেন সেপ্টেম্বর ২-রা। সেখান থেকে ১৯৩৩ মার্চ ২৮-এ তাঁকে যেতে হ'ল বহরমপুর-ক্যাম্পে। এবারে জেল-জীবন এবং জীবনের মেয়াদ তাঁর শেষ হয়ে এল, ১৯৩৪ অক্টোবর ৪-ঠা, ফরিদপুরের গোয়ালন্দঘাট থানার দৌলতপুর গ্রামে অন্তরীণ অবস্থায় থাকায়।

রোহিণীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার পড়লো দারোগা সৈয়দ এরসাদ আলির ওপর। বাসস্থানের পরিবেশ জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তার ওপর ছিল এরসাদের অনন্ত দুর্ব্বৃত্তপনা। সহ্যের অতীত যখন হয়ে উঠলো—তখন ১৯৩৫ জুন ১৫-ই, রোহিণী এরসাদের ঘাড়ে ঘা-দুই-তিন দা-এর কোপ মেরে দারোগার মুণ্ডটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দেন।

ঘটনার পর, কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে রোহিণী এক বিবৃতি দেন। স্মরণে রাখা ভাল, রোহিণীর বয়স তখন মাত্র উনিশ। রোহিণী বললেন ঃ

"এরসাদ-সাহেবের এক্তিয়ারে এসে পর্য্যন্ত আমার শান্তি ছিল না। এখানে আসার অল্পদিন পরে কন্‌ষ্টেবল কচিমুদ্দিনের ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার সময় কাটে কি করে। তার উত্তরে বলি, 'বাধ্য হয়ে থাকতে হয়, কাজকর্ম্ম কিছুই নেই।' এতেই দারোগা-সাহেব আমাদের দু'জনকে ডেকে আনেন এবং ঐ লোকটিকে যথেষ্ট ভৎ'সনা করেন। আমাকে প্রশ্ন করলে বলেছিলাম, 'আমি ও-লোকটিকে চিনি না, নামও জানি না। আমি মাত্র ওঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।' দারোগা-সাহেব কতকগুলি কটু কথা বলেন, আমি আর তার উত্তর দিইনা।

"এরপর বেশীদিন কাটেনি। পাঁচু নামে দোকানদারের কাছে আমি কিছু টাকা ধারতাম কাপড় কেনার জন্য। তিনি একদিন থানার সামনে দিয়ে যাবার সময় টাকার তাগিদ করেন। দারোগাবাবু তাঁকে ডেকে বলেন যে, তিনি তাঁকে (পাঁচুকে) গ্রেপ্তার করে চালান দেবেন; আর আমাকে যা অনুযোগ করলেন তার উত্তরে আমি বলি যে, স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা-বলার কোনও বাধা-নিষেধ গভর্ণমেণ্ট-অর্ডারের কোথাও নেই। তাঁরা আমার সঙ্গে দেখাও করতে পারেন। ক্রুদ্ধ হয়ে দারোগাবাবু বললেন যে, তিনি দারোগা, আমার পক্ষে তাঁর চেয়ে আইন বেশী জানা কখনও সম্ভব নয়। তর্ক চললো খুব। বলা বাহুল্য, দারোগাবাবু বহু আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ করেন। তাঁর সঙ্গে আর কথা-বলা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বলে আমি সে-স্থান ত্যাগ করে চলে আসি।

"এর কয়েকদিন বাদেই আমি ও আর একটি ডেটেন্যু নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী বিকালে থানার সামনেই রাস্তার ধারে বসে গল্প করছিলাম। সে-সময় দারোগাবাবু ও আরও দু'-তিনজন অচেনা লোক থানায় বসে ছিলেন। আমি সেটা জানতাম না। থানার বারান্দায় উঠে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'দারোগা-সাহেব আছেন নাকি? আমার একটা চিঠি দেবার আছে; আজ কি এটা যাবে?'

"এরসাদ আলি চটে উঠলেন: 'আমাকে দারোগা-সাহেব বলো কেন? আমার এতে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়। তোমার কি বলার আছে, বলে চলে যাও।' আমি বললাম যে, আমি তাঁকে থানার দারোগা বলেই জানি, আর তাই বলেই ডেকেছি; এতে কোনও অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি না। এতে তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'আমি তার চেয়ে ঢের বড় কর্ম্মচারী ('I am a higher officer here.')—মুখ সামলে কথা বলো। আমার সাথে এভাবে কথা-বলা তোমার পক্ষে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।' আমি বলি, 'আপনার মাথার ঠিক নেই, সে-কারণে এ তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনি যা-তা বলছেন এবং উপস্থিত ভদ্রলোকদের সামনে আমাকে অপমান করছেন। আমার সামান্য প্রশ্ন: চিঠিটা আজ যাবে কিনা।' কিছু উত্তর না-পেয়ে আমি চলে আসি।

"এরপর থেকে অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও তিনি আমার প্রতি লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়িয়েই চললেন। অশ্রাব্য কটু গালিগালাজ তাঁর ভাষার অঙ্গ হয়ে উঠলো। থানায় ডেকে পাঠালে, আমি সব শুনে চলে-আসা আরম্ভ করলাম।

"গতকাল (১৯৩৫ জুন ১৫-ই) আমি আর নির্ম্মলবাবু সকালে বাজারে গিয়েছিলাম। বেলা ন'টার পর যখন আমরা দু'জন ফিরে আসছি তখন পথে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। ভদ্রলোক ঐ পথ ধরেই চলছিলেন। বাসার কাছে এসে আমরা রাস্তা ছেড়ে চলে এলাম। ভদ্রলোক সামনে থানার দিকে চলে গেলেন। তাঁর নাম জানি না, কেবল 'ডাক্তারবাবু' বলে জানি। তিনি

রাস্তার ওপরেই থানার সামনে এলেই, কচিমুদ্দি মোল্লা আর দারোগা দক্ষিণ দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। ঐ ঘরটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, তাইতে মনে হয়, সে-ঘরের মধ্যে তাঁরা আড়ি-পেতে বসে ছিলেন।

"থানার সামনে ডাক্তারবাবু এসে পড়তেই তাঁকে থামবার হুকুম দেওয়া হয় এবং বলা হয়ঃ 'সারা পথ আপনি রোহিণীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এসেছেন—আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম।' আমাকে বললেন, কেন আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি উত্তরে বললাম, আমি কোনও কথা বলিনি। দারোগা-বাবু উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি যে কথা বলিছি, সে-সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিৎ। তিনি নিজে দেখেছেন এবং কানে শুনেছেন। মাত্রা ছাড়িয়ে স্বর উঠলো ঃ 'আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম, আমার হুকুমমত চলুন।' কন্‌ষ্টেবলদের উদ্দেশ করে আমাকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিলেন। প্রতিবাদে আমি বললাম, 'ঝুট্‌মুট্‌ আমাকে ধরছেন কেন ?' তাঁর আদেশে কন্‌ষ্টেবল জহর আলি মুন্সী ছুটে আমার ঘরের কাছে আসে। আরও অপমানিত হবার ভয়ে আমি সেখান থেকে চলে আসি।

"দারোগা-সাহেব সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরে এসে কটুস্বরে বললেন, 'আপনি কথা বলেছেন।' আমি বললাম, 'না।' কচিমুদ্দিন মোল্লাকে দেখিয়ে বললেন যে, সে তার সাক্ষী। তা ছাড়া, আরও দু'জন সাক্ষী তাঁর আছে। চীৎকার করে বললেন, 'মিথ্যাবাদী !—মিছে-কথা বলছেন।' আমি তখন আগের গ্রেপ্তার-করা লোককে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। ভদ্রলোক উত্তরে বললেন, তাঁর সাথে আমার কোনও কথা হয়নি।

"এরসাদ-সাহেব চটে আগুন ! তিনি তাঁর চোখ-কানকে কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারেন না। তিনি বক্সী-সাহেবকে কেস্‌-ডায়েরী (case diary)-তে ঘটনা লিখে নিতে হুকুম দিলেন। একটু সামলে নিয়ে, তিনি আমাকেও একটু পরেই চলে যেতে বললেন।

"অপমানের তীব্রতায় আমার মনটা ভেঙ্গে পড়লো। কিছু না-করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। যথাসময়ে পরিচারক এসে জানালে, আমি স্নানাহার কিছুই করবো না বলে জানিয়ে দিলাম।

"মনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। কেবল ভাবতে লাগলাম, বারে বারে এই দারুণ অপমানের আঘাত আর কতদিন সইতে পারবো ? স্থির করলাম, যখন কোনও প্রতিকার নেই, আত্মহত্যা করে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ করি। তখন নির্ম্মল আমাকে নানা ভাবে সান্ত্বনা ও সাহস দিতে লাগলেন এবং স্নানের জন্য ধরে নিয়ে গেলেন। মনে হ'ল, তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে বিকেলবেলা যা-হয় স্থির করলেই চলবে। পুলিশ-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে লিখে

গোপন-তথ্য-বিভাগ (Intelligence Department)-এর এক পদস্থ কর্ম্মচারীকে পাঠিয়ে তদন্তের ব্যবস্থা করবার কথা লিখতে হবে।

"তখন দু'জনে খেতে গেলাম; আমার গলা দিয়ে কিছু নামলো না। অপমানে ক্ষোভে তখনও আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে। কি করবো ভেবে কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না। দারোগা-মারফত আমার মাতৃসমা বৌদির মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে আমার মন অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। একবার বিছানায় শুয়ে পড়ি, পরমুহূর্ত্তে আবার বাইরে বেরিয়ে পায়চারি করি। রাত্রি বেশ খানিকটা গড়িয়ে গেল। চোখে ঘুমের লেশ নেই। তখন বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। খালি মনে হতে লাগলো, যত ভদ্র-ব্যবহারই করছি—অপমান-বিড়ম্বনা ততই আমার ওপর চেপে বসছে। তখন ঘরের বাইরে খুব খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু কিছুতেই ইতিকর্ত্তব্য স্থির করে উঠতে পারলাম না।"

তখন রোহিণীকুমার যে-পথ গ্রহণ করলেন সেটা প্রাণবন্ত আত্মসম্মানদৃপ্ত যুবকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তিনি স্থির করলেন—তিনি মরবেনই; সঙ্গে করে দারোগাকে নিয়ে যেতে পারলে, পরে যাঁরা সেই থানায় আসবেন, তাঁরা কতকটা শান্তিতে বাস করতে পারবেন। অন্যায় অপমানকারীকে শাস্তিবিধান ন্যায়শাস্ত্রে আছে। সুতরাং—

পায়চারি করতে করতে রোহিণীকুমারের মন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। মনে হঠাৎ অমিত শক্তির উদ্ভব হ'ল।

বিবৃতিতে তিনি বলেছেন ঃ

"দুপুর হতেই প্রতিহিংসা-চিন্তা আমার মনকে দখল করে বসলো। আমার এ ব্যর্থ দুর্ব্বহ জীবনে আর কোনও কাজ নেই। রান্নাঘরে গিয়ে দা-খানা সংগ্রহ করে এনে কাছে রেখে দিলাম। তিন বছর ডেটেন্যু-জীবন কাটালাম, আর কতকাল এভাবে থাকতে হবে তার কোনও স্থিরতা নেই। দুপুর থেকে এই চিন্তা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করে বসলো—আর, বেঁচে থাকার সমস্ত প্রয়োজন মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

"এই সিদ্ধান্তের পর আমি আর কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিনি। বেলা পাঁচটা নাগাদ বাইরে একটু ঘুরতে গেলাম। নির্ম্মল আমার সঙ্গে ছিলেন। ফিরে এসে আমার ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে রইলাম। নির্ম্মলবাবু প্রশ্ন করলেন—অত গরমে কেন আমি ঘরের মধ্যে বসে আছি। তিনি আমাদের পোষা বেড়ালটাকে আমার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলেন; আমি সেটাকে নামিয়ে দিলাম।

"সন্ধ্যা হয়ে এল; ঘর থেকে আমি বাইরে এলাম দা-খানাকে সঙ্গে নিয়ে। থানার সামনে তখন বিশ-পঁচিশ-জন লোক রয়েছে। তাদের মধ্যেই আমি ঘোরাফেরা করতে লাগলাম; কোঁচার কাপড়ের মধ্যে দা-খানা লুকানো রইল।

খানিক পরে লোক সব চলে গেলে, দা সঙ্গে করে আমি ঘরের মধ্যে গেলাম। তখন দারোগা-সাহেব চেয়ারে বসে লিখছিলেন। থানার কর্ম্মচারী বঙ্কিমবাবু সেখানে উপস্থিত। বৃথা কালক্ষেপ না করে আমি এরসাদের ঘাড়ে দু'-কোপ দা বসিয়ে দিলাম। বঙ্কিমবাবু চীৎকার করে জানালেন—'দারোগা-সাহেব খুন হয়ে গেল', আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরার জন্য এগিয়ে এলেন। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁকে এক-ঘা কষাবার উদ্যোগ করছি দেখে, তিনি পিছু হটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পালালেন। তাঁর পিছে খানিকটা ধাওয়া করে আমি ফিরে এলাম, —দা তখনও আমার হাতে।"

রোহিণীর মনে সংশয় হয়েছিল যে, দারোগার আঘাত যথেষ্ট মারাত্মক হয়নি, বেঁচে গেলেও যেতে পারেন। তাই তিনি ফিরে এসে দারোগার ঘাড়ে আর এক-ঘা দিলেন, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সবাই সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে। সব "চাচা"ই আপন প্রাণ বাঁচাতে অদৃশ্য হয়েছে।

দারোগার মৃত্যু-সম্বন্ধে সুনিশ্চিৎ হয়ে রোহিণী থানার কাছেই এক নালার মধ্যে দা ফেলে দিলেন। ফিরে এসে সকলকে ডেকে বললেন যে, তাঁর কাছে কোনও অস্ত্র নেই, যে-কেউ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে! এই বলে তিনি দৃঢ়পদে থানা-ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। তখন কন্‌ষ্টেবল বিজয় ঘোষ তাঁকে ধরবার পর, জহর আলি মুন্সী তাঁকে গারদে (লক্-আপ) বন্ধ করলেন।

শেষ পর্য্যায়ে রোহিণী বলেছেন যে, তিনি যখন থানা-ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন তখন নির্ম্মলবাবু বিড়াল নিয়ে খেলা করছিলেন। কারও সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেননি বা কাকেও এক-বর্ণও জানাননি। পরের দিন সকালে ছোট-দারোগা যখন খোঁজ করছিলেন, তখন তিনি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দা-খানা কোথায় ফেলা হয়েছে, দেখিয়ে দেন।

এর পর থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক-বাক্যও তাঁর মুখ থেকে কেউ শোনেনি।

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে, ১৯৩৫ জুলাই ১৮-ই, রোহিণী বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড প্রকাশিত হ'ল। রোহিণী নির্ব্বিকার।

হাইকোর্টে আপীলে নভেম্বর ২৫-এ পূর্ব্বদণ্ড সমর্থিত হয়।

১৯৩৫ ডিসেম্বর ১৮-ই ফরিদপুর জেলে রোহিণীর ফাঁসি হয়।

রোহিণীর আত্মাহুতি কেবল সৈয়দ এরসাদ আলির 'রাজ্যে' নয়, যেখানে যত থানার অধীনে ডেটেন্যু ছিলেন, তাঁরা স্থানীয় দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্ত্তা দারোগাদের কাছ থেকে সভ্য ব্যবহার পেতে থাকেন। রোহিণীর দুঃসাহসিক কাণ্ড অত্যাচারী দারোগাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে।

দূর-দূরান্তর পল্লীতে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, দরদহীন দারোগাদের অত্যাচারে, গভর্ণমেণ্টের হৃদয়হীনতায় বিনা-বিচারে বন্দীদের অধিকাংশ কালাতিপাত করতে বাধ্য

হয়েছেন, তার পরিচয় রোহিণী বড়ুয়া রেখে দিয়ে গেছেন। অত্যাচারীকে যথোচিত সাজা দিয়ে, শেষপর্য্যন্ত যে আত্মদান করে গেছেন, সে-কথা বাঙ্গলার বিস্তৃত বিপ্লবের ইতিহাসে স্থান গ্রহণ করে থাকবে।

ত্রিপুরা ঃ আগরতলা— ঢাকা লোহাজং-এর নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আগরতলায় আটক-বন্দী থাকাকালে বে-আইনী অস্ত্র রাখার অপরাধে, ১৯৩৫ জানুয়ারী ২৪-এ, চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

রংপুর ষড়যন্ত্র

পর পর কয়েকটা রিভলভার ও বন্দুক চুরি যাওয়াতে, পুলিশ খুব সতর্ক হয়ে ওঠে। সন্দেহ করে একজনকে গ্রেপ্তার করবার পর, তাঁর কথামত একস্থানে মাটীতে পোঁতা এক হাঁড়ির ভিতর থেকে একটা রিভলভার পাওয়া গেল। উৎসাহিত হয়ে পুলিশ নানা স্থানে তল্লাসী চালিয়ে তিনটে রিভলভার, দুটো দো-নলা গাদা-বন্দুক উদ্ধার করে। সে-সময়কার দু'-একটা ডাকাতির সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক আছে বলে পুলিশের ধারণা।

ধরা পড়লেন একুশজন; তার মধ্যে মামলা হ'ল পনেরো-জনের বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে। ১৯৩৫ জানুয়ারী ২৮-এ রায় প্রদত্ত হয়। তাতে চারজনের সাত বছর হিসাবে, পাঁচজনের পাঁচ বছর হিসাবে, একজনের চার বছর, আর একজনের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড, দু'জন প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, আর দু'জনের কাছারিতে অবস্থানকালীন অবরোধ দণ্ড বলে গৃহীত হয়।

হাইকোর্টে আপীল হলে, ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারী ১৭-ই রায় জানা যায় ঃ

(১) পূর্ণেন্দুশেখর (পর্ণচন্দ্র) গুহ, (২) বীরুভূষণ চক্রবর্ত্তী ও (৩) রমেশচন্দ্র দত্তর পূর্ব্বের সাত বছর সশ্রম কারাবাস বহাল থাকে; কেবল অনন্তেশ্বর (কালাচাঁদ) মৈত্রর সাত বছরটা তিন বছরে পরিণত হয়।

যে পাঁচজনের পাঁচ বছর হিসাবে দণ্ড হয়েছিল, তার মধ্যে নগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর দণ্ড অপরিবর্ত্তিত থেকে যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর দণ্ড পাঁচ থেকে তিন বছরে পরিণত হয়; একজনের দু'বছরে দাঁড়ায় এবং একজনের আবদ্ধ-থাকা-কাল দণ্ডের মেয়াদ বলে সাব্যস্ত হয়। আর, একজন মুক্তি পান।

ধীরেন্দ্রনাথ (ধীরেন্দ্রলাল) ঘোষের চার বছর দণ্ড বহাল থাকে।

যাঁর দু'বছর সাজা হয়েছিল, তাঁর ক্ষেত্রে আবদ্ধ-থাকা-কালই দণ্ডের মেয়াদে পরিণত হয়।

রাজসাহী ঃ বঙ্গীয় (সংশোধিত) ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ধারা অমান্য করায়, বাণীকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ১১-ই তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ঢাকা ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে গোবিন্দ কর্ম্মকারের, ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ২৩-এ, তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

নোয়াখালি ঃ দেহালা— রায়গঞ্জ থানায় কৃষ্ণসুন্দরের বাড়ী এক ডাকাতি হয়—১৯৩৪ মার্চ মাসে। হাসনাবাদের শ্রমিক-নেতা কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক এবং ক্ষেত্রনাথ শর্ম্মাকে ঐ ডাকাতির অভিযোগে, ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ২৫-এ, সাত বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ময়মনসিংহ ঃ গাঙ্গাইল— ডাকাতি উপলক্ষ করে ১৯৩৫ মার্চ ২-রা কেরামত আলি মিশ্রীকারীর পাঁচ এবং ইলাহি বক্স ও মকবুল হোসেন—প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীলে কেরামতের দণ্ড তিন বছরে পরিণত হয়—১৯৩৬ এপ্রিল ২৮ তারিখে।

বাখরগঞ্জ ঃ 'ধেনুয়াবাড়ী ডাক-লুঠ'-এর ব্যাপারে ১৯৩৫ মার্চ ১৮-ই সুরেন্দ্রনাথ সরখেলের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

দুর্দ্দান্ত সাহস এবং বিপদের প্রতি দারুণ উপেক্ষা নিয়ে তিনি বিপ্লবী-জীবন আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর প্রথম দণ্ড ঘটে কলিকাতায়, ১৯৩৩ অক্টোবর ১৭-ই ; দ্বিতীয় সাজা—দশ বছর, 'আগলপাশা ডাকাতি' সম্পর্কে, ১৯৩৪ মার্চ ২৮-এ।

তিন দফায় চব্বিশ বছর, অর্থাৎ ১৯৩৩ অক্টোবরের সাজার আগে তিনি অপর দুটি ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যার ফলে তাঁর শেষ সাজা ঘটে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত।

দিনাজপুর ঃ বালুরঘাট— গোষ্ঠবিহারী সরকার ও তাঁর দুই সঙ্গীর বাড়ী ১৯৩৫ মে ৬-ই তল্লাসী করলে, দুটো রিভলভার ও সাতটা কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। ১৯৩৫ মার্চ ১৯-এ স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ে গোষ্ঠর চার বছর ও অন্য দু'জনের ছ'মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ময়মনসিংহ ঃ নেত্রকোণা— মণীন্দ্রনাথ সিংহকে সুষং (দুর্গাপুর)-এ অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। যেখানে সাধারণের সঙ্গে কথা বলাই নিষিদ্ধ, সেখানে পাট-শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা দেওয়ার ফলে, ১৯৩৫ মার্চ ৩১-এ তাঁর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

হুগলী ঃ সন্ত্রাস-দমন-আইনে মনোরঞ্জন হাজরার তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়—১৯৩৫ এপ্রিল ৩-রা তারিখে।

হাওড়া ঃ রামকৃষ্ণপুর— হৃষীকেশ দত্তর নিকট আগ্নেয়াস্ত্র-উদ্ধারের ফলে, ১৯৩৫ এপ্রিল ১৭-ই তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

কলিকাতা ঃ জেলে বন্দী দেবতোষ দাশগুপ্ত হাইড্রোসিল-অপারেশনের জন্য ১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ১-লা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থান পেয়েছিলেন। রোগমুক্তির

পর, আবার প্রেসিডেন্সী জেলে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ ছিল। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছে তিনি সরে পড়েন। সেপ্টেম্বর ৩-রা তাঁকে সত্যেন দত্ত ষ্ট্রীট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৫ এপ্রিল ১৭-ই হাইকোর্ট পূর্ব্বদণ্ডই বহাল রাখে।

চব্বিশ-পরগণা ঃ বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্যবিধির নির্দ্দেশ অমান্য করায়, কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৩৫ এপ্রিল ২৯-এ তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তার পর, জেলে গণ্ডগোল ও মারপিট উপলক্ষে, অক্টোবর ২৩-এ, দু'বছর এবং আরও দু'বছর সমকালীনভোগ সশ্রম দণ্ড হয়। জেল-আইন-ভঙ্গের অপরাধে ১৯৩৬ জুন ২৫-এ, এবং আগষ্ট ১৭-ই—প্রত্যেকটিতে এক বছর দণ্ডভোগ আদেশ হয়।

বীরভূম ঃ 'প্রথম বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা'র শেষপর্য্যন্ত হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হয়—১৯৩৫ সেপ্টেম্বর ২০-এ। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মামলা আরম্ভ হয়, আটজন আসামী নিয়ে। ১৯৩৫ এপ্রিল ৩০-এ রায় প্রকাশিত হয়।

তিনজন প্রত্যেকের দু'বছর কারাদণ্ড, আর কাশীনাথ রায়চৌধুরী, ধরণীধর চৌধুরী এবং উমাপদ মণ্ডল প্রত্যেকের চার, হরিপদ মণ্ডলের সাড়ে-চার এবং গোবিন্দ বাগদীর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ধরণী জীবন্ত বাড়ী ফেরেননি। কয়েদী অবস্থায়, ১৯৩৭ এপ্রিল ২-রা, সিউড়ী জেলে তাঁর জীবনান্ত ঘটে।

ময়মনসিংহ ঃ বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর, ১৯৩৫ মে ৫-ই, তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

নলডাঙ্গা (রংপুর)

নলডাঙ্গায় প্রথম দফায় ১৯৩৪ জানুয়ারী ৮-ই জন-দশেকের দীর্ঘ-মেয়াদী দণ্ড ঘটে গেছে। এবার গাইবাঁধা (নলডাঙ্গা) দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র। পুলিশের সংবাদ ঃ ১৯৩৪ অক্টোবর ১-লা, নগেন্দ্রনাথ মুস্তোফী কলিকাতা থেকে একটা রিভলবার সংগ্রহ করেছেন। পুলিশে খবর হয়ে গেছে মনে করে তিনি সেটা পুকুরে ফেলে দেন। ডিসেম্বর ৭-ই, পুলিশ জল থেকে এই রিভলভার উদ্ধার করে।

১৯৩৫ মে ১৫-ই স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ষড়যন্ত্র মামলার রায় দেন। তাতে (১) নগেন্দ্রনাথ মুস্তোফী, (২) পরেশচন্দ্র চৌধুরী (ব্যাং) ও (৩) যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস—প্রত্যেকের সাত ;

(৪) নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, (৫) সত্যেন্দ্রচন্দ্র চাকী (সোনা)—প্রত্যেকের ছয় ;

(৬) বিনয়কুমার তরফদার ও (৭) বিনয়কুমার নন্দী—প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৫ ডিসেম্বর ১১-ই সত্যেন্দ্র ও বিনয় নন্দীর সাজা চার বছরে হ্রাস ক'রে আর-সকলের দণ্ড সমর্থন করে হাইকোর্ট।

ফরিদপুর ঃ গোপালগঞ্জ— সন্ত্রাস-দমন-আইনে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যর, ১৯৩৫ মে ২৮-এ, তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

নোয়াখালি ঃ ডাকাতিতে লুণ্ঠিত মাল রাখায় (দণ্ডবিধি ৪১২ ধারা), মুক্‌লেশ্বর রহমানের, ১৯৩৫ জুন ৮-ই, পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাস ঘটে।

ময়মনসিংহ ঃ জীবিকার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় না-থাকায়, ১৯৩৫ জুন ১২-ই, সুনীলকুমার দত্ত রায়ের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

জলপাইগুড়ি ঃ বক্সা— ক্যাম্পের দুই বন্দী—জ্ঞানাঞ্জন লাহিড়ী ও সুশীলকুমার সরকারের ওপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে বদলির হুকুম হয়। ক্যাম্প-অফিসে মালপত্র তল্লাসীর সময় সুশীলের সুটকেসের মধ্যে জ্ঞানাঞ্জনের এক ফটো পাওয়া যায়। বাঁধানো ছবির ফ্রেম খুলে ২৫০ টাকা পাওয়া যায়।

কাজ-দুটোই বে-আইনী বলে—জলপাইগুড়ি ফৌজদারী আদালতের বিচারে, ১৯৩৫ জুন ২৯-এ, প্রত্যেককে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম ঃ নিজ গৃহে বন্দী বীরেন্দ্রবিনোদ চক্রবর্ত্তীকে পুলিশ হঠাৎ একদিন আর খুঁজে পেল না। ১৯৩৪ নভেম্বর ১৫-ই, তাঁর গ্রেপ্তারের পরোয়ানা পুলিশ-গেজেটে প্রকাশিত হ'ল যে, ডিসেম্বর ২৭-এর মধ্যে হাজির হতে হবে। কিছু ফল হ'ল না।

১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী ১৭-ই কেরেঙ্গাঘাটে এক মেলাতে তাঁকে দেখতে পেয়ে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করে তখন তাঁর নাম হয়েছে 'বনমালী শর্ম্মা'। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে, ১৯৩৫ জুলাই ৫-ই, তাঁর পাঁচ বছর ও ছ'মাস সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারী ২১-এ হাইকোর্ট তাঁর আপীল নাকচ করে।

চট্টগ্রাম ঃ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সন্দেহে ক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোয়—১৯৩৪ আগষ্ট ৬-ই। বাড়ী গিয়ে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। আগষ্ট ১৩-ই ক্ষীরোদের পলায়নবার্ত্তা 'গেজেটে' প্রকাশিত হয়, এবং পনেরো দিনের মধ্যে হাজির হবার আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশের নকল আগষ্ট ২২-এ ক্ষীরোদের পিতৃগৃহে লটকে দেওয়া হয়েছিল।

তখনও তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ১৯৩৫ জানুয়ারী ২৮-এ, চব্বিশ-পরগণার ক্যানিং টাউনে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। চট্টগ্রামের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৯৩৫ জুলাই ৫-ই, আসামীর ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। ডিসেম্বর ১৭-ই হাইকোর্ট আসামীর আপীল নাকচ করে।

ঝরিয়া ঃ মাঝে মাঝে চেষ্টা হলেও, শেষপর্য্যন্ত কিছু ঘটে ওঠেনি। এবার, ১৯৩৫ জুন ১-লা, একটা ডাকাতির যোগাযোগ করা হয়েছিল। পুলিশ খবর পেয়ে তল্লাসী চালায় এবং বিভিন্ন স্থান থেকে বাঁশী-আকারের ছোরা, আপত্তিকর সাহিত্য ও ষড়যন্ত্র-সংক্রান্ত চিঠিপত্র হস্তগত করে।

ঝরিয়ার অতিরিক্ত ডেপুটী কমিশনারের বিচারে, ১৯৩৫ জুলাই ২৭-এ, একজনকে পাঁচশ' টাকার জামিনে মুচলেকাবদ্ধ করা হয়, এবং সুবোধচন্দ্র দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ সান্যাল ও দ্বিজপদ বিশ্বাস এই তিন আসামী প্রত্যেকের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

নদীয়া ঃ নবদ্বীপ— ১৯৩৫ মার্চ ৬-ই বুড়োশিব-মন্দির তল্লাসী করে একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ও আপত্তিজনক কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায়। মন্দিরের পুরোহিত ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য। তাঁর জবানবন্দীর ওপর মুরারিমোহন গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরও একজনকে জুটিয়ে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচার হয়।

আগষ্ট ২-রা প্রদত্ত রায়ে তৃতীয় ব্যক্তি মুক্তি পান। ক্ষুদিরাম আর মুরারি প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারী ২১-এ, আপীলের রায়ে হাইকোর্ট দু'জনেরই দণ্ড বহাল রাখে।

দিনাজপুর ঃ কালীতলা— ডাকাতি হ'ল, ১৯৩৫ জানুয়ারী ২৬-এ। প্রমাণাদি সংগ্রহ হবার পর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার সমাপন করে ১৯৩৫ আগষ্ট ১০-ই দু'জনকে মুক্তি দেন এবং মনোরঞ্জন সেনের চার এবং হৃষীকেশ মিত্র ও চৈতন্য দাস প্রত্যেকের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান দেন।

বাঁকুড়া ঃ লক্ষ্মীসাগরের এক বাড়ীতে ১৯৩৫ এপ্রিল মাসে তল্লাসী করে কার্ত্তুজের ক্যাপ্, একটা টোটা ও বারুদহীন কার্ত্তুজ উদ্ধার করা হয়। বিচারে আগষ্ট ২৮-এ, নারায়ণচন্দ্র দাসের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটে একটা পিস্তল-সমেত ধরা পড়ায়, ১৯৩৫ আগষ্ট ২৯-এ, হরিদাস ভট্টাচার্য্যর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

মেদিনীপুর ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গের অপরাধে, ১৯৩৫ সেপ্টেম্বর ৩০-এ, অনন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

রাজসাহী ঃ কুমারপাড়ায় হরিগোপাল গোস্বামীর হেপাজতে কতকগুলি কার্ত্তুজ আবিষ্কৃত হওয়ায়, ১৯৩৫ অক্টোবর ১-লা, আসামীর তিন বছর সশ্রম কারাবাস হয়।

ঢাকা ঃ সূত্রাপুর— গুপ্তচর যদি বিপ্লবীর ভেক ধরে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে, তাহলে বিপ্লবী-সংস্থার মহা বিপদ। কয়েকজন বিপ্লবী-সন্দেহে সূত্রাপুর অঞ্চলে আটক-বন্দী অবস্থায় ছিলেন। সন্দেহ হ'ল—হীরালাল চক্রবর্ত্তী এঁদের ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখছেন, অথচ তাঁর ওপরে থানায় হাজিরা দেওয়ার সরকারী নির্দ্দেশ রয়েছে। সে-কারণে প্রতি বুধবার বেলা একটায় সূত্রাপুর থানা এবং দু'টায় পুলিশ-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। একই দিনে দু'জায়গায় হাজিরা-ব্যবস্থা বিপ্লবীদের সন্দেহের উদ্রেক করে। ফলে, ১৯৩৫ জুলাই ৩-রা টিকাটুলির পথে ছোরা দ্বারা তাঁকে হত্যা করা হয়।

এ-ব্যাপারে অমূল্যকুমার রায় ও পরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে ১৯৩৫ সেপ্টেম্বর ১০-ই প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ডিসেম্বর ৩-রা এ-দণ্ড হাইকোর্ট কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পরিণত হয়।

কলিকাতা ঃ অন্তরীণ অবস্থা থেকে পালাবার অপরাধে আলিপুর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৫ অক্টোবর ৩০-এ প্রফুল্লকুমার সেনের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

ফরিদপুর ঃ কোহেলদিয়া— দণ্ডকেণ্ডুয়ার ছোট-দারোগার (এ.এস্.আই.) একটা রিভলভার চুরি যায়। তার ওপর, ১৯৩৫ মে ১১-ই তারিখে সংঘটিত কোহেলদিয়ায় ডাক লুণ্ঠিত হলে, ন'জনকে আসামী করে মামলা আরম্ভ হয়।

১৯৩৫ নভেম্বর ২৩-এ, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার-শেষে তিনজনের সাত বছর করে এবং দু'জনের পাঁচ বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। হাইকোর্টে আপীলের রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩৬ জুন ১-লা।

কৃপানাথ দে ও নির্ম্মলেন্দু গুহর পূর্ব্বদণ্ড সশ্রম সাতবছরটা পাঁচবছরে এবং যোগজীবন দত্তর সাতবছরটা তিনবছরে পরিণত হয়। অতুল দত্ত (সেন রায়)-এর চারবছর অপরিবর্ত্তিত থাকে। একজনের পাঁচবছরটা দু'বছর সশ্রম দণ্ড এবং তিনজনকে সন্দেহের অবকাশে (benefit of doubt) মুক্তি দেওয়া হয়। একজনের প্রথম দণ্ডকাল থেকে আপীলের রায় পর্য্যন্ত অবরোধ-অবস্থা দণ্ডের মেয়াদ বলে গ্রহণ করে মুক্তি দেওয়া হয়।

ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে নিখিলচন্দ্র ঘোষের নাম পাওয়া যায়। উপরে বর্ণিত যে-সকল আসামীর মামলা একসঙ্গে হয়, সম্ভবতঃ নিখিলের মামলা সেই সময়েই হয়েছে। তাঁর দণ্ডভোগকাল চার বছর সশ্রম বলে প্রকাশ।

ফরিদপুর ঃ নরহত্যার প্রস্তুতি, অস্ত্রসংগ্রহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯৩৫ নভেম্বর ২৩-এ অতুলচন্দ্র দত্তর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ বঙ্গীয় সন্ত্রাস-দমন-আইনে কার্ত্তিকচন্দ্র দাসের ১৯৩৫ ডিসেম্বর ২১-এ তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মরণ-যজ্ঞ

বিহারীলাল বড়ুয়া ঃ 'পুলিশ গেজেটে' প্রচারিত হয় যে, রাওজানের বিহারী-লাল বড়ুয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে ১৯৩৪ অক্টোবর ২৮-এ তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। গভর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করে আত্মসমর্পণ না-করার অপরাধে, সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে ১৯৩৫ জুলাই ৫-ই আসামীকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। হাইকোর্টে আপীলের ফলে, ডিসেম্বর ১৬-ই সেটা তিন বছরে পরিণত হয়।

কয়েদী অবস্থায় বিহারীলালের যক্ষ্মারোগ প্রকাশ পায়; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁকে মুক্তি দেয়নি। ১৯৩৭ নভেম্বর ২৭-এ স্বয়ং ধর্ম্মরাজ এসে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সব বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে যান।

ননীগোপাল সরকার ঃ ননীগোপাল সরকার, ১৯৩১ ডিসেম্বর ১১-ই, গ্রেপ্তার হয়ে স্থানীয় জেলে আবদ্ধ থেকে, সপ্তাহ-পাঁচেকের মধ্যে বহরমপুর-ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হন। সেখান থেকে ১৯৩৩ মার্চ ২৭-এ যশোহর কোটচাঁদপুরে অন্তরীণ হয়ে যান। অস্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। বহু দরখাস্ত ও আবেদন করে কোনও ফল হ'ল না। আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায় সেখানেই তাঁর দেহান্তর ঘটে।

শেষ পর্য্যায় (১৯৩৬—১৯৩৮)

বৈপ্লবিক বড় ঘটনা প্রায় শেষ হওয়ার অবস্থা। এর প্রধান কারণ—কর্ম্মীদের বিচারে বা বিনা-বিচারে বে-পরোয়া বৎসরের পর বৎসর আবদ্ধ করে রাখা। এর আগে দণ্ডিতের সংখ্যা এত বেশী আর কখনও হয়নি। ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ব্যাপক প্রয়োগে সাময়িকভাবে বিপ্লব-আন্দোলন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছিল। ১৯৩০ সালের অর্ডিনান্স-সাহায্যে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে বড় বড় সংগঠনকারী ও কর্ম্মী সবাই অপসারিত হয়ে যান এবং ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত বেশ কয়েকজনকে জেলে থাকতে হয়। বিনা-বিচারে বন্দীদের মুক্তি আরম্ভ হয়—১৯৩৪ জুন মাস থেকে। এঁদের মধ্যে অনেকেই বারে বারে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন; আজ তাঁরা ক্লান্ত। ১৯২৮-২৯ সাল থেকেই নতুন নতুন রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক, কৃষক, যুব ও ছাত্র সংস্থা গড়ে উঠেছে। যাঁরা বিপ্লবী-দলে এসে গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করতে পারতেন, তাঁদের অনেকেই এইসকল প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে গেলেন। বড় করে প্রশ্ন ওঠে যে, কেবল সন্ত্রাসের সাহায্যে স্বাধীনতার পথ যতটা উন্মুক্ত হবে, কেবল সেইটাই ধরে না রেখে, নানা দিক থেকে জাতকে সংগ্রামের জন্য আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। অবশ্য এই ব্যাপারে যাঁরা নিজ নিজ স্বার্থে, অর্থাৎ বিরাট শিল্পের, জমির এবং সম্পদের মালিক হওয়ায় ইংরেজকে সম্পূর্ণ বিতাড়নের কথা ভাবতে পারেন না, সুতরাং তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালাবার দল গড়ে উঠতে থাকে। এ-সময়ও ধনীর সমর্থক বলে কংগ্রেসের মধ্যে এক্ দলের কাছে যথেষ্ট দুর্নাম ছিল। তাঁদের বিপক্ষেও এক মত গড়ে উঠতে থাকে।

এইসঙ্গে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব ও রূপায়ণ-প্রচেষ্টা চলতে থাকে। মডারেট বা নরম দল চিরকালই শাসনযন্ত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলেই আনন্দিত; এখন, কংগ্রেসও ধীরে ধীরে এর মধ্যে এসে পড়তে থাকে। ১৯৩৫ আগষ্ট ২-রা 'ভারত-শাসন-সংস্কার বিল' পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়ে যায়। সুতরাং জনসাধারণের মন থেকে বড় বিপদের ঝুঁকি নেবার সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে।

১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের যে-কয়টি ঘটনার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, তার পিছনে খুব বড় ষড়যন্ত্র ও সংগ্রামের প্রস্তুতি যে নেই, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

এসব ছাড়া, বিপ্লবী-দলও এত খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যে, তাদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করা আর সম্ভব হচ্ছিল না।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস-অধিবেশন। আসন্ন নির্ব্বাচনের জন্য ইস্তাহার প্রকাশিত হয়—১৯৩৬ আগষ্ট মাসে। দ্বিতীয় মহাসমর বাধলে, ভারত তাতে কোনও অংশগ্রহণ করবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ-ধারে সব সত্যাগ্রহ প্রায় বন্ধ হয়েছে—১৯৩৪ মে ৫-ই থেকে। ১৯৩৫ আগষ্ট ২-রা 'ভারত-শাসন-সংস্কার বিল' পার্লামেণ্টের অনুমোদন লাভ করে।

১৯৩৬ সালে ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনে বোঝা গেল দেশের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রসারলাভ করছে। আর, কংগ্রেসের ভিতর থেকে কংগ্রেস-সদস্য-প্রধান রাজ্যগুলিতে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে সম্মতিদানের শলা-পরামর্শ বলবান হয়ে উঠছে।

এইসব কারণে সশস্ত্র-বিপ্লব-আন্দোলন বেশ খানিকটা দুর্ব্বল হতে থাকে। প্রদীপের তেল পুড়ে শেষ হয়ে আসছে,—ভিজে সলতে যতক্ষণ জ্বলেছে, সে-সময়টা নিষ্প্রভ আলোর শিখা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘটনা-প্রবাহ

মেদিনীপুর : বঙ্গীয় সন্ত্রাস-দমন আইনে সতীশচন্দ্র সেনাপতির, ১৯৩৬ জানুয়ারী ৬-ই, চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

ঢাকা : 'আটপাড়া রোড ডাকাতি' সম্পর্কে কেওটখালির অনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তীর, ১৯৩৬ জানুয়ারী ৩০-এ, পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

দিনাজপুর : বারে বারে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের আদেশ সত্ত্বেও দিনাজপুরের নরেন্দ্রনাথ ঘোষকে হাজির হতে দেখা গেল না। শেষপর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলে, প্রথম দফায় 'বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন' অনুযায়ী, ১৯৩৬ জানুয়ারী ২৭-এ, একদফা পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

এরপরই কয়েকটা ডাকাতির ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত বলে মার্চ ২৩-এ আবার দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ফরিদপুর : আব্দুল জব্বর (জীবন) মোল্লার ওপর বহুদিন থেকেই পুলিশ খরদৃষ্টি রেখে চলেছে। ফরিদপুর (গোবিন্দপুর) কংগ্রেস অফিসে একটা বোমা আবিষ্কৃত হয়। এ ব্যাপারে আব্দুলকে জড়িয়ে, ১৯৩২ ফেব্রুয়ারী ১৩-ই, তাঁর তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীলে সেটা আড়াই বছরে দাঁড়ায়।

এবার বিস্ফোরক-আইন-ভঙ্গের বিচারে, ১৯৩৬ মার্চ ১৮-ই, ঈশান-গোপালপুরের একটা পরিত্যক্ত বাড়ীতে দুটো পিতলের বোমার খোল, খানিকটা এ্যাসিড প্রভৃতি পাওয়া গেল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে মারবার জন্য তোড়জোড় চলছিল। জীবন মোল্লার সঙ্গে কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও আর-একজনকে জড়িয়ে যে মামলা হয়, তাতে প্রত্যেকের পাঁচ বছর ও অতিরিক্ত পাঁচ বছর সমকালীন-ভোগ দণ্ড হয়। ১৯৩৭ জানুয়ারী ১৫-ই হাইকোর্ট তৃতীয় আসামীকে মুক্তি দেয় এবং অপর দু'জনের দণ্ড পূর্ণ সমর্থন করে।

ফরিদপুর : বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে রত্নেশ্বর শীলের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়—১৯৩৬ ফেব্রুয়ারী ১৮-ই।

কলিকাতা ঃ গৌরীবেড়ে— সহরের উত্তরাঞ্চলে গৌরীবেড়ে লেনের একটা বাড়ীর ওপর পুলিশ খরদৃষ্টি রেখেছিল। ১৯৩৬ জানুয়ারী ৭-ই, সন্ধ্যা ৫-৪৫ মিনিটের সময় এক ভদ্রলোক ঐ বাড়ী থেকে এসে যখন উল্টাডাঙ্গার পুল পর্য্যন্ত গেছেন, সে-সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। দেহ-তল্লাসীতে একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল পাওয়া যায়।

ধৃতব্যক্তি প্রফুল্লকুমার বিশ্বাসের ৪৭।১-নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ী ঐ রাত্রে তল্লাসী হয় এবং পরদিন (৮-ই) বেলা ১-টা পর্য্যন্ত চলে। তখন প্রফুল্ল পুলিশকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়, ৪৫-নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। সেখানে কয়েকটা কার্ত্তুজ পাওয়া গেল। তারপর সদলবলে ৫৬।১-নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে ঊষার বাসায়। সেখানে যখন পুলিশ দাঁড়িয়ে—তখন হঠাৎ সুধীর এসে উপস্থিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবস্থা যখন বেশ জটিল তখন ঊষা এসে পৌঁছুলেন। তখন কাশীপুরে ১০।৩-নং প্রাণনাথ চৌধুরী লেনে সুধীরের বাসা-তল্লাসীতে (জানুয়ারী ৮-ই) একটা বড় ছোরা ও নানা আপত্তিকর মাল পাওয়া গেল।

এত মালমশলা পাবার পর মামলা আরম্ভ হ'ল। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৬ মার্চ ২৩-এ—(১) ঊষারঞ্জন দে, (২) সুধীরচন্দ্র রায় ও (৩) চিন্তাহরণ দাস —প্রত্যেকের পাঁচ ও অতিরিক্ত পাঁচ বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রফুল্লকুমার বিশ্বাসের ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

অপর দুই আসামী প্রত্যেকের ছ'মাস কারাদণ্ড হয়।

হাইকোর্ট আপীলের রায় দেয়—মে ২৫-এ। ঊষা, সুধীর ও চিন্তাহরণের দু'দফা পাঁচবছরের বদলে একটা পাঁচবছর দণ্ড বহাল থাকে (ফল কিন্তু একই)। প্রফুল্লর দণ্ড সমর্থিত হয়।

ত্রিপুরা ঃ বাখরা-র নিত্যহরি সেনের কাছে নিষিদ্ধ অস্ত্র পাওয়া গেলে, ১৯৩৬ এপ্রিল ১৬-ই, ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রদত্ত রায়ে তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ময়মনসিংহ ঃ বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্যবিধির ধারায়, ১৯৩৬ মে ৫-ই, মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

নোয়াখালি ঃ ফেণী— সহরের আশপাশে খুব কঠোরভাবে পুলিশ-চৌকি চলেছে। সন্দেহ—এই জায়গাটা বিপ্লবীদের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ১৯৩৬ এপ্রিল ৪-ঠা, রাত্রি ১-টার সময়, রেল-লাইনের শ'-দুই গজের কাছাকাছি সহদেবপুরে একটা ঝোপের আড়ালে তিনজন লোককে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। চৌকিদারদের দেখতে পেয়ে, অজ্ঞাত লোকগুলি ছুটে পালাবার চেষ্টা করে। পুলিশ পিছু নেয় এবং পলায়মানদের একজনকে প্রায় ধরে ফেলবার অবস্থা এসে

দাঁড়ায়। তখন হিমাংশু ভৌমিক রিভলভার ছুড়ে পালাবার চেষ্টা করেন। সে-সময় পাল্টা গুলি চললে, একটা বুলেট হিমাংশুর উরুদেশ বিদ্ধ করে। গুলির আঘাতে হিমাংশু ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। একেবারে হাতে-নাতে ধরা-পড়া। যে দু'জন পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা পরে ধরা পড়েন।

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের রায়ে, ১৯৩৬ জুন ১২-ই, হিমাংশুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। সেপ্টেম্বর ৪-ঠা হাইকোর্ট ঐ দণ্ড সমর্থন করে।

হিমাংশু ১৯৩৪ সেপ্টেম্বর থেকে পুলিশের হাত এড়িয়ে চলেছেন। শেষ-পর্য্যন্ত ধরা পড়ে দণ্ডভোগ করতে হ'ল।

ফরিদপুর ঃ মাদারিপুর দরগাখোলায় একটা দল অস্ত্রাদি সংগ্রহ করছিল। দলের একজন (পরে রাজসাক্ষী) তেঁতুলগাছের গর্ত্তের মধ্যে একটা রিভলভার লুকিয়ে রাখে প্রায় বছর-দুই। পরে এটিকে চন্দ্রশেখর পাঠককে দেওয়া হয়। পুলিশ-তদন্তে প্রকাশ পায়—এটি ১-নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড)-এর টি. আর. মার্শম্যান-এর সম্পত্তি।

সন্দেহবশে পুলিশের প্রথম তল্লাসী হয়—১৯৩৫ সেপ্টেম্বর ১৭-ই। পরে নভেম্বর ১৪-ই, গোপাল সরকারের বাড়ী একটা চাল-ভর্ত্তি কলসীর ভিতর থেকে একটা রিভলভার পাওয়া যায়।

বারোজনকে আসামী করে অস্ত্র-আইন-ভঙ্গ ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে মামলা হয়। ১৯৩৬ জুলাই ২৫-এ, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট তিনজনকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। একজনের এক বছর, দু'জনের প্রত্যেকের তিন এবং ছ'জনের প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে আপীলের রায়, ১৯৩৭ জানুয়ারী ২৭-এ, প্রকাশিত হয়। এক বছর ও তিন বছর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা মুক্তি পান। দু'জনের দণ্ড পাঁচ থেকে দু'বছরে পরিণত হয়। আর, (১) হরিপদ পাটনী (সরকার), (২) চন্দ্রশেখর পাঠক, (৩) গোপাল সরকার ও (৪) রঞ্জিৎ রায়চৌধুরী —এই ক'জনের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড সমর্থিত হয়।

ঢাকা ঃ 'মাকুহাটি ডাকাতি'র অভিযোগে, ১৯৩৬ আগষ্ট ২৫-এ, সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পাঁচ বছর ও তিন বছর সমকালীনভোগ সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটের ওপর একটা রিভলভার ও কয়েকটা কার্ত্তুজ সমেত ধরা পড়লে, ১৯৩৬ আগষ্ট ২৬-এ হরিদাস ভট্টাচার্য্যর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

চট্টগ্রাম ঃ আটকরণ লেনে হীরেন্দ্রকুমার মজুমদারকে একটা পিস্তল ও কয়েকটা তাজা কার্ত্তুজ সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে,

১৯৩৬ অক্টোবর ২-রা, হীরেন্দ্রর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। নভেম্বর ৩-রা আসামীর দণ্ড হাইকোর্ট কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়।

হুগলী ঃ বৈদ্যবাটী— ১৯৩৩ জুন ১৭-ই, বৈদ্যবাটীর নন্দ কর্ম্মকারের বাড়ী একটা বড়রকমের ডাকাতি হয়। এ-ঘটনায় নন্দ ও তাঁর মা নিহত হন।

নরহত্যা, ডাকাতি ও ষড়যন্ত্র মিলিয়ে, ন'জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ১৯৩৫ মে ৩১-এ, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রদত্ত রায়ে—একজনের সাত, তিনজনের ছয়, দু'জনের পাঁচ, একজনের চার ও দু'জনের তিন বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে আপীলের ফলে সব বিচার বাতিল করা হয়, কারণ গভর্ণমেণ্টের বিশিষ্ট নির্দ্দেশ ছাড়া স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা বিচার করতে পারেন না।

এবার স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে মামলা ; রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩৬ অক্টোবর ১০-ই। তাতে একজনের সাত, একজনের ছয়, চারজনের পাঁচ, আর একজনের দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। দু'জন মুক্তি পান।

• হাইকোর্টে আপীলের রায় বেরোয়—১৯৩৭ মে ৭-ই। তাতে—(১) নিতাই জানা-র পাঁচ, (২) জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার এবং (৩) রাধারমণ অধিকারীর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তা'ছাড়া একজনের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও তিনজনের মুক্তির আদেশ হয়।

রংপুর ঃ 'সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি-আইন-ভঙ্গ' অপরাধে, ১৯৩৬ মার্চ ৩১-এ, যতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মার চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

মরণ-যজ্ঞ

নীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য ঃ চট্টগ্রামের ধোরোলায় ছিল নীরেনের বাস। চটপটে ছেলে—দেশপ্রেমের নেশায় পড়েন এবং তার ফলস্বরূপ তাঁর জেল-বাস ঘটে। চট্টগ্রাম থেকে হুগলী জেলে তাঁকে পাঠানো হ'ল, সেখান থেকে যেতে হ'ল হিজলী-ক্যাম্পে।

অনিশ্চিৎ বন্ধনদশা তাঁর পক্ষে একটা গুরু দায় হয়ে উঠেছিল। চিরমুক্তির আশায় তিনি আলো-বাতাস-আসার জানালার (fan-light) গরাদের সঙ্গে দড়ি বেঁধে, ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারী ২৭-এ, আত্মহত্যা করেন।

সুধাংশুকুমার দত্ত ঃ চাঁদপুর হারারচরের সুধাংশুকে গ্রেপ্তার করে ১৯৩৪ আগষ্ট ৮-ই প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী করে রাখা হয়। সেখান থেকে যেতে হয় গ্রামের অন্তরীণে। রোগে রোগে জর্জ্জরিত অবস্থায় আইনের শত-বন্ধনের মধ্যে ১৯৩৬ মার্চ ১৭-ই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মণীন্দ্রনাথ উকিল : মণীন্দ্র ঢাকা এবং রংপুর দু'জায়গার কর্ম্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতিভাবান ছাত্র। পুলিশের কাছে অবশ্য তার কোনও দাম নেই।

মণীন্দ্র প্রথম গ্রেপ্তার হন—১৯৩০ সেপ্টেম্বর ২৬-এ ; অবস্থান : প্রেসিডেন্সী জেলে ; পরে ১৯৩১ মে ৩-রা হিজলী-ক্যাম্পে ; সেপ্টেম্বর ২-রা হাওদাবিটা জোট—খরিবাড়ী, দার্জ্জিলিঙ। শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, ১৯৩২ মার্চ ১১-ই, দার্জ্জিলিঙ জেলে স্থান পেলেন। ১৯৩৩ মার্চ ৩০-এ, হিজলী-ক্যাম্পে যেতে হ'ল। এইবার বাঙ্গলার বাইরে, ১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ১৪-ই দেউলী-ক্যাম্পে গেলেন। শরীর অবসন্ন এবং ক্রমেই অবনতির দিকে। ১৯৩৫ অক্টোবর ৭-ই টেনে আনা হ'ল প্রেসিডেন্সী জেলে। স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাতে হবে ; সুতরাং সদাশয় গভর্ণমেণ্টের আদেশে নভেম্বর ১-লা সিউড়ী জেলে যেতে হ'ল। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায়, ১৯৩৫ ডিসেম্বর ১১-ই, স্বগৃহে অন্তরীণ হয়েছিলেন। যখন ধরা পড়েন, মণীন্দ্রর সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল ; এ-ক'বছরে দেহ কঙ্কালসার হয়ে গেছে। ১৯৩৬ মে ১১-ই মৃত্যুর কৃপায় পুলিশের হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পান।

ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী : সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করে ময়মনসিংহের জামালপুর থানার মাদারগঞ্জে ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ননীগোপালের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অন্যস্থানে বদলি হবার চেষ্টা করেও তিনি বিফল হলেন।

১৯৩৬ এপ্রিল ১২-ই থেকে তাঁর ঘরে আর তাঁকে পাওয়া গেল না। পুলিশের রীতি অনুযায়ী তিনি হলেন পলাতক ; একবার ধরা পড়লে, তাঁর পাঁচ-সাত বছর জেল অবধারিত। সকল সন্দেহের নিরসন হ'ল যখন খরখরিয়া বিল (জলাশয়)-এ তাঁর গলিত শব ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেল।

তাঁর অন্তরীণ-গৃহে অনুসন্ধানে, কোটের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল ; তাতে লেখা রয়েছে : "আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে আর কেউ আমার জীবন বিড়ম্বিত করতে পারবে না।" কেন্দ্রীয় আইন-সভায় বহু প্রশ্ন করে এ-আত্মহত্যা (বা পিটিয়ে হত্যা)-র কারণ জানা যায়নি।

মাণিকলাল চক্রবর্ত্তী : পিতার নিবাস মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর থানার কেওটখালি। পুত্র মাণিক বহরমপুর-ক্যাম্পে বন্দী হয়ে রইলেন। তাঁর পীড়ার খবর কেউ শোনেনি ; তবে ১৯৩৬ মে ২২-এ তাঁর মৃত্যু-সংবাদ বহন করে এক পত্র পিতার নিকট প্রেরিত হয়েছিল।

বনলতা দাশগুপ্ত : চট্টগ্রামের মেয়ে বনলতা ১৯৩৫ সেপ্টেম্বর ৫-ই প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী হলেন। সেখান থেকে হিজলী-ক্যাম্প ; পরেই হিজলী জেলে ১৯৩৫

জুন ২৭-এ থেকে। শরীরের অবস্থা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়েছে ; উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। শেষপর্য্যন্ত, ১৯৩৬ জুন মাসে তাঁকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জুলাই ১-লা সেখানেই তাঁর দেহাবসান ঘটে।

নবজীবন ঘোষ ঃ মেদিনীপুরের এই ঘোষ-পরিবারটি বৈপ্লবিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে—জেল, হাজত, ফাঁসি প্রভৃতি সকল নির্য্যাতনই সহ্য করেছে। শেষকালে নির্ম্মলজীবনের ভাই নবজীবন ঘোষকে ১৯৩৩ নভেম্বরে তাঁর 'দেশভুঁই' মেদিনীপুর থেকে নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হয়।

বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এই অজুহাতে তাঁকে ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ২৭-এ কলিকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়। প্রমাণ কিছুই নেই, সুতরাং চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হাজতে না পাঠিয়ে, সরাসরি মুক্তি দেন। পুলিশ কিন্তু ছাড়লো না। বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে গ্রেপ্তার করে তাঁকে বহরমপুর-ক্যাম্পে ঠেলা হ'ল। সেখান থেকে, ১৯৩৬ মার্চ ৩০-এ, ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থানা এলাকায় অন্তরীণে পাঠানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ কিছু না-থাকায়, এপ্রিল মাসে দু'দিনের ছুটিতে তাঁকে বাড়ী আসতে দেওয়া হয়।

ফিরে গেলেন ছুটির মেয়াদ অন্তে। তারপরই সরকারী বিজ্ঞপ্তি যে, নবজীবন আত্মহত্যা করেছেন। স্থানীয় লোকে বললেন যে, দারোগার সঙ্গে প্রায়ই বিতণ্ডা হ'ত এবং একদিন সহনাতিরিক্ত প্রহারের ফলে বন্দীর প্রাণহানি ঘটে। তিনি দু'খানি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন, তন্মধ্যে একখানি তাঁর পিতার উদ্দেশে লেখা। এ-কথা পুলিশও স্বীকার করে। বহু অনুরোধ ও অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও সে-চিঠি তাঁকে দেওয়া হয়নি। ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ হত্যা ছাড়া আর-কিছুই নয়।

সন্তোষচন্দ্র গাঙ্গুলী ঃ ঢাকা কলেজের এম্.এস্.-সি. শ্রেণীর ছাত্র সন্তোষ ১৯৩০ সালে বেঙ্গল অর্ডিনান্স-এর প্রয়োগে কারারুদ্ধ হন। এরও আগে, ১৯২৬ জুন ১৯-এ ধরা পড়ে ১৯২৮ সালে মুক্তিলাভ করেন।

শেষবারে তাঁকে দেউলী-ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল। একাদিক্রমে ছ'বছর কাটলো—মুক্তির কোনও কথা নেই। তিনি তাঁর মায়ের পীড়া এবং সাংসারিক অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য দীর্ঘ এক পত্র লেখেন। তার পরের দিন, ১৯৩৬ অক্টোবর ১৭-ই, গলায় ফাঁস দিয়ে তিনি আত্মহত্যায় সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়েছিলেন।

কৃষ্ণপঙ্কজ গোস্বামী ঃ মালদহের কৃষ্ণপঙ্কজকে ১৯৩৪ সালে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখা হয়। পরে তাঁর নিজ বাড়ীতে অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণর আটক অবস্থা তাঁর জীবনে বিতৃষ্ণা এনে দেয়। পুলিশের উপদ্রবে বিব্রত, কর্ম্মহীন জীবনের অবসান হয়েছিল—১৯৩৬ নভেম্বর ২২-এ, গলায়-দড়ির সাহায্যে।

মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস ঃ ১৯৩৬ সালে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে চট্টগ্রাম-

পুলিশের বিষনজরে পড়ে স্বাধীনতা হারালেন। তিনি বিপ্লবীদের নানা ভাবে সাহায্য করতেন এবং পলাতকদের গোপন-আশ্রয়-সংগ্রহকার্য্যেও তাঁকে পাওয়া যেত। পুলিশ গ্রামের অন্তরীণ অবস্থা থেকে জেলে আটক রাখার ব্যবস্থা করে। তাঁর মর্য্যাদার উপযুক্ত ব্যবহার না-পাওয়াতে তিনি অনশন আরম্ভ করেন। সেই অবস্থায় জেলের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে ('চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ—১৯৩০ আলেখ্যমালা' হইতে গৃহীত সূত্র)।

প্রতিশোধ

ফরিদপুর ঃ কোতোয়ালীপাড়ার ঘাঘোর ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানী কালীপদ ভট্টাচার্য্য বালিয়াডাঙ্গা স্কুলের প্রধানশিক্ষককে সংবাদ দেন যে, রাজদ্রোহমূলক কাগজপত্র সেখানে গোপনে বিলি হচ্ছে। ঐ স্কুলের ছাত্র আশুতোষ ভরদ্বাজ এ তথ্যটি সংগ্রহ করেন।

১৯৩৫ জুন ৪-ঠা, সন্ধ্যা ৭-টার সময় যখন কর্ম্মস্থল থেকে ফিরছেন তখন অমূল্যভূষণ চৌধুরী পিছন থেকে কালীপদর পিঠে ছোরা বসিয়ে দেন। পরদিন গোপালগঞ্জ হাসপাতালে কালীপদর মৃত্যু হয়।

আশুতোষ ভরদ্বাজকে ষড়যন্ত্রের অংশভাগী বলে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অমূল্যকে তখনকার মতো আর পাওয়া গেল না। হত্যা, হত্যার ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অভিযোগে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে ১৯৩৬ জানুয়ারী ২৭-এ (ভিন্নমতে ফেব্রুয়ারী ২০-এ) যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রদত্ত হয়। জুন ৪-ঠা হাইকোর্ট সে-দণ্ড বহাল রাখে।

অমূল্যভূষণ চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১৯৩৮ সালে। বিচারে ফেব্রুয়ারী ১১-ই তাঁরও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

ঘটনা-প্রবাহ

চট্টগ্রাম ঃ কুয়াপাড়া— ১৯৩৬ আগষ্ট ১৮-ই পুলিশ রাজেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে রাত্রিবাস করতে আসে। পরদিন সকালে এক সাব-ইন্সপেক্টর পাশের ঘরে সঙ্গীর কাছে টোটা-ভরা রিভলভার রেখে দিয়ে অন্যত্র যায়। দ্বিতীয় ভদ্রলোক একটি গুপ্তচরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায় এবং এসে দেখে বন্ধুর এবং তার নিজের রিভলভার, সঙ্গে বেল্ট, দড়িদড়া প্রভৃতি সব উধাও হয়ে গেছে।

রাজেশ্বরের এক খুড়ততো বা জাঠতুতো ভাইকে জিজ্ঞাসা করে পুলিশ জানতে পারে যে, একটা লাল চাদর গায়ে জড়িয়ে রাজেশ্বর পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ীর বাইরে গেছেন। পিছু ধাওয়া করে টের পাওয়া গেল—তিনি বন্ধু তেজেন্দ্রলাল সেনের বাড়ী গেছেন। সেখানে খোঁজ করে কাকেও পাওয়া গেল না।

পরদিন (২০-এ) তাঁকে এক সাম্পান চড়ে যেতে দেখে পুলিশ নৌকা নিয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করে। লম্বুর-হাটের কাছে রাজেশ্বর ডাঙ্গায় লাফিয়ে পড়েন এবং সেখানেই তিনি গ্রেপ্তার হন। ২১-এ সব বামাল উদ্ধার হয়েছিল তেজেনের বাড়ীর পাশের এক খানা থেকে।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩৭ ফেব্রুয়ারী ১০-ই। তাতে দুজনেরই সাত বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এপ্রিল ২৮-এ হাইকোর্ট দণ্ড কমিয়ে, রাজেশ্বরের তিন ও তেজেনের পাঁচ বছর করে দেয়।

কলিকাতা ঃ অপূর্ব্ব মিত্র লেন থেকে নিষিদ্ধ অস্ত্র আবিষ্কার করে মহাদেও মাহাতোকে আলিপুর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। ১৯৩৭ এপ্রিল ২৬-এ তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

চব্বিশ-পরগণা ঃ টিটাগড়— বাঙ্গলার বিপ্লব-আন্দোলনের সর্ব্বশেষ ষড়যন্ত্র হয়েছিল টিটাগড়ে। বহুসংখ্যক কর্ম্মী এই দলে জুটেছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র-সংগ্রহ, বোমা-তৈরী, বিপ্লব-মন্ত্রের প্রচার প্রভৃতি বহু দিকে লক্ষ্য রেখে যুবকের দল অগ্রসর হয়েছিল—গোপনসূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করে পুলিশ ১৯৩৫ জানুয়ারী ২০-এ টিটাগড়ে একটা বাড়ী তল্লাসী করে। সে-সময় একটা টোটা-ভরা রিভলভার উপরের ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সেটা পুলিশ টের পায়। পারুল মুখোপাধ্যায়কে বহুপরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্যাদি সমেত একটা ঘরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়; আর দেখা গেল স্তূপাকার কাগজপত্র পুড়ছে।

এই ব্যাপারে ঊনত্রিশজনকে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে হাজির করা হয়। রায় প্রদত্ত হয়—এপ্রিল ২৭-এ। একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, একজনের বারো বছর দ্বীপান্তর, একজনের দশ, একজনের আট আর একজনের সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হয়। এ ছাড়া, ছ'জনের পাঁচ বছর, দু'জনের চার বছর হিসাবে ও চার জনের তিন বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বারোজন আসামী নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন।

হাইকোর্টে আপীলের রায় প্রকাশিত হয়—১৯৩৮ মে ৯-ই। ট্রাইবিউন্যালের প্রত্যেকের দণ্ড সমর্থিত হয়; যথা—(১) পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ঃ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; (২) প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত ঃ বারো বছর দ্বীপান্তর; (৩) শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী ঃ দশ বছর সশ্রম; (৪) দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ঃ আট বছর সশ্রম; (৫) নিরঞ্জন ঘোষাল ঃ সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

(৬) শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত, (৭) হরেন্দ্রনাথ মুন্সী, (৮) কার্ত্তিকচন্দ্র সেনাপতি, (৯) জীবনকুমার মুন্সী, (১০) জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও (১১) ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম;

(১২) দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও (১৩) জগদীশচন্দ্র ঘটক—প্রত্যেকের চার বছর সশ্রম ;

(১৪) প্রীতিরঞ্জন পুরকায়স্থ, (১৫) পারুল মুখোপাধ্যায়, (১৬) বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য ও (১৭) সুধাংশুবিমল দত্ত—প্রত্যেকের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা ঃ চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু থেকে ১৯৩৭ ফেব্রুয়ারী ২৪-এ পুলিশ ঢাকার সুরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মণকে গ্রেপ্তার করে একটা টোটা-ভরা রিভলভার ও চৌদ্দটা তাজা কার্ত্তুজ উদ্ধার করে। বিচারে ১৯৩৭ মে ৭-ই তাঁর তিন ও চার বছর সমকালীন-ভোগ দণ্ডাদেশ হয়।

চট্টগ্রাম ঃ শ্রীপুরে পরেশ গুপ্ত-কে আটক-বন্দী করে রাখা হয়। একদিন তাকে ডেকে এনে পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কিরকম সে-সব প্রশ্ন করেন এক বিপ্লবী। ১৯৩৭ ফেব্রুয়ারী ১১-ই, ভোর ৪-১০ মিনিটে পরেশকে বাড়ী থেকে টেনে বার করে নিয়ে বেদম প্রহার করে বাড়ীতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এর কিছুক্ষণ বাদেই থানায় খবর পৌঁছায় যে, পরেশকে আগের রাত্রি ১১-১২-টার মধ্যে খুন করা হয়েছে। পুলিশ এসে দেখে পরেশ বাড়ীতেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। পুলিশ তাকে ১২-ই হাসপাতালে ভর্ত্তি করে। মার্চ ৫-ই পরেশ পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরে আসে।

খোঁজ করে অমূল্য আচার্য্যকে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে হাজির করা হলে, ১৯৩৭ জুন ১২-ই আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ডিসেম্বর ৯-ই হাইকোর্ট সেটা দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে পরিণত করে।

ফরিদপুর ঃ অনন্তচৈতন্য ব্রহ্মচারীকে অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে, ১৯৩৭ অক্টোবর ২২-এ, পাঁচ ও অস্ত্র-সংগ্রহের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ছ'বছর সমকালীনভোগ কারাদণ্ড প্রদত্ত হয়।

ফরিদপুর ঃ কালাগাঁও— পুলিশের মতে, এখানে একটা ষড়যন্ত্র গড়ে উঠছিল ১৯৩০ সাল থেকে। ক্ষেত্র হচ্ছে কালাগাঁও, পণ্ডিতসর, দেওভোগ, ছায়াগাঁও প্রভৃতি ; উদ্দেশ্য—মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ ও তৎসাহায্যে ডাকাতি করা।

মোট এগারোজনের বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জ্জ-শীট (charge sheet) দাখিল করে। ১৯৩৭ অক্টোবর রায় প্রদত্ত হয়। তাতে ছ'জনের প্রত্যেকের ছ'বছর, একজনের চার, আর দু'জনের প্রত্যেকের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। একজন 'দিঙ্গামাণিক মামলা'য় জেল খাটছিলেন—স্বতন্ত্র সাজা দেওয়া হয়নি। আর, এক-জনের দু'শ' টাকা অর্থদণ্ড হয়।

হাইকোর্টে আপীলের ফলে চারজনের মুক্তিলাভ ঘটে। তিনজনের জেলে আবদ্ধ অবস্থা দণ্ডকালে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি ঘটে।

শেষপর্য্যন্ত (১) কৃষ্ণকান্ত দেবদাস, (২) ফণীভূষণ বসু ও (৩) বেণুগোপাল পাল—প্রত্যেকের পূর্ব্ব আদালতের ছ'বছর কালটা চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে পরিণত হয়।

ঢাকা ঃ আর্মানিগোলার অবনীনাথ দাস ১৯৩৭ জুলাই ২৫-এ ঢাকা থেকে কলিকাতায় যাচ্ছিলেন। বাড়ী থেকে বেরিয়ে, ঘোড়ার-গাড়ীতে ষ্টেশনের কাছাকাছি যখন এসেছেন তখন তাঁর গাড়ী আক্রান্ত হয়। লুণ্ঠনকারীরা সংখ্যায় চারজন। দু'খানা সাইকেলের পিছনে একজন করে বসিয়ে নিয়ে এসেছেন; সাইকেল থেকে নেমে, ঘোড়ার মুখ ধরে গাড়ী থামিয়ে দেন। আসামী শিবপ্রিয় গাড়ীর মধ্যে উঠে অবনীর মুখ বেঁধে ফেলেন এবং তাঁর কোমরে বাঁধা সোনা-ভরা গেঁজিয়া খুলে নেবার পর সকলে চম্পট দেন।

পরে মামলা জোড়া হয়—(১) শিবপ্রিয় বসু, (২) শম্ভুনাথ সূত্রধর ও (৩) গৌরচন্দ্র সাহা দাসের বিরুদ্ধে। ১৯৩৭ নভেম্বর ৩০-এ—প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা হয়। ১৯৩৮ মার্চ ২৮-এ, হাইকোর্টে আপীলের প্রদত্ত রায়ে প্রত্যেকের দণ্ড তিন বছরে পরিণত হয়।

চব্বিশ-পরগণা ঃ অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে, ১৯৩৭ এপ্রিল ২৬-এ, সুবোধচন্দ্র ঘোষ ও নারায়ণচন্দ্র দাস ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যথাক্রমে চার ও পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

মরণ-যজ্ঞ

মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ঃ বাখরগঞ্জ জেলার মহেন্দ্রচন্দ্র রায়কে গ্রেপ্তার করে ১৯৩২ মার্চ ১২-ই রাজসাহী জেলে রাখা হয়। এপ্রিল ৩০-এ, সেখান থেকে বক্সা-ক্যাম্প। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে; সু-চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসের আবেদন করে বারে বারে বিফল হয়েছেন। শেষপর্য্যন্ত ১৯৩৬ মে ৩১-এ তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে আনা হয়। চিকিৎসায় কোনও ফল না-হওয়ায়, তাঁকে শেষসময়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেওয়া হয়। সেখানে ১৯৩৭ ফেব্রুয়ারী ৪-ঠা তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ খাঁটি বিপ্লবী বললে, মনে যে চিত্র ফুটে ওঠে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে যে মহামানবদের কথা সবিস্তারে মনে আসে, চব্বিশ-পরগণার সোনারপুর থানা এলাকায় মাহিনগর গ্রামের সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

যুগান্তর-দলের মধ্যেও তাঁর মেলামেশা ও পরিচয় ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজের জন্য যেটুকু দরকার তার বাইরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেত না। কোমলে কঠিনে যে অদ্ভুত সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে, তার তুলনা মেলা ভার। লক্ষ্য

স্থির রেখে তিনি চলতেন আপনার পথ বেছে নিয়ে। আসতো যারা কাছে, তারা ছেড়ে যেতে চাইত না—কি অভাবনীয় আকর্ষণী শক্তি ছিল তাঁর মধ্যে! দুর্ব্বলচিত্ততা বা কর্ত্তব্যে ত্রুটি হলে, মৃদু থেকে গুরু ছিল তাঁর শাসন। কিন্তু অন্তরের গভীর প্রেমের স্পর্শ যে পেয়েছে, তার পক্ষে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। চুম্বকের মতো টেনে রাখতেন তিনি, আর কর্ম্মীরা স্বেচ্ছায় তাঁর আদেশ-পালনে তৎপর থাকতো।

কম কথার মানুষ। বিপ্লবের ঘটনা তিনি একা বসে ভাবতেন, কোন্ পথে চলতে হবে, মনের মধ্যে ছবি এঁকে কাজে লাগাতেন নিখুঁতভাবে—"একলা চলো রে" ছিল তাঁর কর্ম্মপন্থার এক বিশিষ্ট পরিচয়। কলিকাতা এবং সহরতলীর কয়েকটা দুঃসাহসিক কাজ তাঁর নির্দ্দিষ্ট যুবকদের দ্বারা সংসাধিত হয়েছে, সে-কথা পুলিশও টের পায় ঘটনার অনেক পরে!

সাতকড়ির বন্দী-জীবন আরম্ভ হয়—১৯১৬ সাল থেকে। তাঁর মাহিনগরের বাড়ী তল্লাসী হয়—১৯১৬ মার্চ ৪-ঠা, এবং ভারতরক্ষা আইনে—ফেব্রুয়ারী ১৯-এ তাঁকে ময়মনসিংহে অন্তরীণ যাবার আদেশ হয়। তখন তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। রাহা-খরচের ব্যবস্থা না-থাকায়, তিনি যেতে রাজী হলেন না; উপরন্তু তিনি অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করেন। তখন হুকুম পাল্‌টিয়ে দেওয়া হয়। নানা স্থানে বন্দী-অবস্থায় কাটিয়ে, ১৯২০ সালে তিনি ঘরে ফেরেন।

তারপর নিরুপদ্রব অসহযোগ-আন্দোলনের শেষে যখন সশস্ত্র বিপ্লবের পুনরভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় গভর্ণমেণ্ট ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ করে, তখন ১৯২৪ অক্টোবর ২৫-এ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারও তাঁকে বেশ কয়েক বছর দূর-দূরান্তর গ্রামে বাস করতে হয়।

ফিরে এসে তিনি নিঃশব্দে তাঁর অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলে নেন। ১৯৩০ সালে যখন গুরুতর বিস্ফোরণ আরম্ভ হ'ল, তখন সেপ্টেম্বর ২৬-এ তাঁকে ফের গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন প্রেসিডেন্সী জেলে রেখে, ১৯৩১ মে ৪-ঠা তিনি মাহিনগরে স্বগৃহে অন্তরীণ হন। তাঁর বাড়ীতে থাকা গভর্ণমেণ্ট নিরাপদ মনে করেনি। ১৯৩২ মে ৪-ঠা ফের প্রেসিডেন্সী জেলে ফিরিয়ে এনে, ১৯৩৪ জানুয়ারী ৫-ই বক্সা-ক্যাম্প এবং ১৯৩৬ এপ্রিল ২৪-এ দেউলী জেলে পাঠানো হয়।

ঐ সময়টা তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। অর্শ থেকে অজস্র রক্তস্রাব হ'ত, সময় সময় এত রক্তস্বল্পতা ঘটতো যে, জীবনের আশঙ্কা দেখা দিত। দেউলীর শীত তাঁর সহ্য হচ্ছিল না, বিশেষ করে রক্তহীন অবস্থায়। জেলের বন্ধুবান্ধব তাঁর স্থানান্তরের জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজে কখনও আবেদন করেননি। আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ, পারিবারিক অর্থসাহায্য, অন্তরীণ বা জেলে দুরবস্থা, নিজের চিকিৎসা-বিষয়ে তিনি গভর্ণমেণ্টকে লিখে কখনও জানাননি। এবারও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। ১৯৩৭ জানুয়ারী ২৭-এ তিনি

কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং জেল-হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। এ-সময়ও প্রচুর রক্তস্রাব চলছে। দেউলীতে এ-চিকিৎসার কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। ফেব্রুয়ারী ৬-ই তিনি মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় নেন এবং সর্ব্বরোগের কবল থেকে মুক্তিলাভ করেন।

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম ঃ কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট-হত্যার পর, প্রফুল্লকে ১৯৩১ সালে গ্রেপ্তার করে থানা-হাজতে রাখা হয়। মামলার উপযুক্ত প্রমাণ না-থাকায়, ১৯৩২ মার্চ ২১-এ তিনি জেলে প্রেরিত হন। পরেই মে ৩০-এ চললেন হিজলী-ক্যাম্পে। গ্রেপ্তার হবার সময় তিনি ফয়েজুন্নেসা স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। জেলে ও বন্দী-নিবাসে থাকাকালে তিনি ইণ্টারমিডিয়েট ও বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৫ মে ৩-রা, হিজলী থেকে দেবীদুয়ার কাকসারে গেলেন। "হাওয়া-বদল" চলছে! এবার ১৯৩৬ এপ্রিল ১৭-ই গন্তব্যস্থান স্থির হ'ল ত্রিপুরা বানিয়াচঙে; তাঁর নিজ বাড়ীতে তিনি বন্দী হলেন। স্বাস্থ্য এমনিই ভেঙ্গেছে, তার ওপর তলপেটে এক গুরুতর ফোড়া ওঠে এবং ১৯৩৭ ফেব্রুয়ারী ২২-এ বন্দী-অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ঃ পাবনা উল্লাপাড়ার রবীন্দ্রকে ১৯৩১ ফেব্রুয়ারী ২৬-এ প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠানো হয়। নোয়াখালির হরিশপুর যাবার হুকুম হয়—১৯৩১ মে ৬-ই। এ হুকুম সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে তাঁকে কুমিল্লা জেলে পাঠানো হয়—১৯৩২ মার্চ ৮-ই। ক'দিন বাদেই, ৩১-এ হিজলী-ক্যাম্পে যাবার হুকুম আসে। ছ'বছর সেখানে থাকবার পর মুর্শিদাবাদ রাণীনগরে অন্তরীণ হলেন। সেখানে অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়; প্রায় মরণাপন্ন। ১৯৩৭ এপ্রিল ১৬-ই তাঁকে বাড়ীতে আটক রাখার ব্যবস্থা হয়; কিন্তু সব বাধা-নিষেধ অতিক্রম করে রবীন্দ্র আগষ্ট ২৬-এ মহাপ্রস্থান করেন।

রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ঃ কৃষ্ণনগরের রাজেনকে ১৯৩৬ মার্চ ১১-ই প্রেসিডেন্সী জেলে ভরা হয়। কয়েকদিন বাদে, অর্থাৎ ২৩-এ বহরমপুর-ক্যাম্পে প্রেরিত হন। নানা সর্ত্তে জড়িয়ে, তাঁকে ১৯৩৭ মার্চ ১২-ই বাড়ীতে আটক করা হয়। জীবনদীপ যে নিভে আসছে, গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিৎ জেনে, সর্ত্তগুলি অপসারণ করে একেবারে শেষকালে। ডিসেম্বর ২-রা তিনি "মুক্ত" হলেন—আর ৭-ই, অর্থাৎ পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর শব চৌকি দেওয়ার জন্য আর পুলিশের প্রয়োজন হ'ল না।

গোপাল মেরু ঃ মেদিনীপুরের বোরবল্লভপুরের গোপালকে ১৯৩৩ নভেম্বর ৩-রা মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ভরা হয়। ১৯৩৪ জানুয়ারী ২৫-এ তাঁর ওপর বহরমপুর-ক্যাম্পে যাবার আদেশ হয়। ধরা-পড়ার আগে থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন ছিল; এখন প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। দয়াপরবশ হয়ে গভর্ণমেণ্ট, ১৯৩৭ জুলাই ৩১-এ, তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ দেয়। অবস্থার কোনও উন্নতি লক্ষ্য করা গেল না। ডিসেম্বর ২৮-এ মৃত্যু এসে তাঁর সমস্ত দুর্ভোগের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল।

শেষ-শিখা (১৯৩৮)

ত্রিশবৎসরাধিককাল বোমা ও রিভলভার কাজ করে চলেছে ; কিন্তু এইবার যেন একটা অবসাদ এসে গেছে। যে পরিমাণ ত্যাগ, নির্য্যাতন-ভোগ ও আত্মবিলোপ চলেছে, একবার মনে হ'ল, প্রয়োজনের তুলনায় একটা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সবটাই নিবদ্ধ। বিপ্লব আরও ব্যাপক না-হলে, বিদেশী শাসকদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না।

গান্ধীজীর আন্দোলনে লোক যোগ দিয়েছে হাজারে হাজারে। সদ্য ফল কিছু দেখা না-গেলেও, বিদেশী শাসনের বিপক্ষে একটা ঘোর প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে। এসকল ঘটনা, যাঁরা এতকাল বিপ্লব-আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন এবং এখনও জীবিত, তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। যুগান্তর-দলের পক্ষে এক গোপন সভা হয়— ১৯৩৮ জুলাই মাসে। তাঁদের সিদ্ধান্ত হ'ল পথ বদলাতে হবে। তাঁরা যা চেয়ে এসেছেন, গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেস মন্থরগতিতে সেই পথেই চলেছে। সুতরাং তাতে শক্তি যোজনা করলে, তাড়াতাড়ি সুফলের আশা করা যায়। গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলে দেশের শাসনভার জনপ্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে।

অন্য দলের কথা বিশেষ জানা যায় না, তবে এ-সময়ে আগের পথ পরিবর্ত্তনের পক্ষে যে সকলেরই সমর্থন এসেছে, সেটা বোঝা যায়, কর্ম্মকাণ্ডের ধারা লক্ষ্য করলে (Appendix, পৃঃ ৬৭৪)। এ-হিসাবে মনে করা চলে যে, ১৯৩৮ সালেই সশস্ত্র বিপ্লবের শিখা মিলিয়ে যায়। এ-সময়ে বৈপ্লবিক কোনও ঘটনার পরিচয় নেই ; বন্দী অবস্থাতেই কয়েকজনের প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

ঘটনা-প্রবাহ

ত্রিপুরা ঃ বে-আইনী বিস্ফোরক রাখার অভিযোগে রেবতীমোহন সাহার ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারী ৯-ই সাত বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

নদীয়া ঃ বঙ্গীয় সন্ত্রাস-দমন-আইনে কুমুদরঞ্জন রায়ের ১৯৩৮ মার্চ ৩০-এ তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

মরণ-যজ্ঞ

হরেন্দ্রনাথ মুন্সী ঃ আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রে (পৃঃ ৬৬৭) হরেন্দ্রর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাঁকে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে ১৯৩৮ জানুয়ারী ২১-এ তিনি অনশন ধর্ম্মঘট করেন। নাকের ভিতর দিয়ে দুধ

দেবার চেষ্টায়, সেটা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। তার ফলে, ১৯৩৮ জানুয়ারী ৩০-এ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কালাচাঁদ সাহা : ঢাকার নারায়ণগঞ্জের কালাচাঁদকে ১৯৩৪ আগষ্ট ৯-ই গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলে আটক করা হয়। সেখান থেকে ১৯৩৪ নভেম্বর ১৩-ই হিজলী-ক্যাম্প এবং ১৯৩৭ মে ৮-ই বহরমপুর-ক্যাম্প ঘুরিয়ে, ১৯৩৭ নভেম্বর ১০-ই তাঁর বাড়ীতে অন্তরীণ করা হয়। মুক্তির জন্য আবেদন করে ফল হয়নি ; পুলিশের চৌকিদারি সমানে চলেছে। বন্ধন-দশা অসহ্য মনে হওয়ায়, ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই তিনি আত্মহত্যা করে সকল বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

নির্ম্মল দাশগুপ্ত : ১৯৩২ জানুয়ারী ৬-ই নির্ম্মলকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়। মে ১২-ই বক্সা-ক্যাম্প ; ১৯৩৩ এপ্রিল ৫-ই প্রেসিডেন্সী জেল ; নভেম্বর ৪-ঠা দেউলী জেল। সেখান থেকে ১৯৩৫ জুলাই ১৫-ই প্রেসিডেন্সী জেল। এবার জেলের বাইরে, ১৯৩৬ মার্চ ১৩-ই, দিনাজপুরের পার্ব্বতীপুরে তাঁকে অন্তরীণ করা হয়। স্থান-বদল করে জুলাই ১০-ই ঐ জেলারই ঘোড়াঘাট থানায় দেওয়া হয়। নানা বাধা-নিষেধের মধ্যে, ১৯৩৭ ডিসেম্বর ১২-ই তাঁকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হয়েছিল, ১৯৩৮ মার্চ ১৩-ই ক্যাম্পবেল (নীলরতন সরকার) হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটবার জন্য।

দিবাকর পাত্র : বিপ্লব-সংক্রান্ত কাজের মধ্যে দিবাকরের বিশেষ পরিচয় ছিল— 'কোথায় কি হবে, কি হচ্ছে' এইজাতীয় খবর জানবার আগ্রহ। ১৯৩০ নভেম্বর ১৯-এ তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে বন্ধ করা হ'ল। তারপর ১৯৩১ মার্চ ৬-ই হিজলী-ক্যাম্প। সেখান থেকে ডিসেম্বর ৪-ঠা ফের প্রেসিডেন্সী জেল। ১৯৩২ সেপ্টেম্বর ২৩-এ তিনি দেউলীতে প্রেরিত হলেন। প্রায় তিন বছর সেখানে থাকার পর, আবার প্রেসিডেন্সী জেলে আনা হয়। ১৯৩৮ মে ২৯-এ তাঁকে সর্ত্তাধীনে যখন বাড়ী পাঠানো হয়, তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। ক'দিন বাদে, জুন ১১-ই তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী : অপরিণতবয়স্ক গণেশকে ১৯৩৪ মে ১-লা গ্রেপ্তার করে কুমিল্লা জেলে বন্ধ করা হ'ল। আগষ্ট ১৫-ই হিজলী-ক্যাম্পে এবং ১৯৩৭ এপ্রিল ১৯-এ বহরমপুর-ক্যাম্পে ভরে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নিবাস বরিশালে ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারী ১২-ই অন্তরীণ করা হলে, চিরমুক্তির জন্য যেটুকু বাকি ছিল, ১৬-ই জুন টাইফয়েড জ্বর সে-কাজ সম্পূর্ণ করে দিল।

APPENDIX

Dr. Jadugopal Mukherjee's statement issued in July, 1938 (dissolving the *Jugantar Party*) :

"Some of my friends and colleagues, who have for many years in deportation, internment and imprisonment have recently been released. ....

* * *

"Their present feeling and sentiment are and must be quite different from those that inspired them at the dawn of the century. Even then they felt that the freedom movement had not come a moment too soon. India must take up her rightful place in the comity of nations. She must play her part in the evolution of the nobler type of human beings.

"The history of civilization is the history of the conquest of nature by man. Man's conquest of nature can never be complete if he remains satisfied only with his mastery over these forces of nature which are external to him. Here lies the inherent urge in man for the eternal struggle to be free from all kinds of bondage—political, social, and economic. Like man each nation has the inherent tendency to grow according to its own genius so that ultimately the happy consummation of the free associations of free men may actually come about. Thus, the regional cultures like the rivers entering the sea, will ultimately merge and by their contributions enrich the general fund of world culture. This ideological background, particularly the interpretation of history then current will go a long way to explain how the past contributions of my friends have helped to evolve the struggle to the stage where we find it today.

"It was this band of devoted workers who lifted the cult of suffering patriotism to a higher and sublimer level of self-effacement. The loss of the last century's fight for Indian freedom brought home to them that *without mass support such a fight it is bound to fail.* With the definite objective already in view to approach wider and wider rings, they began to cover new milestones literally with their life and relentless activities, the undertone of which was the absolute independence of India. A new opportunity came during the World War. Though they had a fair prospect of getting advantage of what each of the belligerent sides was doing to deal a knockout blow at the

other's empire, they did not entertain the day-dream that Indian independence was at hand. What they really and directly sought was *self-immolation, the surest means to bring the struggle to the door of the masses.* An apparent failure brought success in an unforeseen way. The war-time activities of these workers brought Gandhiji to the arena of the Indian revolution via the Rowlatt Act. My friends then coming out of prison and exile ascertained personally from Ganahiji that the conditions fulfilled, it was his idea to declare the Congress as the free republican government of India. They then carried the message of this mass awakening far and wide. Through checks and movements of adverse character they ultimately came to the year 1930. The pressure brought and the atmosphere created in the previous years led directly to this phase of the mass struggle. A spirit of resistance kept up the morale of the masses. National humiliation maddened the Indian youth. The happenings of the period brought an extraordinary repression. But the intensive character that the struggle thus attained only foreshadws the potentiality of the extensive movement on the brink of which the country stands at the moment.

"Economic forces have of course been operating throughout at the bottom. New incentives are at work today. New stirrings are already apparent even among the Indian masses. Just at the moment when they are already hearing of the tremendous growth of the productive forces, they are already becoming aware of the vision of the classless society that these forces have brought within the range of the possibility of actual realisation. The potentially revolutionary masses are thus being arrayed on the border line between the deep despondence of the present and the bright hope of the future. It is, therefore, the immediate task of those sincere fighters who have lived and suffered for a revolution in mass interest to develop mass leadership and mass action in this phase of the fight against Imperialism.

"My friends have come out today to face a new situation. Passing through different phases that has held the field so long, they have reached the stage of socio-economic politics. The gospel of social emancipation is now the creed of the Indian Revolution. Throughout the world the struggle between the two civilizations, agricultural and industrial, is seeking a solution in a social recon-

struction, so that the exploitation of man by man may cease, so that the social control over all means of production and distribution may be established, that poverty, unemployment and illiteracy may be replaced by truly human conditions of life, so that the work may be recognised as a right, a privilege and an honour for all. To attain such ends, mass organisations are growing up throughout the world with slogan that class privileges must go. When organisations on such basis are giving unity and strength to the masses elsewhere, it is inevitable that the Indian masses also will see similar source of strength for themselves. But these are only broad indications of the lines in which forces are developing. The shape each will take at a given moment will always abide by the objective conditions prevalent and must be subjected to the considerations of ever-shifting strategy and tactics of the political fight.

"For us Indians the greatest stumbling block at the moment is foreign domination. Our immediate objective must, therefore, be to attain national freedom. In course of the fight that has been raging during these decades, the all-India apparatus of the political struggle that has emerged is the Indian National Congress. While making every endeavour to radicalise the organisation by bringing into it politically conscious sections among the workers and peasants, we heartily welcome the consensus of view that this body must be the rallying ground for all anti-Imperialist forces working in the country. Because the only character of a successful fight that can at present be visualised is a determined, desperate, wide-spread and long drawn-out struggle. It will be our business to organise the workers and peasants on their immediate grievances and to develop their leadership while marching forward through local fights for the removal of those grievances. Such fights will inevitably clarify the real issues before them and make them realise the need for the fight against Imperialism. Congress being the most suitable organisation existing for the capture of political power and it being extremely impolitic to foster the growth of more than one political organisation which may issue commands at a moment of fight, we must whole-heartedly join that organisation. We should not for the present start a formal party within or outside it, nor seek foreign affiliation, nor raise slogans and issues unconnected

with the realities of the situation as such steps are only capable of dividing the revolutionary forces in the country. My friends in the course of carrying out their programme must co-operate on issues with the really radical elements which will naturally tend to merge. The leftist forces must quicken their pace to meet the exigencies that may arise out of the present international complications and at the same time check the sinister forces deliberately fostering fissiparous tendencies.

"With the prospect of a nation-wide struggle delineated above, my friends must continue their role as the vanguard of the revolutionary masses no matter in what crooked ways Imperialism after the lost battle has managed to set the stage to baffle them by intensive repression on the one hand and by organised attempt to misrepresent, isolate and disrupt their forces on the other. With that confidence and hope, I should like to invite them and their co-workers to accept the following basic principle for the work ahead. This acceptance must of course admit of further evolution and re-shaping with the needs of the changing times and must also be subjected to the considerations of democratic centralism :

"(1) We, as vanguard of the revolutionary masses, stand for a social transformation that would admit of the complete freedom of the masses and of their fullest development. With such end in view we aim at present at a national democratic revolution which will overthrow Imperialism and make India a sovereign State ;

"(2) We will conduct the revolutionary struggle in such a way that after seizure of political power the social control should rest in the masses themselves ;

"(3) In the Federation Republican Democracy based on *panchayet* system that will emerge after the overthrow of Imperialism all wealth shall belong to the society ;

"(4) We aim at a complete industrialisation of India and the anachronic feudal system must be abolished ;

"(5) Private property being recognised only so far as it does not exploit the labour of others ; there shall be a nationalisation of industries and industrialisation of agriculture. Both agriculture and industry shall be organised on the basis of planned national economy."

শেষের প্রস্তুতি (১৯৩৯—১৯৪১)

ভারতের শাসনযন্ত্রের মধ্যে আসন-সংগ্রহ নিয়ে একঝাঁক নেতা ও তাঁদের সমর্থক দল অতিমাত্রায় ব্যস্ত, বৈপ্লবিক ঘটনা নিঃশেষিতপ্রায়, আর ওদিকে ইংল্যাণ্ড তখন দ্বিতীয় মহাসমরে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। ১৯৩৯ সেপ্টেম্বর ১-লা জার্ম্মানী কর্ত্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হ'ল। দু'দিন বাদে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করলো। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রাষ্ট্র ভাগ হয়ে দুইপক্ষে যোগ দেওয়ার ফলে, যুদ্ধের ব্যাপকতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রম করে চললো। এ যুদ্ধে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে এ-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। উগ্রপন্থীরা এই যুদ্ধের সুযোগ নেবার জন্য খুবই উন্মুখ ; কংগ্রেস নিজ দাবি জানিয়ে গেলেও, ইংল্যাণ্ডকে নিতান্ত বিব্রত করতে পরাঙ্মুখ। সাধারণ লোক, যারা রাজনৈতিক দলের আওতার বাইরে, তারা এ-যুদ্ধে সাহায্য করতে প্রস্তুত। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সমর্থক দলগুলি প্রকাশ্যভাবেই স্বাধীনতা-লাভের জন্য যে-কোনও পথ গ্রহণের পক্ষপাতী।

কোনও দলের মতামত না-নিয়ে ভারত-সরকার ইংরেজের যুদ্ধ ভারতবাসীর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। থেকে থেকে কংগ্রেস "ফোঁস্" করেছে ; বলেছে—ভারতের স্বাধীনতা, যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য বলে এখনই প্রকাশ করা চাই ; না হলে সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। অন্যান্য দলও নানা দাবি, নানা সর্ত্ত উল্লেখ করতে থাকে।

লাট লিনলিথগো ১৯৩৯ অক্টোবর ১৭-ই জানালেন—যুদ্ধান্তে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, কিন্তু বর্ত্তমানে ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার কার্য্যকর থাকবে। যুদ্ধশেষে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল দলের মতামতে ভারতের লক্ষ্য সম্বন্ধে বিচার করা যেতে পারে। যুদ্ধ-পরিচালনায় সাহায্য করবার জন্য তিনি এক 'পরামর্শদাতা কমিটী' (Consultative Committee) গঠনের জন্য আহ্বান জানান।

আদর্শ বা লক্ষ্যবস্তু থেকে মাত্রা অনেক নিচে নেমে যাওয়ায়, ১৯৩৯ অক্টোবর-নভেম্বরে গদিতে আসীন বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করে।

একটা রফার চেষ্টা ইংরেজ ভিতরে ভিতরে চালাতে থাকে। ভারতে নানা আকারের দূতের আবির্ভাব ঘটেছে। ১৯৩৯ ডিসেম্বরে ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ (Stafford Cripps) ভারতে এসে বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা জুড়ে দেন। সুভাষচন্দ্রের দল 'ফরোয়ার্ড ব্লক' এবং তাঁর অন্যান্য সমর্থক দল ১৯৩৯

অক্টোবরে নাগপুরে এবং ১৯৪০ মার্চে রামগড়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দলের সম্মেলনে (Anti-Imperialist Conference) জমায়েত হয়। এর ভিতর দিয়ে ভারতের এক বিরাট অংশের বিপক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবী-দলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার। শেষ শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হবার পর তাদের সঙ্ঘবদ্ধতা অসম্ভব হয়ে ওঠে। যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে নানা মতভেদ প্রকাশ পায়; একপক্ষ লেখনী-সাহায্যে নানা ভাবে ইংরেজের যুদ্ধের সহায়তা করেছে। কেউ-বা মাল-সরবরাহ ব্যাপারে কংগ্রেস-নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে ইংরেজের সহায়তা করেছে। পরোক্ষ সাহায্য ছিল প্রচুর। তৎসত্ত্বেও মনে করা যেতে পারে, সুভাষচন্দ্রের নীতি ভারতের মধ্যে গৃহীত হবার সম্ভাবনা কম হলেও, তাঁর ব্রিটিশ-বিদ্বেষী মন ভারতের বাইরে ভারতীয় বিপ্লবের বিরাট অভিব্যক্তি সম্ভব করে তুলেছিল।

আস্ফালন আর দাবি পেশ করা ছাড়া, কংগ্রেস কোনও প্রকাশ্য আন্দোলনের কথা আর ভাবছিল না। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের বিচলিত হবার কারণ ছিল না। অখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটীর নানা অধিবেশনে আলোচনার ফলে, ১৯৪০ জুলাই (৩ থেকে ৭ তারিখ) কেন্দ্রে জাতীয় সরকার স্থাপন এবং যুদ্ধান্তে স্বাধীনতা-ঘোষণার দাবি জ্ঞাপন করা হয়েছিল।

নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্জিতও হয়েছে। শেষপর্য্যন্ত ১৯৪০ অক্টোবর ১৭-ই গান্ধীজী ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। পরের মাসে এটাই সামান্য পরিবর্ত্তিত হয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে "সংগ্রাম" রূপে চলতে থাকে। বিশেষ কোনও উৎসাহ ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়নি। শ'ছয়েক লোক কারাবরণ করবার পর, ডিসেম্বর ১৭-ই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত হয়।

আবার ১৯৪১ জানুয়ারী মাসে আন্দোলন চালু করা হ'ল। এবারে কয়েক হাজার সত্যাগ্রহী কারারুদ্ধ হন। ব্রিটেনের বিচলিত হবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পায়নি। কেবলমাত্র চিয়াং-কাই-সেক ও আমেরিকার কয়েকজন কূটনীতিক এসে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ভারতের হাতে শাসনযন্ত্রের ক্ষমতা কিছু বৃদ্ধি করা হয়—১৯৪১ জুলাই ২২-এ, যখন লাট-সভার (Excecutive Council) তেরোজনের মধ্যে আটজন ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হয়। এঁরা অবশ্য দল-নিরপেক্ষ সদস্য। সাধারণ লোকের কাছে মনে হয়েছে ইংরেজ এঁদের দিয়ে একটা ধোঁকা সৃষ্টি করছে।

উপদ্রবহীন আন্দোলন চলছে; কাগজপত্র হাত-ফেরত হচ্ছে অনেক, কাজের লক্ষণ কিছুই নেই। সমুদ্রপারে ইংরেজ ও আমেরিকার দুই প্রধান—চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট, আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রবক্ষে দুই জাহাজে ('Augusta' ও 'Prince of Wales')

বসে আলোচনার ফলে—১৯৪১ আগষ্ট ১৪-ই বিশ্বের নানা রাষ্ট্রের জন্য চার "স্বাধীনতা" ঘোষণা করলেন (Atlantic Charter) ; তার মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে—প্রত্যেক রাষ্ট্রের নাগরিক নিজেদের পছন্দমত শাসনে বাস করার অধিকারী এবং তাঁরা (চার্চ্চিল-রুজভেল্ট) দেখতে চান, যে-সকল রাষ্ট্র অপর বিদেশী শক্তির নিকট স্বায়ত্তশাসন হারিয়েছে তারা যেন লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরায় অর্জ্জন করে ("They respect the right of all peoples to choose the form of Government under which they will live ; and they wish to see sovereign rights and self-Government restored to those who have been forcibly deprived of them.") ।

চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল। ভারতবর্ষ চঞ্চল হয়ে উঠলো। সকল আশা ধূলিসাৎ করে ভারতের শনি চার্চ্চিল সেপ্টেম্বর ৯-ই বললেন—"থুড়ি ! এ আশ্বাস ভারতের জন্য নয়।" ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধবাদী দল তো বটেই, মোহগ্রস্ত ভারতবাসী মনে করেছে যে ইংরেজের "সদিচ্ছা" কেবল ছলনার নামান্তর।

এশিয়া-খণ্ডে জাপানের জয় আবার একবার ব্রিটিশ-শাসিত ভারত-সাম্রাজের সক্রিয় সহযোগিতা-লাভের জন্য তৎপর করে তুলেছিল। মিতালি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্রিপ্‌স্ ভারতে পৌঁছুলেন ১৯৪২ মার্চ ২৩-এ। ক্রিপ্‌স্-দৌত্য একটা মীমাংসার কাছাকাছি এনে দাঁড় করালেও, ইংরেজের ওপর দারুণ অবিশ্বাস সেটা সফল হতে দেয়নি। বিতর্ক অনেক চলেছে, বিকল্প ফর্মূলা অনেক এসেছে গেছে, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত বিফল হয়ে ক্রিপ্‌স্-কে ঘরে ফিরে যেতে হয়।

বিক্ষিপ্ত ঘটনা

চট্টগ্রাম ঃ এ-সময়ে অন্য উপদ্রব নেই, কিন্তু সরকারী তালিকায় যাঁদের নাম একবার উঠেছে তাঁদের আর নিস্তার নেই। 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন' থেকে প্রায় সব-কয়টি বিপদসঙ্কুল কাজে বিনোদ দত্তর অংশ ছিল। অনেকে যখন গ্রেপ্তার হয়ে যান, বিনোদ তখন পলাতকের তালিকায় ছিলেন। বহু আয়াসেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

অবশেষে ১৯৩৯ জুলাই মাসে মীরেশ্বরী থানার দুর্গাপুরে বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে বিনোদ গ্রেপ্তার হন ; সঙ্গে ছিলেন 'বাঙ্গুর মা' (দিদি) ছাড়া আরও দু'জন। স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে বিনোদের সাত, 'বাঙ্গুর মা'-এর চার ও বাকী তিনজনের প্রত্যেকের দু'বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

"যায় যাবে জীবন চলে—" (১৯৪২)

"কুইট ইণ্ডিয়া"

যখন আন্দোলন-সাহায্যে বোঝাপড়া শেষ হ'ল না, তখন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে নতুন আন্দোলনের কথা ভাবতে হ'ল। ইংরেজের আপৎকালের কোনও সুযোগ নেওয়া হবে না, এ কথা তারস্বরে বলা হয়েছে। কিন্তু এদিকে সময় বয়ে যায়। দেশের ভিতরেও উগ্রপন্থীরা সোরগোল তুলছে, আর সাধারণ লোকের মন সেদিকে ঝুঁকছে। কখন যুদ্ধের মোড় ঘুরবে সে-কথা বলা যায় না; সুতরাং নতুন করে সব ব্যাপার বিচারের প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

চারিদিক থেকে গুঞ্জন উঠলো যে, ইংরেজকে ভারত ছাড়বার কথা বলার "সময় এবার হয়েছে নিকট"। অবশ্য একটা দল ইংরেজের প্রত্যক্ষ বিপক্ষতাচরণে বিশেষ ইচ্ছুক ছিল না। ধীরে ধীরে একটা সংগ্রামী মনোভাব গড়ে উঠলো। গান্ধীজীর নেতৃত্ব আবার ফুটে বেরুলো। ১৯৪২ এপ্রিল ২৯ থেকে মে ২-রা পর্য্যন্ত 'অখিল ভরিত কংগ্রেস কমিটী'র অধিবেশনে আসন্ন আন্দোলনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এরপরই মে ২৫-এ গান্ধীজী লিখলেন: "হিন্দু বা মুসলমান কারও কাছে ভারতের শাসনভার ছাড়তে হবে না, ছেড়ে দাও ভগবানের হাতে"; অর্থাৎ অরাজকতা এসে সে-স্থান দখল করলেও ক্ষতি নেই। খুনখারাপি ও চরম অশান্তি আসবে; কলহের ভিতর দিয়ে দায়িত্ববোধ জন্মালে একটা মীমাংসা হবেই।

পরে ১৯৪২ জুলাই ১২-ই ইংরেজকে ভারত থেকে অবিলম্বে বিদায় নেবার নির্দ্দেশ-প্রস্তাব গৃহীত হয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে। আগষ্ট ৭-ই 'অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী'তে প্রচুর ভোটাধিক্যে সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

["They must remember that non-violence is the basis of the movement. .... A time may come when it may not be possible to issue instructions or for instructions to reach the people, and when no Congress Committee could function. When this happens every man and woman who is participating in this movement must function for himself or herself within the four corners of the general instructions issued. Every Indian who desires freedom and strives for it must be his own guide urging him along the hard road where there is no resting place and which leads ultimately to the independence of India."]

অধিবেশনের শেষে গান্ধীজীর বক্তৃতা "শান্ত" আন্দোলনকে নতুন পর্য্যায়ে উন্নীত করে তুলেছিল। তিনি বললেন—এখন থেকে প্রতি জনে—নারী-পুরুষ,

নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করবে এবং স্বাধীন নাগরিকের মতো আচরণ করবে। "পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হব না। আমরা তার জন্য লড়বো বা মরবো ('We shall do or die')। এই প্রচেষ্টায় হয়তো আমরা ভারতকে স্বাধীন করবো, নয় জীবন উৎসর্গ করবো।" ১৯৪২ আগষ্ট ৮-ই গভীর নিশীথে অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়।

ভোরের আলো দেখা দেবার পূর্ব্বেই গান্ধীজী-প্রমুখ সমস্ত নেতৃবৃন্দকে ধরে কারাগারে স্থান দেওয়া হ'ল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান—বড়, মাঝারি, ক্ষুদে—সব একসঙ্গে বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। আইন-বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপ, অনাচার, পরিবহণে বিশৃঙ্খলা করবার প্রয়াস, রাজানুগত্য-ভঙ্গ, ধর্ম্মঘট, হরতাল, যুদ্ধসংক্রান্ত যে-কোনও কাজে বাধা-সৃষ্টি, নতুন-সেনা-সংগ্রহে বাধা প্রভৃতি গভর্ণমেণ্ট সহ্য করবে না। এসকল ঘটবার সুযোগ যাতে না পায়, তার প্রতিবন্ধক হিসাবে চণ্ডনীতি গৃহীত হয়েছে।

শান্ত বা নিরুপদ্রব আন্দোলন পরিচালনা করবার মতো, কারাগৃহের বাইরে দায়িত্বশীল লোক আর কেউ রইলেন না। গান্ধীজীর বাক্য পালিত হ'ল,—প্রত্যেকেই "লীডার",—দারুণ উত্তেজনা আর অত্যাচারের মুখে শান্ত থাকার শিক্ষা তারা পায়নি। ক্ষিপ্ত মানুষ যা করে, এখানে তার ব্যতিক্রম হ'ল না। প্রথমে নিরুপদ্রব হরতাল, ধর্ম্মঘট, কর্ম্মবিরতি, মিছিল—ওড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ বাদে ভারতের আর-সব অংশে ছড়িয়ে পড়লো। অল্প সময়ের মধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য যথারীতি লাঠি-পেটা, জেল ও জরিমানা, মিছিলের ওপর নানা ভাবে আক্রমণ, গুলিবর্ষণ প্রভৃতি চলতে লাগলো। অনেক জায়গায় বিমানপোত থেকে বোমাবর্ষণও হয়েছে। এ অবস্থায় প্রতিক্রিয়া যা হতে পারে, তার কোনও ব্যতিক্রম হ'ল না।

ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, রেল-লাইন-উৎপাটন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন, গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, বিশেষ করে পোষ্ট-অফিস, রেল-ষ্টেশন ও থানা আক্রমণ প্রভৃতি চলতে থাকে। গভর্ণমেণ্টের গুলি-বৃষ্টি বর্ষার বারিধারাকে ম্লান করে পড়েছে। কল্পনাতীত অমানুষিক নৃশংসতা, প্রকাশ্যস্থানে নারীধর্ষণ, পুরুষের গুহ্যদেশে যষ্টি বা দণ্ডপ্রবেশ, বেত্রাঘাত, শীতের সময় জলে ডুবিয়ে রাখা প্রভৃতি ব্যবস্থা সভ্য সরকারের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে দিয়েছে!

সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবাঙ্গলা, আর তার মধ্যে মেদিনীপুর, আন্দোলনের প্রচণ্ডতা ও তদনুপাতে নির্য্যাতন-ভোগের ব্যাপারে আর-সকল অঞ্চলকে অতিক্রম করে গেছে। তমলুকে ১৯৪২ ডিসেম্বর ১৭-ই 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রায় দেড় বছর স্বাধীনভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেছে। কোথাও-বা শান্তভাবেই আন্দোলন চলেছে; অধিকাংশক্ষেত্রেই লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি সবরকম দুর্দ্দান্ত কার্য্যকলাপ নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সমগ্র ভারতে বহু প্রাণহানি ঘটেছে উভয়পক্ষেই। পুলিশ ও মিলিটারির হাতে বন্দুক ও রিভলভার অকৃপণভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় আন্দোলনকারীর মৃত্যুসংখ্যা পুলিশ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হয়েছে। পুলিশের গুলিতে মৃত্যুসংখ্যা কখনই জানা যায়নি। সে-সংখ্যা যে পাঁচশতের অধিক সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা যায়। সর্ব্বপ্রকারে মৃত্যুসংখ্যা কয়েক হাজার। সংবাদপত্র হতে যে-সকল মৃতের নাম সংগ্রহ করা গেছে, তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। এগুলি সমস্ত নিহতের ভগ্নাংশ মাত্র। সুপরিকল্পিত সশস্ত্র অভিযান না-হলেও, সংগ্রামে অবধারিত মৃত্যু জেনেও আত্মাহুতি দিয়েছেন, সে-কথা স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য।

মহিষাদল থানায় মোট ন'বার ব্যাপকভাবে পুলিশের গুলি চলেছে। মৃতের সংখ্যা অন্ততঃ ১৬ জন। সেপ্টেম্বর ২৯ থেকে উপর্য্যুপরি কয়েকবার পুলিশের গুলি চললেও, প্রথম শুরু হয়েছিল ২২-এ থেকে। মারা গেছেন যামিনীকান্ত কামিলা, অনন্তকুমার পাত্র (ও আর তিনজন)। ২৯-এ সেপ্টেম্বর থেকে, থানা আক্রমণ করতে যাবার ফলে, মরেন—শশীভূষণ মান্না, সুরেন্দ্রনাথ কর, আশুতোষ কুইলা, ক্ষুদিরাম বেরা। এর পরে আক্রমণের ফলে মরণ হয়—ভোলানাথ* মাইতি, হরিচরণ দাস, সুধীরচন্দ্র জানা, প্রসন্নকুমার ভুঁইয়া, পঞ্চানন দাস, দ্বারকানাথ দাস, গুণধর হাণ্ডা, সুরেন্দ্রনাথ মাইতি, যোগেন্দ্রনাথ দাস, রাখালচন্দ্র সামন্ত, আশুতোষ কুইলা, প্রফুল্লকুমার বাগ-এর।

তমলুকে পুলিশী হানা হয় বার-চারেক। থানা-আক্রমণে প্রাণ দিলেন (সেপ্টেম্বর ২৯-এ)—মাতঙ্গিনী হাজরা, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, জীবনচন্দ্র বেরা, পুরীমাধব প্রামাণিক ও রামচন্দ্র বেরা।

নন্দীগ্রাম থানা চারবার আক্রমণের চেষ্টা হয় ও পুলিশের বে-পরোয়া গুলি চলে ততবার। মারা গেলেন—ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ভানু রাণা, ভূতনাথ সাহু, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বিহারীলাল হাজরা এবং আরও ৮ জন।

বৃন্দাপুর থানা আক্রান্ত হয়—সেপ্টেমর ২৯-এ। এখানে মোট দু'জন নিহতের নাম পাওয়া যাচ্ছে ঃ গৌরহরি কামিলা এবং গান্ধার সাহু।

পটাশপুর থানা আক্রমণে মরেন—কেদারনাথ জানা, মুচিরাম দাস, অখিল গিরি, ভগীরথ রথ ও মুরারিমোহন বেরা।

ভগবানপুর থানা আক্রমণ-চেষ্টার বলি ঃ যুধিষ্ঠির জানা, বিভূতি দাস, রামচন্দ্র দাস, রঘুনাথ মণ্ডল, তারকনাথ জানা, উপেন্দ্রনাথ জানা, গৌরহরি কামিলা, রজনীকান্ত মাইতি, শ্যামাচরণ মাইতি, জগন্নাথ পাত্র, ভূপতি দাস, শ্রীনাথচন্দ্র প্রধান, হরিচরণ বেরা, হরিপদ মাইতি, পরেশচন্দ্র জানা, ভারতচন্দ্র সিংহ, জ্ঞানদা মাইতি, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী, ভূষণ সামন্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ দাস।

পূর্ব্বালক্ষ্যাতে নিহত হন—বিপিনবিহারী মণ্ডল ও চন্দ্রমোহন ডিণ্ডা। গ্রামের মধ্যে ঢুকে পুলিশ হরেকৃষ্ণ ধরকে হত্যা করে।

সবঙ্গ থানার বেলকী (বেলকানি) গ্রামাঞ্চলে পুলিশ-আক্রমণের কালে জীবন-উৎসর্গ করেন—ভজহরি রাউত, বংশীধর কর, চন্দ্রমোহন জানা, হেমন্তকুমার দাস, চৈতন্যচরণ বেরা, বৈশ্যচরণ মহাপাত্র, শিবপ্রসাদ, চন্দ্রমোহন দাস, সর্ব্বেশ্বর প্রামাণিক, রামপ্রসাদ জানা ও রজনীকান্ত ঘোষ।

কেশপুর থানা আক্রান্ত হয়—সেপ্টেম্বর ৩০-এ। এ-সম্পর্কে নিহত হন—শশীবালা দাসী, রামকৃষ্ণ ঘোষ ও আর দু'জন।

কাঁথিতে সেপ্টেম্বর ২২-এ অনন্তকুমার পাত্রকে পুলিশ হত্যা করে। ওখানে সাব-জেলে সুরেন্দ্রনাথ ধাড়া ও হরেকৃষ্ণ জানা মারা যান।

কানাইদীঘিতে ১৯৪২ অক্টোবরে নিহত হলেন অমূল্যকুমার শাসমল।

বাসুদেবপুর আশ্রম আক্রমণ করে পুলিশ ব্রজগোপাল দাসকে হত্যা করে।

তমলুকে শঙ্কর-আড়া পুল আক্রমণ করতে প্রাণ দেন—রামেশ্বর বেরা, ভূষণচন্দ্র জানা, নিরঞ্জন জানা ও পূর্ণচন্দ্র মাইতি।

গোপুর থানা অঞ্চলে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে কনকলতা বেরা গুলিতে আহত হয়ে মারা পড়েন।

সরিষাবাড়িয়ায় ১৯৪২ সেপ্টেম্বর ২২-এ পুলিশের গুলিতে আহত অবস্থায় সর্ব্বেশ্বর জানা দেহত্যাগ করেন।

এই আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত "সৈনিক"—জেলে বন্দী বা অন্তরীণ অবস্থায় বা পুলিশ-প্রহারের ফলে মৃতদের মধ্যে অমূল্যচরণ গড়াই, গোবিন্দচন্দ্র গড়াই, গৌরহরি গড়াই, ব্রজমোহন জানা, হরেকৃষ্ণ জানা, সর্ব্বেশ্বর জানা, রাখালচন্দ্র দাস, ন'কড়িচরণ দাস মেদিনীপুরে ; নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বোলপুরে আহত হয়ে ; সুরেশচন্দ্র ঘোষ ১৯৪২ অক্টোবরে সিউড়ী জেলে ; অধর মণ্ডল ১৯৪২ সেপ্টেম্বর ৪-ঠা পশ্চিম দিনাজপুর জেলে ; গজেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯৪৩ মে ৭-ই দিনাজপুর জেলে ; প্রবোধ মজুমদার ১৯৪৩ সালে ঢাকা জেলে ; হুগলীর অধিবাসী অসিধারী ঘোষ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে চিরনিদ্রায় মগ্ন হন।

বর্দ্ধমানে বিক্ষোভ ব্যাপারে গর্ভাবস্থায় সরসীবালা দাস পুলিশ-প্রহারে মারা যান, ১৯৪২ নভেম্বর ১১-ই ; জনসভায় বক্তৃতা দেবার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন নলিনীরঞ্জন দাস, আর দু'জন ; চন্দ্রমোহন দাস ও জীবনকৃষ্ণ বেরা যথাক্রমে ১৯৪২ সেপ্টেম্বর ২৭-এ ও ২৯-এ অনুরূপ কারণে দেহত্যাগ করেন।

বিহার-সেক্রেটারিয়েট আক্রমণ করতে গিয়ে, ১৯৪২ আগষ্ট ১৫-ই, দেবীপদ চৌধুরী পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

বলা বাহুল্য, সকলের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি ; বহুক্ষেত্রে পুলিশ লাশ ছাড়েনি।

মেদিনীপুরের বাইরে নানা স্থানে কমবেশী নানা গোলযোগ হয়েছে। তার মধ্যে ঢাকার হাঙ্গামা কিছুটা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। নারায়ণগঞ্জ ও সূত্রাপুরে যথাক্রমে ছাত্র জ্যোতির্ম্ময় ভৌমিক ও অখিলচন্দ্র দাস পুলিসের গুলিতে নিহত হন। ১৯৪২ আগষ্ট ৯-ই ঢাকার ইংলিশ রোডের ওপর হৃষীকেশ সাহা ও ১৫-ই বিপুল বসাকের হত্যা পূর্ব্বঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। ষ্টেশন আক্রমণ করতে গিয়ে রাধানাথ সেন, ঢাকার তালতলায় সেপ্টেম্বর ১৭-ই হীরালাল দত্ত ও তাঁর তিন সহকর্ম্মী জীবন উৎসর্গ করেন। দীনেশচন্দ্র ধূম (?) ১৯৪২-এ গ্রেপ্তার হয়ে, ঢাকা জেলে পরবৎসর মারা যান।

উৎসাদন (১৯৪২—১৯৪৬)

ভারতের মধ্যে আইনের নানা প্যাঁচের মধ্যে বিপ্লবী-আন্দোলন প্রায় স্তব্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কল্যাণে নতুন নতুন আইনের আবির্ভাব ঘটেছে। ওদিকে কংগ্রেস ও মুশ্লিম-লীগের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শাসন-সংস্কারের রূপ নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত।

এ অবস্থা যখন চলছে—বিপ্লবের এক অভূতপূর্ব্ব বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ভারতের বাইরে। কিন্তু এ-কথা স্মরণ করতেই হয়, এর মূল শিকড় ছিল ভারতবর্ষে, শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে পূর্ব্ব-এশিয়ায়। ইংরেজের সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রাম যেটা ঘটে, তার উদ্যোক্তা হচ্ছেন দুই বঙ্গসন্তান, আর তাঁদের সৈন্যসামন্ত সবই ভারতীয়; তার মধ্যে বড় একটা অংশ ইংরেজের সামরিক বাহিনীর বেতনভুক্ যোদ্ধা।

রাসবিহারী

যাঁরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির গতি দ্রুততর করেছেন, তাঁদের দু'জনের সঙ্গেই ভারতের বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ রাসবিহারী বসু যৌবনেই গুপ্ত-সমিতির অন্যতম নেতা ছিলেন এবং কর্ম্মক্ষেত্র গড়েছিলেন ভারতের উত্তরাঞ্চল প্রায় সমস্তটা নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে পাঞ্জাব থেকে বাঙ্গলার পূর্ব্বসীমান্ত পর্য্যন্ত এবং শেষদিকে পূর্ব্ব-এশিযার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।

তাঁর কর্ম্মশক্তির সর্ব্বাপেক্ষা বড় পরিচয়—বড়লাটের ওপর বোমা-নিক্ষেপ। সে-ঘটনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আরও বহুতর বৈপ্লবিক কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য আদা-জল খেয়ে লেগে গেল। তিনি গভর্ণমেণ্টের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে 'পি. এন্. ঠাকুর' এই ছদ্মনামে পাশপোর্ট সংগ্রহ-পূর্ব্বক ১৯১৫ মে ১২-ই 'সানুকি মারু' জাপানী জাহাজে চিরতরে তাঁর মাতৃভূমি ত্যাগ করে মে ২২-এ সিঙ্গাপুর পৌঁছুলেন। সেখান থেকে জুনের প্রথমদিকে টোকিয়ো উপস্থিত হন। জুনের মাঝামাঝি তিনি সাংহাই যান এবং সেখানে জার্ম্মান পদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে ভারতে অস্ত্র-সরবরাহ করার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

জাপানীদের মধ্যে ভারতের দুরবস্থার কথা কিছুটা জানা ছিল। তিনি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করতে আরম্ভ করেন। ১৯১৫ নভেম্বর ২৭-এ, এক সভায় তিনি ইংরেজের ভারত-শাসন-ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেন। প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হওয়ার ফলে, তাঁর জাপানে অবস্থান সম্বন্ধে ইংরেজ নিঃসন্দেহ হয়। তাঁকে জাপান

থেকে বহিষ্কারের জন্য ইংরেজ সরকার জাপানের ওপর প্রবল চাপ দিতে থাকে। তখন রাসবিহারী সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করেন জাপানের সমৃদ্ধ ও প্রভূত রাজনৈতিক-ক্ষমতা-সম্পন্ন আইজো সোমা-র ভবনে।

জাপান থেকে বিতাড়নের সরকারী আদেশ প্রচারিত হয়েছিল। এই সময়ে অকস্মাৎ একটা জাপানী ক্ষুদ্রাকৃতি সামরিক জলযান ইংরেজ কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং জাপান তার প্রতিবাদে ইংরেজের প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে, ১৯১৬ এপ্রিলে রাসবিহারী আত্মপ্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে তিনি সর্ব্বরকমে জাপানের অধিবাসীর মতো জীবনযাত্রা-পালন এবং জাপানী ভাষায় অদ্ভুত ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। ১৯২৩ জুলাই ২৩-এ নাগরিক অধিকার লাভ করার পর তোষিকো নামে এক জাপানী মহিলাকে বিবাহ করেন।

নাগাসাকি-তে ১৯২৬ আগষ্ট ১-লা চীন, আফ্‌গানিস্তান ও ভারতবর্ষ থেকে আগত এশীয় প্রতিনিধিদের যে সভা হয়, তাতে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন,—পরে নিতান্ত প্রয়োজনে ১৯৩৭ সালে ত্রিশজন ভারতবাসী মিলে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' (Indian Independence League) গঠন করেন।

ভাবধারা-প্রচারের জন্য রাসবিহারী একখানি ইংরেজী ও একখানি জাপানী ভাষায় সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া, বহু পুস্তক-পুস্তিকা মুদ্রিত করে জনসমক্ষে ভারতের কথা সব জাপানীর মনের মধ্যে প্রকাশ করে চলেছেন—যাতে ভারতের কথা সকল সময় তাদের মনে জাগরূক থাকে।

পরবর্ত্তী ঘটনা রাসবিহারীকে প্রচণ্ড রাজনীতির আবর্ত্তের মধ্যে এনে ফেলে। জাপান আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে—১৯৪১ ডিসেম্বর ৮-ই। এই সময়ে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'-এর তরফে তিনি ইংরেজের নাগপাশ থেকে মুক্তি-প্রচেষ্টায় নেমে পড়েন। জাপান কর্তৃক অধিকৃত ইংরেজ রাজ্যের অংশগুলির তত্ত্বাবধানের ভার নেওয়া হবে বলে তিনি প্রকাশ করেন। কেবল সেইখানে নিশ্চেষ্ট না থেকে, তিনি ১৯৪১ ডিসেম্বর ১১-ই, ১/১৪ পাঞ্জাব-রেজিমেণ্টের মোহন সিং-কে অধ্যক্ষ করে জাপানের হাতে বন্দী ইংরেজ-বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে 'ভারতের জাতীয় বাহিনী' (Indian National Army) গঠন করেন। আলোচনান্তে স্থির হয়, এই সৈন্যবাহিনী 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'-এর সঙ্গে একযোগে কাজ করবে।

১৯৪২ ফেব্রুয়ারী ১৫-ই, সিঙ্গাপুর-পতনের পর, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে প্রকাশ্য সমর্থন জ্ঞাপন করেন। পূর্ব্ব-এশিয়ায় অবস্থিত এবং যুদ্ধে জাপানীদের হাতে বন্দী সৈন্যদের নিয়ে, ১৯৪২ মার্চের শেষে, এক গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। এখানে স্থির হয়, ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভারতীয়ের পরিচালনায় সম্পূর্ণ ভারতীয় সৈন্য দ্বারা গঠিত হবে। প্রয়োজনমত

জাপান সরকারের প্রতিশ্রুত সাহায্য গ্রহণ করা হবে। 'লীগ'-এর পরিচালক সমিতি (Council of Action) সব ব্যাপারে কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে। এরপর ১৯৪২ জুন ১৫-ই থেকে ব্যাঙ্ককে যে কন্‌ফারেন্স হয়—তাতে বর্ম্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়, জাভা, বোর্নিয়ো, মাঞ্চুকুয়ো, হংকং ও জাপানে অবস্থিত সমস্ত ভারতীয় অধিবাসীর শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বলা হয় যে, এশিয়া পর্য্যন্ত ইংরেজের রণক্ষেত্র বিস্তারলাভ করায় ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পথ সুগম হয়েছে। 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' অনতিবিলম্বে নিজ সেনাদল গঠন করবে এবং সংগ্রামে মিত্রশক্তি জাপানের পাশে যুদ্ধ করবে। যে 'কর্ম্মনির্দ্দেশ সমিতি' (Council of Action) গঠিত হয়, তার প্রধান নির্ব্বাচিত হন রাসবিহারী ; এ বিভাগ সম্পর্ণরূপে ভারতীয় দ্বারা পরিচালিত হবে, সে-কথার ওপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়।

ইংরেজের অধিকার চলে যাওয়ার সঙ্গে সমস্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দেশ এবং ভারতীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তি 'কাউন্সিল'-এর নিয়ন্ত্রণে গৃহীত হবার কথা সাব্যস্ত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় চলে আসার অনুরোধ-জ্ঞাপন এবং জাপান সরকারকে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

ইতিমধ্যে বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণকে জাপানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলায়, 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' ভেঙ্গে যায়। তখন তার একমাত্র কর্ণধার হলেন রাসবিহারী। পূর্ব্ব-এশিয়ার নানা স্থান ঘুরে রাসবিহারী 'লীগ'-এর সমর্থন-লাভের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন।

'লীগ'-পরিচালনার পক্ষে রাসবিহারী ব্যতীত দায়িত্বশীল আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। তাতে তিনি নিরুৎসাহ হলেন না। 'লীগ'-এর অফিস ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত হ'ল। সুভাষচন্দ্র এসে টোকিয়ো পৌঁছুলেন—১৯৪৩ জুন ১৩-ই। সকল শ্রেণীর কর্ম্মী ও অধিবাসীদের প্রতিনিধি নিয়ে, জুলাই ৪-ঠা রাসবিহারী ও সুভাষের উপস্থিতিতে বিরাট কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে সর্ব্বসমক্ষে রাসবিহারী সুভাষের ওপর যুদ্ধ-চালনার সমস্ত ভার অর্পণপূর্ব্বক তাঁকে সর্ব্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত করে এক আবেগময়ী বক্তৃতা দেন।

ইংরেজ-শক্তিবর্গের যুদ্ধে তাঁর পুত্রের বীরের-মৃত্যু ঘটে ; পূর্ব্বেই পত্নী-বিয়োগ হয়েছে—শোকতপ্ত, বিরামবিহীন সংগ্রামলিপ্ত, রণক্লান্ত, প্রৌঢ় রাসবিহারী ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তদবস্থায় জাপান-সম্রাট সেখানে তাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাপানী সম্মানে ভূষিত করেন।

১৯৪৫ জানুয়ারী ২১-এ, ভারতমাতার মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান রাসবিহারী বসু শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'নে-তা-জী'

বাঙ্গলায় গুপ্ত-বিপ্লবী-সংস্থার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। সে-সন্দেহে ইংরেজ সরকার বারে বারে তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে।

তাঁর সবিস্তার জীবনী-আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়, সুতরাং আলোচ্য বিষয়ের সীমার মধ্যে তাঁর অসাধারণ কার্য্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হচ্ছে। সুভাষচন্দ্রের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাল আরম্ভ হয়—১৯৪১ জানুয়ারী ১৭-ই, যখন তিনি এলগিন (লালা লাজপত রায়) রোড-এর ভবন ছেড়ে অনিশ্চিৎ যাত্রা অবলম্বন করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বহু ক্লেশ ও অপরিসীম বিপদ মাথায় করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিয়ে তিনি রাশিয়ায় পৌঁছান এবং সেখান থেকে জার্ম্মানীতে যান। একমাত্র লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা।

জার্ম্মানীতে তিনি ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে ইংরেজ-বিরুদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলেন এবং জার্ম্মানীর কাছে ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদের ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন। ব্রিটিশ-বিদ্বেষী জার্ম্মান-প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' গঠিত হয়। ১৯৪১ ডিসেম্বর থেকে তিনি জার্ম্মান-রেডিয়োতে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে তাঁর সঙ্গী-সহচররা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁকে 'নেতাজী' বলে অভিহিত করতে থাকেন।

জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে, জার্ম্মানীতে আবদ্ধ-থাকা তাঁর কাছে অযথা কালক্ষেপ বলে মনে হ'ল। ওদিকে জাপানের জয়ধ্বনিতে পূর্ব্ব-এশিয়া প্রকম্পিত হচ্ছে,—তিনি কালবিলম্ব না করে পূর্ব্ব-এশিয়ায় যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এমন সময়ে রাসবিহারীর আহ্বান এসে পৌঁছাল এবং জার্ম্মান ও জাপানীদের সহায়তায় সাব্‌মেরিন অবলম্বন করে নিদারুণ বিপদের মধ্যে তিনি সমুদ্রে ডুব দিলেন। ১৯৪৩ জুন ২-রা যখন পেনাং পৌঁছলেন তখন সেটাকে যমালয় হতে প্রত্যাবর্ত্তন বললে অত্যুক্তি হয় না। ক'দিন বাদেই তিনি টোকিয়োতে পদার্পণ করেন—ঐ মাসের ১৩-ই তারিখে।

এসেই স্থলের কর্ম্মসমুদ্রে ডুবে গেলেন। জুন ২১-এ জাপান-রেডিয়ো থেকে বক্তৃতা শুরু হয়। জুলাই ৪-ঠা রাসবিহারীর গুরু দায়িত্ব 'লীগ'-এর প্রেসিডেণ্ট পদ তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন। জুলাই ৫-ই 'আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ'-এর গঠন ঘোষণা করেন। বাইরে থেকে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে, ভারতের ভিতরের সংগ্রামকে সাহায্য করাই তাঁর অভিপ্রায়।

ঘটনা-পরম্পরা রূপ পরিগ্রহ করে অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ১৯৪৩ আগষ্ট ১-লা বর্ম্মার স্বাধীনতা ঘোষিত হ'ল। আজাদ-হিন্দ্‌-ফৌজের সর্ব্বস্তরে শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য আগষ্ট ২৫-এ তিনি সর্ব্বাধিনায়কের (সিপাহীসালার)

পদ গ্রহণ করেন। অক্টোবর ২১-এ নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শাসন-যন্ত্রের নানা বিভাগ সংগঠিত হয়ে যথোপযুক্ত পরিচালকগণের হাতে ন্যস্ত হয়। অক্টোবর ২৩-এ থেকে নভেম্বর ১৯-এর মধ্যে জাপান, জার্ম্মানী প্রভৃতি আটটি স্বাধীন রাষ্ট্র নবগঠিত 'স্বাধীন ভারত সরকার' (Azad Hind Government)-কে স্বীকৃতিদান করে।

১৯৪৩ অক্টোবর ২৪-এ, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিপক্ষে নবগঠিত রাষ্ট্র যুদ্ধঘোষণা করে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জাপান-কর্ত্তৃত্ব নভেম্বরে 'আজাদ হিন্দ্ সরকার'-এর হাতে ন্যস্ত হয় এবং নেতাজী ডিসেম্বর ২৯-এ আন্দামান-পরিদর্শনে যান। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপকে যথাক্রমে 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' নাম প্রদত্ত হয়। ১৯৪৪ ফেব্রুয়ারী ১৪-ই 'আজাদ হিন্দ্ সরকার' দ্বীপ-দুটির শাসনভার গ্রহণ করে।

ওদিকে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের ছোট-বড় সঙ্ঘর্ষ চলছে। পর পর কয়েকটা রণে ইংরেজ সৈন্য পিছু হটতে বাধ্য হয়। মে ৭-ই পর্য্যন্ত বর্ম্মা-সীমান্তে দু'-তিনটি স্থানে ভারতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারায়, আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ষা নেমে গেলে, 'ফৌজ' বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়ে। খাদ্যাভাব, রোগের প্রকোপ এবং জাপানী-অস্ত্র-সরবরাহে অপ্রতুলতা প্রভৃতি সব মিলিয়ে যে বিপদ ঘটে, তার ফলে ১৯৪৪ জুলাই ২২-এ আজাদ্-হিন্দ্ ও জাপানী সৈন্য ভারতের ভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

সকল দিক থেকেই দুঃসংবাদ আসতে থাকে। সৈন্যাধ্যক্ষকদের পরামর্শ উপেক্ষা করে নেতাজী সমরক্ষেত্রের সম্মুখভাগে সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করতেন। তাঁকে মরণের কথা বললে, উত্তর দিতেন—"আমাকে মারবার মতো বোমা ইংরেজের কারখানায় আজও তৈরী হয়নি।"

যখন প্রায় সব শেষ, ১৯৪৫ এপ্রিল ২৪-এ, সাধারণ সৈন্য ও সেনানায়কদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—"পরাজয় হয়েছে, তাতে পরিতাপের কিছু নেই। যুদ্ধে হার-জিত আছেই: তবে যে দেশপ্রেম, বীরত্ব, কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মোৎসর্গের নিদর্শন রয়ে গেল, সেটা ভবিষ্যৎ-সংগ্রামীদের পরম সম্পদ।"

পশ্চাদপসরণের পালা শুরু হয়েছে—কষ্টের আর অবধি নেই। শত্রুর বোমা অবিশ্রান্ত চারিদিকে ঝরছে। তার মধ্যে নেতাজী অতি সাধারণ পদাতিকের সঙ্গে ক্লেশ ভাগ করে নিয়ে চলেছেন। বর্ম্মা, থাইল্যাণ্ড, ব্যাঙ্কক, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থলে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তাঁকে যেতে হয়েছে। এখন থেকে সঠিক খবর আর পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতি—আগষ্ট ১৭-ই তিনি বিমানপোতে ব্যাঙ্কক ত্যাগ করে ফরমোজার তাইহকুর দিকে রওয়ানা দিয়ে বেলা দু'টা নাগাদ পৌঁছান; আধ

ঘণ্টার মধ্যে তিনি অপর এক বিমানপোতে রওয়ানা দেন, গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে কারও কোনও ধারণা নেই। বোমারু বিমানখানি বেশী ওপরে ওঠবার আগে জ্বলে ওঠে এবং প্রচণ্ড শক্তিতে মাটীতে পড়ে যায়। ভীষণ আহত অবস্থায় তাঁকে জাপানী সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ১৮-ই রাত্রি আটটা-ন'টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। অপরপক্ষে গোয়েবেল (Goebell)-এর ডায়েরীর টীকাকার বলেন ঃ জাপানে আমেরিকান সৈন্যরা তাঁকে ধরতে সক্ষম হয় এবং সেনাধ্যক্ষের আদেশে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ক্রমে এই মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

প্রথম বিবরণের সত্যতা, প্রচার-কর্ত্তারা ছাড়া কেউ বিশ্বাস করেনি। নেতাজীর অন্তর্দ্ধান জগতের কাছে চিরতরে রহস্যাবৃত থেকে গেল।

রণক্ষেত্রে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ যেরকমই ভাগ্য-বিপর্য্যয় লাভ করে থাকুক, নেতাজী আর তাঁর 'ফৌজ' পরাজয়ের মধ্যে যে আঘাত ইংরেজ শক্তিকে দিয়ে গেলেন, তার ফলে ইংরেজকে ভারত থেকে বিদায়গ্রহণ করতে হয়েছে। পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা মিলিয়ে যা দাঁড়াল তাতে ভারত থেকে সরে পড়াই ইংরেজের একমাত্র গতি হয়ে প্রতিভাত হ'ল।

এ-সম্বন্ধে ভারতের তাৎকালিক সেনাপতি অকিন্লেক (Claude Auchinleck)-এর গূঢ় গুপ্ত মতামত প্রকাশ করা যেতে পারে। ১৯৪৬ নভেম্বর ২৬-এ তিনি বলেন—তাঁর বিশদ ও গভীর অভিজ্ঞতার ফলে তিনি জানেন যে, ভারতীয় সৈন্যদের অন্তরের ভাব বোঝবার শক্তি ইংরেজ অফিসার (সেনানায়ক)-দের নেই। বিশেষ করে বর্ত্তমান সৈন্যবাহিনীদের আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ সম্পর্কে যে মনোভাব সেটা তিনি কতকটা বোঝেন—তাঁর স্বতঃ-উৎসারিত চিত্তবৃত্তি ("instinct"), আর বাকীটা হচ্ছে নানা সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্য থেকে। ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রতি যে রণ-বিভাগীয় শৃঙ্খলা প্রযুক্ত হতে পারে বলে আশা করা যায়, সেটা কল্পনা করতে হয়—যদি আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ সম্পূর্ণ ব্রিটিশ-সন্তান দ্বারা গঠিত হ'ত।

তারপরও ১৯৪৬ জানুয়ারী ১-লা তিনি গোপনে লিখে জানিয়েছেন—আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের খুব বড় একটা অংশ বিশ্বাস করে যে, সুভাষ বোস একজন অতি উচ্চস্তরের দেশপ্রেমিক এবং তারা নেতাজীর নির্দ্দেশিত পথ গ্রহণ করে ঠিকই করেছে। যত প্রমাণ তিনি (অকিন্লেক) পেয়েছেন, তা থেকে, কি বিরাট প্রভাব তিনি বিস্তার করেছিলেন তার ধারণা করা যায় এবং তিনি (নেতাজী) যে বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন সে-বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। তাঁর নিজের ভাষায় ঃ

"I am not in doubt myself that a great number of them (I.N.A.) especially the leaders believed that Subhas Chandra Bose was a genuine patriot and that they themselves were right to follow

his lead. There is no doubt at all from the mass of evidence we have that Subhas Chandra Bose acquired a tremendous influence over them and that his personality must have been a strong one." (J. Connell : *Auchinleck*, p. 806)

সম্মুখ-সমরে

ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সমরে কত ভারতীয় সৈন্য জীবনদান করেছে, তার হিসাব কেউ রাখেনি। যুদ্ধে যতজন প্রাণত্যাগ করেছে—তার চেয়ে হয়তো বেশী মৃত্যুবরণ করেছে রোগে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, অনাহারে, শ্রান্তিতে ও আশ্রয়ের অভাবে। এর মধ্যে আবার বাঙ্গালী বীরবৃন্দের নাম বেছে বার করা কঠিন। যাঁদের মৃত্যু-সম্বন্ধে নিশ্চিৎ সংবাদ পাওয়া গেছে, 'দি রোল অফ অনার' নামক ইংরেজী পুস্তকে সে-রকম প্রায় ১,৮০০ নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সে-তালিকা হতে মাত্র কয়টি নাম (বাঙ্গালীর) উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রতি বিধি বাম হলেন ; বিপর্য্যয় ঘটে গেল। শত্রুর বিমান হতে অজস্র বোমা পড়তে লাগলো প্রায়-নিরস্ত্র ভারতীয় সৈনিকদের ওপর। এপর্য্যন্ত যে-কয়টি নাম সংগ্রহ করা গেছে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

এ. মজুমদার, চিকিৎসক, ১৯৪৫ সালে ড্রেস্‌ডেন সহরে বোমার আঘাতে মৃত্যু ;

এস্. বি. ভট্টাচার্য্য, চট্টগ্রাম, Third Battalion Infantry-র 2nd Lieut., বর্ম্মায় মৃত্যু ;

কে. ভট্টাচার্য্য, Naik, No. 1 Bahadur Group, রেঙ্গুনে রোগে মৃত্যু ;

বি. এন্. চট্টোপাধ্যায়, ১২/২, কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রোড, কলিকাতা-২৬, Civil Administrator, Reconstruction Deptt., চিন্দউইন নদে সলিল-সমাধি ;

বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সরোয়াতলী, চট্টগ্রাম, বর্ম্মা থেকে নিখোঁজ ;

এম্. এন্. দে চৌধুরী, Capt., 3rd Guerilla Regiment, রণক্ষেত্রে হত ;

ডি. এল্. দাস, Benares Cantt., রেঙ্গুনের মিয়াং (Myang) হাসপাতালে বোমার আঘাতে মৃত্যু ;

এইচ্. সি. দাস, রমনা, ঢাকা, Capt., I.N.A., সংগ্রামে নিহত ;

দুর্গা দাস, Infantry Group, নিহত ;

গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী, ৩-ডি, গোপী বসু লেন, বহুবাজার, সংগ্রামে হত ;

হরি দাস, No. 1. Bahadur Group, Lieut. Col., ১৯৪৬ এপ্রিল ৩০-এ জাপানী সান্ত্রীর গুলিতে নিহত ;

এস্. কে. রায়, পি. ৪০-এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯, 31st Guerilla Regiment, Naik, বর্ম্মার হাসপাতালে মৃত্যু ;

রাণা দে, L/Naik, Infantry Group, আরাকান রণক্ষেত্রে সংগ্রামে মৃত্যু ;

রবি দত্ত, চিকিৎসা-বিভাগ, ১৯৪৪ মার্চ ৩-রা ইউ (Ye-u)-তে সংগ্রামে নিহত ;

রাম দেব, জার্ম্মানীতে মৃত্যু ;

রাম দাস, Naik, ১৯৪৪ সালে ইটালীতে মৃত্যু ;

এন্. সেন, ১০২-এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা, Asst. Director, Reconstruction Department, ১৯৪৫ সেপ্টেম্বর ২৭-এ মৃত্যু ;

এন্. জি. সেন, No. 1 Bahadur Group, ১৯৪৫ সালে শত্রুর বিমান-আক্রমণে নিহত ;

বি. ভট্টাচার্য্য, রণক্ষেত্রে নিহত ;

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালেওয়া (Kalewa)-তে বোমার আঘাতে মৃত্যু ;

এম্. এন্. চৌধুরী, আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ চিকিৎসা-বিভাগ, বর্ম্মায় মানেওয়া (Manewa)-তে বোমার আঘাতে মৃত্যু ;

বি. কে. মুখোপাধ্যায়, মৌলমিন হাসপাতালের কর্ম্মী, ইম্ফল সমরক্ষেত্রে মৃত্যু ;

গণেশগোপাল সেন, আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ, মালয়ে মৃত্যু ;

শঙ্কর দত্ত, 3rd Guerilla Regiment, সংগ্রামে নিহত।

আশা করা যাক, একদিন ভারত সরকার ও আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের রেজিষ্টার থেকে সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হবে।

"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—"

বড়ই পরিতাপের বিষয়, দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-যজ্ঞের বলি ন'টি যুবকের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র জানা গিয়াছে—এঁরা 'বিদ্রোহ' করেছিলেন ভারতীয় সামরিক বিভাগে 'চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল প্রতিরক্ষা-বাহিনী' (4th Madras Coastal Battery)-র মধ্যে। অপরাধ গুরুতর ঃ রাজানুগত্য-ভঙ্গ, সৈন্যবাহিনী-ত্যাগের পরামর্শ, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিপক্ষে বিদ্বেষ-প্রচার, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় গলদ-সৃষ্টি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গুপ্তচর আর উৎকট রাজভক্তর অভাব ছিল না ; সংবাদ উচ্চমহলে পৌঁছে গেল এবং দ্বাদশ আসামী গ্রেপ্তার করে সামরিক (Court Martial) বিচারের ব্যবস্থা হ'ল। শুনানি হ'ল—১৯৪৩ জুলাই ৬-ই ও আগষ্ট ৫-ই, বাঙ্গালোর সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুজ চার্চ্চ (St. Andrews Church)-এ। বলা বাহুল্য, সকলেই দোষী সাব্যস্ত হলেন। তার মধ্যে ফাঁসির হুকুম হ'ল ন'জনের। এঁদের সকলের বয়স ২১ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে ঃ

(১) মনকুমার বসু ঠাকুর

(২) নন্দকুমার দে

(৩) দুর্গাদাস রায়চৌধুরী

(৪) নিরঞ্জন বড়ুয়া

(৫) চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(৬) ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী

(৭) সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

(৮) কালীপদ আইচ

এবং (৯) নীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দু'জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও একজনের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

বাঙ্গালোরে বিচার সম্পন্ন হয়েছে। সে-কারণে মহীশূরে ফাঁসিতে লটকানো হবে, সব ঠিকঠাক। এহেন সময়ে স্থানীয় সরকার বললেন—বিচার যখন ব্রিটিশ কোর্ট-মার্শাল কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে, তখন ফাঁসি হবে ব্রিটিশের বধ্যভূমিতে।

অসুবিধে কিছুই নেই। ঠিক হ'ল মাদ্রাজ পেনিটেন্‌সিয়ারী (Penitentiary) ; কয়েকদিন আগে যে-স্থানে আরও ছ'জনের ফাঁসিতে বধ্যভূমি পবিত্র হয়ে আছে। ১৯৪৩ সেপ্টেম্বর ২৭-এ, কারাকক্ষ হতে একজোড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রত্যেক দলই যেতে যেতে "বন্দে মাতরম্" আর "জয় হিন্দ্" ধ্বনি দিচ্ছে, আর হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করছে।

এঁদের চরম ত্যাগের ওপর ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ গড়ে উঠেছে।

"মহাসিন্ধুর ওপার থেকে—"

আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ ভারতের বাইরে থেকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালিয়েছে ; কিন্তু ভারতের ভিতরে সৈন্য ও জনসাধারণের মধ্যে অশান্তি-সৃষ্টি এবং সুযোগ-সুবিধা পেলে, স্থানে স্থানে নাশকতার কাজ করার কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

মোট ব্রিটিশ সমরশক্তিকে দুর্ব্বল করে ফেলা প্রধান উদ্দেশ্য। ওপর থেকে ডাক এল ঃ "কে কে যাবে এই নিশ্চিৎ বিপদ-বহ্নির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ?"

অভাব হ'ল না। চতুর্দ্দশ বীর এগিয়ে এলেন আজ্ঞা গ্রহণ করতে। চারটা দলে তাঁদের ভাগ করে দেওয়া হ'ল। দু'দল স্থলপথে, আর দু'দল জলপথে ভারতের মধ্যে প্রবেশ করবে। স্থলপথের যাত্রীরা রেঙ্গুনে এসে আবার দু'দলে ভাগ হয়ে, একদলের চট্টগ্রাম, আর দ্বিতীয় দলের আসামের মধ্যে দিয়ে আসা স্থির হয়।

চট্টগ্রাম-অভিমুখী চার যাত্রী সেখানে এসে পৌঁছুলেন—১৯৪২ অক্টোবর ২৬-এ। আসাম-যাত্রী দলের পাঁচজনের মধ্যে ছিলেন—ফৌজা সিং আর ফণীন্দ্রনাথ রায়। স্থানীয় গুপ্তচর মারফত খবর পেয়ে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

সমুদ্রপথে সাব্‌মেরিন করে এসে একদল কালিকট আর দ্বিতীয় দল কাথিয়া-ওয়াড় উপকূলে নামেন। দু'দলই রবার-নৌকা-সাহায্যে পাঁচ মাইল দূর থেকে এসে কূলে পৌঁছান। সময় লেগেছিল একুশ ঘণ্টা। কালিকটে অবতরণকারীদের মধ্যে ছিলেন এস্‌. এ. আনন্দ ও এম্‌ এ. কাদির, আর দ্বিতীয় দলের পাঁচজনের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধন।

একুশ ঘণ্টা সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করে সকলেই ক্লান্ত। কোনো নিরাপদ আস্তানা খুঁজে বার করবার আগেই স্থানীয় লোকরা অপরিচিত আগন্তুক দেখে পুলিশে খবর দেয়। 'কালিকট' ও 'কাথিয়াওয়াড়'—দু'দল একই অবস্থায় পুলিশের কবলে পড়ে।

সকল দলের লোককে এনে মাদ্রাজ-দুর্গে জমা করা হয়। ১৯৪৩ মার্চ ৮-ই বিচার আরম্ভ হয় এবং এপ্রিল ১-লা প্রদত্ত রায়ে—(১) আব্দুল কাদির, (২) এস্‌. এ. আনন্দ, (৩) ফৌজা সিং, (৪) সত্যেন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধন ও (৫) বি. পেরিয়ার-এর ফাঁসির হুকুম হয়।

সকলেরই মাদ্রাজ পেনিটেন্‌সিয়ারী (Penitentiary)-তে ১৯৪৩ সেপ্টেম্বর ফাঁসি হয়।

ফাঁসির অব্যবহিত আগের রাত্রিটা সকলে "বন্দে মাতরম্‌" গান করে কাটিয়েছেন। ফাঁসির মঞ্চে যাবার পথে—"সুভাষবাবু কি জয়", "ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নিপাত যাক", "ভারতের জয় হোক" প্রভৃতি ধ্বনি দিয়েছেন—ফাঁসির দড়িতে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার আগে পর্য্যন্ত।

সত্যেনের মাতুল ফণীন্দ্রনাথ রায় অন্যতম আসামী ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি মুক্তি পান। তাঁর কথায় ঃ "সত্যেন বেতারে সংবাদ দেওয়ার বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করেছিল। মালয়ে ডাক ও তার বিভাগে নিযুক্ত ছিল। প্রথম সুযোগেই সে আমার সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'-এ যোগদান করে।"

ফাঁসির আগে সত্যেন এক পত্র লিখে মাতুলকে পাঠান। তাতে ছিল ঃ

"ভাই এবং মামা,

আমার লিখিবার ও বলিবার কিছু নাই। সমস্ত তোমরা জান। যদি কোনো দিন দেশে ফিরে যাও, আমার মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিও এবং দেখিও এই আমার অনুরোধ।

"ভাই ও মামা, আমি ইহজগতে কত সুখী ও গর্ব্বিত যে ভগবান আজ আমার জীবনটা দিয়েছেন দেশের কাজের জন্য বলি দিতে। এ মৃত্যু সম্মানিত মৃত্যু। ··· যদি কোনো দিন ভগবান সময় দেন তাহলে প্রতিহিংসা নিতে চেষ্টা করো। ··· বিদায় দাও হাসিমুখে। ··· বাঙ্গালীর এ মৃত্যু আজ নূতন নয়। ইতি

তোমাদের ভাগ্যবান
কানু"

দক্ষিণান্ত

মোট কথা দাঁড়াচ্ছে ঃ আর 'কালা' সৈন্যদের ওপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সৈন্য দিয়ে এতবড় দেশ-শাসন সম্ভব নয়; অর্থ-সংস্থানের কথা এসে পড়ে। তার ওপর আছে সঙ্ঘর্ষ। 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি'র মতো এসে যোগ দিয়েছিল নৌ-বিদ্রোহ ও বিমান-বহরে বিদ্রোহ। এর প্রথমটি দেখা দিল—১৯৪৬ ফেব্রুয়ারী ৮-ই, যখন বম্বেতে রণতরী 'তলোয়ার'-এর সহস্রাধিক যোদ্ধা, নায়কের আদেশ অমান্য করে বিদ্রোহ ঘটায়। এই ঘটনা উপলক্ষ করে চারিদিকে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য জাহাজের মধ্যে ফিরোজ, মছলিমার, আকবর এবং বেতার-বার্ত্তা-ষ্টেশনের কর্ম্মীরা একযোগে বিদ্রোহ করে। বোম্বাই সহরের নানা স্থানে খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। ফেব্রুয়ারী ২১-এ অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানের কয়েকটি রণতরীকে বোম্বাই অভিমুখে চলে আসার জরুরী বার্ত্তা প্রেরণ করা হয়। বিদ্রোহীরাও নিজেদের মধ্যে তারে ও বেতারে সংযোগ রক্ষা করে ইংরেজের শক্তির সঙ্গে সমান পাল্লা রক্ষা করে চলে। একসময়ে মনে হয়েছিল ইংরেজের ভারতীয় নৌশক্তির বিলোপসাধন ঘটতে বসেছে।

করাচী বন্দরে, ১৯৪৬ ফেব্রুয়ারী ২০-এ, বিদ্রোহ শুরু হয়। হিন্দুস্থান, চানক, হিমালয়, বাহাদুর প্রভৃতি নৌবহরের কর্ম্মীরা ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পাল্লা প্রায় সমান-সমান।

কলিকাতা ও মাদ্রাজে যথাক্রমে 'হুগলী' ও 'আদেয়ার' জাহাজের কর্ম্মীরা বিদ্রোহ করে। 'ইণ্ডিয়া' জাহাজের যে-সকল কর্ম্মী দিল্লীতে ছিল, তারাও প্রকাশ্য-ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বাকি ছিল বিমানবাহিনী। ১৯৪৬ ফেব্রুয়ারী ২১-এ, বোম্বাই-এর মেরিন ড্রাইভ (Marine Drive) ও আন্ধেরীতে অবস্থিত কর্ম্মীরা উপরিতন কর্ত্তাদের আদেশ অমান্য করে এবং বিক্ষোভ-প্রদর্শনের জন্য 'ওভ্যাল' (Oval)-এতে সমবেত হয়। কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে এই লক্ষণ ছড়িয়ে পড়ে। তিন শ্রেণীর বাহিনীই ইংরেজকে বুঝিয়ে দিল—তার খবরদারির অবসান অতি সন্নিকট।

এরপর যে ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করতে হবে, সে-সন্দেহের অবকাশ রইল না। উৎসাদন-পর্ব্ব শেষ। "কুইট ইণ্ডিয়া" আন্দোলন সমগ্র ভারতবাসীর মনে ইংরেজ বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছে। সেটাও ইংরেজ রাষ্ট্রনায়করা কতকটা হজম করেছিল। কিন্তু ভূত ছাড়াবার সর্ষের মধ্যে যখন ভূত আশ্রয় করেছে তখন অবস্থা যে অত্যন্ত সঙ্গীন সে-কথা বুঝতে বাকি রইল না। দম্ভে অন্ধ চার্চ্চিলের পর সতর্ক এ্যাটলী বুঝেছিলেন—এক ফাঁকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ঘাড়ে সব ঝামেলা চাপিয়ে দিয়ে, মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

নিরঞ্জন

"জীবনপণ"-বিক্ষোভ শেষ হবার পর দেশের মধ্যে বড়রকম অন্য আন্দোলনের আর কোনও লক্ষণ ছিল না। বিশ্বযুদ্ধ-জয়ে ব্রিটেনের প্রকাণ্ড এক অংশ রয়েছে। প্রধান দুই শত্রু—জার্ম্মানী আর জাপান সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত, সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা-লাভ-প্রচেষ্টা নতুন করে আরম্ভ করবার কথা সাময়িক-ভাবে স্থগিত হয়ে রয়েছে।

ভারতে বিক্ষোভ যখন স্তিমিত হয়ে পড়েছে, তখন যুদ্ধান্তে ইংল্যাণ্ডের আভ্যন্তরিক অবস্থা ভারতের কিছুটা সুযোগ এনে দিয়েছিল। জয়ী ইংরেজ এখন দস্তুরমত রণক্লান্ত। জয়ের প্রায় সবখানি গৌরব গ্রাস করেছে আমেরিকা আর সোভিয়েট ইউনিয়ন। রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় ইংরেজ তৃতীয় স্তরে নেমে গিয়েছে। লোকক্ষয় হয়েছে প্রচুর। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। ধ্বংসপ্রায় বড় বড় সহর এবং নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত বড় বড় শিল্প পুনর্গঠনের জন্য সকল শক্তি দেশের মধ্যে প্রয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দেশ থেকে খুব বেশী লোক পাঠিয়ে দূর-দূরান্তরেব রাজ্য শাসন-করা আগেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল, আর আজ একেবারে অসম্ভব। ইংরেজের চিরদিনের কামধেনু আজ আর শান্তভাবে অত্যাচার সহ্য করতে প্রস্তুত নন, এখন তিনি বশিষ্ঠের নন্দিনী; গান্ধী-সুভাষ দুই সমর-নায়ক সৃষ্টি করে শত্রু-বিমর্দ্দনে অবতীর্ণ। সে রূপ দেখে ইংরেজ আজ বিস্ময়বিহ্বল। যারা এতদিন ভারতে বসে ইংরেজের সহায়তা করেছে, তারা এখন নিজের দেশ চিনতে পেরেছে।

সুচতুর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন ভারতীয় জনপ্রতিনিধির সঙ্গে একটা মিতালির পথ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে। ক্রিপ্‌স্-দৌত্য ও গোল-টেবিল-বৈঠক পর্য্যায় হয়ে গেছে, এখন সরাসরি কতখানি শক্তি ভারতবাসীর হাতে তুলে দেওয়া যায়, তার চেষ্টা আরম্ভ হ'ল।

এই মত-পরিবর্ত্তনের পিছনে আমেরিকার একটা প্রকাণ্ড চাপ ছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বুঝেছিলেন, যুদ্ধের সময় এক "ভারত ছাড়" ঘরোয়া আন্দোলন ব্যতীত, সমগ্র ভারতে ইংরেজের লড়াইয়ের বিরুদ্ধে কোনও শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপনের বা সাহায্য করার চেষ্টা হয়নি। উপরন্তু গান্ধীজী, জওহরলাল প্রভৃতি নেতৃবর্গ সময়-সময় প্রকাশ্যভাবেই বলেছেন, ইংরেজের বিপন্ন অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁরা আর কোনও ঝামেলা বৃদ্ধি করতে চান না। তাৎকালিক রাষ্ট্রশাসনযন্ত্রে দায়িত্বশীল পদ পেলে, তাঁরা সহযোগিতা

করতেও প্রস্তুত ছিলেন। ব্রিটেন এ-দিকটা উপেক্ষা করলেও, আমেরিকা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। কারণ ইংরেজের সমগ্র সৈন্য-কটকের মধ্যে ভারতের একটা বিরাট সংখ্যা ছিল এবং জয়ের মধ্যে তাদের প্রাপ্য যশের ন্যায্য অংশ উপেক্ষায় উড়িয়ে দেওয়া সমীচীন বলে মনে হয়নি।

অন্যদিকে চাকা ঘুরতে লাগলো। যুদ্ধ ইংরেজের পক্ষে সুসম্পন্ন হ'ল এবং চার্চ্চিল ও তাঁর রক্ষণশীল (Conservative) দলই যে সকল গৌরবের অধিকারী সে-কথা নানা ভাবে প্রচারিত হতে লাগলো। সে-সময় ইংল্যাণ্ডের এ-ধারণাও হয়ে থাকবে যে, পরের সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলই কপালে জয়টীকা প'রে মন্ত্রিত্বের গদিতে আসীন হবে।

কার্য্যক্ষেত্রে অন্য ফল পাওয়া গেল। ১৯৪৫ জুলাই ৫-ই তারিখের সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিক-দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্ব্বাচিত হয়ে, জুলাই ২৬-এ এ্যাটলীকে প্রধানমন্ত্রী করে পার্লামেণ্টে এসে উপস্থিত। সাধারণতঃ শক্তিহীন অবস্থায় মানুষ বা দল যে-সকল সৎকাজ করবো বলে আশ্বাস দেয়, তারা প্রকৃত ক্ষমতালাভের পর সে-কথা আর স্মরণে রাখে না। ব্রিটেনের শ্রমিক-দল বরাবরই ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য-স্থাপন ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করেছে। এবার এ্যাটলী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তৎপূর্ব্বে, ১৯৪৫ মে ২৫-এ, ব্ল্যাক্‌পুল (Blackpool)-এ শ্রমিক-দল-সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁরা ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন (full self-government) দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ১৯৪৬ মার্চ ১৫-ই, প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী হাউস-অফ-কমন্স-এ বলেন যে, ভারত ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা-লাভ করতে চাইলে, তাতে তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কি-ভাবে ভারত শাসিত হবে এবং বহির্জগতের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক থাকবে, সেটা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন।

ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক-সরকার গঠিত হবার পর, ভারতের সঙ্গে নিষ্পত্তির একটা আন্তরিক চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু এদিকে ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের মতভেদ তো ছিলই, তার চেয়ে বড় অশান্তির কারণ দাঁড়াল মুশ্লিম-লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারে। সম্রাট ঘোষণা করেছেন যে, যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করবেন। হাতের মধ্যে রাজশক্তি এসে যাচ্ছে, সুতরাং জিন্নার দাবি উচ্চ থেকে উচ্চতর সুরে উঠতে লাগলো। আর কিছু না হলেও, বাধা দেবার শক্তি সঞ্চয় করতে তাঁদের মোটেই বেগ পেতে হচ্ছে না।

১৯৪৫ আগষ্ট ২১-এ ভারতে সাধারণ নির্ব্বাচন সংঘটিত হবে বলে দিন স্থির হ'ল। সেপ্টেম্বর ১৯-এ ওয়েভেল (Wavell) ঘোষণা করেন, সাধারণ

নির্ব্বাচনের পরই সংবিধান-রচনার জন্য কমিটী গঠিত হবে এবং তাঁদের নির্দ্দেশমত ব্যবস্থা গৃহীত হবে। ইতিমধ্যে শাসন-পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধি নিয়ে রাষ্ট্রীয় শাসন-সভা (Executive Committee) গঠিত হবে। ইংল্যাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রিরূপে এ্যাটলীও ঘোষণা করলেন, সকল দলের পক্ষ থেকে যে সংবিধানই রচিত হোক, তিনি সেটা মেনে নেবেন। ১৯৪৬ ফেব্রুয়ারী ১৯-এ পার্লামেণ্টে তিনি ঘোষণা করলেন যে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের তিন সদস্য—পেথিক লরেন্স (Secretary of State for India), ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ (President of the Board of Trade), এবং এ. ভি. আলেকজাণ্ডার (First Lord of the Admiralty) ভারতে যাচ্ছেন। মার্চ ১৫-ই তিনি বলেছিলেন—"সংখ্যালঘু কোনও দল সংখ্যাগরিষ্ঠের অগ্রগতিতে বাধা দিতে পারবে না ("We cannot allow a minority to place their veto on the advance of the majority")।

সমস্ত অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্য পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিদল ১৯৪৬ মার্চ ২৩-এ করাচী এসে পৌঁছুলেন ; পরদিন দিল্লীতে। ইতিমধ্যে ১৯৪৫ ডিসেম্বরে ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল জানা গেল। তাতে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির স্বরূপ প্রকটিত হ'ল। বোঝা গেল, মাত্র কংগ্রেস আর মুশ্লিম-লীগ ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকারী। অপর দুইপক্ষ যাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না, তারা হচ্ছে তপশীলী আর শিখ।

অন্তর্বিরোধ বৃদ্ধি ছাড়া, অন্যক্ষেত্রে কাজ বিশেষ এগুতে পারেনি। পার্লামেণ্টের তিন সদস্যের ভারত-আগমন, নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তথ্য-সংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করা হবে বলে বোঝা গেল। পার্লামেণ্টারী দলের গুরুত্ব যে খুব বেশী সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

১৯৪৬ মে ৫, ৬, ৮ ও ১০-ই সিমলাতে বড়লাট ও ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদল বসে বিফল আলোচনা হ'ল প্রচুর।

১৯৪৬ মে ১৬-ই ক্যাবিনেট-মিশন তাঁদের খসড়া-পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। এ্যাটলী একই দিনে পার্লামেণ্টে এটা ঘোষণা করেন। তাতে ভারত অখণ্ড থাকবে, কেন্দ্রের হাতে কূটনীতি, বিদেশী শক্তিবর্গের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (Foreign Affairs), প্রতিরোধ-ব্যবস্থা (Defence) এবং যোগাযোগ বা সংযোগরক্ষা (Communications) ছাড়া, বাকী সকল বিষয় প্রদেশের এক্তিয়ারে চলে যাবে। কেন্দ্রে শাসন-বিভাগ (executive) ও বিধান-পরিষদ (legislature) থাকবে।

সমস্ত ভারত—ব্রিটিশ ও দেশীয় নৃপতি শাসিত তিন স্তবকে বা (Group)-এ ভাগ হবে। হিন্দুপ্রধান অঞ্চল, অর্থাৎ প্রথম স্তবক ঃ মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িষ্যা ; দ্বিতীয় স্তবক ঃ মুসলমান-প্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু ; এবং তৃতীয় স্তবক ঃ বাঙ্গলা ও আসাম নিয়ে গঠিত হবে।

প্রত্যেক গ্রুপের এবং গ্রুপের প্রত্যেক রাজ্যের স্বতন্ত্র শাসন ও বিধান -সভা থাকবে। প্রথম দশ বছরের জন্য এক গ্রুপ ছেড়ে অন্য গ্রুপে যাওয়া চলবে না। তারপর বিধানসভার ভোটাধিক্যে এক রাজ্য নিজ গ্রুপ পরিত্যাগ করে অন্য গ্রুপে স্বেচ্ছায় যোগ দিতে পারবে। প্রতি দশ বছর অন্তর এ-বিষয় আবার নতুন করে উঠতে পারে।

'মিশন•প্ল্যান' নিয়ে ১৯৪৬ জুন ২৬-এ দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন হয়, তাতে প্ল্যান-গ্রহণের পক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা হ'ল। জুলাই ৬-ই বোম্বাই কংগ্রেস সেই মতের সমর্থন জ্ঞাপন করে। এর আগেই, জুন ৬-ই 'লীগ' এ-প্ল্যান গ্রহণের পক্ষে মত দেয়। জুলাই ৭-ই গান্ধীজী দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বিরোধী পক্ষকে নিরস্ত করার যুক্তি দিলে, মনে হ'ল, অখণ্ড ভারত রয়ে গেল ; জিন্নার পাকিস্তানের কবর হ'ল।

ক্যাবিনেট-মিশন জুন ২৯-এ ভারত ত্যাগ করে গেলেন।

তখনকার মতো একটা শান্ত ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে একটা বিরাট চক্রান্ত করে বসলেন। তিনি জওহরলালের মাথায় যে কূট-বুদ্ধি যোগালেন, তাতে সব বানচাল হয়ে গেল—তার প্রথম ধাপে, মে ৯-ই জওহরলাল, আজাদের স্থলে, কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট জুলাই ১০-ই বললেন, কংগ্রেস কেবলমাত্র 'কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এ্যাসেম্বলী'তে যেতে রাজী হয়েছে ; সেখানে যা হবে সেটাই চূড়ান্ত, অন্য সব সর্ত্ত—"গ্রুপিং" প্রভৃতি কংগ্রেস মানতে রাজী নয় ("We agreed to go into the Constituent Assembly. .... We agreed to nothing else." On the 'Grouping issue' he said, "Approached from every angle it is clear that there would be no grouping.")। এই বাচালতায় চিন্তাশীল মহলে "হায়! হায়!" পড়ে গেল। জুলাই ২৭, ২৮ ও ২৯-এ সভায় মুশ্লিম-লীগ মিশন-প্ল্যান সরাসরি পরিত্যাগ করে। ইতিহাসের চাকা এক-লহমায় সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরে গেল।

আগষ্ট ১২-ই ওয়েভেল জওহরলালকে ডেকে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার (Interim Government) গঠনের আহ্বান জানালেন।

এইবার জওহরলাল বুঝতে পারেন, তাঁর এক বক্তৃতা চিরকালের জন্য দেশের কতবড় ক্ষতি করতে চলেছে। আগষ্ট ১৫-ই তিনি বোম্বাইতে জিন্নার বাড়ী গিয়ে, বহু স্তবস্তুতি করে বিফল হয়ে ফিরলেন।

মুশ্লিম-লীগ এবার স্বমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'ল। পাকিস্তান-লাভের একমাত্র পন্থা হিসেবে, আগষ্ট ১৬-ই, 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ' (direct action) ঘোষণা করলে। এই

নির্দ্দেশের সাক্ষাৎ ফল হিসাবে যা ঘটেছিল, তার একটা অতি অসম্পূর্ণ চিত্র দিতে চেষ্টা করা যাক। বলা বাহুল্য, এ-ছাড়া নানা আকারের বিভ্রাট ঘটেছে, সারা উত্তর-ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত একটা সশঙ্কিত ভাব প্রেতভয়ের মতো বিস্তৃতিলাভ করে সাধারণ লোককে আকুল করে ফেলেছিল।

১৯৪৬ ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি কলিকাতায় বড়রকমের একটা দাঙ্গা হ'ল। মুস্লিম-লীগের সিদ্ধান্তমতে, আগষ্ট ১৬-ই কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ঐ তারিখে বাঙ্গলা ও সিন্ধুতে সরকারী ছুটি দেওয়ায়, একটা বিরাট অমঙ্গলের আভাষ ফুটে বেরুলো। ১৬-ই থেকে শুরু করে কলিকাতায় তিন দিন যে অবিশ্রান্ত নারকীয় বীভৎস ঘটনা ঘটতে লাগলো, তার বিবরণ লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আহম্মদাবাদ রণক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। পরে অক্টোবর ১০-ই থেকে ২০-এ পর্য্যন্ত নোয়াখালি একেবারে রক্তস্রোতের প্লাবন সৃষ্টি করলো; আর্ত্তের করুণ ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ভরে উঠলো। যতরকম কুৎসিত অত্যাচার কল্পনা করা যায়, সে-সকলকে অতিক্রম করে গেল নোয়াখালির ঘটনা। মহাত্মাজী আর সহ্য করতে পারলেন না; গেলেন দানবীয় তাণ্ডবে শান্তিবারি-সিঞ্চনে। অক্টোবর ৩০-এ হ'ল বিহারে প্রত্যুত্তর। নিপীড়ন সমানই হয়েছে। নোয়াখালির সঙ্গে তুলাদণ্ডে স্থান পাবার উপযুক্ত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল বললেন— দাঙ্গা যদি না থামে, বিমানপোত থেকে বোমা ফেলে সারা বিহার ধ্বংস করে ফেলবেন। নোয়াখালি সম্বন্ধে তিনি কোনও উচ্চবাচ্য করেননি।

অবাধ চলতে লাগলো নিরীহ দুর্ব্বলের ওপর দাঙ্গামত্ত লোকের অকথ্য অবর্ণনীয় নৃশংসতা। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে দাঙ্গা হ'ল পাঞ্জাব সহর অঞ্চলে; ছড়িয়ে পড়লো পাঞ্জাবের বিস্তৃত এলাকায়। দিল্লী সে-তাণ্ডব থেকে বাদ পড়লো না। এর ওপর নানা স্থানে অন্নাভাব এবং অবশ্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির অপ্রতুলতা। আনুষঙ্গিক দুর্দ্দশার কাহিনী লিখে আর কাজ নেই।

১৯৪৬ আগষ্ট ১০-ই ওয়ার্দ্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা মিশন-প্ল্যান সম্পর্ণভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু তখন সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

ইংরেজ যখন স্থির করেছে ভারতীয়ের হাতে শাসনভার ছেড়ে দেবে তখন দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ব্যাপক অশান্তির জন্য নৈতিক দায়িত্ব নামিয়ে ফেলার চেষ্টাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। সেজন্য ক্ষমতা-হস্তান্তরের চেষ্টা দ্রুততর করে তোলা হ'ল।

ব্যাপারটা তলা থেকে ঘুলিয়ে উঠলো। বোধ হয়, এক জহরলাল ছাড়া, সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। কংগ্রেস নানা ভাবে এই ক্ষতে প্রলেপ দিতে চেষ্টা করতে লেগে গেল। প্ল্যান-এর কিছু অদল-বদলের কথা উঠতে লাগলো।

কিন্তু লণ্ডন থেকে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী ও ভারত-সচিব পেথিক লরেন্স বলে দিলেন—১৬-ই মে-র 'প্ল্যান'ই বলবৎ থাকবে।

এই সময়ে বড়লাট ওয়েভেল-এর ধৈর্য্য ও অক্লান্ত শ্রমের তারিফ করতে হয়। এই হট্টগোলের মাঝে তিনি অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পথে অবিচলিতভাবে এগিয়ে চলেছেন। এর একটা প্রাথমিক আভাষ কংগ্রেস ও মুশ্লিম-লীগকে তিনি জানিয়ে দিলেন। মুশ্লিম-লীগ সরাসরি সে-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। দলীয় সংখ্যা ও বিশিষ্ট দলের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আলোচনা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগলো। ১৯৪৬ আগষ্ট ২৪-এ, কংগ্রেস ও তার মনোনীত সভ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় শাসনসভা গঠিত হয়ে গেল। সেপ্টেম্বর ২-রা নবগঠিত "সভা" ভারতের শাসনযন্ত্রের ভার গ্রহণ করলে।

আবার আলোচনা চলতে লাগলো। 'লীগ' মহা অসুবিধায় পড়ে গেল। ওয়েভেল জিন্নার সঙ্গে পত্রালাপ বজায় রেখে চললেন। অক্টোবর ১০-ই 'লীগ' শাসনসভায় আসনগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং অক্টোবর ১৫-ই "সভা" নতুন করে গঠিত হলেও বাদবিতণ্ডা সমানেই চলতে রইল। বরং বাইরে যা ছিল, মন্ত্রিসভার মধ্যে দ্বন্দ্ব অতি তিক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

অযথা কালাতিপাত না করে ওয়েভেল নভেম্বর ২০-এ সংবিধান-রচনা-সভার অধিবেশনের জন্য আমন্ত্রণপত্র ছাড়লেন। কিন্তু জটিলতা বেড়েই চলেছে দেখে, ১৯৪৬ নভেম্বর ১১-ই, এ্যাটলী বড়লাট ও ভারতীয় জন-চারেক প্রতিনিধিকে লণ্ডনে ডেকে পাঠালেন। ডিসেম্বর ১-লা ওয়েভেল ও দলবল রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে ১৯৪৬ ডিসেম্বর ৩-রা থেকে ৬-ই বিফল আলোচনা চললো।

বাক্যের ছড়াছড়ি; কাজের কিছুই হ'ল না। এরপর ডিসেম্বর ৯-ই সংবিধান-সভার প্রথম অধিবেশন হ'ল; 'লীগ'-নেতারা সকলেই অনুপস্থিত। ডিসেম্বর ১২-ই দ্বিতীয় ও ১৯৪৭ জানুয়ারী ২০-এ তৃতীয় সভার অধিবেশন হয়।

এদিকে কেন্দ্রীয় শাসন-সভা দু'দলের প্রতিনিয়ত প্রায় সকল ব্যাপারেই তীব্র কলহে বানচাল হয়ে পড়েছে। কংগ্রেস এ-অবস্থায় দাবি করে যে, 'লীগ' শাসনযন্ত্র থেকে স্বেচ্ছায় বিদায়গ্রহণ করুক। ভিতরের তিক্ত বিতণ্ডার সঙ্গে বাইরে প্রলয়-দাঙ্গা চলছিল। দেশ গুরুতর সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়লো। 'লীগ' যখন ছাড়ছে না, তখন ফেব্রুয়ারী ১৫-ই কংগ্রেস-সদস্যারা একযোগে আসন পরিত্যাগ করার অভিপ্রায় ঘোষণা করলেন।

সকল সহনশীলতার পরিমাপ অতিক্রম করে গেলে, ১৯৪৭ ফেব্রুয়ারী ২০-এ এ্যাটলী ঘোষণা করলেন যে, ১৯৪৮ জুন মাসে ইংল্যাণ্ড ভারত-শাসনের

সমস্ত দায়িত্ব পরিত্যাগ করবে, আর এই সময়টার জন্য মাউণ্টব্যাটেন ওয়েভেল-এর স্থলে ভারতের বড়লাট হবেন।

মাউণ্টব্যাটেন ভারতে পদার্পণ করলেন—১৯৪৭ মার্চ ২২-এ এবং ২৪-এ শাসনভার গ্রহণ করলেন। অবস্থার কোনও উন্নতি নেই, বরং উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই চলেছে। মাউণ্টব্যাটেন মনে করে এসেছিলেন যে, ভারতকে বিভক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে। ১৯৪৭ মার্চ ৮-ই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী পাঞ্জাব ভাগ করার ইঙ্গিত দিলেন ; কার্য্যক্ষেত্রে পড়ে দেখলেন যে, অবস্থা সকল আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এপ্রিল ২৮-এ সংবিধান-গঠন-সভার প্রেসিডেণ্ট ভারত-বিভাগ-ব্যবস্থা মেনে নিলেন। জওহরলাল "গ্রুপিং"-এ আপত্তি করেছিলেন, আজ তিনি নীরব রইলেন ; রাজনীতিতেও তো বটেই, সংবিধান-সভায় এর বিপক্ষে একটু "টুঁ" শব্দও করলেন না। ১৯৪৭ মার্চ ৩১-এ মহাত্মাজী বলেছিলেন—কংগ্রেস ভারতকে বিভক্ত করতে গেলে, আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে করতে হবে ("If the Congress wishes to accept partition, it would be over my dead body")।

এরপর ভারত-বিভাগ-নীতির ওপর খসড়া-দলিল তৈরি হ'ল এবং মে ১৮-ই মাউণ্টব্যাটেন শেষপর্য্যায়ে আলোচনার জন্য লণ্ডন যাত্রা করলেন ; কাকেও সঙ্গে লওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি ফিরলেন, মে ৩১-এ, তাঁর প্রস্তাবে অনুমোদন লাভ করে। জুন ৩-রা নতুন পরিকল্পনা প্রচারিত হ'ল লণ্ডনে ও ভারতে। জুন ৩-রা বড়লাট সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কাছে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা সাধারণের গৃহীত ধারণা অনুযায়ী ("notional" division) বিভক্ত হবে বলে জ্ঞাপন করেন ; আর জানালেন ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হবে। জুন ৪-ঠা মাউণ্টব্যাটেন জানালেন—১৯৪৮ জুনের পরিবর্ত্তে ১৯৪৭ আগষ্ট ১৫-ই শাসনভার-হস্তান্তরের দিন ধার্য্য হয়েছে। তখনও মন্ত্রিসভার মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে,—কোনও ব্যাপারেরই মীমাংসা হয় না। বড়লাটের পরামর্শে, জুন ৪-ঠা স্থির হয়—উচ্চ পর্য্যায়ের সকল বিভেদ তাঁর কাছে পেশ করা হবে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশ তাদের মনোনীত রাষ্ট্রের কথা জ্ঞাপন করতে লাগলো। জুন ২৭-এ 'পার্টিশন কাউন্সিল' তাঁদের সুচিন্তিত প্রস্তাব জ্ঞাপন করতে থাকেন। পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা ভাগ করার ভার র‍্যাড্‌ক্লিফ-কে অর্পণ করা হয়।

বড়লাট-দপ্তরে রাত্রিদিনে কাজের বিরাম নেই। জুলাই ২-রা ম্যাউণ্টব্যাটেন 'ভারত-স্বাধীনতা বিল'-এর খসড়া নেতাদের কাছে স্থাপন করলেন, আর জুলাই ৪-ঠা ঐ বিল হাউস-অফ-কমন্স (House of Commons)-এ উপস্থাপিত হয়। জুলাই

১০-ই বিল-এর দ্বিতীয় এবং ১৬-ই তৃতীয় দফা আলোচনা শেষ হলে, ১৮-ই সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে।

পরদিনই মাউণ্টব্যাটেন 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ আগষ্ট ১৫-ই ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে দুই স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করে। ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হলেন মাউণ্টব্যাটেন আর পাকিস্তানের •জিন্না। আগষ্ট ১৮-ই 'র‍্যাড্‌ক্লিফ রোয়েদাদ' প্রকাশলাভ করে; ফলে—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অংশে পড়ে সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ (Division) এবং রাজসাহী বিভাগের অবিভক্ত রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী ও পাবনা এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের খুলনা জেলা।

পশ্চিম বাঙ্গলার (ভারত) অংশে সম্পূর্ণ বৰ্দ্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিভাগের অবিভক্ত কলিকাতা, চব্বিশ-পরগণা, মুর্শিদাবাদ এবং রাজসাহী বিভাগের দার্জ্জিলিঙ জেলা যুক্ত হয়।

নদীয়া, যশোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদহ—এই পাঁচটি জেলা বিভক্ত হয়ে যায়। চারটে থানা বাদে, বাকী সমস্ত সিলেট আসাম থেকে কেটে নিয়ে পাকিস্তানে জুড়ে দেওয়া হয়। লোকের উঠান, গোয়ালঘর, বাগান, বাস্তুভিটা, খানা-ডোবা ভাগ হয়ে দুই রাষ্ট্রে গিয়ে পড়েছে। এরপর এক রাষ্ট্র থেকে আর-এক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের ধন, প্রাণ, ইজ্জত প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়ে আশ্রয়ের জন্য অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনাহীন! যে বর্ব্বরতার মধ্যে ভীতিবিহ্বল মানুষ রক্তপ্রবাহে ভেসে চলেছে—তার নির্ম্মমতা কল্পনায় আনা যায় না। যত প্রাণহানি, অঙ্গহানি, দৈহিক ও মানসিক অনাচার ঘটেছে, সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা যতটা ভোগ করতে হয়েছে—কালিকলমে তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু সকলের পিছনে যে দুর্ব্বার শক্তি কাজ করছেন, তাঁরই নির্দ্দেশে ইতিহাসের গতিপথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। কেবল বিপ্লবী নয়, কোনও দেশপ্রেমিক এ-স্বাধীনতা মনেপ্রাণে চাননি। "বন্দে মাতরম্" বলতে গেলে খণ্ডিত ভারত—ছিন্নবাহু মাতৃমূর্ত্তি মানসচক্ষে ফুটে ওঠে। "সেই গান্ধার হ'তে জলধি-শেষ" নেই, "পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা" নেই,—সবই টুকরো-টুকরো। তথাপি যতটা রক্ষা পেয়েছে তাকে "জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে" মনে করে—সকল দীনতা, হীনতা, শঠতা, আলস্য ও স্বার্থচিন্তা বৰ্জ্জন করে দেশকে বড় করে তোলবার জন্য সীমাহীন কৃচ্ছ্রসাধন জীবনযাত্রার অঙ্গ বলে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

অবশিষ্ট

পুলিশ-দপ্তর এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত দণ্ডিত ব্যক্তির নাম ও দণ্ডের পরিমাণ ও তারিখ ছাড়া, আর কিছু সংগ্রহ করতে পারা যায়নি ঃ

		সশ্রম কারাদণ্ড (বছর)		সাল (তারিখ)
কুমুদ বণিক	—	সাত	—	১৯০৫
সুরেশচন্দ্র ভাণ্ডারী	—	তিন	—	২২. ১. ১৯০৯
হীরেন্দ্র দত্ত	—	দশ	—	১৫. ৩. ১৯১১
বঙ্কিম দাশগুপ্ত	—	তিন	—	১৯১৩
ঠাকুরদাস পাল	—	সাত	—	১২. ৩. ১৯১৩
*মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	—	তিন	—	×. ৬. ১৯১৪
যতীন্দ্রনাথ হালদার	—	ছয়	—	২৫. ৯. ১৯১৬
আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	—	তিন	—	১৯১৭
শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়	—	ছয়	—	২৫. ৯. ১৯১৬
সুরেশচন্দ্র ভরদ্বাজ	—	চার	—	৩. ৪. ১৯১৮
ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার	—	তিন	—	১৯. ১২. ১৯১৮
দ্বিজেন্দ্রকুমার নাগ	—	চার	—	১৮. ৩. ১৯২৭
রাখালচন্দ্র দাস	—	সাত	—	২৪. ৭. ১৯৩০
বীরেশ্বর সেনগুপ্ত	—	তিন	—	৪. ৫. ১৯৩১
হৃদয়রঞ্জন আচার্য্য	—	চার	—	৫. ৬. ১৯৩১
নগেন্দ্র মোদক	—	নয়	—	৬. ৭. ১৯৩১
বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়	—	তিন	—	২০. ১১. ১৯৩১
হেমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী	—	সাত	—	৩০. ১১. ১৯৩১
লক্ষ্মণ রাহা	—	পাঁচ	—	১৭. ১২. ১৯৩১
ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	—	সাত	—	৮. ১. ১৯৩২
ক্ষীরোদমোহন দাশগুপ্ত	—	দশ	—	১. ৫. ১৯৩২
রামচন্দ্র সাহা দাস	—	পাঁচ	—	১২. ৫. ১৯৩২
সুবলচন্দ্র রায় কর্ম্মকার	—	সাত	—	১২. ৫. ১৯৩২
তারাপদ নাগ	—	তিন	—	১৬. ৫. ১৯৩২

	সশ্রম কারাদণ্ড (বছর)	সাল (তারিখ)
'ভাকু'র বাপ	পাঁচ	২২. ৫. ১৯৩২
অমর সিং	দশ	২২. ৫. ১৯৩২
রবীন্দ্রভূষণ দত্ত	তিন	৭. ৬. ১৯৩২
লতিফ সেখ	পাঁচ	২২. ৬. ১৯৩২
মধুসূদন সেনগুপ্ত	চার	২. ৭. ১৯৩২
কামিনীকুমার দে	পাঁচ	২৬. ৫. ১৯৩২
অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দশ	১২. ৭. ১৯৩২
যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	পাঁচ	১২. ৭. ১৯৩২
গরিবুল্লা সেখ	তিন	১৯. ৭. ১৯৩২
গণেশচন্দ্র সরকার	তিন	২৭. ৯. ১৯৩২
জ্যোতির্ম্ময় সরকার	সাত	২৭. ৯. ১৯৩২
ক্ষিতীশ রায়	ছয়	৩০. ৯. ১৯৩২
ফটিকলাল উপাধ্যায়	চার	২৪. ১০. ১৯৩২
রেণুকুমার ঘোষ	তিন	১. ১২. ১৯৩২
জগজ্জীবন চক্রবর্ত্তী	তিন	১. ১২. ১৯৩২
মণীন্দ্রচন্দ্র সরকার	সাত	৯. ১২. ১৯৩২
ভূপালচন্দ্র গুহ	পাঁচ	১৬. ১২. ১৯৩২
রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	তিন	১৯. ১২. ১৯৩২
অমূল্যকুমার দেওয়ান	তিন	২৮. ১২. ১৯৩২
বঙ্কিমচন্দ্র সাহা	সাত	২৬. ৪. ১৯৩৩
যতীন্দ্রনাথ কর	পাঁচ	১. ৬. ১৯৩৩
নারু মিয়া	চার	৫. ৭. ১৯৩৩
অমর দত্ত	চার	৬. ৭. ১৯৩৩
ভবানীনাথ উকিল	ছয়	৮. ১. ১৯৩৪
কুমুদবন্ধু মজুমদার	দশ	৮. ১. ১৯৩৪
শৈলেশচন্দ্র সেনাপতি	যাঃ দ্বীঃ	৬. ৪. ১৯৩৪
লক্ষ্মণচন্দ্র অধিকারী	ছয়	২৮. ৬. ১৯৩৪
সুধীর কাঞ্জিলাল	পাঁচ	১৬. ৭. ১৯৩৪
অনিলচন্দ্র সেন	সাড়ে পাঁচ	৩১. ৭. ১৯৩৪
হরেন্দ্র দে	ছয়	৩১. ৭. ১৯৩৪
মনোরঞ্জন দে	তিন	৩১. ৭. ১৯৩৪

	সশ্রম কারাদণ্ড (বছর)	সাল (তারিখ)
সুবোধচন্দ্র গুহ	পাঁচ	৩. ১০. ১৯৩৪
তারকনাথ কর	তিন	১. ১২. ১৯৩৪
ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	দশ	১৪. ১২. ১৯৩৪
বিশ্বনাথ লাহিড়ী	সাত	২৮. ১. ১৯৩৫
সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	পাঁচ	২৮. ১. ১৯৩৫
শান্তিলতা মুখোপাধ্যায়	ছয়	২৩. ২. ১৯৩৫
গোলাম হোসেন	সাত	২. ৩. ১৯৩৫
জামাল আলি সেখ	সাত	২. ৩. ১৯৩৫
রাধাবল্লভ সমাদ্দার	পাঁচ	৯. ৩. ১৯৩৫
রাজকা সাঁওতাল	সাত	১৯. ৩. ১৯৩৫
বংশী চাকু	তিন	৩০. ৪. ১৯৩৫
অবনীমোহন ভট্টাচার্য্য	সাত	১. ৫. ১৯৩৫
সুরেশকুমার দত্ত রায়	তিন	১২. ৬. ১৯৩৫
শচীন্দ্র রাউত	পাঁচ	২৩. ৯. ১৯৩৫
অবিনাশচন্দ্র সরকার	চার	২৮. ১১. ১৯৩৫
কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়	তিন	৩০. ১১. ১৯৩৫
দেবেন্দ্রলাল ঘোষ	চার	২৮. ১. ১৯৩৬
সুরেন্দ্রনাথ বসু	চার	১২. ২. ১৯৩৬
শচীন্দ্রকুমার দত্ত	চার	১৫. ৫. ১৯৩৬
সুধীরসিন্ধু দে	পাঁচ	১০. ১০. ১৯৩৬
সুবোধচন্দ্র ঘোষ	সাড়ে চার	২৬. ৪. ১৯৩৭
অধীরচন্দ্র সিংহ	সাত	৩০. ৫. ১৯৩৭
মদনমোহন রায়	ছয়	১১. ৭. ১৯৩৭
সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	তিন	১২. ৪. ১৯৩৮
দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী	পাঁচ	?

যাঁদের সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় পরে পাওয়া গেছে :

ময়মনসিংহের যতীন্দ্রনাথ দে আগ্নেয়াস্ত্র-সমেত ধরা পড়েন ; দণ্ডভোগকালে ময়মনসিংহ জেলে ১৯৩৪ এপ্রিল ৯-ই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বর্ম্মা-সীমান্তে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছিলেন গোপালচন্দ্র সেন। তাঁর বাসস্থান ৪২-নং শিব ঠাকুর লেন, ১৯৪৪ সেপ্টেম্বর ২১-এ, খানাতল্লাসীর সময় তিনি তিনতলার ছাদ হতে লাফ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে।

'বঙ্গীয় সংশোধিত দণ্ডবিধি আইন'-অমান্যে, ১৯৩৬ জুন ১২-ই, অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্যের ছ'বছর ন'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

সুভাষচন্দ্রের পলায়ন সম্পর্কে সাহায্য করার সন্দেহে, যতীশচন্দ্র গুহ গ্রেপ্তার হন এবং পুলিশ-অত্যাচারের ফলে দিল্লী জেলে প্রাণত্যাগ করেন।

'বঙ্গীয় সন্ত্রাস-সমন আইনে' আশুতোষ মাইতি, ১৯৩০ (?) আগষ্ট ৩-রা ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

ললিতচন্দ্র চৌধুরী (পৃঃ ৩৫৪)—দশ বছর দণ্ডকালের মধ্যে ১৯১৭ সালে মণ্টগোমারী জেলে মারা যান।

বারে বারে কারাবরণ করার পর, জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক মুক্তি পেয়ে, ১৯৪১ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ পৌঁচেছিলেন। দারুণ টাইফয়েড রোগে বিছানায় পড়ে আছেন—এমন সময়ে, ডিসেম্বর ১৩-ই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। দু'দিনের মধ্যেই জেলের ভিতর তাঁর মৃত্যু ঘটে। গুজব উঠেছিল : এটি কঠোর পুলিশ-নির্য্যাতনের অবধারিত ফল।

বাঙ্গলার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকায়, কুসুমরঞ্জন পালের কারাবাস ঘটেছিল। পরে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ভারতীয় খনিজদ্রব্যাদির ব্যবসা আরম্ভ করেন। নেতাজী জার্ম্মানী পৌঁছুলে, তিনি নেতাজীর সংস্পর্শে আসেন এবং বার্লিন-রেডিয়োতে বক্তৃতা দিতে থাকেন।

জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর কুসুমরঞ্জন বন্দী-অবস্থায় রাশিয়ায় নীত হন। তার পর থেকে তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রসচিব বলেন—(১) সুরেন্দ্রনাথ কর জেলে আত্মহত্যা করেন, (২) যতীন্দ্রনাথ রায় এবং (৩) ধীরেন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়ের কলেরায় মৃত্যু ঘটেছে। (১৯১৮ জুলাই ৫ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা')

আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার আসামী ভূপেন মজুমদার পলাতক অবস্থায় 'পালা আশ্রমে' এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রাজসাহী জেলে মারা যান (শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত : 'বিপ্লবের পথে')।

পুলিশের সন্দেহ-দৃষ্টি এড়াবার জন্য শচীন্দ্রনাথ রায় আত্মগোপন করেন ১৯১৫ সালে। তারপর আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি।

পাথরপ্রতিমায় অন্তরীণ থাকার সময় গোপেশচন্দ্র রায় ;
বরিশালের সুনীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রাজসাহী জেলে ; এবং
জিতেন সমাদ্দার (বরিশাল) অন্তরীণ অবস্থায় মারা যান।

হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বৈপ্লবিক কার্য্যের অংশগ্রহণে যাবার সময় ইঞ্জিনের তলায় পড়ে প্রাণত্যাগ করেন।

সুশীল দত্ত উত্তরবঙ্গে ১৯১৬ সালে, এবং মণীন্দ্র বসু ১৯১৫ সালে ময়মনসিংহে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

ত্রিপুরার অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী অস্ত্র-আইন-ভঙ্গে ১৯১৭ জানুয়ারী ২২-এ দু-দফায় তিন ও সাত বছর সমকালীনভোগ দণ্ডপ্রাপ্ত হন।

গিরীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জীবিকার্জ্জনের উপায় প্রকাশ না থাকায়, তিন বছর কারাদণ্ড লাভ করেন।

প্রতিশোধ

কুমিল্লার আব্দুল খালেক পাঠান (ওরফে 'মালি') গুপ্তচরবৃত্তি করছেন বলে চরমপন্থীদের নজরে পড়ে। ১৯৩২ ডিসেম্বর ২০-এ, কালীকচ্ছে যাত্রা দেখে যখন ভোররাত্রে বাড়ী ফিরছে, সে-সময় হঠাৎ একটা বুলেট এসে তার বুকের বাঁ-দিক ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটে।

'মাণিকতলা ডাকাতি' মামলায় আশুতোষ নিয়োগী সরকারপক্ষে সাক্ষী দিয়ে বিপ্লবীদের আক্রোশে পড়েছিল। একটা প্রেসে কাজ করে সে উপজীবিকা অর্জ্জন করতো। ১৯৩২ ডিসেম্বর ৩০-এ, প্রায় মাঝরাতে যখন কাজ সেরে ফিরে, বাড়ীর দরজা খুলে দেবার জন্য বাড়ীর লোককে ডাকছিল—সেই সময় একটা গুলি এসে তার রগে (কপালের পাশে) লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটায়।

নারায়ণগঞ্জের ১৯৩৪ নভেম্বর ১১-ই তারিখের সংবাদে প্রকাশঃ হীরেন্দ্রনাথ গুহ গুপ্তচরবৃত্তির অজুহাতে অজ্ঞাত আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হয়েছে।

একসময় "কংগ্রেসের চাঁই" বলে নাম কিনেছিল—খুলনার শিশুপাল দত্ত। গুপ্ত-সমিতি সম্পর্কে খোঁজখবর সংগ্রহ করবার আগ্রহ দেখে দলের লোকরা বার-তিন-চার সতর্ক করে দিয়েছে। নিয়তির টানে যে চলেছে,—কারও কথা সে শোনেনি ; ফলে, ১৯৩২ অক্টোবর ১৭-ই রাত্রে, তার বাড়ীর মধ্যে আততায়ী প্রবেশ করে গুলি মেরে তাকে হত্যা করে সরে পড়ে।

INDEX

Locations and Events

Personages

[*Different persons with the same name have been mentioned separately.*]

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

R

S